# ২৮ অক্টোবর

# ইতিহাসের কলো অধ্যায়

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

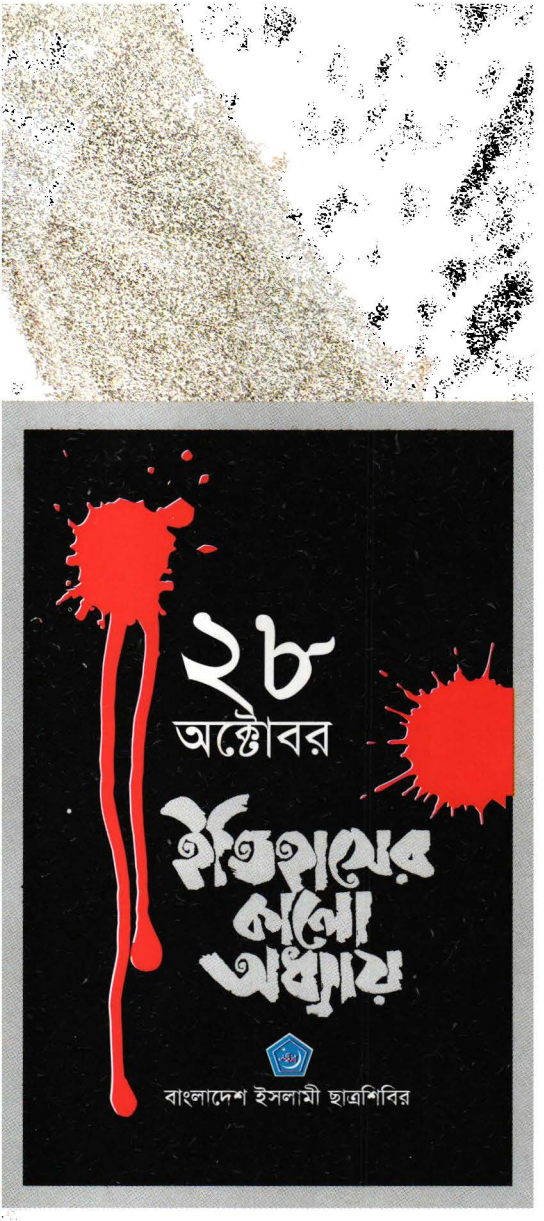


icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর
# ইতিহাসের কালো অধ্যায়

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১ এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৫০৫৩৮, ৯৫৬৬৪৪০
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৮১১৬৬৫০
www.shibir.org.bd

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০০৭ ইংরেজি
কার্তিক ১৪১৪ বাংলা
শাওয়াল ১৪২৮ হিজরী

শুভেচ্ছা মূল্য
১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা

icsbook.info

প্রধান সম্পাদক
মু. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

সম্পাদক
মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম

সম্পাদনা সহযোগী
শেখ নেয়ামুল করিম
মুহাম্মদ রেজাউল করিম
মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন
শেখ মোঃ রোকন রেজা
শিশির মুহাম্মদ মনির
মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন
মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন
হাফেজ আবু তাহের
আবুল কালাম আজাদ
ছগির বিন সাঈদ
শাহ মোঃ ফয়সাল বিন রহমান
ডা. আব্দুল কাদির নোমান
মু. শামসুল আরেফিন হাসিব
মির্জা গালিব
ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক
ডা. মঈন উদ্দিন
আবু সাইদ খান
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
মো'তাছিম বিল্লাহ
মিজানুর রহমান


icsbook.info

আলহামদুলিল্লাহ, কৃতজ্ঞতার মস্তক অবনত করছি সেই মহান আল্লাহ সুবহানহু তায়ালার দরবারে যার একান্ত মেহেরবাণীতে শহীদ ভাইদের স্মৃতি সম্বলিত স্মারক গ্রন্থ-"২৮ অক্টোবর: ইতিহাসের কালো অধ্যায়" বের করা সম্ভব হয়েছে।

"আমাদের শহীদেরা সবচেয়ে বড় সম্পদ, গড়ে গেছে সাহসের দ্বিধাহীন সোজা রাজপথ" সত্য মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্বের আরেকটি অনবদ্য দলিল হয়ে থাকবে ২৮ অক্টোবর। চিরদিন বাতিলের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবে, পেশী শক্তির পরাজয় ঘটে আদর্শের লড়াইয়ের কাছে। পল্টন প্রান্তর তার স্বাক্ষী দেবে যুগ-যুগ ধরে।

দেশ, জাতি, মানবতা ও ইসলামের জন্য যারা প্রাণপন চেষ্টায় নিবেদিত হবে তাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য অনিবার্য।

শহীদ হোসাইন মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন, সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম, আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল, রফিকুল ইসলাম ও শহাজাহান ভাইয়ের জীবন উৎসর্গ ইসলামী আন্দোলনের গতি সঞ্চার করেছে শহীদ শাব্বীর, হামীদ, আইয়ুব ভাইয়ের পথ ধরে।

তাই এই পথ আমাদের চিরচেনা অনুপ্রেরণারই উৎস স্থল। পল্টনের রক্তাক্ত পথ আর বিভিষিকাময় দৃশ্য আমাদের বারবার ত্যাগ আর কোরবাণীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে।

আমি আশা করি এ সংকলনের প্রতিটি ফাইল, প্রতিটি দৃশ্য আমাদের হৃদয় নীড়ে দেশ, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র গঠনে নৈতিক শক্তির বিজয়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে। লক্ষ প্রাণে আশার সঞ্চার করবে। আমাদের শহীদ আর জীবন্ত শহীদ ভাইদের আত্ম প্রত্যয়দৃপ্ত সাহসী ভূমিকার ঋণ পরিশোধ করতে পারবনা বটে তবে তাদের রেখে যাওয়া কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারলেই হয়ত কিছুটা শান্তনা খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন শহীদ ভাইদের শাহাদাতের সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা দানসহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন।
আমীন।

মু. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

icsbook.info

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে ২৮ অক্টোবর তারিখটি স্থায়ীভাবে লেখা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদেরা বাংলাদেশ নামক বইটির পাতা উল্টালেই ২৮ অক্টোবর তারিখটি দেখতে পাবেন। কিন্তু তারিখটি তাদের কোন সুখস্মৃতির কথা বলবে না। সভ্যতা যখন জ্ঞানে বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষের দিকে এগোচ্ছিল সেই একবিংশ শতাব্দির শুরুতে একপাল মানুষের (!) বর্বরতার দৃশ্য ভেসে উঠবে তাদের চোখে। সেদিনের ধারণকৃত ভিডিওচিত্রে চোখ রাখা সম্ভব হলে ইতিহাসবিদেরা দেখবেন মানুষের মতোই দেখতে কতগুলো জীব প্রকাশ্য রাজপথে একটি মৃতদেহের উপরে লাফাচ্ছে। তাদের হাতে লাঠি, বৈঠা। চেহারায় যে উল্লাস তা মানুষের নয়।

ইতিহাস হলো আগামীর রোডম্যাপ। ভবিষ্যতের পৃথিবীকে সুন্দর করতে হলে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হয়। কারা সত্যিকারের বন্ধু আর কারা বন্ধুর ছদ্মবেশে বিষাক্ত ফণা গুটিয়ে রেখেছে; সুযোগ পেলেই ছোবল দিতে প্রস্তুত সুন্দর দেশ গড়তে হলে এই পার্থক্য জানতে হবে। আমরা এই সংকলন রেখে যাচ্ছি ইতিহাসের কাছে, আগামীর কাছে। আমাদের বিশ্বাস ক্ষমতালিপ্সুদের চিনতে অনাগত প্রজন্মকে সাহায্য করবে এই সংকলন। আর যারা এই বইটি হাতে তুলে নিয়েছেন তাদের সবার বিবেকের কাছে এই বইয়ের শব্দ-অক্ষর আর ছবিগুলো এক-একটি প্রশ্নের মতো। নির্দোষ কতগুলো মানুষ, যাদের নিয়ে একদিন স্বপ্ন দেখতেন তাদের স্বজনেরা, তাদের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এ ভূখন্ডের প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তার জন্যই জরুরি।

এই সংকলন আমরা সাজিয়েছি প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, কবিতা আর স্মৃতি-এ্যালবাম দিয়ে। চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব তথ্যসমৃদ্ধ করতে। সংকলনের জন্য অনেক শ্রদ্ধাভাজন অসম্ভব ব্যস্ততার মাঝেও কলম ধরেছেন, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। শহীদদের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। দয়াময় আল্লাহ তাদের ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। এই সংকলনের সাথে জড়িত সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন।

২৮ অক্টোবর আমাদের চোখ খুলে দেয়, শহীদের রক্ত আমাদের কাঁদায়, স্বজন-হারাদের হাহাকার আমাদের স্বপ্ন দেখায় একটি রক্ত ক্লেদ ও জিঘাংসামুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার এই সংকলন আমাদের সুন্দর আগামীর পথ দেখাবে, ক্ষমতালিপ্সু পাশবশক্তির সামনে শীসাঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যাওয়ার শক্তি জোগাবে, এই বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে, এই প্রার্থনা মহান আল্লাহর কাছে।

আমরা জানিনা এ সংকলনে উঠে আসা অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসা রাষ্ট্রীয়ভাবে কবে হবে। তবে আমাদের বিচারের প্রার্থনাকে ঘুরিয়ে ধরেছি মহান প্রভুর দরবারে, আর আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিটি মানুষের বিবেকের দ্বারে।

আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

icsbook.info

# সূচিপত্র

**প্রবন্ধ**


শহীদের সাফল্য নিশ্চিত - ০৯
অধ্যাপক গোলাম আযম

২৮ অক্টোবর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলংকিত দিন - ১১
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

পল্টনে বদরের প্রান্তর - ১৪
শফিকুল ইসলাম মাসুদ

ইসলামী শক্তির উত্থান ঃ বিনাশী নৃশংসতা - ১৮
আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

রাজনীতির নামে পশুশক্তির উল্লাস - ২২
মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

রক্তাক্ত ২৮ অক্টোবর - ২৮
ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক

স্মরণে হৃদয়ে অব্যাহত রক্তক্ষরণে মনে জাগে নতুন নতুন প্রশ্ন - ৩০
আবদুল কাদের মোল্লা

উন্মত্ত ঘাতকের পৈশাচিক উল্লাস - ৩৫
ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

মানবিক বিপর্যয়ের এক কালো অধ্যায় - ৪০
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

যে দৃশ্য দেখা যায় না - ৪৫
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)

ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম রাজনীতির মানবতা বিরোধী নৃশংস রূপ - ৫০
অধ্যাপক মো: তাসনীম আলম

২৮ অক্টোবরের প্রশ্ন - ৫৩
সাইফুল আলম খান মিলন

আটাশে অক্টোবর : অন্যরকম দৃশ্যপট - ৫৬
আ.জ.ম. ওবায়েদুল্লাহ

রক্তাক্ত ইতিহাসের মাইল ফলক - ৬১
অধ্যাপক মফিজুর রহমান

অত্যাচার নির্যাতন ও শাহাদাতের সাথে বেহেশতের সম্পর্ক - ৬৮
প্রফেসর ডা. মো: মতিউর রহমান

মুখোশধারী ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদিদের কান্ড - ৭৩
প্রফেসর ড. কুরবান আলী

শিক্ষা ও নৈতিকতার সমন্বয় অপরিহার্য - ৭৬
প্রফেসর ড. এম. উমার আলী


icsbook.info

যে স্মৃতি আজো কাঁদায় - ৮১
অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম

গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে ফ্যাসিবাদ ঃ ভয়াল ২৮ অক্টোবরের অভিজ্ঞতা - ৮৬
প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ

২৮ অক্টোবর নব্য জাহেলিয়াতের জ্বলন্ত রূপ - ৯১
মতিউর রহমান আকন্দ

২৮ অক্টোবর ২০০৬ : একটি দু:স্বপ্ন যেন! - ৯৫
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের

যে স্মৃতি বেদনা ও প্রেরণার - ৯৭
মজিবুর রহমান মন্‌জু

রক্তের ঋণ শোধ হয় না - ১০৩
মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান

শহীদের কাতারে এক বঞ্চিত মানুষ - ১০৬
মুহাম্মদ রেজাউল করিম

জান্নাতের পথের যাত্রী যারা - ১১৪
শেখ নেয়ামুল করিম

যে স্মৃতি আজও দোলা দেয় - ১২১
মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন

শ্বাসরূদ্ধকর ক'টি ঘন্টা - ১২৫
মো: জামাল উদ্দিন

চলে গেলেন ফয়সাল ভাই - ১৩০
ডা. মুহা: হাফিজুর রহমান

খুনিরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে - ১৩২
হাফেজা আসমা খাতুন

পূন্যভূমি সিলেটে ২৮ অক্টোবর ২০০৬ - ১৩৭
সিরাজুল ইসলাম শাহীন

**শহীদ পরিবারের সদস্যদের লেখা - ২৪১ - ২৮৪**

**অনুভূতি - ২৮৫ - ৩৫২**

**স্মৃতিচারণ - ৩৫৩ - ৩৮০**

**সাক্ষাৎকার - ৩৮১ - ৩৯৬**

**কবিতা - ৩৯৭ - ৪২০**

**শহীদ পরিচিতি - ৪২১ - ৪২৩**

**এ্যালবাম - ৪২৫ - ৪৬৫**

**জাতীয় দৈনিকে ২৮ অক্টোবর - ৪৬৭ - ৪৭৩**

icsbook.info

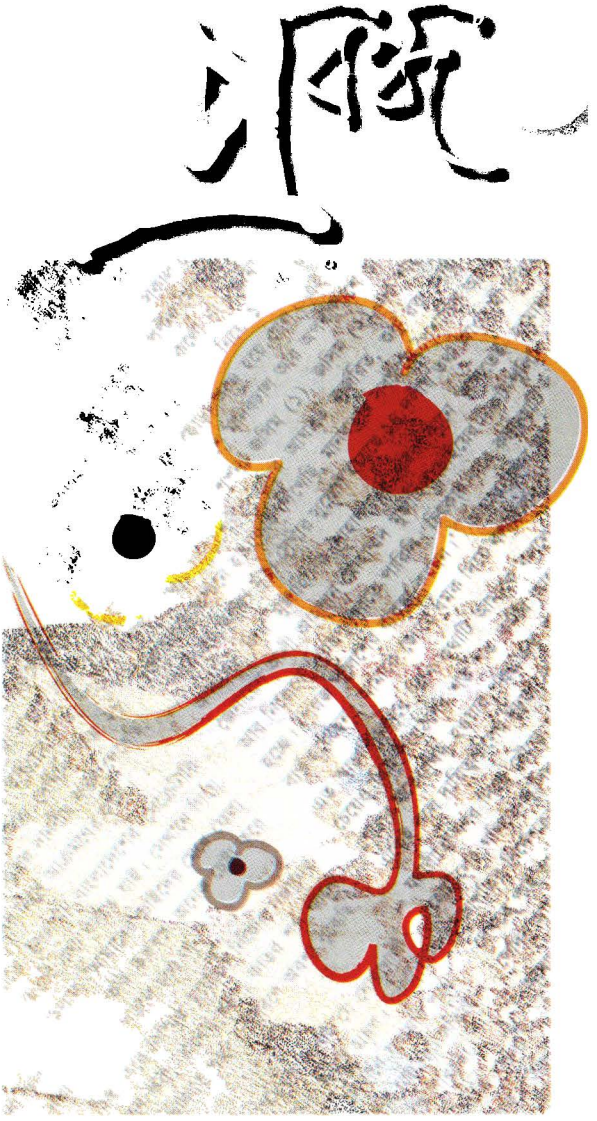

icsbook.info

# শহীদের সাফল্য নিশ্চিত

অধ্যাপক গোলাম আযম

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরাট সম্ভাবনাময় ৫ জন প্রতিভাবান আল্লাহর সৈনিক হিংস্র রাজনীতির শিকার হয়। বেঁচে থাকলে তারা দ্বীনের অত্যন্ত যোগ্য খাদেম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতো। তরুণ বয়সেই তারা শহীদ হয়ে সারা জীবনের করণীয় খেদমত এক সাথেই সমাধা করে গেল।

তাদের কথা মনে হলে তাদের আকর্ষণীয় চেহারা চোখে ভাসে এবং অন্তরে তীব্র বেদনা বোধ করি। তাদের রক্তাক্ত ছবি পোস্টারে ও পত্রিকায় যেই দেখেছে তারই মর্ম স্পর্শ করেছে। প্রত্যেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে যে, কোন মানুষ কি এমনভাবে হিংস্র পশুর আচরণ করতে পারে? তারা তো জনসভায় যোগদান করতে গিয়েছিল। তাদের হাতে ভলান্টিয়ারের লাঠিও ছিলনা। জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় যোগদান করতে আসা ছাড়া আর কোন অপরাধই তাদের ছিলনা। নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যাকরে লাশের ওপরে নৃত্য করে উল্লাস প্রকাশ করার মতো জল্লাদ সৃষ্টি করা কি রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব হতে পারে? এ কেমন রাজনীতি? রাজনীতির উদ্দেশ্য তো জনসেবা। আর কর্মপদ্ধতি হল গণতান্ত্রিক। সন্ত্রাস ও পেশী শক্তির ব্যবহার গণতান্ত্রিক বলে গণ্য হতে পারেনা। এটা রাজনীতি নয়। পাশবিকতা।

২৮ অক্টোবর প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ বাহিনীর সামনে লগি-বৈঠার নৃশংস তান্ডব টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে অগনিত মানুষ হতভম্ব হয়ে দেখেছে। টিভির ফুটেজে তা জীবন্ত আছে। অপরাধিদের চেহারা থেকে তাদেরকে চিহ্নিত করা কঠিন নয়। কাদের নির্দেশে সন্ত্রাসীরা মারমুখী ভূমিকা পালন করেছে তা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত নয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সর্বস্তরের দায়িত্বশীলগণের নিকটই এ ঘটনা ভালভাবে জানা। এ সত্ত্বেও এ মামলা কোন গুরুত্ব পাবে না বলেই মনে



icsbook.info

হয়। কারণ বিষয়টাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হিসাবেই বিবেচনা করা হতে পারে। নিরপরাধ মানুষ হত্যার বিচার করার দায়িত্ববোধ তাদের আছে কিনা তা কে জানে?

১৯৮২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৪ জন নেতাকে হত্যা করা হয়। জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকার অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থাও করল। কিন্তু এরশাদ রাজনৈতিক স্বার্থে ঐ শাস্তি মওকুফ করে দিলেন।

আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয়ে গেল তারা তো জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করল । সুবিচার করতে যারা ব্যর্থ হল তাদের বিচার আল্লাহর হাতে, যিনি কখনও ব্যর্থ হন না। আখিরাতে তো তিনি বিচার করবেনই, দুনিয়াতেও আংশিক বিচার করতে পারেন।

ইসলামী আন্দালনের সাথে আমরা যারা জড়িত তাদের নিকট এ শহীদগণ প্রেরণার উৎস। আমরাও আন্তরিকভাবে শাহাদাতের মর্যাদা কামনা করি। কিন্তু দুশমনের হাতে নিহত হয়ে শহীদ হওয়ার ইখতিয়ার কারো হাতে নেই। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এ বিষয়ে ফয়সালার মালিক। রাসূল (সা.) আশ্বাস দিয়েছেন যে, যদি কেউ আন্তরিকভাবে শাহাদাত কামনা করে তাহলে সে বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মনযিলে পৌঁছিয়ে দেবেন। যারা দুশমনের হাতে নিহত হলো তারা নিশ্চিতভাবে সফল। আমরা যতই শাহাদাতের মনযিল কামনা করি আমাদের সাফল্য অনিশ্চিত।

---

*লেখক : সাবেক আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।*



icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর
# ইতিহাসের কলংকিত দিন

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

২৮ অক্টোবর ২০০৬। বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলংকিত দিন। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ১৪ দলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা লগি-বৈঠা-লোহার রডসহ স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হিংস্র হায়েনার মত বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে আয়োজিত জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের তাজাপ্রাণ নেতা-কর্মীদের। সন্ত্রাসীরা জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাদের লাশের উপর উল্লাস নৃত্য করে সৃষ্টি করেছিল এদেশের ইতিহাসে এক হৃদয় বিদারক কলংকিত ইতিহাস। তাদের বর্বরতা সেদিন আদিম যুগের বর্বরতা ও নৃশংসতাকে হার মানিয়েছিল। হামলাকারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সেদিন বায়তুল মোকাররম ও পুরানা পল্টন এলাকাকে রণক্ষেত্রে পরিনত করে, হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোকানপাটে অগ্নি সংযোগ এবং লুটতরাজ চালিয়ে সৃষ্টি করেছিল এক ত্রাসের রাজত্ব। সেদিনের পৈশাচিক হামলায় নিহত হয়েছিল ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য হোসাইন মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, সাথী গোলাম কিবরিয়া শিপন ও সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম, জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হাবিবুর রহমান, জসীমউদ্দিন (লালবাগ), কর্মী জসীম উদ্দিন (ঢাকা মহানগরী) এবং এক হাজারের অধিক লোক আহত হয়েছিল।

প্রশ্ন হলো কি অপরাধে তাদের হত্যা ও আহত করা হলো ? তাদের অপরাধ তারা ইসলামকে ভালবাসত। তারা এদেশে ইসলামী সমাজ কায়েম করতে চেয়েছিল। তারা মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিত। তারা আল্লাহর রাসূল (সা.) কে ভালবাসত এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলত। তারা আধিপত্যবাদী শক্তির তাঁবেদারদের কবল থেকে এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামকে হেফাজত করার সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল। এ হত্যাকান্ড যারা ঘটিয়েছিল তারা এদেশের স্বাধীনতা



icsbook.info

সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও ইসলামের দুশমন। এ ঘটনার মাধ্যমে জাতির সামনে সেদিন পরিস্কার হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসর ১৪ দল ফ্যাসিবাদী শক্তি। তাদের হাতে এদেশের জনগণের জান-মাল, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন কোন কিছুই নিরাপদ নয়। সেদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত হামলা চালিয়ে তারা এক বিভিষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে গোটাজাতিকে আতংকিত করে দিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার লগি-বৈঠা নিয়ে রাজপথ দখলের মত দায়িত্বহীন আহ্বানের কারণেই ২৮ অক্টোবরের ঘটনার মাধ্যমে সেদিন আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র, মানবতা ও মনুষ্যত্ব ভুলুণ্ঠিত করেছিল। শক্তি নয় যুক্তিই হলো গণতন্ত্রের ভাষা। আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের সন্ত্রাসীরা সেদিন যুক্তির পরিবর্তে পেশী শক্তির মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী কায়দায় শক্তি প্রদর্শন করে মূলত: গণতন্ত্রকেই হত্যা করেছিল। আ'লীগ ২০০১ সালের অক্টোবর থেকেই নির্বাচিত চারদলীয় জোট সরকারকে গায়ের জোরে ঠেলে ফেলে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল ২৮ অক্টোবরের ঘটনা ছিল তারই চূড়ান্ত পর্যায়। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি তাদের ন্যূনতম শ্রদ্ধা থাকলে কখনো তারা সেদিন লাঠি-বৈঠা দিয়ে এভাবে রাজপথে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করতে পারত না। চারদলীয় জোট সরকার সাফল্যের সাথে ৫ বছরের মেয়াদকাল পূর্ণ করে শান্তিপূর্ণভাবে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে নির্বাচনকে পাশ কাটিয়ে জোর করে ক্ষমতা দখলের জন্যই তারা সেদিন এ সশস্ত্র মহড়া দিয়েছিল। তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, ভয় দেখিয়ে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে গোটা দেশের নিয়ন্ত্রভার গ্রহণ করার ষড়যন্ত্রই বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিল। দেশের উপর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ নজিরবিহীন সহিংস ঘটনা ঘটাতে তাদের বিবেক এতটুকু বাঁধেনি। নিরস্ত্র জনতা মানব ঢাল সৃষ্টি করে, শাহদাত বরণ করে ব্যূহ রচনা করে সেদিন আ'লীগের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করেছিল। সেদিনের এ ঘটনায় শান্তির পক্ষে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ দেশের নিরীহ শান্তিকামী মানুষ যে নজীর সৃষ্টি করেছিল তা এ দেশের মানুষের নিকট চিরদিন অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আ'লীগ ও ১৪ দলের সেদিনের নৃশংস ঘটনা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমর্যদা ও ইজ্জত সম্মানকে করেছিল ভুলুণ্ঠিত। সেদিন আওয়ামী বাকশালীদের নৃশংসতা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা বাংলাদেশকে করেছে কলংকিত। তারা সেদিন জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশে হামলা চালিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা চালিয়েছিল। তারা জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের শীর্ষ নেতাদের হত্যা করে তাদের বিদেশী আধিপাত্যবাদ কায়েমের পথের কাঁটা দূর করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল একটি তাঁবেদার সরকার। তাদের সে ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয়নি। আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসর কমিউনিস্টরা কখনো গণতন্ত্র ও জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করেনা। তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দেশবাসীকে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

২৮ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা প্রমাণ করেছে যে, তারা গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত রয়েছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির



icsbook.info

রাজনীতি করে। তারা যে কোন পরিস্থিতি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম। তারা শত উস্কানী ও উত্তেজনার মুখেও আল্লাহর উপর ভরসা ও অবিচল বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে খালি হাতে গুলির সামনে দাঁড়িয়ে সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবন দিতে পারে, নিজেদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে তারা ফ্যাসিবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র বানচাল করার হিম্মত রাখে।

সেদিন যারা আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে নিজেদের জীবন দিয়েছে তারা নি:সন্দেহে সাচ্চা শহীদ। সেদিন যারা শহীদ হয়েছে তারা ভাগ্যবান। সত্য ও ন্যায়ের জন্য আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার চাইতে সৌভাগ্যের আর কিছুই হতে পারে না। সেদিন যারা শহীদ হয়েছে তাদের অনেক স্বপ্ন ছিল, অনেক আশা ছিল। কিন্তু তারা সব কিছু ছেড়ে আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছে। আজকে তারা আমাদের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থান করছে। তাদের রক্তের বদলেই হয়ত আগামী দিনে এদেশে ইসলামী আন্দোলন আরো শক্তিশালী হবে এবং আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে।

শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের সকলের। তাদের হত্যাকারীদের হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়ার জিঘাংসার রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করিনা। আমরা চাই, দেশের প্রচলিত আইনে হত্যাকারীদের শাস্তি হোক। তবে হত্যাকারীদের শাস্তিই শেষ কথা নয়। তারা যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্ন দেখত সে স্বপ্ন যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলেই তাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে এবং তারা শান্তি পাবে। তাই সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এদেশে একটি ইসলামী সমাজ কায়েমের আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। দেশে একটি শোষণ, জুলুম, বৈষম্যমুক্ত, ইনসাফপূর্ণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের সংকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ২৮ অক্টোবরের শহীদদের স্মরণ করার জন্য আমি সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি এবং সেদিনের শহীদদের সাচ্চা শহীদ হিসেবে কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি ও দোয়া করছি। আল্লাহ যেন তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করেন। আমীন।

---

*লেখক : আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং সাবেক কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী*



icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর পল্টনে যা দেখেছি

মু. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

২৮ অক্টোবর ২০০৬। হঠাৎ একটি ফোন এলো!– 'সন্ত্রাসীরা আমাদের ভাইদের ওপর অতর্কিত হামলা করেছে। আমরা এখন কি করবো?'

ফোনটি এলো পল্টন মোড় থেকে। কেন্দ্রীয় অফিসে এসে বসেছি কেবল। অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি অবাক করা দৃশ্য! রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাতে কাতরাতে অফিসের দিক আসছেন একের পর এক আহত ভাইয়েরা! নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করলাম। যতই সামনে এগুচ্ছি, ততই আহত ভাইদের দৃশ্য বাড়তে লাগলো। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

পল্টন মোড়ে পৌঁছে শিউরে ওঠার মতো দৃশ্য দেখলাম। সংঘর্ষ চলছে বিরামহীন। দোকানপাট ভাঙচুর আর অগ্নিসংযোগ করে পরিস্থিতি নাজুক করে ফেলেছে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের সন্ত্রাসীরা। সারাদেশ থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের। সাথে যোগ হয়েছে লগি-বৈঠা হাতে আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত অস্ত্রধারী ক্যাডাররা। সন্ত্রাসীদের মদদদাতা হাজী সেলিম ও ডা. এইচ ইকবালের নেতৃত্বে প্রকাশ্যেই আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে হামলা পরিচালনা করছে জামায়াতের সমাবেশে আগত শ্রোতাদের ওপর।

তখন বেলা ১১টা। মুক্তাঙ্গনে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে বিভিন্ন এনজিও ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে চুক্তিভিত্তিক লোক নিয়ে এসেছে। তাদের কেউ খালি হাতে নেই– লগি-বৈঠা, বাঁশের লাঠি, পিস্তল, চাকু, রামদা, কিরিচ, পাইপগানসহ বিস্ফোরক দ্রব্যে সজ্জিত সবাই। যেই দলীয় নেত্রীর নির্দেশে তারা এগুলো হাতে নিয়েছে, সেই নেত্রীর নির্দেশেই প্রতিপক্ষের ওপর প্রয়োগ করেছে অত্যন্ত নির্মমভাবে।

যে কেউ সেদিনের সংঘর্ষের ধরণ দেখলে বুঝতে পারবেন দেশের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি জামায়াত এবং শিবিরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই তারা এই পরিকল্পিত হামলা পরিচালনা করেছে। জামায়াত-শিবিরের নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয় কর্মীরা কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে যায় বিভৎস এক ভয়াবহ নারকীয় তাণ্ডব! কারো মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। রক্তের স্রোতে মুখমণ্ডল ভিজে গিয়ে পুরো শরীর যেন



icsbook.info

রক্তাক্ত এক জনপদ! কোন স্তর যেন বাদ পড়েনি। কখনও আহত যুবক, কখনও বা তারুণ্যে ভরা ফুটন্ত গোলাপের মতো মুখগুলো, কিংবা দাড়িপাকা পিতৃতুল্য মুরুব্বিরা কাতরাতে কাতরাতে ফিরছেন অফিসের দিকে। একটু সামনে যেতেই গ্র্যান্ড আজাদের সামনে দেখলাম মনজু ভাইকে আহত অবস্থায় রিকসায় করে নিয়ে আসছেন একজন। মাথাটা ঘুরে গেল। নিজেকে সামলাতে না পেরে দৌড় দিলাম পল্টন মোড়ের দিকে। পেছন থেকে কারা যেন আমাকে টেনে ধরার চেষ্টা করলেন। সেই মৃদু বাধা বরং আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আরও সহযোগিতা করলো।

পল্টন মোড়ে গিয়ে দেখলাম তুমুল লড়াই! অস্ত্র, বোমা আর লগি-বৈঠার বিরুদ্ধে খালি হাতে ইট আর পাথরের টুকরা দিয়ে প্রতিরোধের দৃশ্য গা শিউরে ওঠার মতো। অবাক-বিস্ময়ে দেখলাম সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র আঘাতের মুখে ইসলাম, দেশ, গণতন্ত্র আর মানবতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী শিবির কর্মীদের সামনের দিকে এগিয়ে যাবার এক শিলাদৃঢ় অবিচল সুকঠিন প্রত্যয়।

সামনের দিকে অগ্রসর হলে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি। তবু পেছনে ফিরে তাকাবার মতো ফুরসতটুকু যেন নেই কারো। একটু সামনে এগিয়ে ইসলামের শত্রু ও দেশদ্রোহীদের পিছু হটিয়ে দেশের মাটি রক্ষার প্রত্যয়দৃপ্ত অঙ্গীকারের এক বাস্তব প্রতিফলন যেন সবার চোখে-মুখে।

সেই সকাল থেকে শুরু। বিরামহীন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। দুপুরের খাবারের যেন কোন চিন্তাই নেই কারো। এমনকি জোহর এবং আসরের নামাজ পড়ে নিতে হয়েছে রাস্তায়। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য! আল্লাহর এই জমিন এক ইঞ্চিও যেন ষড়যন্ত্রকারী আল্লাহদ্রোহীদের হাতে ছেড়ে দিতে নারাজ। তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে রক্ত ঝরছে শরীর থেকে, হাত ভেঙেছে, কিংবা পায়ে লেগেছে– সেই অবস্থায়ও হাত বেঁধে, রক্তাক্ত মাথায় পট্টি বেঁধে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অবিচল দাঁড়িয়ে ঠায়। ক্লান্ত শ্রান্ত সবাই, কিন্তু তবু কি এক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ! নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারি না। ভিষণ পিপাসার্ত সবাই। একটু পানি পেলে গলা ভিজিয়ে নেয়া আর কি। কিন্তু সেই পানি যাকে দেয়া হয় তিনিই বলেন, আমার পাশের ভাইকে দিন, সে আমার চেয়েও বেশি ক্লান্ত। এক বোতল পানি, পিপাসা নিবারণে সক্ষম অসংখ্য আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদের। দায়িত্বশীল সামনে দৌড়ে গেলে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় আমাদের কর্মীরা, উত্তপ্ত সংঘর্ষমুখর পল্টন মাঠেও দেখলাম আমাদের প্রিয় নবী-রাসূল কারীমের (সা.) যুদ্ধের সেই অবিকল চিত্র। বিশ্বাস করুন, চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। যখন দেখলাম একজন একটু সামনে এগিয়ে গেলেই তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যান অন্য একজন। আমি ডানে কিংবা বাঁয়ে এগোলে আমার সাথে সাথে সেও ডানে কিংবা বামে অবস্থান নেয়। মনে হলো সেই যুদ্ধের ময়দানের কথা, যেখানে সাহাবায়েকেরাম আমাদের প্রিয় নবীকে পাহারা দিতেন জীবন বাজি রেখে।

তখনও চারটা বাজেনি। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে যথারীতি প্রোগ্রাম শুরু হলো। আমীরে জামায়াত বক্তব্য রাখবেন। তীব্র সংঘর্ষের মধ্যেও চোখে মুখে তাই



icsbook.info

কর্মীদের আনন্দের বন্যা। একে অপরের হাতে হাত ধরে দু'হাত উপরে তুলে শপথবদ্ধ কর্মীরা; জীবন যাবে তবু আল কুরআনের সমাবেশ স্থল কুরআনের বিরোধিতাকারীদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে না।

পল্টনে বদরের প্রান্তর তীব্র উত্তেজনার মাঝেও রীতি অনুযায়ী জনসভা শুরু করার ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। কোরআনের কর্মীরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিবেদিত বলেই পেটে তীব্র ক্ষুধা ও পিপাসার্ত বুক নিয়ে অতন্দ্রপ্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজপথে। তেলাওয়াতের প্রতিধ্বনি ক্ষুধা আর পিপাসার রাজ্যে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। মাত্র দশ হাত দূরে হায়েনাদের মরণ ছোবল আর ঠিক তার পাশেই পিনপতন নিরবতায় তেলাওয়াতের মাধ্যমে জনসভা শুরু দেখে বুক ভরে গেল। আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামতের মত কে যেন একজন এই বিরাট ডামাডোলের মধ্যে কিছু খাবার নিয়ে এলো যা প্রয়োজনমতে তুলনীয় খুবই নগন্য। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার! মনে হলো প্রত্যেকেই প্রচন্ড রকম ক্ষুধার্ত থাকার পরও নিজে না খেয়ে অপর ভাইকে খেতে দেবার এক অন্যরকম প্রতিযোগিতা। একে একে সবাই পেট পুরে খেল অথচ কি বরকতময় খাবার যেন তা কখনোও শেষ হবার নয়। পানি দিয়ে কেউ পিপাসা নিবারণ করছেন, কেউবা ক্ষত রক্তাক্ত স্থানে দিয়ে একটু শরীরটা ঠান্ডা করার অবকাশ পাচ্ছেন। চরম শত্রুকে বন্ধু করে নেয়ার এক বাস্তব নমুনা চোখের সামনে পড়তেই চোখ পানিতে ভিজে গেল। একটু আগেই যে পুলিশ আমাদের নিরপরাধ নিরস্ত্র কর্মীদের দিকে তেড়ে আসছিল। ছুঁড়ে মারছিল কাঁদানে গ্যাস– শিবির কর্মীরা নিজেরা খেতে না খেতেই সমান ভাগে ভাগ দিল আমাদের অদূরে অবস্থানরত পুলিশ ভাইদের জন্য। প্রথমে পুলিশের ভাইয়েরা খানিকটা অবাক হয়ে নিতে রাজী হচ্ছিল না। পরে দায়িত্বশীল ভাইদের অনুরোধে তৃপ্তির সাথে সবাই খেয়ে নিলেন। মনে হলো এই পুলিশ এবং এই দেশ আমাদের রাষ্ট্রের সম্পদ, একে রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরও আছে। দেশপ্রেমের নমুনা জীবন বিপন্ন হবার মুহূর্তেও তাই বিলুপ্ত হয়নি হৃদয় থেকে। কিন্তু হায়েনারা হিংস্র পশুকেও হার মানলো। জনসভা শুরু হতে না হতেই পার্শ্বের ৪ তলা বিল্ডিং থেকে সোজা জনসভার মহাসমুদ্রের মাঝে শক্তিশালী বেশ কিছু বোমা ছুঁড়ে মারল। মনে হলো অনেকেই মারা যাবেন। কিন্তু আল্লাহর কী অপার করুণা তাঁর বান্দার জন্যে! বোমার বিকট আওয়াজ আর ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলেও আমাদের ভাইয়েরা ধীরস্থিরভাবে ঠিক তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন কারোরই কিছু হয়নি। তার ঠিক কিছু পড়েই শুরু হলো বন্দুক দিয়ে গুলি ছোঁড়া সেই একই জায়গায় থেকে। আমরা বন্দুকের গুলি দেখাতে পাচ্ছি। কিন্তু কোন এক শক্তির ইশারায় কোথায় এসে যেন তা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তখনও ইস্পাত কঠিন অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের কোরআন প্রিয় কর্মীরা। আমরা বুঝতেই পারছিলাম শত্রু পক্ষের এটা মরণ কামড়। এখন তারা দুর্বল হয়ে এসেছে। আর আমাদের জনসভাও আজ সফল প্রায়।

শ্রদ্ধেয় আমীরে জামায়াতও অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে লাখো জনতাকে সামনে রেখে এই উত্তেজনার মাঝেও এমনভাবে বক্তব্য রাখলেন, যেন এই পল্টনে কিছুই ঘটেনি। বক্তব্য শুনে মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। মঞ্চ



icsbook.info

থেকে নেমে এলে বিডিআর উভয় পক্ষকে মাঠ ছেড়ে দিতে বললে আমরা জনসভা সফল হয়েছে ভেবে সবাইকে বিদায় করে অফিসের দিকে ফিরে যেতেই একজন এসে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করলো। আমাদের প্রিয় মুজাহিদ ভাই আর নেই। তাকে ফিরিয়ে দিন মাসুদ ভাই। শান্তনা দেয়ার কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না। শহীদ মুজাহিদ দেশের জন্য আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে কবুল করেছেন এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি আছে। আল্লাহ তো আমাদের মত গুনাহগারদের কবুল করলেন না। এতটুকু ছাড়া আর কিছুই বলার ছিল না আমার। ইবনে সিনা হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে গিয়ে দেখালাম এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। যেন ৫/৬ জনের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পড়ে আছে। ডাক্তার বললেন– কোন আশা নেই যদি আল্লাহর কোন ফায়সালা থাকে তা ভিন্ন। খুব কষ্টে কান্না থামিয়ে রাখলাম। পাশের রুমের এক মারাত্মক আহত ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলতেই কান্না আর ধরে রাখতে পারলাম না। জ্ঞান ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আমরা সবাই মিলে কাঁদলাম সেই ভাইটির জন্য, কি অবিশ্বাস্য! পাশের আরেকটা রুমে গিয়ে রেজাউল করিম ভাইয়ের সাথে কথা বলছি এমন সময় সেই রুমের ভাইটি গিয়ে আমাকে বললেন যার জন্য দু'আ করেছেন, সে আপনার সাথে কথা বলতে চায়। গিয়ে দেখলাম সত্যি নড়াচড়া করছে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে হাত মেলাবার জন্য। প্রাণভরে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। ইতোমধ্যেই আমাদের মাঝে থেকে বিদায় নিয়েছেন শহীদ মুজাহিদ, প্রিয়ভাই ছাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম ও প্রিয়ভাই শিপন। জানাযা হওয়ার কথা ছিল আমাদের প্রিয়ভাই আমানেরও। আল্লাহ আমাদের আবেদন শুনলেন। ফিরিয়ে দিলেন আমানকে আমাদের মাঝে। ডাক্তারদের কথা মত আমীরে জামায়াতকে ৪ জনের জানাযার কথা বলেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর করুণা যে, আমাদের মোনাজাত তিনি শুনলেন। হাসপাতাল থেকে অফিসে ফিরে যেতে মক্কা থেকে ফোন করলেন একজন ভাই। বললেন, ঘাবড়াবেন না আমরা কাবার গিলাফ ধরে আপনাদের জন্য সেই ঘটনার পর থেকে দু'আ করছি। চোখ পানিতে ভিজে গেল। ঠিক ফোনটা রাখতে না রাখতেই ফোন করলেন আরেকজন ভাই মদীনা শরীফ থেকে। বললেন, মসজিদে নববীতে আমরা আপনাদের জন্য দু'আ করছি, আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন। হৃদয়টা ভরে গেল, মনে হলো আমরা একা নই। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন এবং আমরাই বিজয়ী হবো। সত্যি আল্লাহ আমাদের বড় বিজয় দিয়েছেন। ২৮ অক্টোবর আমাদের জন্য একটা দিন শুধু নয়। এদিনটি আমাদের জন্য প্রেরণার এটি অনেক বড় শেখার এক মুহূর্ত। বদরের প্রান্তরে আমরা ছিলাম না ঠিক কিন্তু অন্য রকম এক বদর পেয়েছি আমাদের জীবনে। যা সুদূরপ্রসারী এক জীবন্ত নমুনা হয়ে থাকবে সকল সংকটে, বিজয়ে আর জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে।

---

*লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# বিনাশী নৃশংসতা

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর শুধু আমার জীবনেই নয় আমার মনে হয় অগণিত বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে একটা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ এঁটে গেছে। কারণ সেদিন যা ঘটেছে এবং যেভাবে ঘটেছে তা সভ্য মানুষের মন নিয়ে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আমার কাছে পল্লবী থানা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি এসে খবর দিল যে, শিবিরের সদস্য মুজাহিদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। খবর পরিবেশনের সময় তাকে আমি অতিমাত্রায় অস্থির, উত্তেজিত, আবেগাপ্লুত এবং বিরামহীন কান্নারত দেখেছি। আমার মনে তাৎক্ষণিক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছিল তার এত বেসামাল হওয়ার কারণ কী? ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীর পক্ষে তো এত অস্থির হওয়া উচিত নয়। কিন্তু পরবর্তীতে আমি সে প্রশ্নের জবাব পেয়েছি, জবাব পেয়েছি ২৮ অক্টোবরের সংঘটিত ঘটনাবলী নিশ্চিতভাবে জানার পর এবং ভিডিও ফুটেজে সেদিনের নির্মমতার দৃশ্য দেখে।

একটি সভ্য সমাজে অথবা গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিভিন্ন দল থাকবে, মত থাকবে, পক্ষ-বিপক্ষ থাকবে। কিন্তু প্রতিপক্ষের লোকদের উপর এভাবে পৈশাচিক ও নির্মমভাবে প্রতিশোধ নিতে হবে তা বিবেক দিয়ে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেদিন তা-ই ঘটেছিল। সেই নির্মম হৃদয়বিদারক ঘটনা আর কোথাও এভাবে ঘটেছে বলে মনে হয় না।

সেদিনের ঘটনা এবং তার পূর্ব ও পরের পর্যবেক্ষণ একথাই বলে যে, জিঘাংসাসুলভ, প্রতিশোধমূলক বড় ধরনের ঘটনা ঘটানোই ছিল সেদিনের লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যটি ছিল জামায়াতে ইসলামীর মূল নেতৃত্বকে বিনাশ করে দেয়া।

ঘটনা পরম্পরায় আক্রমণকারীদের লক্ষ্য পরিষ্কার হয়ে পড়ল। জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশস্থল ছিল বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর দিকের সড়কে অর্থাৎ পল্টন চৌরাস্তা থেকে বেশ নিরাপদ দূরত্বে। সমাবেশটা ছিল শান্তিপূর্ণ এবং সরকারের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং কেয়ারটেকার সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বপ্রস্তুতি



icsbook.info

মাত্র। সমাবেশটির উদ্দেশ্য ছিল জোট সরকারের সফলতার বিশেষ দিককে হাইলাইট করা। ইতোমধ্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের জনমত ছিল জোটের পক্ষে। ফলে আরেকটি শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে চারদলীয় জোটই ক্ষমতায় আসতো। সেজন্য জোট সরকারের অংশীদার হিসেবে জামায়াতের পক্ষ থেকে কোনো বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রশ্নই ওঠে না। শান্তি বিঘ্নিত হোক এমন কোনো কাজ করা জামায়াতের জন্য স্বাভাবিক ছিল না। আর দ্বিপ্রহরের আগে সমাবেশ শুরু হয়নি। সেখানে জামায়াত কর্মীরা মঞ্চ তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল। ফলে সমাবেশের আগে উত্তেজনামূলক বক্তৃতার প্রশ্নই আসে না। যাকে বাহানা করে প্রতিপক্ষ আক্রমণ করতে পারে। তা ছাড়া ১৪ দলের ঘোষিত প্রোগ্রাম ছিল পল্টন ময়দানে। তাদের সমাবেশস্থলে পৌঁছার জন্য দৈনিক বাংলার মোড় ও পল্টন মোড় নিরাপদই ছিল। কিন্তু দেখা গেল তারা ইচ্ছেকৃতভাবে মুক্তাঙ্গনে ও প্রেসক্লাবের সামনে জড়ো হলো। সেখানে তারা সুশৃঙ্খলভাবে সমাবেশ করল না বরং উপর্যুপরি বায়তুল মোকাররমের উত্তর সড়কে মঞ্চ তৈরির কাজে ব্যস্ত জামায়াত কর্মীদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল। শহীদ মুজাহিদ জসীম উদ্দিনসহ যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো তারা কোনো আক্রমণাত্মক ভূমিকায় ছিল না। তারা ১৪ দলের জড়ো হওয়া লোকদের চিনতে পারেনি। চিনতে না পেরে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পোশাক এবং চেহারা দেখে জামায়াত শিবিরের কর্মী ভেবে বিনা কারণে আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাদের উপর পৈশাচিক আক্রমণে মেতে উঠল। এর দ্বারা বুঝা যায় পূর্বঘোষিত জামায়াতের প্রোগ্রাম সম্পর্কে তারা ওয়াকিফ হাল ছিল এবং পরিকল্পিতভাবে এ নির্মম ঘটনা ঘটায়।

কেন তারা এই নির্মমতার আশ্রয় নিল? বিবেকের দরজা পূর্ণ উন্মুক্ত করে ন্যায়-নীতির পবিত্র মাপকাঠিতে যদি মূল্যায়ন করা হয় তাহলে এটা পরিষ্কার যে, জামায়াত কোন অপরাধ করেছে আর সে কারণে তারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা নয়। বরং তারা নিম্নোক্ত কারণে ভেবে-চিন্তে এ পৈশাচিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে–

১। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী মহল ক্ষমতায় গিয়েছিল জামায়াত এককভাবে নির্বাচন করার কারণে। ২০০১ সালে তাদের ভরাডুবি হয়েছে বিএনপি জামায়াত জোটের কারণে। এখানেই তাদের আপত্তি বা বিদ্বেষ। জামায়াত কেন বিএনপির সাথে জোট বাঁধল!

২। জোটে থাকা অবস্থায় জামায়াত ৩টি মন্ত্রণালয় (২ জনে) অত্যন্ত সফলতা ও সঠিকভাবে পরিচালনা করেছে। জামায়াত নেতৃত্ব অর্থাৎ তাদের ভাষায় মোল্লা মৌলভীরা একটি আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় সফলতা দেখাবে কেন? এখানে তাদের মধ্যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে।

৩। জামায়াতের ২ মন্ত্রী শুধু মন্ত্রণালয় পরিচালনায় সফলতা অর্জন করেছে তাই নয়, সততার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যা জনগণের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। জনমতের এ ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি ওদের সহ্য হয়নি।

৪। তারা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে, জামায়াতের এ ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি মানে ইসলামের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি। জনগণের কাছে তা দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে তাদের গালভরা বুলি যে অন্তঃসারশূন্য, তাদের অতীত থেকে জনগণ তা উপলব্ধি



icsbook.info

করতে পেরেছে। একদিকে জামায়াতের ইমেজ বৃদ্ধি, অন্যদিকে তাদের অন্ত:সারশূন্যতা তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

৫। বিগত ৫টি বছর তারা বহু কলাকৌশল করে, অর্থসম্পদ ব্যয় করে দুর্বল দুর্বল জায়গায় আঘাত করেও জোট ভাঙতে পারে নি। ফলে আগামী নির্বাচনের ফলাফল ছিল তাদের নিকট পরিস্কার। আরো ৫টি বছর ক্ষমতার বাইরে থাকার অবধারিত সত্যকে মেনে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ অধৈর্যই তাদেরকে এত নিচে ঠেলে দিয়েছিল।

১৪ দলের রাজনৈতিক নেতাকর্মীরাই কি এ নৃশংস ঘটনা ঘটালো? না এত বড় নৃশংস ঘটনা ঘটানোর সাহস ও পরিপক্কতা তাদের ছিল বলে মনে হয় না। তারাতো চেয়েছিল নিজামী সাহেবসহ জামায়াত নেতৃবৃন্দ বাদ আসর যখন বক্তব্য দিচ্ছিল তখন সশস্ত্রভাবে মঞ্চে আক্রমণ করে জামায়াত নেতৃত্বকে শেষ করে দিতে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানব দেয়াল রচনা করে নেতা-কর্মীরা যখন তাদের সেই ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয় তখন তারা প্রস্তুতি নিয়েছিল আরো ব্যাপক আক্রমণের। সন্ধ্যায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ করে যদি বিডিআর মোতায়েন না করতেন তাহলে তাদের সেই সর্বনাশা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতো।

এজন্য স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন এসে যায় এত বড় পরিকল্পনা করার দুঃসাহস কোত্থেকে এলো? আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, এখানে বাইরের শক্তির ইন্ধন ছিল। যারা বাংলাদেশকে তাঁবেদার রাষ্ট্র বানাতে চায় নেপথ্যে তাদের ষড়যন্ত্র ছিল। যারা বংলাদেশকে পরনির্ভরশীল করে রাখতে চায় এখানে তারা সক্রিয় ছিল। যারা বাংলাদেশকে বাজার বানাতে চায় তাদের ষড়যন্ত্র ছিল। এখানে তারা সুযোগ নিয়েছিল যারা বাংলাদেশকে ইসলাম বিমুখ করতে চায়। এখানে তারা উৎসাহ যুগিয়েছিল। যারা ইসলামী শক্তির উত্থানকে বিনাশ করতে চায়। এখানে তারা সদর্পে বিচরণ করেছিল।

কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে তাদের সে মূল পরিকল্পনা সফল হয়নি। কিছু নিরপরাধ নির্মল মানুষকে হত্যা করা পর্যন্তই তাদের দাম্ভিকতা সীমাবদ্ধ ছিল।

২৮ অক্টোবর যে নির্মমতা পৈশাচিকতার নজির স্থাপন করা হয়েছিল সে দৃশ্য দেখলে বা আমার মনে পড়লে গা শুধু শিউরে উঠে না অস্থির করে তোলে। মানুষ মানুষকে যে এভাবে হত্যা করতে পারে তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। বৈঠা-লগি দিয়ে একের পর এক আঘাত করছে, আঘাত করছে মাথায়, চোয়ালে, বুকে, পেটে। আক্রান্তঅবস্থায় বার বার দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, বসার চেষ্টা করছে কিন্তু একটির পর একটি আঘাত দিয়ে তাদেরকে নিস্তেজ করে দেয়া হচ্ছে, রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে দেহ ও রাজপথ, তবুও তাদের নরপিশাচী আক্রমণচলতেই থাকছে। এ কি বীভৎসতা? কোন ধরনের পৈশাচিকতা, কত গভীর নির্মমতা?

যারা এই পৈশাচিক আক্রমণ করল তারা কি কোনো মায়ের পেটের সন্তান নন? তাদের ঘরে কি বাবা বলে কেউ নেই, তারা কি তাদের মাকে মা বলে ডাকেন না? তাদের বোনেরা কি তাদের ভাইদেরকে ভাইয়া বলে সম্বোধন করে না? তাহলে তারা এটা কি করে করতে পারল?



icsbook.info

এই দুনিয়ার আকর্ষণ কি এতই বড়? রাজনীতি করে হালুয়া রুটি ভাগাভাগি করার প্রবণতা কি এতই শক্তিধর?

তবে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর রাজধানী ঢাকার রাজপথে যা সংঘটিত হয়ে গেল এটা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য এক বড় কলঙ্ক। এ ঘটনার ফলে বিশ্বজুড়ে আমরা নিন্দিত হয়েছি। এ ঘটনা আমাদের গণতন্ত্রের বিশ্বাসের উপর আঘাত হেনেছে। অন্যদিকে এ ঘটনা সভ্য সমাজে বিবেকবান মানুষ অর্থাৎ ১৪ কোটি মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী বেদনার সৃষ্টি করেছে। এ ঘটনা তারা ভুলতে পারে না ভুলবে না।

এদেশের জনগণ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে ঘটনার সাথে এদেশের জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই। এঘটনা যারা ঘটিয়েছে তার লোভী, হিংসুক, অন্যের ক্রীড়ানক, গণবিচ্ছিন্ন একটি অংশ। জনগণ তাদের চিনে ফেলেছে। ইনশাআল্লাহ জনগণ এর বিচার করবে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীলও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর বিচার হবে। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ইনশাআল্লাহ এর বিচার হবে।

যে সমস্ত ভাইয়েরা সেদিন নিহত হয়েছে, মহান আল্লাহর দরবারে তাদের শাহাদাত কামনা করি। তাদের মা-বাবা নিকটাত্মীয় স্বজনদের জানাই আন্তরিক সমবেদনা। আর যারা আহত হয়েছে তাদের জন্য কামনা করি পূর্ণ সুস্থতা।
সর্বাবস্থায় আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমিন!

---

*লেখক: সেক্রেটারিজেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং সাবেক সমাকল্যাণমন্ত্রী*

icsbook.info

# রাজনীতির নামে পশুশক্তির উল্লাস

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

২৮ অক্টোবর ২০০৬ ছিল চারদলীয় জোট সরকারের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন। নৈরাজ্য সৃষ্টি করে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায়বাধা দেয়ার জন্য প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় বামজোট লগি-বৈঠা-লাঠি নিয়ে বঙ্গভবন ঘেরাওয়ের জন্য সারাদেশ থেকে রাজধানীর পল্টন ময়দানে তাদের কর্মীদের জমায়েত হওয়ার আহবান জানায়। তাদের কর্মসূচি ছিল আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ এবং সরকারের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। সেদিন বিকেলে বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেটে জামায়াতে ইসলামী এবং নয়াপল্টনে বিএনপির জনসভা ডাকা হয়েছিল। সকাল ১০টায় সেদিন রাজধানীতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ১৪ দলের কর্মসূচি ছিল পল্টনে সকাল ১০টায়। লগি-বৈঠা-লাঠি ও নানা ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আওয়ামী লীগ তথা ১৪ দলের নেতাকর্মীরা পল্টন এলাকায় আসতে থাকে। তখন স্বাভাবিকভাবেই উত্তর গেটে মঞ্চ তৈরিতে ব্যস্ত ছিল জামায়াতের কিছুসংখ্যক কর্মী। পল্টন মোড় দিয়ে ১৪ দলের কর্মীরা পল্টন ময়দানের দিকে যাওয়ার সময় উদ্দেশ্যমূলকভাবে জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর হামলা শুরু করে। পল্টন ময়দানে পুলিশের সাথে সংঘর্ষের ফলে ১৪ দলের কর্মীরা পল্টন মোড় ও জিরো পয়েন্ট এলাকায় জমায়েত হচ্ছিল। জামায়াতের জনসভা বিকেল ৩টায় থাকায় সকাল ১০-১১টায় লোক সমাগম ছিল সামান্য। সম্ভবত এই সুযোগ নিয়ে ১৪ দলের নেতাকর্মীরা পল্টন মোড়ে হামলা করে জামায়াতের সভা পণ্ড করে দেয়ার পরিকল্পনা করে। জামায়াত-শিবির কর্মীরা প্রতিপক্ষের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে মানবঢাল তৈরি করে সভাস্থল ও সভামঞ্চের ওপর হামলা প্রতিহত করে। দীর্ঘ সময় অর্থাৎ প্রায় ৮ঘণ্টা যাবত ১৪ দলের হামলা চলে জামায়াতের ওপর। এই হামলা রাজধানীতে একটি দলের সভা পণ্ড করার জন্য ইতিহাসের দীর্ঘ সময়ব্যাপী হামলা ছিল। এর আগে কখনো এত দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোন হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়নি আমাদের জানামতে।



icsbook.info

নিরস্ত্র জামায়াত-শিবির কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত এই হামলার উল্লেখযোগ্য দিক হলো– এককভাবে মুকাবিলা করে জামায়াত-শিবির শেষ পর্যন্ত ময়দানে টিকে থাকে এবং জামায়াতের আমীর তখনকার শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ নেতৃবৃন্দ জনসভায় বক্তব্য রাখেন। মাওলানা নিজামীর বক্তব্যের সময় মুহুর্মুহু বোমা হামলা চালানো হয়। শাহাদাত ও রক্তের বিনিময়ে চরম ধৈর্য্যের সাথে জামায়াত এই পাশবিক হামলা প্রতিহত করে।

জানা যায়, ১৪ দলের পরিকল্পনা ছিল জামায়াতের সভা পণ্ড করে মঞ্চ তছনছ করে নয়াপল্টনে অনুষ্ঠিতব্য বিএনপির সভায় হামলা করা। তাদের এ পরিকল্পনা সফল হলে সেদিন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে বিএনপির জনসভায় বক্তব্য দেয়া সম্ভব হতো না। জামায়াত রক্ত দিয়ে ১৪ দলের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। রহস্যজনকভাবে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পল্টন মোড়ে যে পুলিশ ছিল তারা যদি দুই দলের মাঝখানে দাঁড়িয়েও থাকতো তাহলেও এই ভয়ঙ্কর রক্তপাতের ঘটনা ঘটতো না। পুলিশের একজন অফিসারও সেখানে কর্মরত ছিলেন না। যিনি ছিলেন তাকেও প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এত বড় একটি সংঘাতস্থলে কেন এমনটি হলো আজও তার জবাব পাওয়া যায়নি।

পাঁচজন জামায়াত-শিবির কর্মী ঘটনাস্থলেই শাহাদাতবরণ করেন। অন্যান্যরা হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় শহীদ হন। ১৪ দলের কর্মীরা রাজপথের ওপর লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করার পর নিহতের লাশের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে উল্লাস করে। এই দৃশ্য স্যাটেলাইট টেলিভিশনে বাংলাদেশের জনগণ এবং বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে। এই দৃশ্য ছিল বড়ই নির্মম এবং পাশবিক। আওয়ামী লীগ ও বাম দলগুলোর কর্মীরা জামায়াত কর্মীদের লাশের ওপর নাচানাচি করে যে উল্লাস প্রকাশ করে তা পশুত্বকেও হার মানিয়েছে। রাজনীতি মানুষের জন্য অথচ রাজনীতির নামে এই উন্মত্ততা যা পশুত্বকেও হার মানায় তা মানুষের কাম্য হতে পারে না।

পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দীর্ঘ ৮ঘণ্টাব্যাপী পল্টন মোড়ে হামলার ঘটনায় কী করে নীরব থাকলেন তখনকার দায়িত্বশীল সেই কর্মকর্তারাই ভালো বলতে পারবেন। তবে পুলিশ যে দায়িত্ব এড়াতে পারে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জামায়াত নেতাদের বারবার টেলিফোনে অনুরোধ সত্ত্বেও পুলিশের পক্ষ থেকে দীর্ঘ ৮ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব তদানীন্তন পুলিশের আইজি দিতে পারেননি। মাগরিবের নামাজের পর বিডিআর এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং ১৪ দলের উন্মত্ত হামলা বন্ধ হয়।

লগি-বৈঠা দিয়ে রাজপথে নিরস্ত্র মানুষ পিটিয়ে মেরে লাশের উপর নৃত্য করার পৈশাচিক দৃশ্য দেখে দেশের মানুষ ধিক্কার দিয়েছে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় রাজনীতির প্রতি। মানুষ হত্যা করে লাশের উপর নৃত্য করার দৃশ্য দেখে অনেকে সংজ্ঞা হারিয়েছেন, অনেকে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। এমনকি ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখে ঢাকাস্থ অনেক কূটনীতিক চোখের পানি ফেলেছেন এবং রাজনীতির নামে নৃশংসতার তীব্র নিন্দা করেছেন। জাতির দুর্ভাগ্য যে ২৮ অক্টোবরের নৃশংসতম ঘটনার পরও প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমাহীন দুর্বলতা প্রকাশ করায় দেশবাসী নৈরাজ্যবাদীদের হাতে পণবন্দীতে পরিণত হয়।



icsbook.info

অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির নায়কদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দেশে এক চরম নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন এবং ৪ জন উপদেষ্টার পদত্যাগের মধ্য দিয়ে সঙ্কট আরো ঘনীভূত হতে থাকে। সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির অভাবে নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশকে যারা অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছে সেই পঞ্চমবাহিনী সক্রিয়ভাবেসাংবিধানিক সকল প্রতিষ্ঠানকে একে একে বিতর্কিত করে ফেলে। যে কোন মূল্যে নির্বাচন ঠেকানো এবং যে কোন মূল্যে অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টার ফলে দেশে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

২২ জানুয়ারি নির্বাচনের সর্বশেষ তারিখ ঘোষণার পর ১৪ দল নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে তা প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। এ সময় কতিপয় দূতাবাস যারপরনই সক্রিয়হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী তারা রহস্যজনক ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক শক্তির সহায়তায় জাতিসংঘের চিঠির বরাত দিয়ে এক পর্যায়ে দেশে ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা জারি করে নির্বাচন বাতিল করা হয়। জরুরি অবস্থা জারির পর সরকার পরিবর্তন করা হয়। সশস্ত্রবাহিনী এ সময় ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের ফলে দেশের জনগণ জরুরি আইনের প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে সমর্থন জানায়। কিন্তু সেদিন কেউ ভাবেননি যে এই জরুরি আইন এতটা দীর্ঘায়িত হবে। জরুরি সরকার প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে দিয়ে যে ভাষণ দেয়ার ব্যবস্থা করে তাতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালানোর ঘোষণা দেয়া হয়। প্রকাশ করা হতে থাকে দুর্নীতিবাজদের তালিকা। উভয় দলের রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীসহ অনেককেই গ্রেফতার করা হয়। জনগণ ধরে নিয়ছিলেন যে, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা তৈরি করে দেশে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জরুরিভাবে সরকার রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়ে নির্বাচন কমিশন সংস্কার করে অর্থাৎ আগের নির্বাচন কমিশন বাতিল করে নতুন লোকদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। এরপর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের পদত্যাগে বাধ্য করে নতুন লোকদের নিয়ে তা পুনর্গঠন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেও পুরনোদের বাদ দিয়ে নতুনদের বসানো হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আনা হয় ব্যাপক পরিবর্তন। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ, বস্তি নির্মূল, হকার উচ্ছেদ করে হাজার হাজার লোককে বেকার করা হয়। মজুদদার ধরতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ফলে অর্থনীতির ওপর আসে প্রচণ্ড চাপ। ওদিকে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনও দুর্নীতি বিরোধী টাস্কফোর্স গঠনের মধ্য দিয়ে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান বেগবান করা হয়। বলা বাহুল্য যে, দুর্নীতিবিরোধী অভিযান জনগণের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। তবে গ্রেফতার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

দেশের রাজনীতিতে শূন্যতা সৃষ্টির ফলে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাজনীতিতে নামার ঘোষণা দেন। এতে দেশের রাজনৈতিক মহল ও জনমনে নানা সন্দেহ সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। ড. ইউনূস প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে এক পর্যায়ে রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেন। অনেকে মনে করেছিলেন সম্ভবত ১১



icsbook.info

জানুয়ারির নায়করাই ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে রাজনীতির দৃশ্যপটে এনেছেন। প্রমাণিত হয় হঠাৎ করে লাফ দিয়ে এসে রাজনীতির ময়দান দখল করার অবস্থা বাংলাদেশে নেই। অতঃপর জাতীয় সরকার গঠন, নিরাপত্তা পরিষদ গঠন, উপদেষ্টা পরিষদ সম্প্রসারণ ইত্যাদি অনেক ইস্যু সামনে আসে। নতুন করে জাতির পিতা ঘোষণা ও জাতীয় নেতাদের সম্মানিত করার প্রসঙ্গটিও আনা হয়। এপ্রিল মাসে শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু পার্লামেন্ট না থাকায় এসব প্রস্তাব বাস্তবায়িত হবে কিভাবে?

জরুরি আইনের মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করে সংবাদপত্রকে পার্লামেন্টের অনুপস্থিতিতে পার্লামেন্ট বলে আখ্যায়িত করা হয় সরকারের উপদেষ্টাদের পক্ষ থেকে। কতিপয় সংবাদপত্রের সম্পাদক টেবিল চাপড়িয়ে দাবি করতে থাকেন যে, জরুরি সরকার এনেছেন তারা। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী দাবি করেন– জরুরি সরকার তাদের আন্দোলনের ফসল। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস, জরুরি সরকার এক পর্যায়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে আওয়ামী লীগ সভানত্রী শেখ হাসিনাকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে তার দেশে প্রত্যাবর্তনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচনার প্রেক্ষিতে শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। তিনি দেশে ফিরে যথারীতি জরুরি অবস্থার মধ্যেও রাজনৈতিক বক্তব্য দান ও সরকারের সমালোচনা অব্যাহত রাখেন। তার দলে ও জোটে এ নিয়ে মতান্তর দেখা দেয়। এ সময় আসে প্রখ্যাত মাইনাস টু থিওরি। শেখ হাসিনকে আটক করা হয়। অন্যদিকে সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। আন্তর্জাতিক সমর্থন না পাওয়ায় এক পর্যায়ে তা পরিত্যক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, মার্চ মাসেই বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানসহ অনেক মন্ত্রী এমপিকে গ্রেফতার করে আটকাদেশ দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের বেশ কিছু সাবেক মন্ত্রী এবং নেতাকেও গ্রেফতার করা হয়।

সমস্ত দুর্নীতির দায়দায়িত্ব রাজনীতিকদের ওপর চাপিয়ে ব্যাপক প্রচার অভিযান চলে। দুর্নীতিবাজ কিছু ব্যবসায়ীকেও ধরা হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে তা স্তিমিত হয়ে আসে। ইতিমধ্যেই অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য লাগমাহীনভাবে বেড়ে চলেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক গ্রেফতার হওয়ায় জেলখানাগুলো টইটুম্বুর হয়ে আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ আগস্ট '০৭ তারিখে সামান্য খেলা দেখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। ছাত্র-জনতা ২০, ২১ ও ২২ আগস্টের বিক্ষোভে প্রায় সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে যায়। এটা ছিল ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। সেনাবাহনীর গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়। একটি চিহ্নিত পত্রিকা সেনাসদস্যদের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষে একজন সেনাসদস্যের প্রতি ফ্লাইং কিক দেয়ার ছবি সংবাদপত্রে ছাপে। ছাত্র বিক্ষোভ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবার পরও শিক্ষক নামধারী কতিপয় ব্যক্তি ছাত্র বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সারা দেশ থেকে অবিলম্বে জরুরি আইন প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে আল্টিমেটাম দেন। সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে শেষ পর্যন্ত তা দমন করতে কারফিউ দিতে বাধ্য হন।



icsbook.info

জনপ্রিয় জরুরি সরকারকে কারফিউ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার এ ঘটনা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের ৩৬ বছরের ইতিহাসে এভাবে সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি জনতাকে দাঁড় করিয়ে দেয়ার ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। কারা এর পেছনে এবং তাদের মতলবটা যে ভালো নয় তা খতিয়ে দেখা উচিত। এ ঘটনার অব্যবহিত পর সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকেও গ্রেফতার করে শেখ হাসিনার পাশেই জাতীয় সংসদ ভবনের সন্নিকটে স্পিকারে জন্য নির্মিত বাড়িতে সাব জেলে আটক রাখা হয়।

এখন সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী বন্দি। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা এবং খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির মামলা দেয়া হয়েছে। ওদিকে দুই দলেই সংস্কারপন্থিরা তৎপর। দল দু'টি প্রায় ভাঙ্গনের মুখে। তবে এটা কতটা কার্যকর হবে এখনই তা বলার সময় আসেনি। কিছু লোক মাঠে নেমেছেন নতুন একটি দল গঠনের জন্য। সংস্কারের কথা যারা বলছেন তারা সরকারের আনুকূল্য পাচ্ছেন বলে জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে। তবে সুবিধাভোগীরাই যে এসব করছে তা হলফ করে বলা যায়। তবে আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থিরা অনেকটা নিষ্ক্রিয় এবং মনে হচ্ছে তারা এখন ঐক্যবদ্ধ।

তাত্ত্বিকরা বলছেন, রাজনীতির পুনর্বিন্যাস হবে। পুরনো ধাঁচের রাজনীতি চলবে না। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক সংস্কারের খসড়া করেছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা এবং ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাদের ভাষায় রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যেই সংলাপ শুরু হয়েছে। সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ : (১) দুর্নীতিবাজদের বিচার সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে (২) নির্বাচন অনুষ্ঠান ২০০৮ সালের মধ্যে (৩) দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এবং (৪) বন্যাপরবর্তী পরিস্থিতির সফল মুকাবিলা করা।

এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, সেনাবাহিনীর রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে নানা কানাঘুষা চলছে ভেতরে বাহিরে। সশস্ত্রবাহিনী প্রধান অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বারবার ঘোষণা করেছেন কোন অবস্থায় দেশে সামরিক আইন হবে না এবং সেনাবাহিনী রাজনীতিতে জড়াবে না। তার এ ঘোষণার প্রতি জনগণের আস্থা আছে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তাহলে কী হবে এ প্রশ্নটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ২৮ অক্টোবর ঘটনার স্মৃতি এখনও মানুষ ভুলে যায়নি। সে অবস্থা দেশে ফিরে আসুক কেউ তা চায় না। কিন্তু ২০-২২ আগস্ট যে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটলো ২০০ এর অধিক গাড়ি পোড়ানো হলো, শত শত দালান-কোঠায় অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটলো জরুরি আইনের মধ্যেও। এসব ঘটনায় নিঃসন্দেহে গোটা জাতি উদ্বিগ্ন।

এতকিছু সত্ত্বেও দেশের কৃষক সমাজ অমিত সম্ভাবনাময় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সাধারণ মানুষ সত্যিই হানাহানি ও প্রতিহিংসার রাজনীতির অবসান চায়। ২৮ অক্টোবরের মত রাজনীতির নামে পশু শক্তির উল্লাস কেউ দেখতে চায় না। বিভেদ-বিভাজন নয় জাতীয় স্বার্থে ঐক্যের বিকল্প নেই। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই ধরনের নেতৃত্বের আজ বড় প্রয়োজন। এ শূন্যতা কিভাবে পূরণ হবে? জনমনে এখনও শঙ্কা ও উদ্বেগ কাটেনি। দুষ্টচক্রের হাত থেকে



icsbook.info

দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির মুক্তি অনিবার্য। কিন্তু তা অর্জনের জন্য সময় প্রয়োজন। অনির্বাচিত এগারজন উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত একটি সরকার ১৫ কোটি মানুষের এদেশটির জনগণের ঐক্যের শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে কত কম সময়ের মধ্যে দেশের সাংবিধানিক সরকার কায়েম করতে পারে তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ শঙ্কিত। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজটা যে, খুবই কঠিন তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষেত্রে ভুল পদক্ষেপ জাতিকে পিছিয়ে দিতে বাধ্য। সুতরাং যারা বর্তমানে দেশ চালাচ্ছেন তাদের বুঝতে হবে কোন অপশক্তি বাংলাদেশটাকে অকার্যকর রাষ্ট্র বানাতে চায়। কারা বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অবস্থান চায় না, কারা প্রতিরক্ষা বাজেটকে বরাবর অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বলে প্রচারণায় লিপ্ত। এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতা আমাদের জন্য কি বার্তা বহন করছে তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশের ধর্ম ও গণতন্ত্র যে একসাথে চলার মধ্যেই কল্যাণ বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিই তার সাক্ষী। যারা ধর্মহীন গণতন্ত্রের কথা বলে বিভ্রান্তি ছড়ায় বা মৌলবাদের জুজুর ভয় দেখায় তাদের মতলবটা কি তাও বিবেচনায় আনতে হবে। যুগ যুগ ধরে এ দেশের মানুষ ধর্মকে যেমন লালন করেছে তেমনি আসম্প্রদায়িক চেতনা এ দেশের মানুষের মজ্জাগত। পলিমাটির মতই এদেশের মানুষের মনস্তত্ত্বে স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা বিদ্যমান। উগ্রতা সাধারণ মানুষ পছন্দ করে না। ফলে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে অস্ত্রের রাজনীতি, শ্রেণীশত্রু খতম ও মানুষ খুনের রাজনীতি, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার জঙ্গিবাদী রাজনীতি। কিন্তু একশ্রেণীর রাজনীতিক এ দেশের জনমনে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে মানুষকে উন্মত্ততা-প্রতিহিংসা এবং সংঘাত-সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতার রাজনীতিই তাদের লক্ষ্য। এ জন্য তারা উস্কানি দান, হরতাল, ঘেরাও, অবরোধ, জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুরকে অবলম্বন করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। এদের ব্যাপারে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জনতার ঐক্যের শক্তি দিয়ে আমাদের প্রিয় দেশটিকে অকার্যকর রাষ্ট্র বানানোর নীল-নকশার বিরুদ্ধে হুশিয়ার থাকতে হবে। কেউ যেন বাংলাদেশকে ইরাক বা আফগানিস্তান বানাবার স্বপ্ন দেখতে না পারে। সকল বাংলাদেশীদের বীরত্বের সাথে তাদের দুঃস্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

---

*লেখক: সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*
*সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*

icsbook.info

# রক্তাক্ত
# ২৮শে অক্টোবর

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক

২৭ অক্টোবর ২০০৬ সালে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী আমীর রফিকুল ইসলাম খান আমাকে পল্টন জনসভার দাওয়াত দেন। সাধারণত সকল জনসভায় আমি যাই না। কিন্তু এই জনসভায় আমি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। পরদিন সকালে মহানগরী অফিসে পৌছাই। সেখানে আমীরে জামায়াতসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অবস্থান করছিল।

ঐদিন বায়তুল মোকররমে চার দলীয় ঐক্যজোটের জনসভা আগে নির্ধারিত হয়েছিল। এ মর্মে পত্র-পত্রিকায় সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। বেলা ১১টার দিকে খবর পেলাম অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে জামায়াত-শিবির কর্মীদের উপর লগি-বৈঠাধারিরা আক্রমণ করছে। বেলা ১২টার দিকে ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুল আলম খান মিলন আমাকে কয়েকজন আহত ও শাহাদাৎ বরণকারির খবর জানালেন। আর অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য আমি বাইরে যেতে চাইলাম। কিন্তু জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আযহারুল ইসলাম আমাকে বাধা দিলে আমি বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকলাম। এই সময় আহতদের মহানগরী অফিসে আনা হচ্ছিল। বায়তুল মোকাররম এলাকা তখন যেন একটি যুদ্ধক্ষেত্র : রক্ত ঝরছে ও আগুন জ্বলছে। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ছাত্রজনতার উপরে সন্ত্রাসী হামলা করা হয়েছিল।

অক্টোবরের ঐ কালো দিনটিতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই সংকটপূর্ণ। সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বিএনপি'র পক্ষ থেকেও একটি শক্ত অবস্থান নেওয়া হয়েছে। তারা রাষ্ট্রপতি ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সংবিধান প্রদত্ত অন্যান্য বিকল্প প্রস্তাবগুলোকে বিএনপি সম্পূর্ণরুপে নাকচ করে। এ ব্যাপারে তারা শরীকদলগুলোর সাথে কোন আলোচনা করেনি। আওয়ামী লীগও আরো হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিএনপি হতে সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল হাসান কে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মদকে কে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব দেয়া সঠিক ছিলনা। আমার এই মত আমি শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে জানালাম। কিন্তু কোন ফল হলনা। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগের মত বিএনপি



icsbook.info

এ হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিলে হয়ত দেশকে সংকটমুক্ত করা যেত। তারপরের বিষয়তো সকলের জানা। দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালে নেয়া যে কোন ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তের খেসারত জাতিকে দিতে হয় যুগ যুগ ধরে।

একদিকে বায়তুল মোকাররমে রক্ত ঝরছে, আর অন্যদিকে পর্দার আড়ালে দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য চলছিল দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র। অবস্থা সঙ্গীন দেখে প্রস্তাব আসলো আমীরে জামায়াতকে বাদ দিয়ে প্রোগ্রাম করা। আমি এর বিরোধীতা করলাম। কি কারণে করলাম ঠিক মনে নেই। ভাবলাম কর্মীরা ময়দানে যখন রক্ত দিচ্ছে, শাহাদাৎ বরণ করছে– এসময় আমীরে জামায়াতেকে বাদ দিয়ে সভা করা ঠিক হবেনা। ১৯৬৩ সালে অক্টেবারে লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জামায়াত সম্মেলনে যখন সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে। তখন পাকিস্তান জামায়াতের আমীর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে যখন সন্ত্রসীরা গুলি বর্ষণ করছিল তখন বার বার বলা হচ্ছিল– মওলানা বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। তিনি দ্বার্থহীনভাবে শান্তকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন– "আমি যদি বসে পড়ি, তবে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?"

আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী যখন ২৮ অক্টোবর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন অনবরত বোমা বর্ষণ করছিল সন্ত্রাসীরা। কিন্তু অত্যন্ত শান্তভাবে তিনি কর্মীদের ধৈর্য ধরার আহবান জানান। বিরাট কোন বিপর্যয় ছাড়াই মোটামুটি শান্তি পূর্ণভাবে জনসভার কাজ সমাপ্ত হয়।

এদিন ৬ জন জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মী শহীদ হয়। আহত হন অসংখ্যা মানুষ। হত্যা করে মৃত দেহের উপর লাফালাফি করেছিল আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে এমন নৃশংস ঘটনা আর ঘটেনি। যে দেশ যত সভ্য, তার রাজনীতি ততো শান্ত। ২৮ অক্টোবর থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত। তারপর ১১ জানুয়ারির পর একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। দেশের অবস্থা এখন এক কথায় বলা যায় অনিশ্চিত।

যে কয়েকজন সর্বশেষ অফিস ত্যাগ করলেন আমি তাদের একজন। স্বভাবতই পরিবারের সবাই চিন্তিত ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসে নিরাপদে ছিলাম। কিন্তু আহত, শাহাদাত বরণকারী ভাইদের ছবি বার বার চোখের সামনে ভেসে আসছিল। শহীদ আব্দুল মালেক ভাইয়ের কথা মনে পড়ছিল। ২৮ অক্টোবরে যারা শহীদ হল তারা নিঃসন্দেহে জীবিত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত। আল কোরআনে বলা হয়েছে–

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলনা, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয়না।"

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করোনা। তাঁরা আসলে জীবিত। তাদের রবের কাছ থেকে জীবিকা লাভ করছে।"- আল ইমরান : ১৬৯

ইসলামী বিপ্লবের সফলতার জন্য শাহাদাত ও রক্ত অপরিহার্য। যুগে যুগে ইসলামের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে তাই দেখতে পাওয়া যায়।

আমি সাধারণত সকল প্রোগ্রামে যাই না। কিন্তু ঐদিনের প্রোগ্রামে না থাকলে হয়তো সারাজীবনই আফসোস করতাম। বাংলাদেশের ভবিষ্যত কোনদিকে মোড় নেবে বলা মুশকিল।

---

*লেখক: বিশিষ্ট আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট*



icsbook.info

# হৃদয়ে অব্যাহত রক্তক্ষরণে মনে জাগে নতুন নতুন প্রশ্ন

আবদুল কাদের মোল্লা

২৮ অক্টোবর ২০০৬। সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের বিদায় নেয়ার আগের দিন। তখনও বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ দু'জনেই জোট সরকারের মন্ত্রী। বিএনপির জনসভা তাদের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে। জামায়াতের জনসভা বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেটে, উভয় সভারই সময় বিকেল ৩টায়। স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ সমর্থক এবং জনগণ তিনটা সাড়ে তিনটার আগে আসার কথা নয়। সেকুলার বাম ও সুশীল সমাজের একটি কলংকিত অংশটির সুশীল এবং রাজনৈতিক দলগুলোর আক্রমণের মূল টার্গেট যেহেতু জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির, তাই কোনো সভা সমিতির আয়োজন করলে দুর্বৃত্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীদের আক্রমণের আশংকায় একটু আগ থেকেই সেচ্ছাসেবকদের থাকতে হয়। দুর্বৃত্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সশস্ত্র মাস্তানদের আক্রমণ থেকে যাতে মঞ্চ নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ নির্বিঘ্নে করা যায় সেজন্যে বেলা সাড়ে দশটায় বসে আছি মহানগরে কেন্দ্রীয় দফতরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জামায়াতের মহানগরী শাখার কেন্দ্রীয় অফিস পুরানা পল্টনে পৌঁছে খবরের কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে প্রায় সাড়ে এগারটা বেজে গেল। যোহর নামাজ বাদ হালকা খানা খেয়ে বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেটের জনসভায় যোগদান করার জন্য উঠি উঠি করছি। হঠাৎ মহানগরী অফিসে ফোন আসল। আমীরে জামায়াতের বরাত দিয়ে-রাস্তার অবস্থা ভালো নয় আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর নির্দেশক্রমেলগি-বৈঠা নিয়ে চৌদ্দদলীয় জোটের মূলত যুব সংগঠনের কর্মীরা জামায়াতের মঞ্চ পাহারায় ব্যস্ত চার/পাঁচশত কর্মীর উপর হামলা চালাচ্ছে। সাথে সশস্ত্র মাস্তানরা আছে আর জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে তেমন কিছুই নেই। পথেঘাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইটের টুকরো আর পোস্টার ফেস্টুনের



icsbook.info

দু-চার খানা লাঠি। সুতরাং অবস্থা আমাদের জন্য ভাল নয়। সভার মঞ্চ পর্যন্ত তারা যেকোনো সময় চলে আসতে পারে। তাই আমি আর পল্টনে না গিয়ে কেন্দ্রীয় আফিসে থেকে টেলিভিশন দেখি আর প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতা চাই। পুলিশের সংখ্যা একেবারেই কম, যারা আছে তারাও নিষ্ক্রীয়, টেলিভিশন খুললাম কোন চ্যানেলে খবর বা বিশেষ বুলেটিন প্রচার করে কিনা সযত্ন দৃষ্টি রাখছি, কিন্তু মোবাইল ও টিএণ্ডটি ফোনে বারবার বিভিন্ন দিক থেকে খবর আসছে– অবস্থা ভয়াবহ, আহত শতাধিক, কয়েকজনের অবস্থাই আশংকাজনক, পরান দুরুদুরু করছে। না জানি কত মায়ের বুক আজ আবার খালি করার ব্যবস্থা হচ্ছে। শহীদের তালিকা আরো দীর্ঘ হবে নাকি, এরই মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোলাম আযম ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন– পুরানা পল্টনের জনসভার খবর কিছু জানো। দরদভরা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বললেন– ইতোমধ্যেই নাকি দুজন শাহাদাত বরণ করেছেন? জামায়াত-শিবির কর্মীদের প্রতি তার অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসায় ভরা শিশুর মতো কোমল মনে আঘাত যাতে কম লাগে সেজন্য বললাম– আমি শুনেছি, নজর রাখছি, আক্রমণ চলছে হিংসাত্মক ভাবে। কিন্তু শাহাদাতের ঘটনা বোধহয় এখনো ঘটেনি। তবে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত কয়েকজনের অবস্থা শুনেছি দোয়া করেন। হঠাৎ চ্যানেল আইতে দেখি খবর অথবা বিশেষ বুলেটিনের সচিত্র রিপোর্ট। একজন পাঞ্জাবি পরা কিশোরের উপর হঠাৎ লাঠি-বৈঠার উপর্যুপরি আঘাত কিলঘুষির পর ছেলেটি পিচঢালা পথে লুটিয়ে পড়ে গেল, এরপরও তার উপর চললো লাঠি-বৈঠার আঘাত আর উপুর্যপরি জুতা পায়ে লাথি। কিন্তু অবাক হলাম মানুষখেকো দলের মধ্যে একটি মানুষকেও দেখলাম না আঘাতকারী কাউকে থামানোর চেষ্টা করতে অথবা এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করতে যে, ছেলেটি তো বেহুশ হয়ে পড়ে গেছে আর মারার দরকার নেই। অবস্থা দেখে ভাবলাম এদের কারো মধ্যেই মানুষের আত্মা নেই। আর বয়সের কারণে পিতৃসুলভ দৃষ্টিতে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখে নিজের অজান্তেই কয়েক ফোঁটা পানি চোখ থেকে মুখমণ্ডল হয়ে দাড়ি পর্যন্ত গড়িয়ে পড়লো। মনটা একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইলো। কারণ স্বভাবগত ভাবেই আমি ফ্যানের নিচে বসে এ ধরণের অমানবিক দৃশ্য মৌনভাবে দেখে চুপ থাকার লোক নই। এরপর যা দেখলাম তা আরো ভয়াবহ এবং পৈশাচিক। কয়েকজন নরপশু ছেলেটির আসাড় লাশের উপর লাফালাফি শুরু করলো! টেলিভিশনের সংবাদ পাঠকের কণ্ঠে শুনা গেল যে, অমানবিকভাবে একে হত্যা করা হয়েছে, একটি বিষধর সাপকেও এরূপ নির্দয়ভাবে কেউ মারে না। দেখছি আর দেখছি। পুরানা পল্টনের অলিগলি আমার চেনা। একদিক থেকে অব্যাহতভাবে লাঠি, লগি-বৈঠার আঘাত আর পিস্তলের গুলি চলছে, অন্যদিক থেকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থল পুরানা পল্টন মোড়, প্রিতম হোটেল, বাসস এবং এর উল্টা অর্থাৎ উত্তর দিকে বহুতল বিশিষ্ট ভবনের সামনের এ ফাঁকা এলাকা জুড়ে। এরপর দেখলাম একজন গুলি করে মারার পর লাশের উপর আঘাতের পর আঘাত দিয়ে গোটা শরীরকে এমনভাবে রক্তাক্ত করা হয়েছে যাতে মানুষটিকে চেনার উপায় নেই। পরনে লুঙ্গি এবং গায়ে একটি হাফশার্ট। চারজনে দুই হাত দুই পা ধরে এমভাবে লাশটিকে নিচ্ছে যেন কসাইখানায় একটি গরু জবাই করে অন্যত্র সরিয়ে আরেকটি গরু জবাই করার জন্য জায়গা করে নিচ্ছে। নিহতের শরীর থেকে অব্যাহতভাবে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। একটু পরে একজন লোককে আনা হলো টেলিভিশনের ক্যামেরায়, তিনি দাবি করলেন নিহত ব্যক্তির



icsbook.info

নাম মনির, তিনি তার বাবা শিবিরের ছেলেরা গুলি করে মেরে ফেলেছে। ভয়ে শিউরে উঠলাম। কারণ যদি এ বিবরণ সত্য হয়, তাহলে আমাদের পত্রপত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলোর সত্য বা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের যে মান আর ঐসব সাংবাদিকদের নৈতিক অধঃপতনের যে পর্যায় তাতে এটাকেই জামায়াত শিবিরের দ্বারা সংঘটিত নৃশংস দৃশ্য বলে প্রচার করবে। ফলে মার খেয়ে জান দিয়ে নিহত হয়েও জনগণ এবং আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে আসামি হিসাবে। তবে নকল বাপের প্রকাশ ভঙ্গি এবং তার শরীরের ভাষা দেখে বিশ্বাস করতে পারলাম না যে আসলে ঐ মিথ্যাবাদী লোকটি নিহতের পিতা। এভাবে চার-পাঁচটি দৃশ্য দেখলাম। যে দৃশ্য দেখে কেউ সহ্য করতে পারে না। পৈশাচিক মানবতার করুণ আর্তনাদের যে দৃশ্য দেখলে পাষাণ গলে, আকাশ কান্দে, বাতাস কান্দে, আল্লাহর আরশ প্রকম্পিত হয়। কিন্তু দয়া মায়ার লেশমাত্র দেখলাম না শুধু ঐ নরপিশাচদের মধ্যে। কারণ ওরা বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনা, পেশাগতভাবে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য খুন খারাবি আর রক্তপাত হত্যা লুণ্ঠন যা কিছু দরকার তাই করার জন্য ওরা আধিপত্যবাদী এবং ইহুদী সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ভাড়ায় খাটে। আর এর জন্য ইসলাম ও ইসলামী সংগঠনের লোকজনদের জানমাল ওদের কাছে খুব সস্তা। টেলিভিশনের ভিডিও ফুটেজে তাদের চিহ্নিত করা গেলেও সাম্রাজ্যবাদি পশ্চিমা গোষ্ঠী এবং আধিপত্যবাদী শক্তিশালী মুরুব্বী আছে তাদের, তারাই তাঁদের রক্ষাকর্তা। সরকারের কোন শক্তি নাই তাদের গায়ে হাত তোলে। জনগণ দেখলো– জামায়াতের শহীদ হাবিবুর রহমান, শহীদ জসিম উদ্দিন নামের দুজন, শিবিরের শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম, হাফেজ কিবরিয়া, সাইফুল্লাহ, রফিকুল ইসলাম, মো: শাহজাহান, আবদুল্লাহ আল-ফয়সালসহ এতগুলো প্রাণ ঝরে গেল প্রকাশ্য দিবালোকে। তাদের রাস্তার উপর পিটিয়ে গুলি করে হত্যা করা হলো। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের উল্লেখ করার মতো কাউকেই গ্রেফতার করা হলো না। আমি নিজ চোখে দেখলাম আওয়ামী লীগের একজন ধনী ব্যবসায়ী এবং সাবেক এমপি জনৈক ডাক্তার পিটিয়ে মানুষ মারার এবং লাশের উপর নাচানাচি করার পৈশাচিক কান্ডটি সম্পাদন করার পর সঙ্গী সাথীদের বা হাত দিয়ে ইশারা করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন এমন ভাবে, যেন "এখানে কাজ শেষ এখন অন্যত্র অভিযান পরিচালনা করতে হবে"। তাকে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর না চেনার কথা নয়।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ধরপাকড়, দুর্নীতি দমন অভিযান, জরুরি পরিস্থিতি, ছোট ছোট অপরাধের জন্য বিভিন্ন স্থানে গুরুদণ্ড অথচ এমন একটি পৈশাচিক ঘটনা যা সেনাপ্রধান, আইন উপদেষ্টাসহ অনেই বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন কিন্তু খুনিদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়ার কোন উদ্যোগ নেই। এসব দেখে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে, এগুলোর উত্তর চাই সুহৃদয় পাঠক সমাজ এবং বর্তমান ক্ষমতাধর সরকারের কাছে :

১. ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর দিন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ মন্ত্রী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকার পরও মন্ত্রীদের ঘোষিত কর্মসূচি বিশেষ করে জনসভার কর্মসূচি যা বানচাল করার জন্য রাজনৈতিক অন্যপক্ষ ঘোষণা দেয়ার পরও কোনো প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি কেন? এমন সাধারণ অবস্থায় চলাফেরা করার সময় পূর্ণ মন্ত্রীরা



icsbook.info

যে নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন ঐদিন তারও কোন ব্যবস্থা কেনইবা করা হয়নি?

২. পল্টন ময়দান থেকে বিএনপি প্রোগ্রাম প্রত্যাহার করার পরও হাজার হাজার পুলিশ দিয়ে খালি মাঠ পাহারা দেয়া হয়েছিল কার নিরাপত্তার জন্য?

৩. আমি নিজে পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি পর্যন্ত যোগাযোগ করেও কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপের আশ্বাস তো দূরের কথা বরং যারা খুন হচ্ছে লগি-বৈঠা ও পিস্তলধারিদের হাতে সেই নির্যাতিত মানুষগুলোকে অভিযুক্ত করা হচ্ছিল কেন?

৪. ঘটনা স্থলেই যেখানে ৭জন জামায়াত ও শিবিরের কর্মী শহীদ হয়েছেন, শত শত আহত হয়ে কেউ হাসপাতালে কেউ রাস্তায় কাতরাচ্ছে, পিচঢালা পথে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, বহুতল ভবন বিশেষ করে বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে বহু মানুষ চিৎকার করছে, সেই চিৎকারে মানুষের কলিজা ছিদ্র হওয়ার উপক্রমহলেও বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা দীর্ঘ আট ঘন্টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চললেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কেন কোন দায়িত্ব পালন করল না? সন্ধ্যায় পৌনে ৭টায় বিডিআর না এলে শহীদের সংখ্যা কত হতো আল্লাহই জানেন- চিন্তা করলেও গা শিউরে উঠে।

৫. যারা জীবন দিল, আহত হলো তাদের পক্ষ থেকে মামলা দিতে গেলে মামলা গ্রহণে কর্তৃপক্ষের গড়িমসি ছিল কার নির্দেশে? অনেক পর একটি কাউন্টার মামলা নেয়া হলো কেন হত্যাকারীদের পক্ষ থেকে। জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আসামি করে যে মামলা দেয়া হলো মূল মামলা না ধরে প্রথমেই কাউন্টার মামলা ধরে আইনের স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে কোর্টে তলব করা হলো কেন?

৬. দুর্নীতি দমনের নামে গ্রামে-গঞ্জে দু'চারখান টিন-কম্বলের জন্য বাঘা বাঘা লোককে আসামি করা হলেও ২৮ অক্টোবরের এতবড় ঘটনার জন্য ভিডিও ফুটেজ দেখে কোনো আসামিকে গ্রেফতার করা হচ্ছেনা কেন? আমীন বাজারের ইটের ভাটায় দুইজন র‍্যাব সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর মাত্র দু'তিন দিনের মাথায় ভোলা জেলা থেকে আসামি ধরে যেখানে আমাদের পুলিশ এবং র‍্যাব সদস্যরা যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতের অন্ধকারে ঘটনা ঘটলেও নামকরা ও ছাত্রনেতাদের যারা গ্রেফতার করতে পারেন। ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর আসামি ধরার ক্ষেত্রে তাদেরকে কেন ব্যবহার করছে না?

৭. সেনাবাহিনী প্রধান তার প্রথম নীতিনির্ধারণী ভাষণে যে ঘটনার ভয়াবহতা উল্লেখ করলেন মর্মস্পর্শী ভাষায়, এমনকি মানব সভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা বলে উল্লেখ করার পর সেই বিভাগের গোয়েন্দারাই বা কী দায়িত্ব পালন করলেন?

৮. ইদানিং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদীদের অর্থে ও আশির্বাদে লালিত পালিতদের কর্তৃক বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত আমাদের প্রিয় নবীজীকে (সা.) নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করার পর সেখানে বাংলাদেশের সাধারণ আইনের আওতায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে ডিক্লারেশন বাতিল করার চেষ্টা না করে দুইজন উপদেষ্টা সম্পাদককে পাহারা দিয়ে জাতীয় মসজিদের খতিবের কাছে মাফ চাওয়ার ব্যবস্থার জন্য এতটা উৎসাহী হলেন কেন? বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা তো পথে ঘাটে তাদেরকে হেনস্তা করেনি, শুধু আইনের মাধ্যমে তাদের শাস্তি ও



icsbook.info

পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল চেয়েছে। একাজটুকু করতে সরকারের এত ভয় কেন?

৯. ডেইলি স্টার গ্রুপের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকা পবিত্র এবং সম্মানিত মক্কা নগরীকে বেশ্যাখানার সাথে (নাউজুবিল্লাহ) তুলনা করে কুখ্যাত দাউদ হায়দারের লেখা ছাপার পরও পত্রিকার প্রকাশক সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এই ব্যক্তিই আইন, বিচার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার সামনে টেবিল চাপড়িয়ে জরুরি আইন আনার ব্যাপারে কৃতিত্ব দাবি করে। স্বাধীনভাবে যা খুশি লেখার জন্য ধমকের সুরে কথা বলেন। ঐ সাহস পান কোথায়?

১০. সিপিডি নামক এনজিও যারা বাংলাদেশের স্বাধীনসত্তা, সীমানা ও মানচিত্র মুছে ফেলার জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এমন কোনো কাজ নেই যা করেনি, বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রমাণ করার জন্য যা যা করা দরকার সবই করেছে। তারপরও বাংলাদেশকে ধ্বংস করার এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সবচাইতে করিতকর্মা লোকটাকেই কেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো ? তার স্ত্রীও একজন বিদেশী নাগরিক এমন ব্যক্তিরা দেশের জন্য প্রতিনিধিত্ব করলে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নয় কি?

যা হোক লেখার কলেবর বৃদ্ধি না করে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সমন্বয় করলেই ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর ষড়যন্ত্র ধরা পড়বে বলে আমার বিশ্বাস। আর এর ফলে একজন সচেতন নাগরিকের মনে যে ভয়ভীতি বা আশংকার উদ্রেক হয়, তা কতটা ভয়াবহ– তা ভেবে গা শিউরে উঠে। আমরা কি ভয়াবহ এক নিরুদ্দেশ যাত্রা শুরু করেছি? এ যাত্রার শেষ কোথায়? আজ এ পর্যন্তই, আশায় রইলাম আমাদের সরকার, কেয়ারটেকার (অন্তবর্তীকালীন) সরকার ও সচেতন পাঠক সমাজ আমার প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত করবেন।

---

*লেখক: সহকারী সেক্রেটারিজেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ*



icsbook.info

# রাজনীতির নামে
# উন্মত্ত ঘাতকের পৈশাচিক উল্লাস

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

ইতিহাসের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, ভিয়েতনামের মাইলাই হত্যাকাণ্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের হত্যাকাণ্ড যেমন রোমহর্ষক ঘৃণিত কাহিনী হিসেবে পরিচিত আছে, তেমনি বাংলাদেশে ২৮ অক্টোবরের (২০০৬) আওয়ামী হত্যাকাণ্ডও বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘৃণিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। শেখ হাসিনার নির্দেশে তার লগি-বৈঠাধারি সন্ত্রাসী কর্মীরা সেদিন নির্বিচার গণহত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল তা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসেবে দীর্ঘকাল মনে রাখবে বাংলাদেশের মানুষ।

১৯৭২ সালে সদ্যস্বাধীন এই বাংলাদেশের রাজধানী শহরে আমি ঘাতকের উল্লাস দেখেছিলাম। জিপিও'র সামনে একজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছিলেন দ্রুত পায়ে নির্ধারিত গন্তব্যে। হয়ত স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতার কাছে। হয়তো স্বজন-বান্ধব কারও সঙ্গে দেখা করতে। কিংবা নিজের কর্মক্ষেত্রে! কোথা থেকে একজন চিৎকার করে ছুটে গেল তার দিকে। রাজাকার রাজাকার বলে কিল ঘুষি দিতে শুরু করল। লোকটি বুঝে ওঠার আগেই আরও কয়েকজন তারপর অনেকে। রাজপথের ওপর আমার চোখের সামনে একজন প্রাণবান মানুষ নিস্প্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়লো পথের ওপর। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে দিতে দিতে সরে গেল আওয়ামী কর্মীরা। ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। কেবল পথের ওপর লুটিয়ে পড়ে থাকলো একজন যুবকের প্রাণহীন রক্তাক্ত লাশ। জিপিওর সামনে দাঁড়িয়ে থমকে গেলাম। এ যুবক কারও সন্তান, কারও ভাই, স্বামী কিংবা পিতা। সে সংসারে আজ কি হবে? ক্রন্দনধ্বনি উঠবে। হয়ত আমারই মতো সেও এ সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সেই পরিবারে তার ওপর নির্ভরশীলদের অন্ন সংস্থানের কী গতি হবে? এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে হবে? বেদনায় গ্লানিতে বুক ভারী হয়ে এল। ধীর পায়ে কর্মস্থল দৈনিক বাংলায় গিয়ে পৌছলাম। প্রত্যক্ষদর্শী আমি, সহকর্মীদের কাছে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অশ্রু রোধ করতে পারি নি।

এভাবেই কারো কারো উস্কানিতে রাজপথে অকারণে দিতে হবে প্রাণ? ব্যক্তিগত শত্রুতার বশে কেউ যে ভবিষ্যতেও এভাবে এক একজন মানুষকে হত্যায় উদ্বুদ্ধ হবে না,



icsbook.info

তার গ্যারান্টি কোথায়। কাল কেউ আমাকেই এভাবে পিটিয়ে মারবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? পরদিন সংবাদপত্রে খবর বের হলো: গণপিটুনিতে একজন নিহত।

আমার দেখা ঐ ঘটনাই বাংলাদেশে প্রথম 'গণপিটুনিতে' নিহত হওয়ার ঘটনা কি না, মনে নেই। কিন্তু এরপর দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংবাদপত্রে গণপিটুনিতে নিহত হওয়ার খবর আসতে শুরু করতে লাগলো। তার সঙ্গে সঙ্গে এ খবর আসতে শুরু করল– নিহত ব্যক্তি নিতান্তই নিরীহ, ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে এ ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। এ অবস্থা বেশ অনেক দিন চলেছে। অনেকদিন ধরে চলছে। শেষ দিকে অনেকেই নিহত হয়েছেন 'ছিনতাইকারী' বলে, অনেকেই 'পকেটমার' বা 'ডাকাত' বলে। কিন্তু তারা যে ছিনতাইকারী, পকেটমার, ডাকাত ছিলেন এমন কথা কখনও প্রমাণিত হয়নি। তবে ছিনতাইকারী বা ডাকাত হিসেবে ধরা পড়ার পরও কেউ কেউ নিহত হয়েছে গণরোষে তাও সত্য, সেটা অস্বীকার করি না।

দেশে তখনও আওয়ামী লীগের সরকার ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু আওয়ামী লীগের কোনো নেতাই তখন বলেননি যে, ছিনতাইকারী, চোর-ডাকাত ধরতে পারলে গণপিটুনি দিয়ে খুন করে ফেল। বরং অন্তরে যাই থাক, তারা মুখে অন্তত আইনের শাসনের কথা বলেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ১৯৯৬ সালের আগে তারা আর কখনো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়নি জনগণের কাছ থেকে। আওয়ামী লীগের ১৯৭২-৭৫ সালের দুঃশাসন, ভয়াবহ নিপীড়ন, শোষণ- লুণ্ঠনের পর সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ রক্ষী বাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর রোমহর্ষক নির্যাতনের স্মৃতি এ দেশের জনগণকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। সে কারণেই মানুষ আর কখনও তাদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনা দায়িত্ব তুলে দিতে নিরাপদ বোধ করেনি।

তারপর ১৯৮১ সালে মহান স্বাধীনতার ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা এবং ১৯৮২ সালে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা গ্রহণ করেন সেনাপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। সে ষড়যন্ত্রে শুরু থেকে অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বেগম খালেদা জিয়া। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা বারবার জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এরশাদ সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য। কারণ তিনি নিশ্চিত জানতেন, জনগণ যদি সুযোগ পায় তা হলে তার দলকে কিছুতেই নির্বাচিত করবে না। ফলে ক্ষমতার ছিঁটেফোটা উচ্ছিষ্টের জন্য মরিয়া ছিলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনে যখন উত্তাল সারা দেশ তখন এসে শরিক হয়েছিলেন সে আন্দোলনে। সেখানে যত না গণআন্দোলনে শরিক হওয়ার মানসিকতা ছিল তার চেয়েও বেশি ছিল গণরোষের ভয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এবং জনগণ আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করল। নির্বাচনে জয়লাভ করলো বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি।

১৯৯৬ সালে তাই ভিন্ন কৌশল নিল আওয়ামী লীগ। হাতে তসবিহ, মাথায় হেজাব তুলে জায়নামাজে বসে মোনাজাত করতে করতে শেখ হাসিনা জনগণের কাছে তার ও তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, আর শুধু একটিবারের জন্য জনগণ



icsbook.info

যেন তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। শুধু একটি বারের জন্য। এ দেশের মানুষের দয়ার শরীর। উদার তাদের মন, ক্ষমাসুন্দর তারা। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তারা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় যাবার সুযোগ করে দিল।

এবং ক্ষমতা গ্রহণের পরপর জনগণ বুঝতে পারল শেখ হাসিনার হেজাব-তসবিহ বড় ভণ্ডামি ছিল। ক্ষমতা গ্রহণ করেই শেখ মুজিবের মতই শেখ হাসিনা লুণ্ঠনের সকল আয়োজন করলেন। এরশাদ ও আ.স.ম আবদুর রবকে নিলেন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। প্রকাশ্যে বললেন, একা খাব না, সবাই সরকারে ভাগযোগ করে খাব। আর আবার ও শুরু হল ১৯৭২-৭৫ সালের নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি। গণতন্ত্র নয়, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইল তাদের দুঃশাসন, আবারও গঠিত হল বিভিন্ন বাহিনী। সে বাহিনী ভিন্ন মতাবলম্বীদের ধরে এনে থানায় লকআপে নির্যাতন শুরু করল। মানুষ বিচার বিভাগের কাছে যাবে কিন্তু বিচারকরা যেন সরকারের অনুকূলে রায় দেবে। মানি না এমন বিচার। তবে বিচারকদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তারা। যেমন হয়েছিল ১৯৭২-৭৫ সালে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের নেতৃত্বে প্রকাশ্য রাজপথে বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করল আওয়ামী লীগ। অর্থাৎ ক্ষমতা কর্তৃত্ব এমন কী বিচার– সবকিছু অনুকূলে চাই। তার জন্য কোনো আইন কানুনের তোয়াক্কা করি না। শক্তি প্রয়োগ করেই সব কিছু নিজেদের অনুকূলে আনব।

সেই শক্তি প্রয়োগের খেলা আওয়ামী লীগ শুরু করল ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে। জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। তত্ত্বধায়ক সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে। সে সময় চিরাচরিত ধারায় আওয়ামী লীগ বল প্রয়োগ আর ভয় দেখানোর রাজনীতি শুরু করল। সন্দেহ নেই যতই দিন যাচ্ছিল জোট সরকার ততই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আওয়ামী লীগের বল প্রয়োগের ধারা ততই জোরদার হয়ে আসছিল।

সংবিধান মতে বিচারপতি কে এম হাসানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেয়ার কথা। কিন্তু শুরু থেকেই তাকে অস্বীকার করতে শুরু করল আওয়ামী লীগ ও তাদের অরাজকতাপন্থি দোসররা। কেন? তিনি নাকি দু'যুগ আগে কোনো এক সময় জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সংবিধান অনুযায়ী এরপর যার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার কথা ছিল, তিনি ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজ। তিনি বিএনপি ধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তেমন অভিযোগ ছিল না। অভিযোগ, তিনি জোট সরকারের আমলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ পেয়েছেন, ফলে তাকে মানি না। কিন্তু জোট সরকারের আমলে এই সাংবিধানিক পদে কাউকে না কাউকে নিয়োগ তো দিতে হবে। এ পদ কি তবে শূন্য রাখতে হতো? এ যুক্তির পথে কেউ গেলেন না, মানি না মানি না বলে রাজপথ গরম করে তুললেন এবং শেষ পর্যন্ত সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিই প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যে বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হল, সেখানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ জলিল ও বিএনপি নেতা আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, তারা মেনে নিলেন। বলতে শুরু করলেন, তারা পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করছেন কি না।

কিন্তু ২৮ অক্টোবর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগেই এক ভয়ঙ্কর নারকীয় কাণ্ডের কর্মসূচি ঘোষণা করে বসল আওয়ামী



icsbook.info

লীগ। টেলিভিশনের পর্দা কাঁপিয়ে আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন এক ফর্দ দাবি। সে দাবি পূরণ না হলে বন্ধ করে দেবেন রাজপথ এবং ড. ইয়াজউদ্দিন ও এম.এ আজিজকে ভাতে-পানিতে মারবেন বলে ঘোষণা দিলেন তারা। বাজারের ইট-মারা ছিঁচকে রাজনৈতিক কর্মীরা ঘোষণা করল, তারা কাঁচাবাজার সরবরাহ করবে না এঁদের। যেন তাদের সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার। শেষ পর্যন্ত তারা ঘোষণা করলেন দাবি না মানলে বঙ্গভবনে অক্সিজেন সরবরাহও বন্ধ করে দেবেন। খোদার ওপর খোদাগিরির কর্মসূচি! আল্লাহ তায়ালার আসমানে যেখানে বায়ুর প্রবাহ আছে, সেখানে প্রাণীর বেঁচে থাকার অক্সিজেনের সরবরাহ আছে। আল্লাহর আসমানের বায়ু প্রবাহ থেকে তারা ছেঁকে তুলে নেবেন অক্সিজেন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে অক্সিজেনবিহীন চেম্বারে হত্যা করবেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকে। কী ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মসূচি! আর শেখ হাসিনা ঘোষণা করলেন, লগি-বৈঠা নিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মীরা দলে দলে চলে আসবে রাজধানীতে। তারা লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করবে জোট সরকার সমর্থকদের। এ কর্মসূচি নিয়ে কোনো রাখ-ঢাক ছিল না। রাতারাতি ফুটপাতের ফার্নিচারের দোকানগুলোতে অর্ডার গেলো বৈঠা তৈরির। তারা সকল সাজ ফেলে লেগে গেল বৈঠা-লগি তৈরিতে। মানুষ মারার হাতিয়ার তৈরি ও গণহত্যার উস্কানি দেওয়ার মত কর্মসূচি। এ কথা হাসিনা যত বললেন তার পরিষদরা বললেন তা শত গুণে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী মাস্তান, খুনি, লুটেরা কর্মীরা নতুন নতুন বৈঠা নিয়ে এসে হাজির হলেন রাজধানী ঢাকায়। লক্ষ্য জোট সরকারের সমর্থকদের কতল করা।

তারপরের ঘটনা দূর অতীতের স্মৃতি নয় ২৮ অক্টোবর ২০০৬ রাজপথে নেমে এল সবাই। বিএনপি নয়া পল্টনে তাদের অফিসের সামনে, জামায়াত পুরানা পল্টন এলাকায়, আর বিবি এভিনিউতে আওয়ামী লীগ অফিস এলাকায় তাদের কর্মীরা। সে অবস্থান নিতে কোন দোষ ছিল না, যদি না তা শান্তিপ্রিয় হতো। সরকার ঘোষণা করেছিল, লগি-বৈঠাসহ কোনো লঠিসোটা বা আঘাত করার উপযুক্ত কিছু বহন করতে পারবে না কেউ। শুনল না আওয়ামী লীগ ও তাদের মোসাহেবরা।

তারপর পল্টন এলাকায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা তাদের নেতাদের নির্দেশে যে ঘটনা ঘটালো, তাতে শঙ্কিত হয়ে গেল গোটা বাংলাদেশ। শত শত স্টিল ও ভিডিও ক্যামেরার সামনে তারা অকারণেই আক্রমণ করে বসল একজন নিরীহ যুবককে। হেঁটে আসছিল সে। সাধারণ, নিরীহ, নিরস্ত্র, সুদর্শন এক যুবক। হাঠৎ কয়েকজন লগি-বৈঠাধারি সন্ত্রাসী তার ওপর আক্রমণ করে বসল। লগি-বৈঠার আঘাতে আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। আবারও লগি-বৈঠার হামলা। সটানপড়ে গেল সে যুবক। ক্ষত-বিক্ষত দেহ। তার ওপরই তারা আঘাত করতে লাগল লাঠি-বৈঠা দিয়ে। মৃত্যু নিশ্চিত করেও থামেনি তারা। সেই মৃতদেহের ওপরে উঠে পৈশাচিক উল্লাসে লাফাতে শুরু করল লগি-বৈঠাধারিরা। প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি কেউ। কিন্তু টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে এক আতঙ্কিত রিপোর্টার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলছিলেন, লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে এই মাত্র হত্যা করা হল একজন নিরীহ যুবককে, যেন তারা পিটিয়ে সাপ মারছে। এই রোমহর্ষক হৃদয়বিদারক ঘটনা যে শুধু পল্টনেই ঘটল, তা নয়। ঘটল আরো একাধিক স্পটে। মৃত্যু নিশ্চিত করে থামল লগি-বৈঠাধারি শেখ হাসিনার সোনার ছেলেরা।

কিন্তু কী হৃদয়হীন আওয়ামী লীগ ও তার দোসররা! শেখ হাসিনার ঘোষণা করলেন– পল্টনের মোড়ে যাকে জনরোষে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, সে ছিল শিবিরের



icsbook.info

ক্যাডার। আর সে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছিল বলেই জনরোষে তার মৃত্যু হয়েছে। আওয়ামী মোসাহেবরাও শেয়ালের মত একাই রা করতে থাকলেন। হ্যাঁ, সে গুলি চালিয়েছিল। এমন নির্লজ্জ মিথ্যাচার টিকল না। দীর্ঘ ভিডিও ফুটেজে দেখা গেল নিহত নিতান্তই পদচারী ছিল। আর লগি-বৈঠার কভারেজে লুকিয়ে গুলি চালাচ্ছে আওয়ামী লীগের এক কর্মী।

বুক ফুলিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কী জানান দিতে চাইল আওয়ামী লীগ? তারা জানান দিতে চাইল, আওয়ামী লীগের কথা মতো না চললে, তাদের রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ালে একই পরিণতি অপেক্ষা করছে সবার জন্য। যেন আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ আবারও ফিরে এসেছে।

২৮ অক্টোবরের (২০০৬) পরও একই ধাঁচের আওয়ামী আন্দোলন অব্যাহত ছিল ২০০৭ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। আওয়ামী লীগ তাদের একই ধরনের মাস্তান বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে অবরোধের নামে সারা দেশকে জিম্মি করেছে। দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। চট্টগ্রাম বন্দর অচল করে দিয়ে রফতানি বন্ধ করে দিয়েছে। ভয় দেখিয়ে হাজার হাজার শিল্পকারখানায় উৎপাদন বন্ধ করেছে। মানুষের দৈনন্দিন চলাফেরা বাধাগ্রস্ত করেছে করেছে। স্থবির করে দিয়েছে দেশকে। দেশের ব্যবসায়ী সমাজ যখন এই কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করলেন, তখন শেখ হাসিনা বললেন, তারা ক্ষমতায় গেলে এ ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন। তৈরি পোশাক রফতানিকারকদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ক্ষমতায় গেলে যুক্তরাষ্ট্রকে বলে রফতানি বাড়িয়ে ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন। সবই ক্ষমতায় গেলে। কিন্তু শেখ হাসিনা ভাবেননি যে, তিনি ক্ষমতায় নাও যেতে পারেন। ক্ষমতায় না যেতে পারলে তিনি তো ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারবেন না। তবে কি এই ক্ষতি সাধনের জন্য তার কাঠোর শাস্তি হওয়া উচিত নয়। তবে তার এইসব ঘাতক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যে ছিল, এই শক্তি প্রয়োগ, এই ভীতি প্রদর্শনের ফলে হয় ভবিষ্যৎ নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে বাধ্য হবে। নয়ত তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে আওয়ামী লীগকে যারা সমর্থন করে না, তারা ভোট কেন্দ্রেই যাবে না। ফলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতার গদিতে বসবে। শেখ হাসিনা মনে রাখেননি, এই নির্যাতন-নিপীড়ন, হত্যাযজ্ঞ, খুনের উল্লাস কোনো কিছু দিয়েই শেষ রক্ষা হয় না। শেখ হাসিনা তো শেখ মুজিবের তুলনায় নস্যি। শেখ মুজিবই এর মধ্য দিয়ে শেষ রক্ষা করতে পারেননি, হাসিনাও পারবেন না।

তবে ২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার নির্দেশে তার লগি-বৈঠাধারি কর্মীরা নৃশংস নরহত্যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা ম্লান করে দিয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখেছে। রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে শেখ হাসিনা ও তার দোসররা কত বিভৎস নরহত্যা চালাতে পারে।

আজ ২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার কর্মীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত মানুষের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন নিহতদের শহীদি মর্যাদা দিয়ে বেহেশত নসিব করেন। আর দোয়া করি এ ধরনের নৃশংস ঘটনা ঘটানোর মতো কোনো অপশক্তির আবির্ভাব যেন বাংলাদেশে আর না ঘটে।

---

*লেখক: বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক*



icsbook.info

# মানবিক বিপর্যয়ের এক
# কালো অধ্যায়

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

২০০১ এর জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চরমভাবে ভরাডুবিতে তাদের নেতৃবৃন্দের উচিৎ ছিলো জাতি তাদেরকে কেনো এতো তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করলো তা খতিয়ে দেখে আত্ম-বিশ্লেষণ করে জনগণের নিকট নিজেদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চেয়ে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর পরিকল্পনা হাতে নেয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্য আওয়ামী লীগের, তারা সহজ-সরল পথ ছেড়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের পথে পা বাড়লো। পরিণামে দেশ-জাতি জাহান্নামে যাক তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না এবং দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও অবকাঠামো নির্মাণ বাধাগ্রস্ত হোক তাতেও তাদের কিছু আসে যায় না । সেই প্রবাদ বাক্যের মতো, 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই'। ক্ষমতা হারানোর প্রতিশোধ নেয়ার জিঘাংসায় মরিয়া হয়ে উঠলো আওয়ামী লীগ এবং তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবী, সুশীল (!) ও কলামিস্টরা।

জনগণ কর্তৃক ভোটে প্রত্যাখ্যাত আ'লীগ জোট সরকারের সাথে একা পেরে উঠবে না বুঝতে পেরে সেই সব বামদের তারা বিভিন্নস্তর থেকে তুলে এনে তিল কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাল বানানোর মতো জোট থেকে তথাকথিত মহাজোটে পরিণত হলো। ছিন্নমূল বামদের নিয়ে জট পাকানোর সময় আ'লীগ কল্পনা করলো না, এই বামরাই দেশের স্থপতি জনগণের প্রিয় জননেতা মরহুম শেখ মুজিবর রহমানকে বিভ্রান্ত করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে এক দলীয় বাকশালী শাসনের দিকে নিয়ে জনবিচ্ছিন্ন করার মূল নায়ক ছিলো। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের বিশাল জনপ্রিয়তায় রাতারাতি ধ্বংস নামানোর কুশীলব ছিলো ছিন্নমূল বামরাই। বামরা এদেশের পরগাছা বা শূন্যলতার মতো পরনির্ভর। বামগোষ্ঠীরা ভালো করেই জানে নির্বাচনের মাধ্যমে জীবনে তারা ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। এর মূল কারণ দু'টি। এক : বামরা চরম ধর্ম-বিদ্বেষী আর দেশের ৯৯%ভাগ জনগণ ধর্মভীরু। দুই : বামদের রাজনীতির মূলশক্তি ষড়যন্ত্র আর গায়ের জোর। তাদের স্লোগানই হলো, 'বন্দুকের নল থেকেই ক্ষমতা বেরিয়ে আসে'। অন্যদিকে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শান্তি



icsbook.info

কামী। এই বামরাই সর্বহারা ও জনযুদ্ধ নামক সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টি করে সমগ্র দেশ জুড়ে অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে এবং দেশব্যাপী এ পর্যন্ত নৈরাজ্য সৃষ্টির মূল হোতাও তারাই। দেশের যে সেক্টরেই অরাজকতা দেখা দিয়েছে, সেখানেই নেপথ্যে বামদের ষড়যন্ত্রের কালোহাত সক্রিয়থেকেছে। সারা দেশে বিভিন্ন ছদ্মনামে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ যেনো একই বৃক্ষের অনেক শাখা-প্রশাখা। দেশের মাটি ও মানুষের সাথে তাদের তেমন সম্পর্ক না থাকার কারণে পরগাছার মতো হয়েই কোনো একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বেড়ে যাওয়া বামদের মজ্জাগত অভ্যাস ও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র অবলম্বন। তবে তাদের অধিকাংশের কাছে বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদী মূল্যবোধে বিশ্বাসী দলের চাইতে ধর্মনিরপেক্ষবাদী দল বেশি পছন্দের। সে হিসেবে বামদের অধিকাংশই সুযোগ বুঝে আওয়ামী লীগের ঘাড়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো বসে পরিস্থিতি নিজেদের মতো করে বিগড়ে দেয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শুরু করলো।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্টিং মিডিয়ার একটি বিরাট অংশ তারা তাদের দখলে নিয়ে দেশকে অকার্যকর ব্যর্থ রাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদি, জঙ্গি ইত্যাদি নামে অভিহিত করার সর্বাত্মক দেশ বিরোধী মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়ে ছুটে চললো দেশ থেকে দেশান্তরে। জনবিচ্ছিন্ন বামদের সকল দলকে নিজেদের মুঠোয় পাওয়ার পর তাদের ক্ষয়িষ্ণু শক্তির ওপর নির্ভর করতে না পেরে আ'লীগ আরেকটি বড় শূন্যতায় ভুগছিলো। সে শূন্যতা হলো, আ'লীগ ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শে বিশ্বাসী বলে দেশের কোনো পরিচিত ওলামা-মাশায়েখ তাদের সাথে ছিলো না। কারণ প্রকৃত আলেম সমাজের নিকট ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে একটি সুস্পষ্ট কুফরী মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত। তাই তাওহীদি জনতা সকল নির্বাচনে আ'লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

আ'লীগ তাদের এ বিরাট শূন্যতা পূরণের জন্য বহু কিছুর বিনিময়ে দেশের একজন বর্ষিয়ান প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনকে 'ওয়াস ওয়াসায়' ফেলতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত চরম ধর্মবিদ্বেষী বামদের খুশি করার জন্য আ'লীগ ঐ চুক্তি থেকে তওবা করে এবাউট-টার্ণ করলো সে কাহিনী দেশবাসীর অজানা নয় এবং এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তথাকথিত মহাজোটের ইসলাম বিদ্বেষের মুখোশ আরেকবার উন্মোচিত হলো।

এদিকে আওয়ামী লীগ ঐ বামদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়েই গণতন্ত্র দু'পায়ে দলে সংসদ বর্জন শুরু করলো। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার পথ পরিহার করে জোট সরকারের উন্নয়নের পথে ধাবমান অর্থনৈতিক চাকা বন্ধ করার লক্ষ্যে পোশাক শিল্প কারখানায় অস্থিরতা সৃষ্টি, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লাগাতার হরতাল, অবরোধ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জোট সরকারের ঘুম হারাম করার মহা রোডম্যাপ বাস্তবায়ন শুরু করালো। একটানা পাঁচ বছর তাদের এ দেশ বিরোধী আত্মঘাতী কার্যক্রমেরমধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অপরিসীম দয়ায় জোট সরকার সফলভাবেই তাদের মেয়াদকাল পূর্ণ করে ২৮ অক্টোবর শনিবার ৮ম সংসদের পরিসমাপ্তি করলো। ইতোপূর্বে আ'লীগের পল্টন মহাসমাবেশ থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আ'লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশ থেকে তাদের নেতা-কর্মীদের লগি-বৈঠা নিয়ে ২৮ অক্টোবর ঢাকা অবরোধের ঘোষণা দিলেন।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিএনপি নয়াপল্টন, আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দান এবং জামায়াতে ইসলামী বায়তুল মুকাররমের উত্তরগেটে সমাবেশের প্রস্তুতি নিলো। অন্য দিকে ইসলাম বিদ্বেষী বিভিন্ন এনজিও বিশেষ করে প্রশিকার হাজার হাজার কর্মী এবং বামদের



icsbook.info

সর্বহারা, জনযুদ্ধ ও আওয়ামী লীগের উচ্ছৃঙ্খল আরও হাজার হাজার কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকাল ন'টা দশটার দিকে পল্টন ময়দানে জড় হতে থাকলো। পুলিশের তাড়া খেয়ে আ'লীগ তাদের জন্য নির্ধারিত সমাবেশ স্থল পল্টন ময়দান ছেড়ে দিয়ে নিরস্ত্র জামায়াত শিবিরের নেতা-কর্মীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে প্রেসক্লাব থেকে পল্টন মোড় ও বিজয় নগর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা লগি-বৈঠা বাহিনী দিয়ে ভরে ফেললো। বেলা এগারটার দিকে শুরু হলো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জামায়াত-শিবিরের নিরস্ত্র কর্মীদের ওপর ইতিহাসের বর্বরোচিত ঘৃণ্য হামলা।

আমি সেদিন সকাল ন'টা থেকেই পল্টনস্থ জামায়াতের ঢাকা মহানগরী অফিসে কেন্দ্রীয় এবং মহানগরী নেতৃবৃন্দের সাথে জামায়াতের সমাবেশে অংশগ্রহণ করার জন্য অবস্থান করছিলাম।

## এতো রক্ত জীবনে দেখিনি

২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার লগি-বৈঠাধারী বাহিনীর নির্মম নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত হাত ভাঙা, পা ভাঙা, থেঁতলানো রক্তাক্ত মাথা ও সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত জামায়াত-শিবির কর্মীদের একের পর এক মহানগরী অফিসে বহন করে আনা হচ্ছিলো। আহতদের করুণ আর্তনাদে পরিবেশ বেদনা বিধুর হয়ে উঠেছিলো। আমি অসহায়ের মতো চোখের সম্মুখে এ ধরণের অমানবিক নির্মম দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। বাম ও আ'লীগের লগি-বৈঠা বাহিনীর বর্বর আঘাতে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঙা নামাযী মানুষগুলোর যন্ত্রণাকাতর রক্তাক্ত করুণ চেহারার দিকে শুধু অশ্রু সিক্ত চোখে তাকিয়েই ছিলাম, সান্ত্বনা দেয়ার কোনো ভাষা আমি খুঁজে পাইনি। ভাবছিলাম, কি এদের অপরাধ? এরা তো নিজেরা নামাজ রোজা আদায় করে, কোরআন হাদীসের বিধান নিজেরা অনুসরণ করার চেষ্টা করে এবং অন্য মানুষদেরও আল্লাহ তা'য়ালা ও তার রাসূল (সা.) এর বিধান অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানায়। এটাই কি এদের অপরাধ? ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ এবং নাস্তিক্যবাদী বামরা এ জন্যেই এদেরকে সহ্য করতে পারে না ? ইসলামের বিধান অনুসরণকারী এসব মানুষদের অপরাধ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তারা এদের (ঈমানদার) কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি যে, তারা এক পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এসেছিলো'। –সুরা বুরুজ : ৮।

সুতরাং এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, নাস্তিক্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ লাভের চাবিকাঠি কোরআন হাদীসের বিধান অনুসরণ করাইছিলো ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবিদ্বেষী বামদের কাছে জামায়াত-শিবিরের অপরাধ।

সেদিন আমি স্পষ্ট অনুধাবন করলাম, আ'লীগ ও বামরা আজ আল্লাহভীরু মানুষদের রক্ত পিপাসায় লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে লাশের স্তুপ জমে যাবে। বন্য হায়েনাদের এই হিংস্র তান্ডব দ্রুত রোধ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী থেকে শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকবার যোগাযোগ করে সাহায্য চেয়েও তাদের কাছ থেকে কার্যকর কোনো সাড়া পাইনি, অজ্ঞাত কারণে তারা নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। সেদিন আওয়ামী ও বাম সন্ত্রাসীদের বর্বর আক্রমণে শত শত জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মী আহত



icsbook.info

হলেন, কেউ কেউ সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন। লগি-বৈঠার নিষ্ঠুর ছোবলে প্রকাশ্য রাজপথে জীবন হারালেন হাফেজে কোরআন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী সম্ভাবনাময় ছাত্রসহ ছয়জন নিরীহ আদম সন্তান। মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। টেলিভিশনের পর্দায় গোটা বিশ্ব সেদিনের সে বর্বর দৃশ্য দেখে বাংলাদেশকে বন্য অসভ্য বলে মন্তব্য করলো, জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে আমরা মর্যাদা হারালাম।

দেশে সংঘটিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনায় বুদ্ধিজীবী, তথাকথিত সুশীল ও মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ বিবৃতির বহর খুলে দেন। টিভি চ্যানেলগুলোয় টক-শো'র মাধ্যমে মুখে ফেনা তোলেন, কিন্তু ২৮ অক্টোবরের বর্বর পশুসুলভ ঘটনায় তাদের মুখ বা কলম থেকে দুঃখ প্রকাশ জনিত একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। ধিক! শত ধিক এসব সুশীল (!) ও বুদ্ধিজীবীর মানবতাবিবর্জিত জ্ঞান বিবেকের প্রতি। যারা নিজেদের বিবেক পয়সার বিনিময়ে অন্যের কাছে বিক্রি করে ভিন দেশের গোলামী করাকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন, আর যাই হোক তারা সভ্য মনুষ্য পদবাচ্যে বিবেচিত হতে পারেন না। আর এ জাতীয় লোকেরাই যদি হন সুশীল তাহলে কুশীলের ব্যাখ্যা কি ?

মাস দুয়েক পূর্বে কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় আওয়ামী সভানেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা আমি মা শীর্ষক একটি লেখার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তার আসন্ন প্রসবা প্রবাসী কন্যা পুতুলের প্রসবকালীন সময় তার সান্নিধ্যে থাকতে পারছেন না এই মানসিক কষ্টের কথা নানা ভাবে ঐ লেখায় তিনি উল্লেখ করেছেন।

মা হিসেবে মেয়ের প্রতি এ দরদ ও আকুতি উৎসারিত হওয়া নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ২৮ অক্টোবর তাঁরই নির্দেশে তার লগি-বৈঠা বাহিনীর লোকেরা ছয়জন মায়ের নাড়িছেঁড়া কলিজার টুকরা বুকের মানিক, সম্ভাবনাময় নিরস্ত্র নিরীহ ছয়টি সন্তানকে রাজপথে দিবালোকে সাপ মারার মতো পিটিয়ে পিটিয়ে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে লাশের ওপর উঠে পৈশাচিক উল্লাস করলো, এ রোমহর্ষক দৃশ্য অবলোকন করার পর আ'লীগ নেত্রীর মাতৃহৃদে কোথায় ছিলো? ওরাও তো ছিলো আপনার মতো কোনো না কোনো মায়ের নয়নের মণি কলিজার টুকরা পরম আদরের সন্তান। যে মায়েরা বুকভরা আশা নিয়ে দিনের পর দিন বছরের পর বছর নিজেকে একটু একটু করে কর্পূরের মতো নিঃশেষে ক্ষয় করে ঐ সন্তানগুলোকে যুবক বয়সে পৌঁছে দিয়েছিলো, আপনার লগি-বৈঠাধারিরা মুহূর্তেই সেই মায়েদের সকল স্বপ্নস্বাদ চিরকালের মতো ভেঙে ধূলিস্মাৎ করে বুকের মধ্যে সন্তান বিচ্ছেদের যে অনির্বাণ অনল শিখা জ্বালিয়ে দিলো, তা নির্বাপিত করা অসম্ভব হলেও পরের দিনের পত্রিকায় আপনি যদি আপনার বাহিনী কর্তৃক নিহত ব্যক্তিদের পিতামাতাদের একটু সমবেদনা জানাতেন এবং যেসব পশু প্রবৃত্তির মানুষগুলো ওদেরকে হত্যা করলো তাদেরকে ধিক্কার জানাতেন তাহলে আপনার লেখা 'আমি মা' শীর্ষক প্রবন্ধটি জাতির বিবেককে অবশ্যই নাড়া দিতো। সুতরাং মহাকালের ঘূর্ণায়মান চক্রের আবর্তনে ২৮ অক্টোবর এ বাংলায় যতবার আসবে ততবার আওয়ামী লীগ ও বাম সংগঠনের নেতা-কর্মীদের জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে ধিক্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে। এবং ২৮ অক্টোবর চিহ্নিত হয়ে থাকবে ইতিহাসের মানবিক বিপর্যয়ের এক কালো অধ্যায় হিসেবে। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মানবতা বিবর্জিত মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের দৃষ্টি নিপতিত না হলেও টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার বিবেকবান মানুষ



icsbook.info

দেখেছে জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের শান্তিপ্রিয় মানসিকতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, মানবতা, সর্বোপরি গণতান্ত্রিক চরিত্র। জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমীরে জামায়াতসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যে মুহূর্তে মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই মঞ্চের পাশ দিয়ে তাদের চোখের সম্মূখ পথেই জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীদের আহত রক্তাক্ত দেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। সেই সাথে মঞ্চ লক্ষ্য করে নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার জন্য আ'লীগ ও বামদের সশস্ত্র উচ্ছৃংখল সন্ত্রাসীরা অবিরাম বোমা ও গুলি ছুঁড়ছিলো। জীবনের সেই চরম মুহূর্তে তারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জামায়াত-শিবির কর্মীদের শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে বক্তব্য দিয়েছেন এবং আক্রমণাত্মক ও উত্তেজক একটি শব্দও তারা বক্তব্যে ব্যবহার করেননি। জামায়াত-শিবিরের এই অতুলনীয় সহনশীলতা, শান্তিপ্রিয় মানসিকতা ও গণতন্ত্রিক চরিত্র দেখেও যারা সত্য আড়াল করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে মৌলবাদি, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গি ও সন্ত্রাসী হিসেবে অপবাদ দিয়ে জামায়াত-শিবিরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অবিরাম চেষ্টা সাধনা করে যাচ্ছেন, এখনও সুযোগ পেলেই জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে কলাম লেখা, টিভি চ্যানেলে টক-শো'র মাধ্যমে বিবেক বিবেচনার মাথা খেয়ে জামায়াত-শিবিরের গোষ্ঠী উদ্ধার করে মজা পান তাদের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী কবি, মনবতার কবি ও ইসলামী জাগরণের অনন্য কবি কাজী নজরুল ইসলামের সেই বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করে আজকের এ প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই–

নিজেদের চারধারে বাঁধ বেঁধে মৃত্যু জীবাণু যারা জিয়ায়,
তারা কি চিনিবে মহাসিন্ধুর উদ্দেশ্যে ছোটে স্রোত কোথায়!
স্থাণু গতিহীন পড়ে আছে তারা আপনারে লয়ে বাঁধিয়ে চোখ
কোটরের জীব, উহাদের তরে নহে উদীচীর ঊষা-আলোক।
আলোক হেরিয়া কোটরে থাকিয়া চেঁচায় প্যাঁচারা, ওরা চেঁচাক।
মোরা গাব গান, ওদের মারিতে আজো বেঁচে আছে দেদার কাক।
জীবনে যাদের ঘনাল সন্ধ্যা, আজ প্রভাতে শুনে আজান
বিছানায় শুয়ে যদি পাড়ে গালি, দিক গালি তোরা দিসনে কান।
উহাদের তরে হতেছে কালের গোরস্থানে রে গোর খোদাই,
মোদের প্রাণের রাঙা জলসাতে জরা জীর্ণের দাওয়াত নাই।
জিঞ্জির পায়ে দাঁড়ে বসে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল,
আকাশের পাখি! ঊর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল!
তোরা ঊর্ধ্বের অমৃত লোকের ছুঁড়ুক নীচেরা ধুলাবালি,
চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিন ডিবে কালি ঢালি!
বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিঁটাক, পাঁকের ঊর্ধ্বে তোরা কমল,
ওরা দিক কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল ওরা পশুর দল!
তোদের শুভ্র গায়ে হানে ওরা আপন গায়ের গলিত পাঁক,
যার যা দেবার সে দেয় তাহাই, স্বর্গেও শিশু সহিয়া থাক!

---

*লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য, খ্যাতিমান মুফাচ্ছিরে কুরআন।*



icsbook.info

# যে দৃশ্য দেখা যায় না

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

লগি-বৈঠা নৌকায় থাকার কথা। নৌকা ঠেলা হয়। মাঝি লগির সাহায্যে নৌকা চালায়, যাত্রীদের উপকার করে। কিন্তু সেই লগি যে রাজপথে এসে মানুষ পিটানোর কাজে ব্যবহৃত হয়– এটা জানা গেল ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর একটি ধর্মনিরপেক্ষবাদী দলের প্রধানের নির্দেশ এর মাধ্যমে। 'The scene they created is not only horrible but also uncommon in the history of mankind. বৈঠা দিয়ে নৌকা চালানো হয় পানির মধ্যে। মাঝি বৈঠা ধরে যুগ যুগ নৌকা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে আসছে। কত কবি সাহিত্যিক, লেখক বৈঠার উপমা দিয়ে গল্প, কবিতা লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অনেক হতাশ কণ্ঠ উচ্চারণ করে–

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।"

ছাত্র জীবনে এসব ভাব সম্প্রসারণ লিখে নম্বর তুলে রেজাল্ট ভাল করার কথা। নৌকায় ভ্রমণ করতে গিয়ে বৈঠা দিয়ে মাঝির নৌকা চালনার দৃশ্য দেখে এদেশের মানুষ অভ্যস্ত। কিন্তু সেই বৈঠা যে পানি ছেড়ে ডাঙ্গায় চলে আসবে এবং তা শুধু ডাঙ্গায় নয় খোদ রাজধানীর পীচঢালা রাজপথে এসে মানুষ খুন করবে এমন দৃশ্য কখনও দেখার নয়, কল্পনাও করা যায় নি। কিন্তু সেটাও বাস্তবে দেখা গেল ২০০৬ এর ২৮ অক্টোবর গণতন্ত্রের মানস কন্যা নামে পরিচিত নেত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নকারীদের পশুসুলভ তান্ডব এর মাধ্যমে।

মানুষ খুন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর মানুষ খুন করার জন্য লগি ও বৈঠা নিয়ে ঢাকায় সমবেত হবার ঘোষণা শেখ মুজিব কন্যার মুখে প্রথম শোনা গেল। তার নির্দেশমত হাজার হাজার পেশাদার খুনি ঢাকায় সমবেত হল।

আগেই জেনেছি সেদিন ঢাকা মাহনগরী জামায়াত অফিস থেকে বলা হয়েছিল নেতৃবৃন্দকে দুপুরের আগেই অফিসে চলে আসার জন্য। সেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ দুপুরের খাবার ও জোহরের নামাজ একসাথে পড়ার কথা। ঘোষণা মোতাবেক রিক্সায় চড়ে বেলা ১২টায় দিকে রওয়ানা হলাম।



icsbook.info

রিক্সাওয়ালাকে সোজাসুজি না এসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পাশ দিয়ে দৈনিক বাংলা হয়ে যেতে বললাম, একটা আশংকা ছিল যে পল্টন মোড় দিয়ে রিক্সায় যাতায়াত করতে পারবে না। ফলে রাস্তা পরিবর্তন করে গেলাম। দৈনিক বাংলার মোড় দিয়ে ঢাকা জামায়াত অফিসে যাবার জন্য রিক্সা ঘুরতেই দেখি দুজন সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত ছাত্র তাদের মাথায় রক্ত এবং সাদা পাঞ্জাবির সামনের বুকের অংশ রক্তে লাল হয়ে গিয়াছে। বুঝতে বাকি রইলো না, আওয়ামী লীগের খুনিচক্র মানুষ খুনের হোলী খেলা শুরু করে দিয়েছে। রিক্সা যত কাছাকাছি হয়, আহতদের সংখ্যা তত বেশি চোখে পড়তে থাকে।

দ্রুত রিক্সা থেকে নেমে আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারি জেনারেল যে রুমে ছিলেন, সেখানে যাই। দেখি দুজনই প্রশাসনের দায়িত্বশীলদের সাথে ও পুলিশের দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোনে কথা বলছেন। যে সব কথাগুলো প্রশাসনের সাথে বলা হল তা ছিল–

১। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব প্রশাসনের। অতএব যারা প্রশাসনের দায়িত্বশীল আছেন তাদের এই মুহূর্তেই ভূমিকা পালন করা দরকার। কারণ আমাদের লোকজন যোহর নামাজের পর আসবে আমাদের সভায়। এখন যারা মঞ্চ তৈরি করছেন ও স্বেচ্ছাসেবক আছেন তাদের উপর এক পক্ষ থেকে হামলা চালিয়ে বেশ কিছু শিবির ও জামায়াত কর্মীকে ইতিধ্যে আহত করেছে। হতাহতের সংখ্যা আরো বেড়ে যাচ্ছে। দ্রুত পদক্ষেপ নিন।

২। আক্রমণকারি আওয়ামী লীগের আহুত লগি-বৈঠাধারি সন্ত্রাসী বাহিনী। তারা অস্ত্রসহ লগি ও বৈঠা দিয়ে আমাদের লোকজনকে আহত ও রক্তাক্ত করেছে। কমপক্ষে জিরো পয়েন্ট ও পল্টন মোড়ের চৌরাস্তায় পুলিশ দিয়ে ব্যারিকেড দিলে এই ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু অতীতে সব সময় এ স্থানে পুলিশ থেকে উভয় পক্ষকে সংঘর্ষ থেকে দূরে রাখতো। কিন্তু আজকে কেন পুলিশ নেই?

এর জবাব সেদিন পাওয়া যায় নি। ততক্ষণে খবর আসা শুরু হয়েছে– শাহাদতের ঘটনা বেশ কয়েকজনের। সেদিনের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে বলেও কোন কাজ হয় নি। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করতে হয়েছিল। দুপুরের নামাজ শেষে সভার স্থান বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেটে নেতৃবৃন্দসহ হাজির হলাম। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সংক্ষেপে কিছু কথা বলার পর পরই আমীরে জামায়াত বক্তব্য শুরু করেন। মুহতারাম আমীরে জামায়াতের বক্তৃতা শুরু হবার সাথে সাথে পল্টন মোড়ের হামলার তীব্রতা লগি, বৈঠা ও অস্ত্রধারীরা বৃদ্ধি করে। প্রচন্ড শব্দ, ধোঁয়া ও গন্ধে এলাকা ভয়াবহ হয়ে উঠে। অত্যন্ত শান্ত ভাষায় মুহতারাম আমীরে জামায়াত কথা শুরু করেন। ওদিকে লগি বৈঠাধারীদের বোমা ও গুলির প্রচন্ড শব্দের মধ্যে থেকেও তিনি বক্তব্য দিচ্ছেন, সকলকে শান্ত থেকে বক্তব্য শুনার জন্য আহ্বান করেছেন। বিপদের মুহূর্তে শান্ত থেকে এমন বক্তব্য দেয়ার দৃশ্য-সেদিন দেখলাম। মুহতারাম আমীরে জামায়াতকে আর একবার জাতীয় সংসদে বিরূপ পরিবেশের শান্ত থেকে বক্তব্য দিতে দেখেছিলাম। আওয়ামী সংসদ সদস্যগণ প্রচন্ড হৈ চৈ করছেন এবং মতিয়া চৌধুরী হাক থু থু শব্দ করে প্রচন্ড চিৎকার করার মধ্যেও আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী অত্যন্ত



icsbook.info

শান্তভাবে বক্তব্য দিচ্ছিলেন- যা সত্যিই ব্যতিক্রম।কোন উত্তেজনার বহি:প্রকাশ ছিল না, বরং যুক্তি দিয়ে অত্যন্ত শাণিত ও সুন্দর ও সুন্দর বলিষ্ঠ ভাষায় বক্তব্য দিচ্ছিলেন।

২৮ অক্টোবর বায়তুল মোকাররমের জনসভায় আমরা যারা স্টেজে ছিলাম- আমরাই বরং স্টেজে থেকে নড়াচড়া করে এদিক ওদিক নিরাপত্তার খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম।

ইতিমধ্যে শহীদ ও আহতের সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি হতে হতে প্রায় শতাধিক আহত ও পাঁচজন শহীদ হয়েছেন খবর আসল।

বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম মানুষ খুনের দৃশ্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মারফতে সারা দুনিয়ার মানুষ মুহূর্তে জেনে যায়। মানুষ খুন করার পরও লাশের উপর নৃত্য করা এবং লাশকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটাতে থাকার এ দৃশ্য দেখে অনেকে মুর্ছা যায়। নির্মম এ দৃশ্য বর্ণনা করা অসম্ভব শুধু নয়, দেখাও অসম্ভব।

সংঘর্ষ চলাকালে জামায়াত শিবির কর্মী সাংবাদিক জনতাসহ আহত হয় ছয় শতাধিক। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে। জামায়াত-শিবির কর্মীরা মানব প্রাচীর গড়ে তুলে শহীদ ও আহতদের রক্তের বিনিময়ে সেদিন ইসলামী আন্দোলনের পতাকা রাজধানী ঢাকায় সমুন্নত রেখেছেন। আল্লাহ না করুক সেদিন যদি তারা সমাবেশে ঢুকে নেতৃবৃন্দের উপর হামলা করতে পারত তাহলে এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান কোথায় যেত- চিন্তা করা যায় না। আল্লাহর একান্ত মেহেরবানীতে তিনি ইসলামী আন্দোলনের মর্যাদা রক্ষা করেছেন শহীদ ও আহতদের রক্তের বিনিময়ে। সারা দুনিয়ায় ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে যারা সন্ত্রাসীকর্মকান্ড বলছে এবং মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী বলতে চাচ্ছে, শহীদ ও আহতদের রক্ত তাদের অন্ধ চোখকে খুলে দিয়েছে। তাদের রক্ত যেন বলছে সন্ত্রাসী কারা এবং সন্ত্রাস কারা করছে চোখ খুলে একবার দেখ... অপপ্রচারের নেশায় মত্ত হয়ে থেক না। দুনিয়ার সামনে চোখ খুলে নিজে দেখ অন্যকে দেখাও যে, ইসলাম সন্ত্রাসবাদ নয় এবং ইসলামী আন্দোলন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে বিশ্বাস করে না। লগি-বৈঠা নিয়ে যারা মানুষ খুন করে, খুন করার পরে লগি-বৈঠা দিয়ে লাশ পিটায়, লাশের উপর নাচানাটি করে ঐ সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষবাদি ও সম্রাজ্যবাদী শক্তির পদলেহনকারীই প্রকৃত পক্ষে সন্ত্রাসী।

২৮ অক্টোবরকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের লগি-বৈঠার শিকার হয়ে ঘটনার আগে, পরে ও সেদিন যারা শহীদ হয়েছিলেন, সেই নিস্পাপ জান্নাতী শহীদদের তালিকায় যারা নাম লিখিয়েছেন তারা হলেন :

১। হুসাইন মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম
সদস্য, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ছাত্র, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি

২। গোলাম কিবরিয়া শিপন
সাথী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ছাত্র, ঢাকা কলেজ

৩। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
কর্মী, ইউনিট সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, মীরপুর পশ্চিম, ঢাকা

৪। মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন
কর্মী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, লালবাগ, ঢাকা



icsbook.info

৫। রুহুল আমীন
রুকন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, গাজীপুর
প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, গাজীপুর
৬। জসিম উদ্দীন
কর্মী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা
৭। আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল
কর্মী, ইসলামী ছাত্র শিবির, নারায়ণগঞ্জ
৮। রফিকুল ইসলাম
সাথী, ইসলামী ছাত্রশিবির, কুড়িগ্রাম
৯। আরাফাত
সমর্থক, ইসলামী ছাত্রশিবির, মাগুরা
১০। আব্বাস আলী
কর্মী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, মেহেরপুর
১১। সাবের হুসাইন
কর্মী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জলঢাকা, নীলফামারী
১২। জাবিদ আলী
কর্মী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, আশাশুনি, সাতক্ষীরা

১২ জন শহীদের সাথে হাসপাতালে চিকিৎসাপ্রাপ্ত ও চিকিৎসা ছাড়া যারা আহত এমন সংখ্যা প্রায় ৬০০জন। এ সমস্ত শহীদ ও আহতদের রক্ত ঝরালো যারা তারা ধর্মনিরপেক্ষবাদি একজন নেত্রীর হুকুম পালন করেছে। এখন যদি ন্যায় বিচারের কথা তুলতে হয় তাহলে এক নম্বর হুকুমের আসামী হবে সেই নেত্রী। তারই হুকুমে লগি-বৈঠা হাতে নিয়ে রাজধানী ঢাকায় তারা সমবেত হয়েছিল।

যারা শহীদ হলেন বা আহত হলেন তাদের অপরাধ কি? আলকুরআন এ ব্যাপারে ১৪শ' বছর আগেই মোমিনদের অপরাধ সম্পর্কে ধারনা দিয়েছে। কুরআন বলছে–

'আমা নাকামু মিনহুম আঁই ইয়ুমিনু বিল্লাহিল আজিজিল হামীদ'

'তাদের এ ছাড়া আর কোন অপরাধ ছিল না যে তারা মহা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে'। আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও তার হুকুম মেনে চলার কাজে আঞ্জাম দেয়া ইসলামের দুশমনদের কাছে একটা বড় অপরাধ।

২৮ অক্টোবরের দেখতে না পারা দৃশ্যগুলো প্রমাণ করছে মুসলমানরা সন্ত্রাসী নয়, বরং সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত। মুসলমানরা জালেম নয় বরং তারা মজলুম। তারা অত্যাচার করে না বরং অত্যাচারের তারা শিকার। আজকের ইরাক, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, কাশ্মীরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম নারী ও শিশুরা যেভাবে নির্মম মৃত্যুর শিকার হচ্ছে– তারা সন্ত্রাসী নয়, বরং যারা তাদেরকে হত্যা করছে সেই ইহুদী ও বুশ তার এবং গংরাই খুনি, সন্ত্রাসী ও জালেম। মজলুম মুসলমানদেরকেই তাদের প্রচার মিডিয়াগুলো সন্ত্রাসী বলে মিথ্যাচার চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সবাইকে শক্তিশালী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যে কুরআনের বিধান চালু করার জন্য এত রক্ত, এত কুরবানী, এত আন্দোলন, সেই আন্দোলনের চালিকা শক্তির কেন্দ্র বিন্দু আল কুরআন ঘোষণা করছে–

'লাসতা আলাইহিম বেমুসাইতির'



icsbook.info

'তোমাকে দারোগা করে পাঠানো হয় নি। –সুরা গাশিয়া : ২২।

সুরা কাফ এর সর্ব শেষ আয়াতে বলা হয়েছে– 'নাহনো আ'লামো বেমা ইয়াকুলুনা, অমা আনতা আলাইহিম বেজাববার, ফাজাক্কের বিল কুরআনা মাই ইয়াখাফো ওয়াইদ'।

'আমরা জানি তার যা বলে বিরোধী কথাবার্তা ও উস্কানিমূলক বক্তব্য তোমাকে তাদের উপর জবরদস্তকারি করে পাঠাই নি, তাই আমার শাস্তিকে যারা ভয় করে তাদেরকে কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও'। –কাফ : ৪৫০।

যারা সকল অবস্থায় সবর করে তাদেরকে নরম ভাষায় যুক্তিভিত্তিক দাওয়াত দেয়ার কথা বলা হয়েছে–

ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পর্কে মূল কথা হল রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পদ্ধতিতে কাজ করছেন সেই পদ্ধতিই সঠিক পদ্ধতি। অন্য কোন পদ্ধতি ইসলাম সমর্থন করেন না।

সুরা জুমআ ও সুরা বাকারাসহ কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে : তার কাজ ছিল–

১। আয়াত তেলাওয়াত করা ও মানুষকে কুরআনের আয়াত বুঝানো।

২। আয়াতের শিক্ষা দ্বারা তাদের সংস্কার করা।

৩। মানুষকে কুরআনের মুয়াল্লিম বা প্রশিক্ষক বানানো, দায়ী ইলাল্লাহর কাজ করানো।

৪। হিকমা বা প্রজ্ঞার সাথে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে আল্লাহর হুকুমগুলো বাস্তবায়ন করা।

কুরআনের হুকুমকে রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে চালু করার উপরোক্ত কর্মসূচির বাইরে অন্য কোন কর্মসূচি নেই। তাই যারা অন্ধ তাদের চোখ খোলার জন্য সময় এসেছে ২৮ তারিখ থেকে সবক নেয়ার। সবক নেয়ার সময় এসেছে ডাইরেক্ট কুরআন অর্থসহ অধ্যয়ন করার।

পরিশেষে দোয়া করি মহান আল্লাহর দরবারে- হে রব্বুল আলামীন! ২৮ তারিখে যারা শহীদ হল, যারা আহত হল, যারা কষ্ট পেল সবাইকে তুমি কবুল কর ও তাদের কুরবানীর সর্বোত্তম পুরস্কার তুমি দান কর।

২৮ তারিখের ঘটনা দেখে ইসলাম বিদ্বেষীদের অন্তরকে তুমি সংশোধন করার তৌফিক দাও তারা যেন বুঝে ইসলাম ও মুসলমান সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে। ইতিহাস বলে মুসলামানরা দাওয়াত ও উত্তম ব্যবহার দ্বারা ইসলামকে বিজয়ী করেছে।

ইসলামের দুশমনদের অন্ধ চোখকে খুলে দিক ২৮ অক্টোবরের রোমহর্ষক ঘটনাবলী... যা কোনদিন বর্ণনা করা যাবে না। হে অন্তরের মালিক! আমাদের সকলের অন্তরগুলো তোমার দ্বীনের জন্য ও তোমার আনুগত্যের জন্য কবুল কর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাষায় দোয়া করেছেন সে ভাষায়ই বলি–

"ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাবিবত কুলুবানা আ'লা দ্বীনেক, ইয়া মুসাররিফাল কুলুব সার-রিফ কুলুবেনা আলা তা'তিক" আমীন।

---

*লেখক: সাবেক এমপি, কেন্দ্রীয় সভাপতি- শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।*



icsbook.info

# ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম রাজনীতির মানবতা বিরোধী নৃশংসরূপ

অধ্যাপক মো: তাসনীম আলম

২৮ অক্টোবর, ২০০৬ এর পল্টনের হত্যাকান্ড বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি টার্নিং পয়েন্ট। কেননা এ হত্যাযজ্ঞ ছিল পরিকল্পিত এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে। আর তা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষার বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য শক্তি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন জামায়াত ও শিবিরের নেতা কর্মীদেরকে নিশ্চিহ্ন করা। ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম ধারার ১৪ দলের ক্ষমতায় যাবার পথ নিস্কন্টক করা। লগি-বৈঠা দিয়ে তরুণ তাজা প্রাণকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশের উপর নৃত্য করার দৃশ্যে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম রাজনীতির মানবতা বিরোধী নৃশংস রূপই ফুটে ওঠেছে। বাংলাদেশের মানুষ হত্যার অনেক ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলের মিটিং এর উপর হামলা করে সহস্রাধিক লোককে আহত করা এবং লগি, বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে লাশের উপর নৃত্য করার দৃশ্য মানুষ আর কখনো দেখেনি। পল্টন হত্যাযজ্ঞের প্রথম বার্ষিকীর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে যখন এ নিবন্ধ লিখছি তখন কলম আর চলছে না, দু'নয়নে অঝোর ধারায় অশ্রু নামছে। চোখের পাতা ভিজে আসছে। ভিডিও দৃশ্য চিত্র এখনও চোখে ভাসছে। নরঘাতকরা জামায়াত কর্মী জসীমকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটাচ্ছে, তাজা প্রাণ বের হতে চাচ্ছে না। বার বার মাথা তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। শেষ বারের মত প্রিয় জননীর চেহারা দেখার উদ্দেশ্যেই যেন মাথা উঁচু করছে। তার চোখে অন্ধকার। 'মা' ডাক দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু জীবনী শক্তি নি:শেষ হয়ে যাওয়ায় সে ডাক আর বেরুচ্ছেনা। নরঘাতকরা বার বার লগি-বৈঠা দিয়ে আঘাত করছে। ওরা ওকে খুন করে মায়ের বুক খালি করবেই। লগি-বৈঠার আঘাতে আঘাতে শেষ পর্যন্ত কলেমার আওয়াজ দিয়ে চিরদিনের তরে নিস্তেজ হয়ে পড়ল কিছুক্ষণ আগের জীবিত একজন সুন্দর চেহারার নিস্পাপ এক যুবক। শিবির নেতা মুজাহিদকেও তারা একই কায়দায় পিটিয়ে হত্যা করেছে। এ দৃশ্য সহ্য করা যায়না। টেলিভিশন চ্যানেলের



icsbook.info

বদৌলতে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এ দৃশ্য দেখেছে। এ দৃশ্য বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে জসীমের পিতা, মুজাহিদের মা, তাদের পরিবার, শহীদ জসীম মুজাহিদের সঙ্গী-সাথী ইসলামী আন্দোলনের অসংখ্য নেতা কর্মী, বিশ্বের বিবেকবান কোটি কোটি মানুষ। এ দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি আর কেউ চায় না। চরম আফসোস নিয়েই এ লেখা লিখতে হচ্ছে। আর তা হলো ভিডিওতে ধারণকৃত ঐসব চিহ্নিত ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম রাজনীতির কর্মীরা এখনো গ্রেফতার হয়নি, হয়নি তাদের বিচার। আমরা আশা করবো বর্তমান সরকার অতি সত্ত্বর মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়াদ্রুত সম্পন্ন করবেন।

যারা পল্টনের হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছে তারাও কিন্তু মানুষ। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম রাজনীতি তাদেরকে মানুষ থেকে পশুর চাইতেও নিচুস্তরে নামিয়ে দিয়েছে। তাদের মানবতাবোধকে নিঃশেষ করে দিয়ে এদেরকে সন্ত্রাসী, খুনিরূপে গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের আবহমান ইসলামী ধারা বুকে ধারণকারি জনগণের উপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র চাপিয়ে দেবার জন্য তারা বার বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তল্পীবাহক হিসাবে বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য বিদেশী প্রভুদের নিকট সঁপে দেবার চেষ্টা করেও তারা পারেনি। আর তা পারেনি এদেশের জনগণের দেশপ্রেম ও ইসলাম প্রীতির কারণে। তাই জনগণের মাঝে যারা দেশপ্রেমের বীজ ছড়াচ্ছে, জনগণকে ইসলামী চেতনায় যারা উদ্বুদ্ধ করছে, যারা তরুণ প্রজন্মকে শাহজালাল (র.), শাহ মখদুমের (র.) সংগ্রামী কাহিনী শুনাচ্ছে, কুরআনের চিরশান্তির পথে ডাকছে তাদেরকে ওরা নিশ্চিহ্ন করতে চায়। ক্ষমতার স্বপ্নে বিভোর এ গোষ্ঠী খুন করে হলেও ক্ষমতার স্বাদ নিতে চায়। বাংলাদেশের মানুষ শান্তি প্রিয়, গণতন্ত্রমনা, সাম্প্রায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। এদেশের মানুষ সন্ত্রাসকে কখনো গ্রহণ করেনি। এদেশে অস্ত্রের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টির রাজনীতি প্রথম আমদানি করে বামপন্থী রাজনীতিবিদগণ। তাদের মুখে স্লোগান ছিল বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। সমাজতন্ত্রীদের সেই চির চেনা স্লোগান 'ভোটের বাক্সে লাথি মারো' এখনো কানে বাজে। তেমনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিদের ইতিহাসও বড়ই বিভৎস। ফ্যাসিবাদী কায়দায় অন্যদলের মঞ্চ দখল করার অভ্যাস তাদের পুরোনো। তাছাড়া সমাজতন্ত্রীরা তাদের ঘাড়ে সওয়ার হবার কারণে তাদের বিভৎস কালো চেহারা আরো কুৎসিৎ আকার ধারণ করেছে। বাকশাল কায়েম করে তারা গণতন্ত্রের বুকে পেরেক ঢুকিয়ে চিরদিনের জন্য হত্যা করেছিল। মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিরা বড়ই হিংস্র।

পল্টনের ঘটনায় দেশবাসী একদিকে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদি ও সমাজতন্ত্রীদের হিংস্ররূপ যেমন দেখতে পেয়েছে, পাশাপাশি জাতি অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করেছে ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর দৃঢ়তা, ধৈর্য, দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ, হিংস্রতার পরিবর্তে হিংস্রতা নয় বরং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শিক্ষা।

দেশবাসী আরো লক্ষ্য করেছে, ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের পর্বতপ্রমাণ দৃঢ়তা। শরীর থেকে তাজা রক্ত ঝরছে, শত্রুর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত শরীর আর চলছে না, চোখে অন্ধকার দেখছে তারপরেও ময়দান ছাড়েনি। ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রীরা



icsbook.info

গুলি বোমা ছুঁড়ে, লগি-বৈঠা চালিয়েও নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মীদেরকে। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ক্যাবিনেট মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করেনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও ছিল অরক্ষিত। বৃষ্টিরমত গুলি-বোমা আর ইটের আঘাতের মুখে পিঠ পেতে দিয়ে মানব ঢাল তৈরি করে রক্ষা করেছে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাদের প্রিয় নেতৃবৃন্দকে। এ দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

২৮ অক্টোবর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রক্ত ঝরার দিন। কিন্তু এ রক্ত পরাজয় মানেনি। নেতা কর্মীদের ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে ইসলামী আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়েছে। শেখ হাসিনার লগি-বৈঠাই বরং পরাজিত হয়েছে। জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীদের নজিরবিহীন এ আত্মত্যাগ দেশের স্বাধীনতা স্বার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে মাইল ফলক হয়ে থাকবে। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদি ও সমাজতন্ত্রীদের বিভৎস রূপ জাতির কাছে যেভাবে উন্মোচিত হয়েছে তাতে জাতি আর কখনো তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাবে না।

---

*লেখক: সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# ২৮ অক্টোবরের প্রশ্ন

সাইফুল আলম খান মিলন

গত বছর ২৮ অক্টোবরের বর্বর হত্যাকান্ডের পর ইংল্যান্ডের ব্রাডফোর্ডে এক প্রবাসী বাংলাদেশী তরুণ প্রকৌশলীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তরুণ এই ইঞ্জিনিয়ার আমার সাথে ২৮ অক্টোবর নিয়ে কথা বলেন। সে জানায় ঘটনার সময় সে তুরস্কে ছিল। টিভিতে যখন এই হত্যাকান্ডের চিত্র দেখানো হচ্ছিল, তার সহকর্মীরা তাকে নানান প্রশ্ন করছিল। এর দ্বারা বাংলাদেশকে একটি বর্বর দেশ হিসেবে বিবেচনা করছিল। সেনাবাহিনী প্রধানও এ বর্বরতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমার জানামতে এ পৈশাচিক ঘটনার দ্বিতীয় কোন নজির নেই। এখনও পর্যন্ত অপরাধীদের খুঁজে বের করার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ঐদিন ঢাকায় বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও কতিপয় সংগঠনের কর্মসূচী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সকলেরই জানা ছিল। বিএনপি ও জামায়াতের কর্মসূচী ছিল জোট সরকারের সমাপ্তি পালন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলের কর্মসুচী ছিল লগি-বৈঠার কর্মসূচী। কাজেই এটা ধরে নেয়া স্বাভাবিক সরকারের বাহিনীগুলোর সব প্রস্তুতি ছিল। রাজধানী শহরে ঘটে যাওয়া এ হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তাই স্বাভাবিক ভাবে কিছু প্রশ্ন সামনে এসে যায়।

১। এ হত্যাকান্ড চলেছে সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। প্রকাশ্য দিবালোকে এ হত্যাকান্ড চলছিল। লগি-বৈঠা ও গুলি করে মানুষকে আহত করে মারতে মারতে রাস্তায়, ড্রেনে, ফুটপাতে ফেলে উপর্যুপরি পিটানো হচ্ছিল। শুধু তাই নয় লাশের উপর দাঁড়িয়ে লগি-বৈঠাধারিরা নাচানাচি করছিল। পাশেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ জামায়াত অফিস থেকে আমীরে জামায়াত, সেক্রেটারি জেনারেল ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ আইজিপি, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তার সাথে উপর্যুপরি যোগাযোগ করছিল কিন্তু কোন আবেদন কাজে লাগেনি। হত্যাকারীরা এত দীর্ঘ সময় ধরে নির্বিঘ্নে রাজপথে পুলিশের সামনে মানুষ হত্যা করলো। লাশের উপর নাচানাচি করল। পাঁচশতাধিক মানুষকে মারাত্মক আহত করলো। যাদের মধ্যে অনেকে চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে BDR এসে



icsbook.info

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে পুলিশ Action এ গেল না কেন? কোন একটি T.V Channel এর সাংবাদিক পুলিশের কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করে যে আপনারা Action এ যাচ্ছেন না কেন? পুলিশ কর্মকর্তা উত্তর দেন, সময় হলেই যাব। সাংবাদিক পুনরায় প্রশ্ন করেন, এখনও কি সময় হয়নি? (ভিডিও ফুটেজ দেখালে এসব কিছু জানা যাবে)। এখন প্রশ্ন হলো, পুলিশ কেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলো না? অর্থাৎ এ হত্যাকান্ডটি ঘটতে দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে পুলিশ বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোন বক্তব্য দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। ঐ দিন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কোন পর্যালোচনা পুলিশ বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করেছে কি ? কে দোষী এটা বিচারের বিষয়। কিন্তু নির্বিঘ্নে দিনভর হত্যাকান্ড চলতে দেয়ায় পুলিশ আর তার মন্ত্রণালয় তাদের দায়িত্ব কিভাবে এড়াবেন? হত্যাকারীরা তাদের প্রভুর নির্দেশে পৈশাচিক কাজ করেছে। কিন্তু পুলিশের সামনে দিন ভর এমন কান্ড করতে পারলে মানুষ হত্যাকারী আর পুলিশের ভূমিকাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে? তাই সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য বলবো।

২। ২৮ অক্টোবর হত্যাকান্ডের বিস্তর Vedio ফুটেজ রয়েছে। যেখান থেকে এসব কর্মকান্ডের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া অতি সহজ। হামলাকারীদেরকে পরিস্কার ভাবেই চেনা যায়। আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ সহজেই দায়ীদের চিহ্নিত করতে পারেন এবং বিচারের সম্মুখীন করতে পারেন। আহত নিহতরা মামলা করলো কিনা এটা বড় বিষয় নয়। বরং সরকারের উচিত প্রকৃত অপরাধীদের বের করা। নইলে সরকার তার দায়িত্ব এড়াবেন কি করে?

৩। এমন একটি ঘটনার পর যারা মুক্ত চিন্তার, মানবতার ও মানবধিকারের কথা বলেন তাদেরকে এর নিন্দা করতে দেখিনি। এঁদের কেউ আহত নিহতদের খোঁজ নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। দলীয় মনোভাব আমাদের এতো বেশি যে, তা কোন কিছুর ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। জাতি হিসাবে এটা আমাদের বড় ব্যর্থতা?

৪। যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারগুলো স্বামী, সন্তান ও পিতা হারানোর বেদনা ভুলতে পারছে না। যাদের পরিবার প্রধান বিদায় নিয়েছে তাদের সংসার কে চালাবে। রোজা, ঈদে তারা কেমন আছেন? বিধবা আর এতিমদের চোখের পানি কে মুছে দিচ্ছে? এসব পরিবারের সন্তানদের লালন পালন করার দায়িত্ব কার? বিধবা এতিমদের আর সন্তান হারা বাবা-মায়ের হাহাকার আর চোখের পানিতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠছে। না কি মজলুমদের কথা কেহ শুনছে না? হায় রাজনীতি! নীরিহ মানুষের জীবন নিয়ে এ কোন খেলা? এমন দিন কখন আসবে যখন মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি হবে না? পৃথিবীর পুলিশ, সরকার আর বিচার ব্যবস্থায় এর বিচার না হলেও আদালতে আখেরাতে তারা কিভাবে রেহাই পাবেন।

৫। বাংলাদেশের কিছু বিদেশী দূতাবাস এসময় খুব তৎপর ছিলো। এখনও তারা তৎপর। প্রতি বছর পৃথিবী জুড়ে মানবধিকারের ওপর Report প্রকাশ করেন। ২৮ অক্টোবর সম্পর্কে তারা কোন Report প্রকাশ করেছে কিনা আমার জানা নেই। তবে আমরা অপেক্ষায় রইলাম।



icsbook.info

৬। যারা নিহত হয়েছেন তাদের তো দুনিয়ার পর্ব শেষ। কিন্তু আহতদের কাহিনী তো এখনও শেষ হয়নি। পৈশাচিক আঘাতের ক্ষত এখনও তারা বয়ে চলছে। তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব কার? পরিবারগুলো এ দায়ভার কিভাবে বহন করছেন? অনেকে আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়েছেন। আজীবন আহত ও তার পরিবারগুলো ২৮ অক্টোবরের পরিনতি তিলে তিলে বহন করে চলতে হবে।

৭। আর একটি প্রশ্ন থেকে যায়। যারা লগি-বৈঠার কর্মসূচি হাতে নিলেন এবং বাস্তবায়ন করলেন, আহত নিহত বা না হয় তাদের নিমিত্ত হলেন। কিন্তু তারা যে জন্য এসব কিছু করলেন তাদের প্রয়োজন মিটেছে তো? জানতে বড় ইচ্ছে হয়। কেউ যদি সাহস করে বলেন তো জাতি জেনে দেখতে পারতো কি সে প্রয়োজন? কাজেই এ সর্বনাশা রাজনীতি আমরা চাই না। যাদের কাছে দেয়ার কিছু নেই তারা লগি-বৈঠা আর লাশ দেয়। ওরা দেউলিয়া হয়ে গেছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যখন এদের খোলায় আর পয়সা পড়বে না। মানুষকে বুকে নিয়ে যে মহানায়ক একদিন জয় করছিল মক্কা নগরী। বাংলাদেশের মানুষ এমন একটি বিজয় মিছিলের অপেক্ষায় আছে।

---

*লেখক: সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# আটাশে অক্টোবর অন্যরকম দৃশ্যপট

আ.জ.ম. ওবায়েদুল্লাহ

আটাশে অক্টোবর ২০০৬, এক বিভীষিকাময় মেঘে ঢাকা দিন। রক্ত-খুন, সন্ত্রাস-উল্লাস-ক্রন্দন ও বুকফাটা আর্তনাদে ভরা দিন। মানুষ নামের কলঙ্ক একদল নরপিশাচ ও হায়েনার উন্মত্ততা ও জিঘাংসায় ভরা সে ছিল এক ভয়াল-কালো দিন।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সুবাদে দেশী-বিদেশী লক্ষ-কোটি মানুষ বিস্ফারিত চোখে দেখতে পেয়েছে নারকীয় তাণ্ডব ও হোলি-উৎসবে মত্ত সভ্যতার ধ্বজাধারিদের। পরদিন কাগজের পাতায় ছাপা হয়েছে রোমহর্ষক সেই ভয়াবহ ঘটনার আদ্যোপান্ত। এর মাঝে তথ্য সন্ত্রাসও কম হয়নি। 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর সকল অপপ্রয়াসের পরও সচেতন মানুষ জেনে গেছে প্রকৃত সত্য কোনটি। আটাশে অক্টোবরের ঘটনাটি ছিল অনেকটা একতরফা।

বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি ছিল– জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রোগ্রামের জন্য মঞ্চ তৈরি ও পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করছিলো জামায়াত-শিবিরের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণ। হঠাৎ করেই সকাল ৯টা থেকে সেদিকে ধেয়ে আসে লগি-বৈঠা-নেজা-বল্লমে সজ্জিত আওয়ামী-নেতৃত্বাধীন হামলাকারী বাহিনী। এ যেন শান্ত জনপদে বর্গীদের ক্রোধান্ধহামলা। এ যেন সবুজ জনপদে শ্বাপদ-অরণ্যের হিংস্র হায়েনার আগ্রাসী ছোঁবল। সেদিন যা হয়েছে তা ভাষায় লিখে প্রকাশ করার মতো নয়।

নিরস্ত্র সাধারণ কর্মীদের ওপর হামলে পড়া আওয়ামী জঙ্গিদের অত্যাচার নির্যাতন ও উন্মত্ততার দৃশ্য সভ্যতার কোন মানদণ্ডেই মানবীয় আচরণ বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। রাতের আঁধারে ডাকাতি করতে আসা হার্মাদ বাহিনী ধরা পড়লে যেমন গণধোলাইয়ের মুখোমুখি হতে হতো এ দৃশ্য তাকেও হার মানায়। বিষাক্ত সাপ জনপদে ঢুকে পড়লে যেমন তাকে মারতে মারতে থেতলে দিয়ে তার ওপর অবিরাম আঘাত চলতে



icsbook.info

থাকে তার চেয়েও নির্মম-নির্দয়ভাবে নির্দোষ কিশোরদের আঘাতে আঘাতে হত্যা করে তাদের লাশের উপর হয়েছে পৈশাচিক নৃত্য। জামায়াত-শিবিরের প্রোগ্রামে আগত সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচার গোলাগুলি হয়েছে। এ যেন কোন সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে শত্রুর ব্যূহে হামলা।

এত কিছুর পরও ঠাণ্ডা হয়নি খুনিয়ার পাষাণ হৃদয়।

মেটেনি তাদের জিঘাংসার নেশা, প্রতিহিংসার লালসা।

বন্ধ হয়নি আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়ার সব ভ্রষ্টাচারি মিডিয়া-যুদ্ধ।

অবাক চোখে আমরা লক্ষ্য করলাম।

এক. কয়েকটি চিহ্নিত পত্রিকা পরদিন হামলাকারীদের পক্ষ নিয়ে সাফাই গাইতে নেমেছে।

দুই. দু'একটি চ্যানেল লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে চেষ্টা করেছে মিথ্যাচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে।

তিন. বেশ কয়েকটি চ্যানেল টক-শো আয়োজন করে অপরাধিদের আড়াল করা ও জামায়াত-শিবির ও দেশপ্রেমিক শক্তির বিরুদ্ধে বিষেদগার অব্যাহত রেখেছে।

চার. খুনের মামলার আসামিরা প্রতি-মামলা (Counter Case) দায়ের করেছে তাদেরকে আসামি করে যারা খুনের মামলার বাদী পক্ষ।

পাঁচ. আটাশে অক্টোবরের যে নারকীয় তাণ্ডব তারই ধারাবাহিকতায় সারাদেশে তাণ্ডব চালাতে চেয়েছিল চিহ্নিত মহলটি। চেয়েছিল বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র (Dysfunctional State) হিসেবে প্রতিভাত করতে।

ঘটনা যদি এমন হতো ...

আটাশে অক্টোবর যদি হতো অন্য রকম। দৃশ্যপট যদি হতো উল্টো। হামলাকারীদের ওপর আক্রান্তদের পক্ষ থেকে প্রথম হামলার কথা আমি বলছি না, বলবোও না। যদি প্রতিরোধ হতো যথাযথ, যদি শক্তির মোকাবেলা হতো শক্তি দিয়ে, খুনের বদলা হতো খুন।

যেকোন সুস্থ-সচেতন-বিবেকবান মানুষ নিশ্চয়ই বলবেন না সেটি অপরাধ হতো। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে– আত্মরক্ষার, অধিকার রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জানমালের হেফাজত করার। আত্মরক্ষার অধিকার নিয়ে জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা যদি সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতো তাহলে কী হতো?

## দৃশ্যপট এক

## পল্টনের মোড়

* অতীতের ইতিহাস বলছে– তাহলে হয়তো ছয় ছয়জন তাজা প্রাণ কিশোর যুবককে এভাবে পৈশাচিক হামলার শিকার হয়ে জীবন দিতে হতো না।
* শিবির-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুললে হামলাকারি লগি-বৈঠাধারিরা বহু আগেই পালিয়ে বাঁচতে চেষ্ট করতো। দেখা যেতো ১৯৯২-র ঘাদানিক



icsbook.info

হামলার প্রতিরোধের সময় যেসব নেতা-নেত্রী-কর্মী সমেত লেজ গুটিয়ে দৌড়াচ্ছিল সে দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি হতো।

* এভাবে এক পক্ষীয় জানমালের ক্ষতি না হয়ে হামলাকারিদের মধ্যেও কাউকে না কাউকে প্রত্যাঘাতে আহত-এমনকি নিহত হতে হতো।

* এই দৃশ্য দেখে জ্বলে ওঠতো ক্যামেরার ফ্লাশ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চোখ আর সাংবাদিকদের চৈতন্য, শুরু হতো ত্বরিত সেসব দৃশ্য ধারণ, সাধ্যমতো বিকৃতিকরণ ও ব্যাপকভাবে জনমত বিভ্রান্ত করার প্রক্রিয়া।

* পল্টন-মোড় ভরে যেতো পোশাকি আর অপোশাকি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি সদস্যের উপস্থিতিতে, তাদের হাতে গ্রেফতার হতো জামায়াত-শিবির কর্মীরা আর দ্বিগুণ উৎসাহী হয়ে ছুটে আসতো লগি-বৈঠা বাহিনী। অন্তত সেদিন মনে হয়নি তারা শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বরং ভাবতে কষ্ট লাগে তারা নীরব দর্শক হিসেবে হত্যাকারীদের ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন।

## দৃশ্যপট দুই

## জাতীয় পত্রপত্রিকা ও মিডিয়া

ঘটনা যদি এমনটাই হতো তাহলে দেখা যেতো আমাদের প্রচার মাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের তীব্রতা।

২৮ অক্টোবর যখন কিছু কিছু চ্যানেলে হত্যা অত্যাচার ও নির্যাতনের এই মর্মান্তিক দৃশ্য বারবার সম্প্রচার হচ্ছিলো মনে হচ্ছিলো এসব প্রচার মাধ্যম তাদের সমর্থনপুষ্ট বাহিনীর বিজয় গাঁথা প্রচার করছেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসব অসহনীয় দৃশ্য দেখানোর মাধ্যমে তারা চেয়েছিলেন জনগণকে জামায়াত-শিবির করার পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিতে, তরুণদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে।

সেদিন কিন্তু তারা ভেবেই উঠতে পারেননি প্রচারযন্ত্র তার নিরপেক্ষতা ঠিকই বজায় রেখেছে অত্যাচার নির্যাতন-নির্মমতার এই চিত্র মূলত ষড়যন্ত্র ও হত্যাকারীদের জন্য বুমেরাং হয়ে গেছে। তাদের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার জ্বলজ্যান্ত দলিল হয়ে গেছে এসব। কিন্তু যদি ঘটনা হতো উল্টো হলে এই প্রচার মাধ্যমই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এক জঘন্য প্রচার যুদ্ধে নেমে যেতো জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে।

* প্রথমেই তারা এই নিষ্ঠুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের সব দায়-দায়িত্ব জামায়াত-শিবিরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতো। প্রথমে হামলা কারা কীভাবে করেছে তা চেপে গিয়ে প্রতিহামলার এপিসোড দিয়ে ঘটনার সূচনা দেখাতে মোটেও ভুল করতো না।

* তারপরই শুরু করতো জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে একাত্তরের প্রসঙ্গ তুলে অন্যরকম প্রচারণা। অতীতের সব অপপ্রচারকে নতুন করে সম্প্রচার করা হতো। এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে বসতো তারা।

* এরপর শুরু হতো ঘটা করে টক-শো, সাক্ষাতকার, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর নতুন এক যুদ্ধের আয়োজন। অবাক হওয়ার বিষয় হলো– এসব অপপ্রয়াস নিতে তারা এরপরও ভুল করেননি। কিন্তু মিথ্যাকে পুঁজি করে কতদূর যাওয়া যায়?



icsbook.info

* যদি আমাদের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দক্ষ কারিগরদের সততা ও সাহস থাকে তাহলে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করবো আসুন না একবার সাহসী হয়ে সত্যটিকে প্রকাশ করি।

  হাস্যকর হলো কোন কোন বুদ্ধিজীবী ও নেতা ২৮ অক্টোবরের লগি-বৈঠার হামলাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে মুক্তিযুদ্ধে 'যার যা আছে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার' সাথে তুলনা করেছেন। হায়রে মুক্তিযুদ্ধ! হায়রে তুলনা! হায়রে আমাদের বিবেক।

* প্রিন্ট মিডিয়ায় পরদিন থেকে যে সব সাফাইমূলক প্রবন্ধরাজি ছাপা হয়েছে তা দেখে মনে হয়নি আমরা কোন সুস্থ সমাজে বসবাস করছি। আমাদের কলমজীবীরা বুঝেন না কলম থাকলেই যা তা লেখা যায় না, আর যাচ্ছে তাই কিছু লেখলেই তা লেখা হয়ে যায় না, অন্তত পাঠকের সেই অন্ধত্ব ও চোখ বুঁজে গ্রহণ করার দিন শেষ হয়ে গেছে।

## দৃশ্যপট তিন

## বিএনপির রহস্যময় ভূমিকা ও আইনের এক চক্ষু হরিণ

২৮ অক্টোবর ক্ষমতায় ছিলো চারদলীয় জোট। জোটের পক্ষ থেকে লগি-বৈঠার তাণ্ডব আগেই আঁচ করা উচিত ছিলো। সরকারের এজেন্সিগুলো নিশ্চয় তাদের জানিয়েছেন কীভাবে আওয়ামী লীগ সারাদেশে মাস্তানদের ঢাকায় জড়ো করেছে, কী পরিমাণ লগি-বৈঠা ও অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছে।

প্রশ্ন হলো এ সব জানার পরও কী জোটের প্রধান শরিক বিএনপি এ বিষয়টিকে প্রাধিকার দিয়ে কোন কর্মসূচি নিয়েছিল?

আজকের সংস্কারপন্থি নেতা মান্নান ভুঁইয়া সেদিন কেন তার দলের পক্ষ থেকে হামলাকারীদের প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেননি? কেন সেদিন লুৎফুজ্জামান বাবর আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঐরূপ নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় বসিয়ে রাখলেন?

প্রশ্নগুলো যেকোন সচেতন মনেই জাগতে পারে। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আইনি লড়াই শুরু হয়েছে।

জামায়াত-শিবির ঘটনার জন্য দোষীদের দায়ী করে বিচার প্রার্থী হয়ে মামলা দায়ের করেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সেই মামলায় কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ভিডিও ফুটেজ দেখে যদি ঢাবি'র ঘটনায় কয়েক হাজার লোকের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে, চারজন শিক্ষক গ্রেফতার হতে পারেন তাহলে মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজ দেখে কি ঐ দিনের সব খুনিকে চিহ্নিত করা এতই কঠিন?

এভাবেই আইন যেনো এক চক্ষু হরিণের মতো আচরণ করে চলছে।



icsbook.info

## দৃশ্যপট চার

## ওরা চেয়েছিল তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে মসনদে বসে যাবে,

## নিয়তি বলতে এখনো কিছু আছে

২৮ অক্টোবরের ঘটনার সূত্র ধরে সারা দেশে যে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছিলো লগি-বৈঠা বাহিনী তা ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। তারা চেয়েছিল এই রকম তাণ্ডব অব্যাহত থাকবে, সবাই অস্থির হয়ে উঠবে এবং এই অস্তিরতার ফাঁকে 'মীর-জাফরী স্টাইলে' তারা মসনদে বসে যাবে।

কিন্তু বিধি বাম!

দেশ যখন টালমাটাল, রাজনীতি অসুস্থতায় আক্রান্ত, তখন দেশে জারি হলো জরুরি আইন। এই পথ ধরে এলো নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা উপদেষ্টা পরিষদ।

তারপরও আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরদের সেই আনন্দ উজ্জ্বল হাসিমুখ, উপদেষ্টাদের শপথ অনুষ্ঠানে সরব-সক্রিয়উপস্থিতি, বিমান বন্দরে শেখ হাসিনার বক্তব্য কেন যেন বারবার ফ্লাশ ব্যাকে চলে আসছে। প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মেই প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। এমনি করেই বদলে যায় দৃশ্যপট, বদলে যায় আমাদের পৃথিবী।

---

*লেখক: বিশিষ্ট লেখক ও সংগঠক, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# এক রক্তাক্ত ইতিহাসের মাইল ফলক

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

## পটভূমি

অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পরিপূর্ণভাবে শেষ হওয়ার শেষ মূহূর্তে দেশব্যাপী শুরু হলো এক ভয়াল সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, অবরোধ, সংঘাত ও সংঘর্ষ-এর মূলে ছিল এক সময়ের দেশের প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা ১৪ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত অপরিনামদর্শী, ধ্বংসাত্মক ঘোষণা। সংবিধান অনুসারে বিচারপতি কে.এম হাসানের তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের কথা। কিন্তু ১৪ দলীয় জোট নেত্রী তাকে দলীয় লোক এক খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে তাকে ক্ষমতা গ্রহণের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কর্মসূচী ঘোষণা করেন ও কর্মীদেরকে লগি-বৈঠা ও যার যা আছে তা নিয়ে দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নে রাজপথে নৈরাজ্যের আগুন ছড়িয়ে দেন। ও সরকারের উপর অন্যায় চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে এক অচলাবস্থা সৃষ্টি করেন। দেশের মোট জাতীয় আয়ের সিংহভাগের যোগান দানকারী গার্মেন্টস শিল্পকে অচল করে দেয়ার ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তৈরি করে একটি শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি ও আগুন ধরিয়ে Finished goods পুড়ে ছারখার করা হয়। চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বন্দর দিনের পর দিন বন্ধ করে হাজার হাজার কোটি টাকা জাতীয় অর্থ সম্পদের ক্ষতি সাধন করা হলো। যার কল্যাণে চট্টগ্রাম বন্দরকে অচল করার গভীর ষড়যন্ত্র সৃষ্টি ছিল বিদেশীদের ইঙ্গিতে।

## আক্রমণকারীদের পরিচয়

বিএনপি ও ৪ দলীয় জোট সরকারকে হেনস্তা করার জন্যে, যে কোনভাবে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার উদ্দ্যেশ্যে দেশ ও জনগণের স্বার্থবিরোধী ভয়ংকর রোমহর্ষক কর্মকান্ডের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামীলীগ ও তাদের সাথীরা। দেশ ও জনগণের বিষয় যদি তাদের বিবেচনায় আসতো তবে কি ভাবে প্রথমে ড. ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মেনে নিয়ে পরে আবার তার পতন আন্দোলনে সর্বাত্মক জ্বালাও পোড়াও,



icsbook.info

অবরোধ খুন, লুটের ও নৈরাজ্যের ডাক দিতে পারে? দিতে পারে গণভবন ঘেরাও এর ভয়ংকর কর্মসূচী ও President কে ভাত পানি নয় Oxygen বন্ধ করে দেয়ার কর্মসূচী ঘোষণা? দেশের আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনে বৃটেন ও আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে সরাসরি আহবান করতে পারল? কোন সুস্থ রাজনৈতিক দল এই আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত কিভাবে নিতে পারে? অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে President ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেনাবাহিনী মোতায়নের সিদ্ধান্ত দিলেও ঐ ১৪ দল উহারও বিরোধিতা করে ও তাদের সুরে সম্পূর্ণ কূটনৈতিক শিষ্টাচারের মাথা খেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর রাষ্ট্রদ্বয়ের রাষ্ট্রদূতগণ ও সেনাবাহিনী ব্যারাকে নিয়ে যেন নৈরাজ্য বহাল রাখার জন্য সরকারের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে। এর উপর জাতিসংঘের মহামান্য সেক্রেটারি জেনারেলের এর বিশ্ব শান্তিমিশন থেকে বাংলাদেশের সৈন্য প্রত্যাহার এর হুমকির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা না করে বলতে চাই– সে সময়ে উহা ছিল পরিস্থিতি আরও অবনতির সাথে নূতন মাত্রার সংযোজন। এ দিকে সহিংসতা রাজধানী থেকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হলো। তাদের বর্গিবাহিনী লগি-বৈঠা ও আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত হয়ে প্রতিপক্ষকে প্রকাশ্য রাজপথে খুন হত্যার মহড়া চালাচ্ছিল, আর তাদের বাড়ি-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলছিল অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজের মহোৎসব। দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিনত করার জঘন্য লক্ষ্য বাস্তবায়নের নাটকের এক একটি অংক যেন মঞ্চস্থ হচ্ছিল।

## নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী এদের ইতিহাস

এ নৈরাজ্য পিপাসু দলটিকে কিভাবে জাতি গ্রহণ করতে পারে? এ বর্বরতা সৃষ্টিকারি দল দেশ ও জাতির জন্যে কি ভায়াবহ অভিশাপ! এ দলের সাথে কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ কিভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে? এদের অতীত ইতিহাস আর বর্তমানের বর্বর, পৈশাচিক ও হিংস্র কর্মকান্ড প্রমাণ করে এদের কোন পরিবর্তন হবেনা। এদের অস্তিত্ব দেশ জনগণ ও সার্বভৌমত্বের জন্যে এক বিপর্যয়ের অশনি সংকেত।

১৯৭১-৭৫ ও ১৯৯৬-২০০১ সালের সেপ্টম্বর পর্যন্ত এদের অপশাসনের ইতিহাস বিশ্ব কোষের কয়েক ভলিউমে সংকুলন হবে না।

* এরাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও হত্যার সূচনা করে।
* এরাই বাংলাদেশের গণতন্ত্র গলাটিপে হত্যা করে বাকশাল কায়েম করেছিল।
* এরাই দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেশকে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিনত করেছিল।
* এরাই সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণ করে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।
* এরাই শিল্প, কল-কারখানা বন্ধ করে লাখ লাখ শ্রমিক বেকার করেছিল।
* এরাই লাল বাহিনী, রক্ষীবাহিনী, শেখ বাহিনী সৃষ্টি করে লুট পাট, অত্যাচার ও নির্যাতনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল।
* এরাই দেশকে পার্শ্ববর্তী দেশের তাঁবেদার দেশে পরিনত করেছিল, এদের সময় কলিকতার এক সভায় আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ২বার মূখ্যমন্ত্রী বলা হয়েছিল।
* এরাই বাংলাদেশকে পানি বন্টনের অসম চুক্তি করে দেশকে মরুভূমিতে পরিনত করার ব্যবস্থা করেছিল।
* এরাই দেশের মূল অংশ ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিল।
* এরাই দেশে ১৯৭৪ সালে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে লাখ লাখ মানুষ হত্যা করেছিল।



icsbook.info

* এরাই জাসদের হাজার হাজার প্রতিবাদী কর্মীদের রাজনৈতিকভাবে খুন করেছিল।
* এরাই জাতীয় সংসদের পবিত্র স্থানে Speaker হত্যার ভয়াল অপরাধ সংগঠিত করেছিল।
* এরাই দেশের অগনিত প্রতিষ্ঠান দলীয়করণের ও পারিবারিকী করণের নির্লজ্জ কান্ড ঘটিয়েছিল।
* এরাই পার্বত্য চুক্তি সম্পাদন করে হাজার হাজার বাঙালি হত্যাকারী ভারতীয় মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের স্বার্থরক্ষার্থে দেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করেছিল।
* এদের শাসনামলে ধর্মীয় মূল্যবোধ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল, আলেম ও ইমামদের উপর চলেছিল জুলুম, ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানের টুঁটি চেপে ধরেছিল।
* এরাই সৃষ্টি করেছিল গত ২৮ অক্টোবরের'০৬ রোমহর্ষক, বর্বর, পৈশাচিক ও নির্মম হত্যাকাণ্ড।

## খুন ও হত্যা কি ভয়াবহ বিষয়

খুনের যোগ্য কোন অপরাধ করেনি এমন নিরাপরাধ কোন মানুষ যে কোন ধর্মের, বর্ণের ও মতাদর্শের হোক না কেন তাকে হত্যা করা এক ভয়াবহ বিষয়। কোরআনে করিমে আল্লাহ তায়ালা এমন অপরাধকারীকে সমগ্র পৃথিবীর মানব খুন করার তুল্য ভয়াবহ অপরাধ বলেছেন। আর একটি মানুষের জীবন বাঁচানোকে বলা হয়েছে সমগ্র মানবতার জীবন বাঁচানো। কোরআন বলেছে- "যদি কেহ কোন খুনের পরিবর্তে কিংবা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সমগ্র মানবতাকে খুন করল। আর কেউ যদি কোন মানুষকে জীবনে বাঁচিয়ে দেয় সে যেন সমগ্র মানবতাকে বাঁচাল" –মায়েদা : ৩২।

কোরআন করিম হত্যাকারীর জন্যে আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন শাস্তি ঘোষণা দিয়ে বলেছে- "যে কোন মুমিনকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে তার শাস্তি সরাসরি জাহান্নাম, যাতে সে চিরকাল থাকবে। হত্যাকরীর উপর আল্লাহর গজব ও লানৎ এবং অভিশাপ। আল্লাহতায়ালা তার জন্যে চিরস্থায়ী কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"। –নিছা : ৯৩।

নবীয়ে করিম (সা.) বলেন, "একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা আল্লাহ তায়ালার নিকট সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করার চেয়েও ভয়াবহ"– (মুসলিম)।

হত্যাকারীদেরকে সাবধান ও তাওবা করে এ মানবতা বিরোধী নারকীয় কর্মকান্ড থেকে ফিরে আসতে হবে। নির্দেশ ও হুকুমের অপরাধীরা সমাজের সাধারণ মানুষের নেতা। তাদের বিবেকের দংশন আসা উচিত। তাদের কান্ডজ্ঞানহীন নির্দেশ সমাজ জীবনে কি ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। হুকুমের অপরাধী করা আল্লাহ তায়ালার নিকট ও ইসলামের আদালতে গুরুতর অপরাধী। দুনিয়ায় তাদের শাস্তি ও হত্যাকারীর শাস্তি এক আর পরকালে তারা প্রবেশ করবে জাহান্নামের দাউ দাউ অনলে।

## হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োজন

হত্যাকারীদের প্রতি ক্ষমাশীল ও আপোষকামীরা হত্যার সহযোগী। এদের প্রতি করুণার অর্থ হত্যা ও খুনকে পৃথিবীতে লালন করার শামিল। সকল দেশে ও সমাজে হত্যাকারীদের শাস্তির বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইহা মানবতার দাবি ও মৌলিক অধিকারের দাবি। প্রকাশ্য দিবালোকে লগি-বৈঠা দিয়ে, অস্ত্র উঁচিয়ে মানুষ খুন করল যারা, যাদেরকে সহজে সনাক্ত করা যায়, ক্যামরার ফুটেজে রয়েছে তাদের জঘন্য চেহারা আর হাতে অস্ত্র



icsbook.info

তাদেরকে আইনের আওতায় এনে বিচার না করার মানে হত্যা ও খুনকে উস্কে দেয়ার মত অপরাধ। রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের প্রথম দায়িত্ব মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দান। রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল এবং সেনাপ্রধান পর্যন্ত ২৮ অক্টোবর'০৬ এর নৃশংস হত্যার নিন্দা করেছেন। কিন্তু ইহাই কি শেষ। হত্যাকারীদের এ আস্কারা দান মানবতার প্রতি ও বিবেকের গালে চপেটাঘাত তুল্য। আমরা যদি এ নির্মম হত্যার বিচার করতে ব্যর্থ হই তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি– আমাদের উপর আসমান থেকে গজব আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর কিতাবে কোন সন্দেহজনক শব্দ নেই।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে আজ জোরালো আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। বহুদিন পরে হলেও আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠে যে আওয়াজ ধ্বনিত হয়েছিল উহা আজ গোটা জাতির কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। কিন্তু আমার কাছে দুর্নীতিমুক্ত সমাজের আগে প্রয়োজন খুন মুক্ত Blood Free World সমাজ ও বিশ্ব। হাজার দুর্নীতির সমষ্টি অর্থের অংকে যত বিলিয়ন ডলার হোক না কেন একজন মানুষের খুন ও জীবন এর চেয়েও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মূল্যবান।

## শহীদদের মাতা পিতা ও আত্মীয়দের প্রতি

শহীদদের জন্যে শোক করা বৈধ নয়। ইসলামে শাহাদাত অতি পবিত্র বিষয় ও মর্যাদার দাবীদার।

শাহাদাতের মাধ্যমে তারা অমর জীবনে প্রবেশ করেছেন। কোরান বলেছে তারা কোন দিন মরবেনা- "সাবধান, তোমরা তাদেরকে মৃতদের মধ্যে শামিল করোনা যারা সত্যের জন্যে আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছে বরং তারা জীবিত। শাহাদাতের সাথে তারা জান্নাতের রিজিক গ্রহণ করে"– আলে ইমরান : ১৭৯।

যে সত্যের জন্যে তারা জীবন দিয়েছে উহা তাদের জীবন ও জীবনের সবকিছুর চেয়ে অনেক বড়।

তারা কোন দিন মরবেনা বরং বেঁচে থাকবে যুগ থেকে যুগান্তরে। তারাই আমাদের জাতির বিবেক, সম্বিতহারা জাতির হৃদয়ে চেতনার অনুভূতি। তারাই জাতির গৌরব, হতাশার আঁধারের ধ্রুবতারা। কবি বিনয়ন বলেন, "As the stars that are starry in the time of our darkness. To the end, to the end they remain"

হে শহীদের পিতা মাতাগণ!

যে সন্তান ছিল তোমাদের হৃদয় নিধি, তোমাদের নিকটই শুধু প্রিয়। তারা আজ গোটা জাতির হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে। তারা আজ তোমাদের গন্ডি পেরিয়ে জাতির মূল্যবান সম্পদে পরিনত হয়েছে। তারা আজ পংকিলতা, পাশবিকতা বিদূরিত করে ন্যায়ের সমাজ ও মানবতার বিকাশ সাধনে জাতীয় মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের মিছিল থেকে গগন বিদারী আওয়াজ শুনা যাচ্ছে "শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না"। এমন সন্তান জন্ম দিয়েছে যারা তারা গোটা জাতিকে রক্ত ঋণে ঋণী করেছে, যাদের ঋণ কখনও পরিশোধ করা যাবেনা। পৃথিবীতে তারা যেমন মানবতার মুক্তির পথ রচনা করেছে পরকালেও তারা তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করবে জান্নাতের পথ।

## উপসংহার

কয়েকটি বিষয় দিয়ে আমি আলোচনার ইতি টানতে চাই।

একঃ ঐ সকল পুলিশ যারা ২৮ অক্টোবর'০৬ বায়তুল মুকাররম এর উত্তর গেটে দায়িত্বে



icsbook.info

নিয়োজিত ছিলো পাশে মুক্তাঙ্গন থেকে লগি-বৈঠার নরপিশাচেরা জামায়াতের সমাবেশে হামলা করতে আসছে পুলিশ কেন প্রথম থেকে ব্যারিকেড তৈরি করলনা। ঘন্টার পর ঘন্টা যেখানে সংঘাত চলছে সেখানে OC, IGP, DMP সকলের নিকট বিষয়টি জানা ছিল। যথার্থ দায়িত্ব পালন করা হলে হয়তো এতগুলো জীবন, এত রক্ত, এত অপূরণীয় ক্ষতি হতো না। দেশের জনগণের অর্থে যারা লালিত, জনগণ অর্ধাহারে অনাহারে থেকে যাদের পেটের অন্ন ও পিঠের বস্ত্র যোগান দেয়, লালন করে তাদের পরিবার তাদের নিরপেক্ষ ও ন্যায় পক্ষ হতেই হবে। বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ কারও পছন্দ থাকতে পারে কিন্তু পুলিশের পোশাক পরে সরকারি অস্ত্র ও ক্ষমতা ব্যবহার করে বিশেষ দলের কর্মীর ভূমিকা পালন করা অমার্জনীয় অপরাধ। দুর্ভাগ্য যে এ জাতীয় দুর্নীতি এ বিভাগে দীর্ঘদিন থেকে লালিত হয়ে আসছে। জানি না দুর্নীতি দমন বিভাগের এ বিষয়ে নজর দেয়ার সুযোগ হবে কিনা। পুলিশ বাহিনীর চোখের সামনে কিছু সন্ত্রাসী অপর দলের বৈধ সভায় হামলা করবে, খুন হত্যা ও অস্ত্র চালাবে– এটি লক্ষ্য নয়। আমরা কেউ বলব না সকল পুলিশ এমন। তবে যারা রাষ্ট্রীয় এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছে তাদেরকে অবশ্য ন্যায়ের ও বিবেকের অনুসারি হতে হবে। অপরাধিদের চিহ্নিত করতে হবে, আইনের আদালতে হাজির করাতে হবে। নতুবা অপরাধের দায়ভার থেকে অন্যরাও মুক্ত থাকতে পারবেনা।

দুই ঃ সাংবাদিক ও মিডিয়াতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ। যাদেরকে গোটা জাতির বিবেক বলা হয়। জাতিকে সত্য সংবাদ পৌঁছে দেয়া ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা তাদের পেশার নৈতিক দাবি। কিছু পত্রিকার সাংবাদিক ২৮ অক্টোবর'০৬ ঘটনার ভয়াবহতা ও নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা দেখেও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে বলেছে যে, বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে শিবির নাকি আওয়ামী লীগ-এর মিছিলে হামলা করেছে। হলুদ সাংবাদিকতা একটি জাতির সংঘাত, সংঘর্ষের উস্কানি দেয়। সত্যের স্থলে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে তারা নিরাপরাধকে অপরাধি বানায় আর অপরাধিকে নির্দোষ বলে। এ মানের লোকদের সাংবাদিকতা একটি জাতির জন্যে দুর্ভাগ্যজনক বৈকি। কিছুদিন পূর্বে প্রথমআলোর আলপিন ম্যাগজিনে মহামানব মুহাম্মদ (সা.) কে বিড়ালের সাথে যুক্ত করে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, ইহা কি ভুল বশত:? এরা ইচ্ছেকৃত ভুল বারবার করে, প্রতারণামূলক ক্ষমাও চায়।

অবশ্যই একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্ষমার যোগ্য। আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সংঘাত, সহিংসতার মূল উপাদান এরাই যোগান দেয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আজ গোটা বিশ্ব বিক্ষুব্ধ কিন্তু অস্ত্রের সন্ত্রাস এর চেয়ে তথ্য সন্ত্রাস বেশি ভয়াবহ। মিথ্যা সংবাদ, উস্কানিমূলক সংবাদ ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন অবশ্যই বিবেক ও নৈতিকতার সকল মানদণ্ডে গর্হিত কাজ। এ তথ্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সকলকে প্রতিরোধ গড়তে হবে। কোরআন বলছে– "যে বিষয়ে তোমাদের যথার্থ জ্ঞান নেই এমন বিষয়ে চুপ থাক, নিশ্চয় তোমাদের চক্ষু কি দেখে, কান কি শুনে ও হৃদয় কি ভাবে আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হবে" –বনী ইস্রাইল : ৩৬।

তিন ঃ শহীদদের পথে যারা চলছে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই; তোমাদের জন্যে সামনের পথ আরও ঝুঁকিপূর্ণ, কন্টকাকীর্ণ, রক্তাক্ত ও পিচ্ছিল। কুসুমাস্তীর্ণ, নির্ঝঞ্ঝাট, সহজ কোন বিকল্প পথ নেই। সাফল্যের পথ, বিজয়ের চূড়া সর্বদা কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ দুর্গম পথে যারা পা বাড়িয়েছে অবশ্যই তারা জানে এ পথের দাবি কি? কত দীর্ঘ এ পথ! এ জন্য প্রয়োজন-



icsbook.info

**জ্ঞান ও প্রযুক্তি** এ পথে যারা চলতে চায় তাদের প্রথম প্রয়োজন জ্ঞানর্জন। এ পথের খবর নেয়া, ভালভাবে জানা, জানার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ জ্ঞান অর্জন। ব্যাপক অধ্যয়ন। পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানের উপর প্রাধান্য অর্জন ও আজকের প্রযুক্তি করায়ত্ব করা। পৃথিবী জ্ঞানের নিকট পরাভূত হওয়া নয়।

আর যে সত্য নিয়ে সামনে চলছে তার খুঁটিনাটি জানা। নবীজি (সা.) বলেন– এ জ্ঞানই আলো আর আলো হচ্ছে শক্তি। আল্লাহ তায়ালা নিজকে বলেছেন, 'আলো' বলে। ইসলাম আলো, নবীগণ আলো এ আলোই অর্জন করতে হবে। যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কখনও এক হতে পারে না। জ্ঞান হচ্ছে নবীদের রেখে যাওয়া সম্পদ। নবীজি (সা.) বলেন– "জ্ঞান মুমীনের হারানো সম্পদ।" "ইহাকে যেখানে পাও কুড়িয়ে নাও।" "জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র"। অজ্ঞতা হচ্ছে মানবতার বড় শত্রু।

তাদেরকে অজ্ঞতার গহিন অন্ধকার থেকে উঠে আসতে হবে। নিজেদেরকে ও মানবতাকে আলোকিত করতে হবে সত্যের আলো দিয়ে। কোন বিষয়ে শুধু কিছু লিখা পড়ার নাম যথার্থ জ্ঞান নয়। প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ হওয়ার জ্ঞান।

**সাহস ও হিম্মত :** এ কঠিন, দুর্গম পথে চলতে প্রয়োজন প্রচন্ড সাহস। ভীরু ও কাপুরুষ এ পথে চলতে পারবেনা। যারা পৃথিবীর চলমান স্রোতের বিপরীতে চলার দুর্জয় সাহসের অধিকারী, তারা পথের দীর্ঘতা, শত্রুর হুমকি, অত্যাচার ও জুলুম কিছুকে যারা পরওয়া করে না– এ পথে চলার জন্যে প্রচন্ড সাহসের বারুদ কলিজায় ভরে নিতে হবে। শরীরের এক একটি অঙ্গ খুলে নেয়ার পরও যারা চলার সিদ্ধান্ত থেকে নড়েনি, জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে রেখে পাথর চাপা দেয়ার পরও লক্ষ্যচ্যুত হয়নি এমন বীরদের জন্য এ পথ। জীবন ও মরণের পথ। কোরআন তাদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে বলেন– অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাহে সংগ্রামের পথে কোন নির্যাতন, যুলুমকে পরওয়া করোনা। – মায়েদা : ৫৪। শহীদের উত্তরসূরীদেরকে দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে আগাতে হবে।

**চরিত্র :** আখলাক ও চরিত্র এ পথের পুঁজি। ন্যুনতম নৈতিক আখলাক ও মান ছাড়া এ পথে কদম দেয়া ও সামনে চলা অসম্ভব। নবীদেরকে আল্লাহ তায়ালা চরিত্রের এক যাদু দিয়ে ছিলেন। যার সামনে সমস্ত হিংস্র ও ভয়াল মানুষগুলো বশীভূত হয়ে পড়েছিল। চরিত্রের কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীর তামাম শক্তি চরিত্রের সামনে দুর্বল। মানুষের হৃদয় জয় করা হিমালয় জয় করার চেয়েও কঠিন। মানব হৃদয় শুধু চরিত্রে জয় করা সম্ভব। যার কাছে আখলাক নেই তার কাছে আর কিছু বাকি নেই। "Character is lost everything is lost." রাসুলকে জিজ্ঞাসা করা হলো ইসলামের গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় কি? তিনি বলেন, "যার হাত ও মুখের অনিষ্ট থেকে মানুষেরা রক্ষা পেল"। পৃথিবীতে আজ চরিত্রের আকাল চলছে। দ্বীনি ভাইদেরকে বুঝতে হবে চরিত্রই হলো মুহাম্মদ (সা.) নবুয়তের সৌন্দর্য। আল্লাহ তায়ালা তাকে চারিত্রিক সুষমা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। অন্ধকার, অসুন্দর ও বিভৎস মানুষগুলোকে নবীজি (সা.) চরিত্র দিয়ে বিমোহিত করেছিলেন। যারা আঘাত করেছে তিনি তাদেরকেও আঘাত করেননি। যারা গালি দিয়েছে তিনি তাদের সাথেও সুন্দর আচরণ করেছে। খুনে রঞ্জিত অবস্থায় তায়েফের ময়দানে রাসুল (সা.) এ বলে দোয়া করেন– "হে প্রভু না জেনে না চিনে আমাকে যারা আঘাত করেছে! রক্তাক্ত করেছে তুমি তাদের হেদায়ত



icsbook.info

দাও।" নবীজি (সা.) অনুসারিদের জন্য প্রতিহিংসার ও অসুন্দর আচরণ প্রদর্শনের সুযোগ নেই। তারা হবে মার্জিত, সুন্দর ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী।

**হিকমত ও যোগ্যতা ঃ** পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদের জন্যে যারা যোগ্যতম। অযোগ্য ও অথর্ব্যদের বিশাল সংখ্যা কোন কাজে আসবেনা। Quantity এর চাইতে Quality বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াহুদীরা দুনিয়ায় সংখ্যার দৃষ্টিতে ১ কোটির চেয়েও কম। শত শত কোটি মানব গোষ্ঠীর উপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের মূল কারণ তাদের যোগ্যতা। ব্যবসা-বাণিজ্যে, প্রচার ও মিডিয়াতে তাদের যোগ্যতার সামনে সকলেই পরাজিত, পরাভূত। পৃথিবীকে যোগ্যতার শাণিত হাতিয়ার দিয়ে পরাজিত করতে হবে। কৌশল ও হিকমাত সফলতা লাভের অন্যতম শর্ত। যে কোন উপায়ে যোগ্যতার অধিকারি হতে হবে এর জন্য প্রয়োজন সাধনা, নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর নেতৃত্ব অযোগ্যদের হাতে দেবে না। তিনি তার পৃথিবী নামক এ বাগানের দায়িত্ব যোগ্যতম মালিদের হাতে দেবেন। সত্যের দায়ীদের বক্তব্য প্রদানে, কলমের ব্যবহারে, প্রযুক্তি ও Media তে এ কথায় পৃথিবী পরিচালনায় প্রতিটি বিষয়ে তারা হবে চৌকস ও সকলকে হতবাক করে দেয়ার মত যোগ্য। আর প্রতিযোগিতার এ পৃথিবীতে যোগ্যতমেরা বেঁচে থাকবে। অযোগ্যদের জন্য পৃথিবীর কোথাও কোন জায়গা নেই।

প্রবন্ধের কলেবর আর না বাড়িয়ে এখানে ইতি টানতে চাই। জাহেলিয়াত আজ সভ্যতার মুখোশ পরে অভিনয়ে অবতীর্ণ। প্রাচীন অসভ্যতা আবার আধুনিকতার আবরণে মানবতার সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লুণ্ঠনকারীরা নিজদেরকে বলছে মানবতাবাদি বলে। নারীদের চরিত্র হননকারি ও তাদের সতীত্ব বিনষ্টকারিদের পরিচয় দেয়া হচ্ছে নারী অধিকার আন্দোলনকারি বলে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা নাকি শান্তির মহাদূত! আর নিজ দেশের আজাদী ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামী ও লড়াকুরা সন্ত্রাসী ও মৌলবাদি! ইতিহাসে এ কঠিন সময় সম্ভবত আর আসেনি। আজকে যারা– সত্যের পক্ষে অসত্যের বিরুদ্ধে লড়বে– তাদেরকে সমগ্র ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তেরমুখামুখি দাঁড়াতে হবে। মোকাবিলা করতে হবে দেশে দেশে তাদের প্রতিষ্ঠিত ও আশ্রিত তাঁবেদারদের সৃষ্ট নির্যাতন ও জুলুমের হাজার মনযিল।

– তাই বলেছি, তোমরা জ্ঞানের মশাল হাতে নাও,
চরিত্রের বর্মদিয়ে নিজেদের আচ্ছাদন কর,
সাহস ও যোগ্যতাকে সাথে নিয়ে আগুয়ান হও
শহীদদের অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনের সুতীব্র চেতনায়,
আল্লাহ্ তায়ালাই তোমাদের শেষ আশা, শেষ ভরসা।

---

*লেখক: বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ।*



icsbook.info

# অত্যাচার নির্যাতন ও শাহাদাতের সাথে বেহেশতের সম্পর্ক

প্রফেসর ডা. মোঃ মতিয়ার রহমান

পৃথিবীর সকল মুমিন বা মুসলিমের পরম আকাঙ্খার বস্তু হল বেহেশ্‌ত। পরকালে ঐ বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে কিনা সেটি বুঝার একটি মাপকাঠি মহান আল্লাহ কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই সকল মুসলমানের ঐ মাপকাঠির ব্যাপারে সঠিক ধারণা থাকা একান্তই দরকার। পরকালে বেহেশত পেতে হলে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাই রাসূল (সা.)কে অনুসরণ করা ইসলামের সকলের জন্য ফরজ বা ফরজে আইন। তাই রাসূল (সা.) এর অনুসরণ সঠিক হচ্ছে কিনা তা বোঝার মাপকাঠি যা হবে– পরকালে বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে কিনা তা বোঝার মাপকাঠিও তাই হবে। চলুন এখন ঐ মাপকাঠির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা তথা জেনে নেয়া যাক।

## মাপকাঠির বৈশিষ্ট্য

কোন কিছুকে কোন একটি বিষয়ের মাপকাঠি হতে হলে তার মধ্যে নিম্নে বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই থাকতে হবে–

১। মাপকাঠিকে সব সময় একটি জিনিস বা বিষয় হতে হবে।

২। যে জিনিস বা বিষয়কে মাপা হবে মাপকাঠিটি সেই জিনিস বা বিষয়ের কোন এক বা একাধিক অংশ বা বিষয় হতে পারবে না। মাপকাঠিটিকে এমন জিনিস বা বিষয় হতে হবে যা দিয়ে মাপকৃত জিনিস বা বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে মাপা যায়। উদাহরণস্বরূপ চলুন বাংলাদেশের সকল স্কুলের মান যাচাই করার মাপকাঠির ব্যাপারটা দেখা যাক। প্রতি স্কুলে বিভিন্ন বিষয় (ইংরেজি, বাংলা, অংক, ইসলামিয়াত, বিজ্ঞান ইত্যাদি) শিক্ষা দেয়া হয়। স্কুলের মান যাচাইয়ের মাপকাঠি ঐ বিষয়গুলোর একটি বিষয়ে একটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেমন করেছে, তা হবে না। মাপকাঠিটি হতে হবে এমন কিছু, যা দিয়ে স্কুলের মানকে সামগ্রিকভাবে মাপা



icsbook.info

যাবে অর্থাৎ কতভাগ ছাত্র SSC পরীক্ষায় পাস করেছে বা ফেল করেছে ইত্যাদি।

৩। মাপকাঠির ব্যাপারে উপরে বর্ণিত চিরসত্য (Universal Truth) বৈশিষ্ট্যগুলো জানার পর আমরা সহজে বলতে পারি নবী-রাসূলদের সঠিক অনুসরণ হচ্ছে কিনা তা বুঝার মাপকাঠির গুণাগুণ হবে–

১। মাপকাঠিটি হবে এমন কোন বিষয় যা সকল নবী-রাসূলের (সা.) জীবনে ঘটেছে।

২। মাপকাঠিটি নবী-রাসূলগণের করণীয় কোন কাজ হতে পারবে না ।

৩ । মাপাকাঠিটি সকলে সহজে বুঝতে পারে এমন বিষয় হলে ভাল হয় ।

চলুন এবার, বিবেক-বুদ্ধি, আলকুরআন ও নবী-রাসূলদের জীবনী এই ৩টি মাধ্যমের সাহায্যে দেখা যাক নবী-রাসূলদের সঠিক অনুসরণ হচ্ছে কিনা তা বুঝার মাপকাঠিটি কী হবে।

## মাপকাঠির ব্যাপারে বিবেক বুদ্ধির রায়

আলকুরআন অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হচ্ছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যেমে মানুষের কল্যাণ করা।' এই ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে যারা নিজেদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক সুবিধার জন্যে ঐ অন্যায়গুলো করছে বা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে তারা বাধা দিবে অর্থাৎ তাদের নিকট থেকে বাধা বা প্রতিরোধ আসবে, এটা দিবালোকের মত সত্য। আর প্রত্যেক সমাজে কায়েমী স্বার্থবাদী ঐ ধরনের লোক কিছু না কিছু থাকে এটাও একটা চিরসত্য বিষয়। তাই সহজেই বোঝা যায় মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য যে কেউই বাস্তবায়ন করতে যাক না কেন– তাকে অবশ্যই প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে। পূর্বের আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার হয়েছে যে, কুরআন অনুযায়ী নবী-রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তাবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া। তাই সহজেই বুঝা যায় সকল নবী-রাসূলকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী প্রতিরোধ হবে নবী-রাসূলগণের অনুসরণের মাপকাঠি। অতএব আমাদের বিবেক-বুদ্ধির রায় হল নবী-রাসূলদের দুনিয়ায় পাঠানোর আল্লাহ উদ্দেশ্যকে যারাই বাস্তবে রূপদান করতে যাবে তাদের সকলকে অবশ্যই প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে ।

## মাপকাঠির ব্যাপারে কুরআনের রায়

তথ্য-১

পূর্বেই বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলদের পাঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে যেয়ে সুরা তাওবার ৩৩ নং আয়াত ও সুরা ছফ এর ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, নবী-রসূলদের পাঠানো হয়েছে সত্য জীবন বিধান এবং তা বাস্তবায়নের পথ নির্দেশ দিতে, যাতে তারা পৃথিবীর অন্য সব ভ্রান্ত জীবনবিধানের উপর সেটাকে বিজয়ী করতে পারেন। এরপর আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ বলেছেন, নবী-রাসূলদের ঐ কাজটি মুশরিকদের জন্য যতোই মনঃকষ্টের কারণ হোক না কেন– আল্লাহ বলেছেন, নবী-রাসূলদের ঐ কাজটি অবশ্যই ইসলাম বিরোধীদের মনঃকষ্টের কারণ হবে। আর তা ফলস্বরূপ তারা নবী-রাসূলদের প্রতিরাধে নামবে।



icsbook.info

সুতরাং আল্লাহ এই দুটি সুরায় পরোক্ষভাবে বলে দিলেন যে, প্রত্যেক নবী-রাসুলকে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে যেয়ে বিরোধীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে ।

তথ্য-২

সুরা ইয়াসিনের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন– 'বান্দাদের জন্যে অনুশোচনা, তাদের কাছে এমন কোন নবী-রাসুল যায় নাই যাদের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ (নির্যাতন) ইত্যাদি করা হয় নাই' ।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালা এখানে দুঃখ করে বলেছেন, এমন কোন নবী-রাসুল দুনিয়ায় যায় নাই যাদের প্রতি দুনিয়ার মানুষ ঠাট্টা-বিদ্রূপ, নিপীড়ন-নির্যাতন তথা প্রতিরোধ করে নাই।

তথ্য-৩

সুরা যুখরুফ এর ৭ নং আয়াতে আল্লাহ আরো বলেছেন– 'এমন কোন নবী যায় নাই যার প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ নির্যাতন ইত্যাদি করা হয় নাই' ।

সুরা ইয়াসিনের আয়াতটির 'রাসুল' শব্দটির স্থানে সুরা যুখরুফে 'নবী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ রাসূল বা নবী সকলকেই আল্লাহ এই বক্তব্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন, তাই আল্লাহ সুরা ইয়াসিন এবং সুরা যুখরুফের এই আয়াত দুটোর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ীও 'প্রতিরোধ' হল নবী-রাসুলগণের অনুসরণের মাপকাঠি।

## মাপকাঠির ব্যাপারে নবী-রাসূলগণের জীবনী তথা সুন্নাহের রায়

এবার আসুন আমরা নবী-রাসূলদের দুনিয়ার জীবন পর্যালোচনা করে দেখি, কোন কোন ঘটনা তাদের সবার জীবনে ঘটেছে-

* ইসলামকে বিজয়ী করা (যেটা তাদের দুনিয়ায় পাঠানো উদ্দেশ্য) সঙ্গত কারণেই বেশিরভাগের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি
* শরীয়াতের বিধান... সবার একছিল না।
* অনুসারী সাহাবীর সংখ্যা, বিভিন্ন ছিল।
* স্ত্রী ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজনের ইসলাম গ্রহণ সবার স্ত্রী ছেলেমেয়ে ও আত্মীয় স্বজনরা ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।
* উপাসনার অনুষ্ঠান সবার জন্যে এক রকমছিল না।
* পোশাক পরিচ্ছদ সকলের একছিল না।
* খাবার দাবার সবার একছিল না।
* প্রতিরোধ অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অত্যাচার নির্যাতন খুন যখম বহিষ্কার ইত্যাদির একটি, অনেকটি বা সব কটি সবার বেলায় ঘটেছে।

এভাবে যতভাবে সম্ভব নবী-রাসূলদের দুনিয়ার জীবনকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একটি মাত্র জিনিস তাদের সবার জীবনে ঘটেছে, তা হচ্ছে প্রতিরোধ। অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ীও প্রতিরোধ হল নবী-রাসূলগণের অনুসরনের মাপকাঠি।



icsbook.info

## নবী রাসূলগণের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

তাহলে বিবেক-বুদ্ধি কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও রাসূলগণের জীবন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে নবী-রাসুলগণের জীবনে একটি মাত্র জিনিস বা ঘটনা পাওয়া যায় যা তাদের সবার বেলায় ঘটেছে। আর তা হচ্ছে প্রতিরোধ অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, বহিষ্কার, খুন, খারাবি ইত্যাদি নবী-রাসুলদের প্রত্যেকের জীবনে এর একটি, অনেক কটি না হলে সব কটিই ঘটেছে, তাই নি:সন্দেহে বলা যায়। এই প্রতিরোধ হচ্ছে নবী-রাসূলগেণের অনুসরণের মাপিকাঠি অর্থাৎ তাদের সঠিক অনুসরণ হচ্ছে কিনা তা বোঝার মাপকাঠি।

## মাপকাঠিটি যে সঠিক তার প্রমাণ

প্রতিরোধই যে নবী-রাসূলদের অনুসরণের মাপকাঠি তার প্রমাণ হচ্ছে সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ বেহেশ্‌তে যাওয়ার মাপকাঠি কী সেটা বলে দিয়েছেন।

আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন- 'তোমরা কি মনে করেছে অতি সহজে বেহেশতে চলে যাবে ? অথচ এখনওতো তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের ন্যায় উদাহরণ উপস্থিত হয় নাই। তাদেরকে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নে এমনভাবে জর্জরিত করা হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তদানিন্তন রাসূল এবং তার সঙ্গী-সাথীগণ আর্তনাদ করে বলেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে ? (তখন তাদের বলা হয়েছে) আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে'।

ব্যাখ্যা : যে সব মুসলমান ইসলামের কাজ করতে যেয়ে বিপদ-আপদ ও অত্যাচার-নির্যাতন দেখলে অধৈর্য হয়ে পড়ে, তাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ এখানে বলেছেন, তোমরা কি মনে করেছো যে, অতি সহজে বেহেশতে চলে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি (যারা বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল) যে রকম কঠিন বিপদ-আপদ, অত্যাচার নির্যাতন এসেছিল তোমাদের প্রতি তো এখনও সে রকম আসে নাই। অত্যাচারের স্টিম রোলার এত নির্দয়ভাবে তাদের উপর চালানো হয়েছিল যে, তখনকার রাসুল এবং তাদের প্রতি ঈমান আনা ব্যক্তিগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল (আমরা তো আর পারছিনা) আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদের জানানো হয়েছিল আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বেহেশ্‌তে যাওয়ার মাপকাঠি সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন। সে মাপকাঠি হচ্ছে প্রতিরোধ অর্থাৎ বিপদ-আপদ, অত্যাচার-নির্যাতন, নিপীড়ন ইত্যাদি। যারা ইসলামের কাজ করতে যেয়ে অল্প বিপদ-আপদ, অত্যাচার-নির্যাতন দেখে অধৈর্য হয়ে যায় তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ এখানে বলেছেন, তারা এখনও বেহেশ্‌তে যাওয়ার যোগ্য হয় নাই। তিনি আরো বলেছেন, পূর্বে যারা বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল তাদের প্রতি আসা কঠোর নির্যাতনই হচ্ছে বেহেশ্‌তে যাওয়ার মাপকাঠি। এর কারণ হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে অত্যাচার নির্যাতন অবশ্যই আসবে।

## প্রতিরোধ যাদের নিকট থেকে আসবে

এ পর্যায়ে এসে মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, প্রতিরোধ কাদের নিকট থেকে আসবে। এর উত্তর পাওয়া ও বুঝা কোন কঠিন ব্যাপার নয়, মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর



icsbook.info

উদ্দেশ্য বাস্তাবায়ন হয়ে গেলে অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হয়ে গেলে সমাজের, দেশের বা পৃথিবীর যাদেরই স্বার্থের হানি হবে তাদের কাছ থেকে প্রতিরোধ আসবে। আর যে উপদলের স্বার্থ যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার কাছ থেকে সে পরিমাণই প্রতিরোধ আসবে। তাই প্রতিরোধ বেশি আসবে এবং ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় নবী-রাসূলদের প্রতি প্রতিরোধ বেশি এসেছিল, নিম্নে উপদলগুলোর সকলের নিকট থেকে–

১। অনৈসলামী রাজনৈতিক শক্তি

ইসলাম বিজয়ী হলে সমাজ, দেশ বা পৃথিবীর অনৈসলামিক রাজনৈতিক শক্তিই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রতিরোধও সব থেকে বেশি আসে বা আসবে এই শক্তির কাছ থেকে।

২। অনৈসলামী সাংস্কৃতিক শক্তি

ইসলাম বিজয়ী হলে অনৈসলামিক সাংস্কৃতিকচর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এ শক্তির নিকট থেকেও যথেষ্ট প্রতিরোধ আসে বা আসবে।

৩। অনৈসলামিক ব্যবসায়িক শক্তি

অনৈসলামিক পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলাম বিজয়ী হলে তাদেরও স্বার্থের যথেষ্ট হানি ঘটবে তাই তারাও প্রতিরোধে নেমে পড়বে।

৪। প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধর্মীয় শক্তি

সকল সমাজে কোন না কোন ধর্মীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে সমাজে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে নেই, সেখানে ভ্রান্ত ইসলামী শক্তি কোন না কোনভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ভ্রান্ত ইসলামী শক্তির নিকট থেকেও যথেষ্ট প্রতিরোধ আসে। এই শক্তির একটা বিশেষ দিক হল, যেহেতু তারা ইসলামের নামেই কথা বলে, তাই সাধারণ মানুষ তাদের কথা সহজে গ্রহণ করে। আর এটা তো একটা স্বতঃসিদ্ধ কথা (Universal Truth) যে, যে ভুল জানে তাকে সঠিক কথা গ্রহণ করানো, যে মোটেই জানে না তাকে গ্রহণ করানোর চেয়ে অনেক কঠিন।

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির এ সকল তথ্যের মাধ্যমে সহজেই বুঝা যায় পরকালে মুক্তি তথা বেহেশত পাওয়ার মাপকাঠি হল বিরোধীদের নিকট থেকে আসা অত্যাচার-নির্যাতন। আর এই অত্যাচার-নির্যাতনের সর্বোচ্চ মাত্রা হল শাহাদাত।

---

*লেখক: চেয়ারম্যান- কোরআন রিসার্চ সেন্টার।*



icsbook.info

# মুখোশধারী
# ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের কান্ড

প্রফেসর ড. কুরবান আলী

২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর ন্যক্কারজনক ঘটনা জাতিকে যেমন লজ্জা দিয়েছে তেমনি দেশের গণতন্ত্রের পথকে রুদ্ধ করেছে। আর গণতন্ত্রের এ পথ রুদ্ধ হবেই না বা কেন? ২৮ অক্টোবরের লগি-বৈঠার তান্ডবতো আর কোন গণতান্ত্রিক শক্তির কর্ম নয়। অথচ ঐ অপশক্তির প্রধান দলটি গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী।

মূলতঃ দলগতভাবেই ওরা গণবিরোধী। ঐ দল সৃষ্টির পর থেকেই তাদের সন্ত্রাসী রূপ জন সম্মুখে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত। আর এদের এই গণবিরোধী আচরণের অনেক কারণের মধ্যে একটি হলো তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এ মতবাদটির প্রবক্তারা মানবতাবাদি সেজে সামাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করায়ত্ব করতে চায়। আর এ কাজটি করার জন্য যখন যেখানে যা বলার তাই বলে এবং যা করার তাই করে। ধর্মনিরপেক্ষতা এদের একটি মুখোশ মাত্র। এর অন্তরালে বহুবিধ অপকর্ম ঘটানো হচ্ছে এদেশ তথা সারা বিশ্বে।

আমরা যদি নজর দেই প্রতিবেশী ভারতের দিকে তা হলে দেখতে পাব তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নগ্ন চিত্র। সেখানে দেখা যায় জাতিগত সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন রূপ। এতে প্রতি বছর হাজারো মুসলমান মারা যাচ্ছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুদের হাতে। তারা মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির গড়ার ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করছে মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনাকে উপেক্ষা করে।

বর্তমান বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর দুই দেশ আমেরিকা ও বৃটেনও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারি। তারা আজ কি করছে? তাদের উপনিবেশিক বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মুসলমানদের বলীর পাঠা সাজিয়েছে। তারা কথিত সন্ত্রাস ঠেকানোর নামে দখল করে নিয়েছে আফগানিস্তান ও ইরাক। আবার ইরান ও পাকিস্তানের প্রতি হাত বাড়াতেও বাকি রাখেনি। তারা শুরু করেছে খৃস্টানদের ক্রুসেড।উস্কে দিচ্ছে শিয়া-সুন্নী ধর্মীয় উন্মাদনা।



icsbook.info

অথচ প্রতিনিয়ত ইসরাইল ফিলিস্তিন ও লেবাননের উপর মানবতা বিরোধী নগ্ন সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিরা তাকে সন্ত্রাস বলছে না। আন্তর্জাতিক চিত্রের সাথে আমাদের এদেশীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিদের আচরণের কোনই পার্থক্য নেই। বরং আছে ঔদ্ধত্য। গণতন্ত্রের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০ এর নির্বাচন। আর তা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছিল জাতিকে। কিন্তু দেখতে দেখতেই সেই সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করেছিল এই ধর্মনিরপেক্ষবাদিরাই। আবার সেই স্বৈরতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার জন্য সব দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাকশাল কায়েমের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল । কিন্তু বিধিবাম, তাই বাকশালীদের সিংহাসনে বসার সুযোগ হয়নি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিদের ক্ষমতালিপ্সা এদেশের জনগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে।

বাকশালীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে এ প্রজন্মের মানুষেরা অবগত নয়। সে প্রক্রিয়ায় সব দলকে নিষিদ্ধ করে বাকশালে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল সবাইকে। এক্ষেত্রে মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীরা এমনকি সরকারি কর্মচারিরাও রেহাই পায়নি এ প্রক্রিয়ায়। শুধুমাত্র বাধ সেধেছিল সেনা কর্মচারিরা। তারই ফলশ্রুতিতে ঘটে গেল ১৫ আগস্টের ট্রাজেডি।

সে সময়ের ঘটনার রাজনৈতিক প্রতিবাদী ছিল বামপন্থি রাজনীতিবিদগণ। শুধুমাত্র প্রতিবাদ নয় সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছিল তারা। আর তখন থেকেই রাজনীতিতে সহিংসতার অনুপ্রবেশ। রাজনীতিতে সন্ত্রাসের আবির্ভাবও তখন থেকে। সময়ের আবর্তনে অনেক বাম দল ভেঙ্গে আন্ডার গ্রাউন্ডে গিয়ে বিভিন্ন রকম সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাতে থাকে। এদেশে সন্ত্রাসের জন্ম দেয় মূলত এই বামেরা। এখনও প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তারা সন্ত্রাস করে বেড়ায়। এখনও সর্বহারার নামে চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস। আর আমাদের দেশের সন্ত্রাসের মূল চালিকা শক্তি এই বাম সন্ত্রাসীরা।

বাম রাজনৈতিক দলগুলোর সংখ্যা যে কত তা বলা শক্ত। এরা মূলতঃ গণতন্ত্র ও ধর্মবিরোধী। এরা জনগণের রোষ থেকে বাঁচার জন্য নিজেদেরকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। এদেশ যখন গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন এ বামেরা প্রমাদ গোনলো। যখন তারা লক্ষ্য করল যে কোন দল গণতন্ত্র চর্চা করুক আর নাই করুক জনগণ গণতন্ত্রের শুরু করেছে। পচা সমাজতন্ত্র এদেশের মাটি হতে নির্বাসিত হতে যাচ্ছে। এ ফাঁকে নিজেদের ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থের জন্য তারা গণতন্ত্রী ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সেজে বসে। তারা দেশের মধ্যে বিভিন্ন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদি আওয়ামী শক্তির ঘাড়ে সওয়ার হওয়ার প্রয়াস পায়। নবম সংসদ নির্বাচন প্রস্তুতি প্রাক্কালে যখন আওয়ামী শক্তি নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে পারছিল না সেই মুহূর্তে এ বামভূতদের তাদের কাঁধে তুলে নেয়। সাথে সাথে গণতন্ত্রের দুশমন ও স্বৈরশক্তি জাতীয় পার্টি ও সিরিজ বোমা পরিচালনাকারি সন্ত্রাসী শক্তিকে কোলে তুলে নিতেও কার্পন্য করেনি এ আওয়ামী গোষ্ঠী। তাতেও যখন তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করা নিশ্চিত হতে পারেনি, ঠিক সে মুহূর্তে আওয়ামী, স্বৈরাচারি, সন্ত্রাসী ও বামদের সমন্বয়ে ঘটানো হয় ২৮ অক্টোবরের লগি-বৈঠার



icsbook.info

তান্ডব। ঝরে যায় ডজন খানেক তরুণের সতেজ প্রাণ। খালি হয় তাদের মায়ের বুক। আত্মীয় স্বজনদের আহাজারিতে বিষন্ন হয় দেশের আকাশ বাতাস।

এই তান্ডব প্রদর্শিত হয় দেশী-বিদেশী বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও ভিডিও ফুটেজে। সবাই স্তম্ভিত হয় এ তান্ডব দেখে। ধিক্কার দিতে থাকে এই সব সন্ত্রাসী খুনিদের। দেশ ও জাতি তখন বিশ্ব বিবেকের কাছে লজ্জায় মাথা নত করে থাকে। গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য। জাতি বঞ্চিত হয় বাক স্বাধীনতা থেকে।

ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশধারিদের এসব লঙ্কাকান্ডের বিচার এখনও হয়নি। এ ঘটনায় যারা শহীদ তাদের আত্মার শান্তির জন্যই এসব সন্ত্রাসীদের বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া উচিত লোক সম্মুখে।

---

*লেখক: উপাচার্য- বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়*



icsbook.info

# শিক্ষা ও নৈতিকতার সমন্বয় অপরিহার্য

প্রফেসর ড. এম. উমার আলী

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। জাতির ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতির জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষার উপর ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রথম অহী তাকিদ নিয়ে এসেছে 'পড়, জ্ঞান অর্জন কর তোমার স্রষ্টা প্রভুর সঠিক চেতনা নিয়ে'। রাসুল (সা.) তাকিদ দিয়েছেন 'তালাবুল ইলমি ফারিদাতান আলা কুল্লি মুসলিম', জ্ঞান অর্জন করা ফরয। প্রবাদ আছে যে, জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, অশির চেয়ে মসি অধিক শক্তিশালী ইত্যাদি। ইসলামের প্রথম যুগে শিক্ষাদানে সমর্থ এমন কোন ব্যক্তি শত্রুশিবির থেকে বন্দি হয়ে আসলে শিক্ষাদানের শর্তে তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

আল কুরআন বলে যে, প্রথম মানুষ ও নবীকেও আল্লাহ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে শিক্ষা বা জ্ঞান দিয়েছেন– 'আল্লামা আদামাল আসমায়া কুল্লাহা'। আল্লাহ প্রদত্ত এই বিশেষ শিক্ষার জন্যই আদমকে ফিরিশতাকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির পরপরই ফিরিশতাদের দ্বারা আদমকে সম্মান প্রদর্শন করানো হয়েছিলো আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণেই। ভুলবশতঃ ইবলিশের শিক্ষা গ্রহণ করায় ঘটেছিল আদমের চরম অকল্যাণ; ইবলিশের শিক্ষাই হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ থেকে বিমুখ করা। এই জন্যেই অহীর প্রথম নির্দেশেই পাঠ করার সাথে মহান স্রষ্টা রবের নাম গ্রহণের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনকেই ফরজ করা হয়নি। দারুল আরকাম থেকে শুরু করে মসজিদে নববীর মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় যে শিক্ষার প্রচার করা হয়েছে, তাতে ছিলো একটি মননশীল সমাজ গড়ার শিক্ষা; ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার শিক্ষা; পরস্পর হানাহানি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থেকে মুক্ত হয়ে একে অপরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার শিক্ষা; শত্রুসেনার সম্মুখীন হলে এরূপ কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার শিক্ষা; শান্তি রক্ষার জন্য প্লুরালিজমের ধারা সম্বলিত কসমোপলিটান পরিবেশে ভিন্ন মতাবলম্বীদের মাঝে



icsbook.info

আঁতাত গঠনের শিক্ষা; আদর্শের প্রচারে সহনশীলতা ও সংবেদনশীলতা প্রদর্শনের শিক্ষা; এমনিভাবে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনীয় সৎ, যোগ্য ও স্বচ্ছতাসম্পন্ন সাহসী নেতৃত্ব গড়ে তোলার উপযোগী যাবতীয় শিক্ষা। কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কারিগরি ও প্রকৌশলী সর্ব প্রকারের শিক্ষার উপরেই ইসলাম পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তবে সকল ক্ষেত্রেই অহীর জ্ঞানের সমন্বয় সাধন জরুরি।

প্রায় ১৫০০ বছর আগে মক্কা, মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এমন কোন স্কুল, মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো না, যে ধরনের বড় বড় অবকাঠামো বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ আমাদের দেশে কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। ঐ জাহেলিয়াতের সমাজে রাসূল (সা.) তদানিন্তন শিক্ষাকে অহীর শিক্ষার আলোকে সমীক্ষণের ফলে অল্প সময়ের মাঝে এক মহাবিপ্লব সাধন করেন। প্রচলিত শিক্ষা তৎকালিন সমাজকে নিয়ে যাচ্ছিল জাহান্নামের যাত্রি হিসেবে চরম দ্রুততার সাথে। অহীর শিক্ষা কার্যকর হবার সাথে সাথে সমাজ সেই ভয়াবহ পূর্বাবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি হয়ে জান্নাতের পথে আগুয়ান হতে থাকলো। গন্তব্যস্থল তথা টার্গেট স্থির করে সেদিকে দ্রুততার সাথে অগ্রসর হওয়া জ্ঞানীর কাজ। অপরপক্ষে পশ্চিমে যাবার উদ্দেশে কোন দ্রুতগামী গাড়িতে উঠে কোন যাত্রী যদি টের পায় যে, গাড়ি বিপরীতমুখি ভিন্ন গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটছে তখন সময়ের সাথে আনুপাতিক হারে স্বীয় টার্গেট থেকে ক্রমশঃ সে দূরে সরে যাবে। আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা একমুখি করার কথা বহুদিন ধরে চলে আসছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার সকল স্তরে অহীর শিক্ষা তথা নৈতিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন অতিব জরুরি। অন্যথায় সমগ্র জাতি জাহেলিয়্যাতের অমানিশার মাঝেই চিরকাল ডুবে রবে।

জাতির লক্ষ্য একমুখি ও স্থির করে তদানুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হলে সেখান থেকে দেশপ্রেমিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব। সাহিত্য, গণিত, সমাজবিজ্ঞানী, দর্শন, বস্তুবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আইন বা প্রকৌশল জ্ঞানের যেকোন শাখায় বিচরণ ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে যদি তাতে অহীর জ্ঞানের সমন্বয় হয়। কিন্তু একটি প্রভাবশালী মহলের পাশ্চাত্যমুখিতা এবং পশ্চিমাসভ্যতার প্রীতি জাতীয় ক্ষেত্রে অহীর জ্ঞানের সাথে শিক্ষার সংযোগ বিচ্যুত করে চলেছে। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সঠিক জাতীয় লক্ষ্যে বিপরীতমুখি আচরণে অভ্যস্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একশ্রেণীর জনশক্তি গড়ে উঠছে। তাই ইসলামী জীবনধারায় গড়ে উঠা জনগোষ্ঠীকে ঐ ধরণের ভিন্ন আঙ্গিকে শিক্ষিত লোকেরা সর্বদাই নিজেদের প্রতিপক্ষ ভাবছে এবং একই সমাজ ও জাতির ভিতর থেকে একদল অন্যদলের শত্রু হিসেবে পারস্পরিক কলহে লিপ্ত থাকছে। একদল অন্যদলকে বিভিন্ন নোংরা ভাষায় গালি দেয় এমনকি স্বাধীনতার শত্রু হিসেবেও নির্দেশিত করে। কেউবা আবার শুধু নিজকে পাক্কা মুসলমান ও আল্লাহ ওয়ালা হিসেবে চিন্তা করে অন্য সকলকে কাফির ফতোয়া দিয়ে তৃপ্ত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) ইসলামী সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কৌশলী, চৌকস, বাস্তবমুখি এবং গঠনমূলক ভূমিকা রেখে একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিপাহশালার এবং রাষ্ট্র প্রধানের আদর্শ স্থাপন করেন। তিনি এনেছিলেন তৎকালিন বহুধাবিভক্ত সমাজে এক চমৎকার মহাঐক্য। ইসলামী সমাজে বিভেদ সৃষ্টি আল্লাহ কখনই পছন্দ করেন না বরং তিনি উম্মাহকে 'অলাতাফাররাকু' ছিন্নভিন্ন ও বিভক্ত না হওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। 'আয়তাসিমু' বলে এক ঐশী শক্ত রজ্জুকে



icsbook.info

সমবেতভাবে ধারণ করে স্থায়ী টেকসই এবং নন্দিত ঐক্যের বাঁধনে সমাজকে মজবুত প্রতিরক্ষার আওতায় আনতে নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন মতামত থাকতে পারে। সকল মানুষের জীবন ধারণের উদ্দেশ্য যেমন একরকম নয় তাই তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যের মাঝে পার্থক্য থাকাও অযৌক্তিক নয়। কেহ এর ফয়সালা দিবেন এই বলে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যুগোপযুগি জনসম্পদ গড়ে তোলা। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের উপর কেউ শিক্ষার হাইলাইট করতে পারে। কেউ আবার শিক্ষাকে জি.ডি.পি উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে পেশ করে থাকে। জীবন দর্শনের ভিন্নতার কারণে মানুষের চিন্তার পার্থক্য সূচিত হয় মহান আল্লাহ প্রশ্ন করেন...'যে প্রকৃত বস্তুকে আদৌ দেখেনি আর যে সেটা বাস্তবে দেখেছে এদের উভয়ের উপলব্ধি কি সমান হবে'? অন্ধ ও চক্ষুস্মান ব্যক্তি যেমন সমান হতে পারেনা তেমনি অশিক্ষিতরা কখনই শিক্ষিতদের সাথে তুলনীয় হতে পারেনা। যে জানে সে কি কখনও যে একদম জানেনা তার অনুরূপ হতে পারে? যে আল্লাহর মহত্ত্ব এবং শক্তিমত্তার পরিচয় জানেনা তার সাথে আল্লাহভীতি নাও থাকতে পারে। কিন্তু আলেমরা আল্লাহ সচেতনতার কারণে আল্লাহভীতি সম্পন্ন হবেন এমনটাই স্বাভাবিক। আর যাদের মাঝে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয় তারা যেমন দৈহিক কল্যাণের স্বার্থে হালাল হারাম বিচার করে খাদ্য গ্রহণ করে, মননশীল সমাজ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মক্ষেত্রেও তেমনি ভাল মন্দ তথা মারুফ ও মুনকার বিচার করে ক্ষেত্র বুঝে উপযুক্ত ভূমিকা অবলম্বন করে। হুট করে কোনো কাজে অবিবেচকদের ন্যায় স্ববিরোধিতামূলক বক্তব্য পেশ কিংবা আচরণ করা তাদের জন্য সমীচীন হতে পারেনা। এর চাইতে বড় কথা এই যে মুসলিম তো শুধুমাত্র তার বস্তুগত দেহের রিপুর চাহিদা মিটানোর কথা কিংবা দুনিয়ার কল্যাণের কথাই ভাবেনা বরং এর পাশাপাশি আখেরাতের কল্যাণের বিষয়েও তারা অধিকতর সচেতন। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের কল্যাণের অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যেই তারা দুনিয়ায় ন্যায়ের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী হয়।

রুজি, রোজগার, শিক্ষা কিংবা ধন-দৌলত অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ায় ভালোভাবে বেঁচে থাকা ও বৈষয়িক যোগ্যতা প্রাপ্তি। আর দুনিয়ায় বেঁচে থাকা এসময়টুকুতো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই সকল শক্তি ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে হবে। তাই বেশি বেশি উত্তম আমল করে মউতের সীমানার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ণ জীবনের মেয়াদ ভাল কাজে ভরপুর করার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রগামী হওয়ার জন্য (ফাসাতাবাকুল খায়রাত) সদা তৎপর হতেই হবে। কোন পরীক্ষার্থী যখন বুঝে যে অন্যদের মোকাবেলায় বেশি পরিমাণ উত্তম আমল করার মাঝেই তার জীবনের সাফল্য নির্ভর করে তখন তার নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্য বেশি বেশি পয়সা কামাই হতে পারেনা। অন্যের অধিকার নষ্ট করে স্বীয় প্রাপ্তি বৃদ্ধির তদবিরের পিছনে ঘুরে বেড়ানোর মাঝে কোন ঈমানী চেতনা নেই। বরং স্রষ্টা যে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হায়াত ও মওত সৃষ্টি করেছেন সেই পরীক্ষায় চরম সাফল্য হাসিলের জন্যেই অধিকতর ব্রতী হওয়ার মাঝেই প্রকৃত কল্যাণ (খালাকাল মাওতা অল হায়াতা লি ইয়াবলুঅকুম আইয়্যুকুম আহসানু আমালা) এই দুনিয়াকে প্রকৃত ঈমানদারবৃন্দ পরীক্ষার একটি বড় রকমের হল রুম মনে করে। পথের কাঁটা সরানোকেও ইসলামের নবী একটি সুন্দর আমল হিসেবে দেখিয়েছেন। তাই কোন একজন অতি সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন চলার পথ থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের



icsbook.info

জনগণের সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কল্যাণ অর্জনের পথে যেসব কাঁটা, প্রতিবন্ধকতা, জঞ্জাল, সন্ত্রাস কিংবা স্বৈরাচারি জুলুমের জগদ্দল পাহাড় এসে পড়ে তা সারানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো... সে কাজই তো হলো ব্যক্তির ঈমানদারির আসল পরীক্ষা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এসব কঠিন কঠিন পরীক্ষায় পাসের উপযুক্ত করে তাদের নিজ নিজ লেভেলে মানসম্পন্ন যোগ্য কর্মী ও নেতা হিসেবে গড়ে তোলা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরেই রয়েছে জান্নাত। ইসলামের নবী (সা.) তাই ঘোষণা করেন যে, এ কঠিন লড়াইয়ে সংগ্রাম করার (তরবারী চালানোর) বিনিময়েই একমাত্র জান্নাত লাভ সম্ভব হতে পারে (আল জান্নাতু তাহতা জিলালিস সুয়ুফ)। অন্যায়কে শক্ত হাতে প্রতিহত করাই ঈমানের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা (মান রায়া মিনকুম মুনকারান ফালু ইউগায়্যিরু বিইয়াদিহি)। তাই কল্যাণের প্রতিষ্ঠা, জুলুম অন্যায় এবং শোষণ বঞ্চনার প্রতিরোধ (তায়ামুরুনা বিল মাআরুফ অতানহাওনা আনিল মুনকার) মূলক সব কাজ থেকে নিজকে গুটিয়ে রেখে শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতে মশগুল থাকা কখনই ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য হতে পারেনা।

গ্লোবের চতুর্দিকে আজ উম্মাহর দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মূলে রয়েছে মুসলমানদের মাঝে শিক্ষার গুরুত্ব ও নেক আমল কেন্দ্রিক বিভ্রান্তি ও সীমাহীন অজ্ঞতা। আল কুরআনকে মহান আল্লাহ বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ কুরআনুল হাকীম বলে উল্লেখ করলেও আজকের দিনেও একশ্রেণীর পরহেজগার লোক বিজ্ঞান শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছে। অথচ বিজ্ঞান শিক্ষা আল কুরআন ও মহান সুবহানাহু তায়ালার অনেক আয়াত (নিদর্শন)সমূহ অনুধাবন করা সহজ করে দেয়। একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষুদ্র অনু পরমানুর মাঝে আল্লাহর হুকুম যেমন কার্যকর দেখতে পায় তেমনি সেই সত্তার হুকুমের প্রতিফলন খুঁজে পায় বিশাল সৌরজগতে ও বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র ও নিহারিকা পুঞ্জের মাঝেও। 'মা তারা ফি খালকির রহমানি মিন তাফাউত, অ কুল্লুন ফি ফালাকিই ইয়াসবাহুন'। কোথাও কোন অনিয়ম কিংবা বিশৃঙ্খলা নেই। যাকে যেভাবে কমান্ড দেয়া (কুন) সে ঠিক তেমনি ভাবেই সাথে সাথে হুকুম তামিল করছে (ফাইয়াকুন)। আসমান জমিনের সৃষ্টি রহস্য রাত দিনের বিবর্তন মায়ের জরায়ুর মাঝে ভ্রুণের ক্রমবিকাশ নুৎফা থেকে মুদগা, মুদগা থেকে আলাকা, আলাকায় গোস্ত সংযোগ, তাতে হাড্ডি দিয়ে সৃষ্টি সুসম্পন্ন করা আল কুরআনের মাঝে এমন নিখুঁত ও নিপুনভাবে বর্ণিত সৃষ্টি রহস্য ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর তথ্য একজন জীববিজ্ঞানী কিংবা চিকিৎসা বিজ্ঞানী যতটা সুন্দরভাবে বুঝতে পারে তা কি কোন সাধারণ মৌলভী সাহেবের পক্ষে সম্ভব হবে? তেমনি সুরা আল হাদিদে বর্ণিত 'ফিহে বা' সুন শাদীদ' দিয়ে ধাতব লোহার পরমাণুর মাঝে যে প্রচন্ড ও ম্যাক্সিমাম বাইন্ডিং এনার্জির ইংগিত দেয়া হয়েছে তা একজন নিউক্লিয়াস বিজ্ঞানী কিংবা তেজস্ক্রিয়তাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ যেভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তা অন্যের পক্ষে সম্ভব হবেনা। এমনি বহুবিধ বিজ্ঞানময় আয়াতসমূহের অন্তর্নিহিত মর্মকথা, মহান আল্লাহর মহিমা, বাস্তব ধারণা নিয়ে বুঝা বিজ্ঞানের শিক্ষার মাধ্যমে যতটা সহজ হয় অন্যথায় তা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক রোগের প্রতিকার ও প্রতিষেধক হিসেবে ঔষধ রয়েছে (লি কুল্লি দায়িন দাওয়াহ) রাসুলের (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী ইবনে সিনার মত রসায়ন ও চিকিৎসাবিদকে



icsbook.info

রাসূল (সা.) প্রদত্ত তথ্য উদঘাটনের গবেষণাকে ইবাদতের চেতনা নিয়ে আমল করায় উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রথম যুগের মুসলিমরা বিজ্ঞান চর্চাকে দুনিয়াদারী না ভেবে বরং অন্যতম ফরজিয়াত পালনের চেতনা নিয়েই এই ইলমের সম্প্রসারণ করে ইসলামের বিজয় আনয়ন এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধকরণে ব্যস্ত থেকেছেন। আফসোস মুসলিম উম্মাহ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা এবং এসবের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের আমলসমূহও যে অতি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল... তা ইবাদতের চেতনা নিয়ে খুব কম লোকই আমল করে থাকে। তসবীর দানার মাঝে তারা বেহশত তালাশ করে। আল্লাহ ভীরু হবার জন্য যে সব জ্ঞান অর্জন একান্ত সহায়ক, উম্মাহ সে প্রক্রিয়ার আমলসমূহ এড়িয়ে পশ্চিমাদের চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসের জীবন অনুকরণে ভুল পথে দ্রুত এগিয়ে চলছে। শিক্ষিত সমাজের একাংশ তাই অনৈতিক, অশ্লীল কর্মকান্ড, সন্ত্রাস ও নোংরা চাঁদাবাজির কাজে জড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রসমূহে সমন্বিতভাবে অহীর নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকলে এমন দুরবস্থা হতে পারতো না। ইসলামের প্রথম যুগে যারা মুসলমান হয়েছেন, কালেমার অনুসারি হিসেবে যারা নিজেদের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা সকলেই শিক্ষা গ্রহণে যোগ্যতা অনুসারে আগ্রহী ভূমিকা পালন করেছেন। বৈষয়িক শিক্ষার পাশাপাশি তারা ভারসাম্য রক্ষা করে অহীর জ্ঞানে পারদর্শী হয়েছেন। এছাড়া আখেরাতে নাযাত প্রাপ্তির কাজ সহজ হয়না। এ ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে যেসকল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ গড়ে উঠে তারা নিজ সততা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করে উম্মাহর সম্মুখে শাহাদাতে হক্ব এর দায়িত্ব পালন করে সুদ-ঘুষ দুর্নীতি মুক্ত একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের নমুনা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে।

দেশ দুর্নীতিতে বারবার চ্যাম্পিয়নশীপের মর্যাদাপ্রাপ্তির বিষয় যখন প্রচার হচ্ছে। সেই বাস্তবতা ও বদনাম দেশে বিরাজমান অশিক্ষা কিংবা দুর্ভিক্ষের মত কোন দুরবস্থার জন্যে হচ্ছেনা। বরং দেশে শিক্ষিতের হার এ+ প্রাপ্ত উত্তীর্ণদের সংখ্যা, স্কুল-কলেজ মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা, জিডিপির মান, লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সম্প্রতি সুস্পষ্ট তথ্য রয়েছে। কিন্তু যে শিক্ষা দেশকে দুর্বৃত্তায়ন থেকে মুক্ত করে জবাবদিহীমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার সহায়ক– আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ কি তেমন কোয়ালিটি শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে? শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকমন্ডলীর সাফল্য নিরুপিত হয় তাদের উৎপাদনের কোয়ালিটি থেকে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অশ্লীলতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও স্বার্থবাদীতা রোধে পারঙ্গম নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগী ব্যক্তিত্ব কি পরিমাণে তৈরি হচ্ছে তা শিক্ষাব্যবস্থার সার্থকতার নির্দেশক। রাসূল (সা.) এমন যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্ব গঠন করে ছিলেন... তাই আমিরুল মুমেনীন ভৃত্যকে উটের পিঠে নিয়ে রশি ধরে টেনে চলেন। রাতের আরাম হারাম করে প্রজাদের দুঃখ যাতনা নিবারণে রাস্তায় টহল দেন। এখন এমন শিক্ষিত নেতা উৎপাদন হয়না কেন? সমস্যা শিক্ষার বিষয় কেন্দ্রিক নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক নয় বরং এ সমস্যার মূল রয়েছে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতিতে। যেভাবে শেখানো হয় ও যারা শিক্ষা দেন সমস্যা তাদের মধ্যে। নিছক কিতাবী জ্ঞান অর্জনে পন্ডিতী অর্জন অসম্ভব নয়। কিন্তু ভাল মানুষ হবার জন্য এর সাথে প্রয়োজন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক আমল যা কর্ম জগতের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত।

---

*লেখক : উপাচার্য- মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি*



icsbook.info

# যে স্মৃতি আজো কাঁদায়

অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম

সে এক বিভীষিকাময় দৃশ্য। সে এক নারকীয় বর্বরতা। রক্তাক্ত মানবতা ও আহত হৃদয়ের সে এক করুণ আর্তনাদ। নীতিহীন, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন রাজনীতির সে এক অপমানজনক অমোচনীয় দলিল। আমি ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর ভয়াবহ রাজনৈতিক সুনামির কথা বলছি। সেদিনকার সেই রাজনৈতিক তান্ডবের সাথে মুসলিম অধ্যুষিত এই জনপদের বহুকালের ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সেদিনের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ যে দেখেছে সেই কেঁদেছে। বুকফাটা সে কান্না বারে বারে বলতে চেয়েছে এ বর্বরতার সাথে আমাদের জতিসত্তার সম্পর্ক কেবলই দূরত্বের মোটেই নিকটের নয়। এক দঙ্গল উন্মাদ গোছের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজনৈতিক সন্ত্রাসী সুপরিকল্পিতভাবে মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে গায়ে পড়ে হামলা করলো প্রতিপক্ষের নিরস্ত্র ও নিরুপদ্রব এক জনসমাবেশের উপর। হামলার ধরন দেখে মনে হলো এই জনপদ হামলাকারীদের বাপের তালুক। এখানে কে থাকবে কে থাকবে না, কে রাজনীতি করবে কে করবে না, কে কথা বলবে কে বলবে না ইত্যাদি ঠিক করবে তারা। এখানে আইন কানুন, সমাজ সংস্কৃতি, ইতহাস-ঐতিহ্য কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। অথচ ইতিহাস বলে সেদিন যারা হামলা করেছে, হত্যা খুন রাহাজানি করেছে সর্বোপরি, জনগণের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার অন্যায় ও অনৈতিক প্রয়াস চালিয়েছে তারা ইতিহাসের ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। এই জনপদে তাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে যারা সেদিন আক্রান্তহলেন তারা এই জনপদের বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠী। সকল অন্যায্য ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে তারা প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তাদের প্রতি গণমানুষের ভালবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে সময়ের চেয়েও দ্রুততার সাথে। তাদের গণবিচ্ছিন্ন করার সকল প্রয়াস অবশেষে গণসম্পৃক্ততায় রূপান্তরিত হচ্ছে। আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হওয়ার কারণেই তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে প্রতিদিন। আর এখানেই হামলাকারীদের সকল ভয় এবং হতাশা। এই ভয় ও হতাশা থেকেই হামলাকারীদের আইন হাতে তুলে নেয়ার এই অন্যায্য ও বেআইনি প্রয়াস। তারা এদেশে ইসলামী শক্তির



icsbook.info

ভাগ্য নির্ধারণের ভার জনগণের হাতে তুলে দিতে ভয় পায় । কারণ জনগণের উপর তাদের আস্থা নেই। তাছাড়া তারা দিব্য চোখে দেখেছে ইসলামী শক্তি যখনই জনগণের কাছে যাবার সামান্য সুযোগ পেয়েছে তখনই দেশের সর্বস্তরের জনতা তাদের ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিসিক্ত করেছে। আক্রমণকারীরাভালো করেই জানে এই জনপদের ইতিহাস ক্রমাগতভাবে ইসলামের দিকেই ঝুঁকেছে। আর এ অঙ্কটা তারা ভালো করে বোঝে যে এখানে ইসলামী শক্তির উত্থান মানেই তাদের পতন। অন্য কথায় ইসলামী শক্তির শক্তি বৃদ্ধি মানেই তাদের শক্তি হ্রাস। ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা বহিঃশক্তির সহায়তায় তাদের সকল উপায়উপকরণ ব্যবহার করেও এই জনপদে তাদের শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তারা এখন নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াসের পরিবর্তে প্রতিপক্ষের শক্তি হ্রাসের নেতিবাচক কৌশল অবলম্বন করছে। রাজনৈতিক নেতারা যে কতটা দায়িত্বহীন, বিবেক বর্জিত এবং এক দেশদর্শী হতে পারে তার একটি সাক্ষাৎ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়ে গেল । যারা সীমাহীন নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার শিকার হয়ে অকালে মারা গেলেন তারা যে আমাদের কারো ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী স্বজন সর্বোপরি আমাদের স্বজাতি মানুষ সেই সাধারণ মানবিক অনুভূতিটুকুও হারিয়ে বসলেন আমাদের রাজনীতিবিদরা। নিহত হতভাগ্য সে যে দলেরই হোক না কেন তার জন্যে যে তার মা, বোন, স্ত্রী প্রতিদিনের প্রার্থনার মতই নিরাপদ বাড়ি ফেরার প্রত্যাশা নিয়ে পথ চেয়ে থাকবে এবং উৎকণ্ঠিত মন আর ক্লান্ত চোখের আতঙ্কগ্রস্ত চাহনির সবটুকু জুড়ে সন্তান, ভাই কিংবা প্রিয়তম স্বামীর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত লাশের বিভীষিকাময় ছবি এই সব প্রেমময়ী মানুষদের হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতিকে কিভাবে নিস্তেজ ও অসাড় করে দেবে এই সব স্পর্শকাতর অনুভূতির কোন প্রকাশ আমাদের রাজনীতির নীতিহীন নেতাদের সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সাপের মত পিটিয়ে মারা এই হতভাগ্য মানুষগুলি আমাদের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদের কারো সন্তান আবার কারো নাতি পুতির বয়সের। বাবার হে, দাদুর আদর নিয়ে কেউ এই লাশগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাইনি।

জনগণের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব পালনের শপথ নিয়ে ক্ষমতায় বসে যে সরকার তাদের ভূমিকা বরাবরই অন্যায্য ও দুর্বোধ্য থেকে গেছে। এত বড় হত্যাকান্ড সংঘঠিত হলো অথচ নিহতদের পরিবার সুবিচার পেল না। শত শত লোক আহত হলো কিন্তু না পেল ক্ষতিপূরণ না পেল সুবিচার। ঘটনার পর এক বছর পার হয়ে গেল কিন্তু সত্যিকার অর্থে এর সুষ্ঠু তদন্ত বা বিচার হলো না। মামলা যেগুলি হয়েছে তার চরিত্র মূলতঃ রাজনৈতিক। এসব মামলার ধরন দেখে মনে হয়েছে সুবিচারের উদ্দেশে যতটা তার চেয়ে ঢের বেশী রাজনৈতিক নেতাদের হয়রানি করা বা কমপক্ষের চাপের মধ্যে রাখার জন্যই মামলা রুজু করা হয়েছে। একটি দেশের সরকারও যদি খুন খারাবি নিয়ে রাজনীতি করে তবে মানুষ দাঁড়াবে কোথায়? অথচ সরকার ইচ্ছে করলেই এতদিনে এর একটি নিষ্পত্তি করতে পারতেন। যেমন অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভ থেকে শুরু হওয়া নৈরাজ্যমূলক কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন। ভিডিও ফুটেজ দেখে দেখে এই বিক্ষোভ ও ভাংচুরের সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অতি দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এমনকি কমপক্ষে দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততঃ



icsbook.info

দশজন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে সর্বোচ্চ দশ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সাম্প্রতিক দেশব্যাপী বিক্ষোভে প্রাণহানির সংখ্যা একটি আর সম্পদ ধ্বংস হয়েছে প্রচুর। একটি প্রাণহানির ঘটনা সরকারের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে এটা প্রশংসনীয় কিন্তু প্রশ্ন হলো, দেশ কাঁপানো যে মহা তান্ডবে এক ডজনের বেশি লোক নিহত এবং কয়েক শত লোক আহত হলো তার সঠিক নিরপেক্ষ ও দ্রুত বিচারের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছেনা কেন?

আর আমাদের সেই সুবিখ্যাত স্বনামধন্য সুশীল সমাজ? তারা তো মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন। এক ডজনের বেশি মানুষ নির্মমভাবে শহীদ হলেন অথচ তথাকথিত সুশীল সমাজের লোকদের এজন্য দুঃখ প্রকাশ কিংবা শোক সন্তপ্ত পরিবারসমূহের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে দেখলাম না। তবে কি নিহতদের অধিকাংশ ইসলামপন্থি হওয়ায় তারা মনে মনে কিছুটা স্বস্তিতেই ছিলেন ?

ঐসময়ে কিছু কিছু সংবাদপত্রের ভূমিকা সত্যিই হতাশ করেছে আমাদের। সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলার সাহস যাদের নেই তারা যে কেন সাংবাদিকতা করতে আসে ভেবে পাইনা। প্রথম আলো মার্কা পত্রিকাগুলিতে এ সময়ে ইসলামী শক্তির উপর রাম বামপন্থিদের এই জঘন্য পৈশাচিক আক্রমণকে উল্টা ইসলামী জঙ্গিবাদের উত্থান হিসাবে প্রমাণ করার যে অনৈতিক প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে তা রীতিমত উদ্বেগজনক। দৈনিক জনকণ্ঠ যেখানে শিরোনাম করলো 'দর্শকের ভূমিকায় পুলিশ। মাঠে নেমেছে জঙ্গীরা, জামায়াত শিবিরের নেতৃত্বে ছুঁড়ছে বোমাগুলি' সেখানে দৈনিক নয়াদিগন্তের শিরোনাম ছিল 'জামায়াতের সমাবেশে হামলা ঃ ব্যাপক সংঘর্ষ'। একই ঘটনার দুই বিপরীতমুখি এই শিরোনাম জনগণকে হতাশ করে। নয়া দিগন্তের বিস্তারিত রিপোর্ট থেকেও দেখা যায় জামায়াত হামলার শিকার হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নয়া দিগন্ত থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি- 'দুপুর সোয়া ১২ টার দিকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা মুক্তাঙ্গনের দিক থেকে এসে জামায়াতের অবস্থানের দিকে গুলিবর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হতে থাকলে গুলিবিদ্ধ হয়ে জামায়াতের দুজন নিহত হয়। এরা হলেন ৯৭ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াত কর্মী জসিম উদ্দিন (৩৫) ও বাড্ডা থানা জামায়াতের কর্মী আল আমীন। এ ছাড়া বিকেলে ৩টায় কস্তুরী রেস্টুরেন্টের সামনে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলাকালে আওয়ামী লীগ কর্মীরা মুজাহিদুল ইসলাম নামে এক শিবির নেতাকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে।...'

'সমাবেশের শেষের দিকে বিকেল পৌনে ৫টায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা আবারও বায়তুল মোকাররম এলাকায় দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় আওয়ামী লীগের দিক থেকে বিরতিহীনভাবে গুলি ও বোমাবর্ষণ শুরু হয়। জামায়াত কর্মীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও লাঠি হাতে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। এ সময় গুলি ও ইটপাটকেলের আঘাতে জামায়াতের সামনে অবস্থানকারীরা একের পর এর আহত হতে থাকেন'।

পল্টন ও বায়তুল মোকাররম এলাকায় আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় বেলা সোয়া ১১টার দিকে। '...পল্টন ময়দান দখল নেয়াকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু



icsbook.info

এভিনিউ এলাকায় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরুর কিছুক্ষণ পরই আওয়ামীলীগ পল্টনের দিকেও অগ্রসর হতে থাকে। সকাল থেকেই জামায়াত দৈনিক বাংলা মোড় থেকে শুরু করে পল্টন মোড় পর্যন্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। আওয়ামী লীগ কর্মীরা পল্টন মোড়ে এসেই ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে জামায়াত কর্মীদের ধাওয়া করে। জামায়াত কর্মীরা পল্টন মোড় থেকে পিছু হটে আযাদ প্রোডাক্টস পর্যন্ত চলে আসে। জামায়াত কর্মীরা সংগঠিত হয়ে পাল্টা ধাওয়া দিলে আওয়ামী লীগের দিক থেকে ৫ রাউন্ড গুলি বর্ষিত হয়। এ সময় জামায়াতের কয়েকজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ক্লিনিকে নেয়ার পথে তাদের মধ্যে দুজন মারা যান।

'...বিকেল ৩টার দিকে ধাওয়া চলাকালে আওয়ামী লীগ কর্মীরা পল্টন মসজিদের গলির ভেতর ঢুকে শিবির নেতা মুজাহিদুল ইসলামকে ধরে নিয়ে হোটেল কস্তুরীর সামনে এনে বেদম পেটাতে থাকে। প্রায় ১০ মিনিট পর্যন্ত রাস্তায় ফেলে তাকে নির্মমভাবে শত শত কর্মী লাথি, কিল ও ঘুষি দিতে থাকে। রক্তে তার সমগ্র শরীর ভেসে যায়। এক পর্যায়ে তার মৃত্যু ঘটলেও সাপ পেটানোর মতো পিটিয়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে আওয়ামী লীগ কর্মীরা। মৃত্যু নিশ্চিত করে তাদের পারস্পরিক করমর্দন ও চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা যায়।'

এসব উদ্ধৃতি থেকে যে বিবরণ পাওয়া যায় আমাদের চোখে দেখা ঘটনা ও ভিডিও ফুটেজের সাথে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায় । কারণ, জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ ছিল বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে যা পল্টন সংলগ্ন। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণও হয়েছে ঐ এলাকায়। পক্ষান্তরে, আওয়ামী লীগের সমাবেশ ছিল মুক্তাঙ্গণে। সেখানে যদি মারামারিটা হতো তাহলে বলা যেত যে জামায়াত আওয়ামী লীগের সমাবেশে হামলা করেছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। পবিত্র কুরআনের সুরা ইউসুফে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.) এর চরিত্র হনন করে জুলায়খার আনা মিথ্যা অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যে কৌশল গ্রহণের পরামর্শ তার এক জ্ঞাতিভাই দিয়েছিল আমরা এখানে সেই কৌশলটাই প্রয়োগ করলাম। সেখানে বলা হয়েছিল, জমা যদি সামনে দিক থেকে ছেঁড়া হয় তবে ইউসুফ মিথ্যা বলেছে এবং জুলায়খা সত্যবাদি আর জামা যদি পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয় তবে ইউসুফ নির্দোষ এবং জুলেখা মিথ্যাবাদি। আমরাও বলছি মারামারিটা যদি আওয়ামী লীগের সভাস্থলে হতো তাহলে জামায়াত দোষী হতো। যেহেতু মারামারিটা জামায়াতের সভাস্থলে হয়েছে তাই আক্রমণের দায় দায়িত্ব আওয়ামী লীগের উপরই বর্তায়।

কি মেসেজ পেলাম আমরা এই রাজনৈতিক মহা দুর্যোগ থেকে? বার্তাগুলি খুবই পরিস্কার। এদেশে ইসলামী সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন যারা দেখেন এবং এজন্য সময় ও শ্রম দান করেন তাদের নিজেদের আত্মবিশ্লেষণের পাশাপাশি এই মহা দুর্যোগের মধ্য দিয়ে উঠে আসা সত্যগুলি সারাক্ষণ মাথায় রাখতে হবে যাতে সমাজ পরিবর্তনের বাস্তবসম্মত নীতি ও কৌশল প্রণয়নে তা সহায়ক হতে পারে।

প্রথমত:এ দেশটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সত্যিকার শোষণহীন ইসলামী সমাজ নির্মাণের পথে এখানে প্রতিবন্ধকতা মোটেই উপেক্ষা করার মত নয়। এই



icsbook.info

প্রতিবন্ধকতা ঠাট্টা, বিদ্রুপ, অপবাদ, শারীরিক নির্যাতনের সীমানা ছাড়িয়ে পঙ্গুত্ব ও হত্যা পর্যন্ত বিস্তৃত।

দ্বিতীয়তঃ এদেশের সরকারি প্রশাসন বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত বাহিনী ইসলামী শক্তির জন্য নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি নয়। ফলে নিরাপত্তার জন্য সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকার পরিবর্তে সর্বস্তরের জনতাকে নিজেদের নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসাবে গড়ে তুলতে পারার মধ্যেই আগামী দিনের ইসলামী শক্তির সাফল্য নিহিত।

তৃতীয়তঃ বিশেষ করে দায়িত্বশীল ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া গড়ে তুলতে না পারলে বরাবরের মতই ইসলামী শক্তিকে অপরাধ না করেও মিডিয়ার স্বেচ্ছাচারিতায় অপরাধী হিসেবে পরিগণিত হতে হবে।

চতুর্থতঃরাজনৈতিক আধিপত্য অর্জনের লড়াইয়ের চেয়ে সমাজ সংস্কার ও মানব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, মানবিক ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী।

পঞ্চমতঃ প্রচলিত ধারার চর দখলের রাজনীতি ইসলামী দলের জন্য স্থায়ীভাবে গ্রহণযোগ্য কোন সমাধান নয়। ইসলামী দলগুলি সাধারণ জনগণের কাছে প্রচলিত ঘুণে ধরা পেশী শক্তি ও কালো টাকা নির্ভর রাজনীতির সাথে ইসলামী সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার (জিহাদ) পার্থক্য কথায় ও কাজে যত বেশি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারবেন ততই তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা বাড়বে।

---

*লেখক : চেয়ারম্যান- ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*



icsbook.info

# গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে ফ্যাসিবাদ

প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৮ অক্টোবর '০৬ একটি ভয়াল দিন। অমানিশার দিন, কালো দিন। এদিনে এদেশের মানুষ ও বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে রাজধানী শহর ঢাকার জিরো পয়েন্টের সন্নিকটস্থ এলাকায় একটি রাজনৈতিক দলের পূর্বঘোষিত সমাবেশে অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র হামলা। প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে এ ভয়াবহ, নিষ্ঠুর ও বর্বরতম হামলায় উভয় পক্ষের পাঁচজন বনি আদম অকুস্থলেই প্রাণ হারান। আহত হয় পাঁচ শতাধিক মানুষ। এ যেন এক রণক্ষেত্র মানুষ মারার মহোৎসব। একদল তরতাজা যুবককে এসময় ঘাতক দল হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তার মৃত নিথর দেহের উপর চড়ে নৃত্য করে একদল মানুষ! এই ছবি টেলিভিশনের পর্দায় দেখে দেশবাসীসহ বিশ্ববাসী হয়েছে হতবাক বিমূঢ়। প্রশ্ন জেগেছে, আমরা কি আইয়ামে জাহেলিয়াত কিংবা অন্ধকার যুগে বাস করছি? এদেশে কি চলছে বন কিংবা জলের আইন? যেখানে শক্তিমান দুর্বলকে নিধন করেই বেঁচে থাকে। মানুষের জীবন কি লেভিয়াবান গ্রন্থে টামাস হবস বর্ণিত নিঃস্ব, দরিদ্র, কলঙ্কময়,বর্বর ও সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে? রাষ্ট্রের কি কার্যকারিতা নেই? এদেশে কি আবার ফ্যাসিবাদ কায়েম হতে চলেছে?

আমরা জানি, ১৯৯৬ সালে ঐক্যমত্য ভিত্তিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও অন্তবর্তীকালীন এ সরকারের সহযোগিতায় নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠন করে। এরই ধারাবহিকতায় সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতে যথাক্রমেবাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন



icsbook.info

চার দলীয় জোট ক্ষমতাসীন হয়। ২০০৬ সালে আর একটি সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের একটি বড় দল আওয়ামী লীগ কর্তৃক চারদলীয় জোট সরকারের শাসনামলের মাঝামাঝি সময় থেকে সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের নিমিত্তে বিভিন্ন দাবী উত্থাপন করা হয়। ২০০৪ সালে জোট সরকার কর্তৃক বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে সংবিধান সংশোধনের ফলে আওয়ামী লীগ ও তার সমমনা দলগুলো দাবি তোলে যে, বিচারপতি কে.এম হাসানকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নিযুক্ত করার অসৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এটি করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ ও নিরপেক্ষতা নিয়েও আপত্তি তোলে আওয়ামী লীগ। সংবিধান বর্ণিত পথ অনুসরণের পরিবর্তে এই দল ও তাদের জোট নিজেদের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান এবং সবার নিকট গ্রহণযোগ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের দাবি জানায়। এই দল ও জোট থেকে ক্রমান্বয়েআসতে থাকে ধর্মঘট, হরতাল ও অবরোধের মতো চরম রাজনৈতিক অরাজনৈতিক কর্মসূচি।

২৭ অক্টোবর '০৬ তারিখ ছিল চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দিন। আর ২৮ অক্টোবর সৃষ্টি করা হয় বিভিষীকাময় সেই পরিস্থিতি যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় রাজনীতিতে দেখা দেয় চরম অনিশ্চয়তা। এদিন থেকে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল দেশব্যাপী লাগাতার হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঢাকা দখলের অংশ হিসেবে পল্টন ময়দান কব্জা করে সেখানে তারা সারাদিনের কর্মসূচি দেয়। এর আগেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রীসহ ১৪ দলের নেতা কর্মীরা লগি-বৈঠা হাতে তাদের কর্মীদেরকে রাজপথ দখলে নেওয়ার আহবান জানায়। ১৪ দল সমর্থিত একটি দৈনিক পত্রিকা ২৮ অক্টোবর যে সম্পাদকীয় লিখে তার শিরোনাম ছিল "লাঠি-বৈঠা হাতে রাষ্ট্রপতির দিকে তাকিয়ে"। পত্রিকাটি ১৪ দলের দাবি মেনে নেয়ার জন্য প্রকারান্তরে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরের দিন অর্থাৎ ২৮ অক্টোবর '০৬ বিএনপি নয়াপল্টনস্থ তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের সামনে এবং জোটের অন্যতম শরীক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বায়তুল মোকারম মসজিদের উত্তর গেইটে তাদের বিদায়ী সমাবেশ আহবান করে। জামায়াতের এই সমাবেশেই হামলা চালিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মীরা এক নারকীয় ইতিহাসের জন্ম দেয়। ভয়াল সেই দিনের বিবরণ দেখা যাক একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে। পত্রিকাটি লিখেছে, রাজধানীর পল্টন মোড় ও বায়তুল মোকাররম এলাকায় গতকাল জামায়াতে ইসলামী ও ১৪ দল কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত: পাঁচ জন নিহত ও পাঁচ শতাধিক আহত হয়েছে। নিহতদের ২জন জামায়াত, ২জন শিবির ও অপর জন যুব মৈত্রীর কর্মী। বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা, সাত ঘন্টা ব্যাপী এ সংঘর্ষে ব্যাপক গুলি, বোমা ও ইট পাটকেল বর্ষণের ঘটনা ঘটে। এতে বিজয় নগর এলাকা থেকে শুরু করে পল্টন মোড় হয়ে বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেইট ফুট ওভারব্রিজ পর্যন্ত এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। চালানো হয় ধ্বংসযজ্ঞ। পুরো সময় জুড়ে পুলিশ ছিল নিরব দর্শকের ভূমিকায়।



icsbook.info

এতদসত্ত্বেও জামায়াতের কর্মীরা নিরাপত্তা ব্যূহ তৈরি করে বিকেল তিনটায় উত্তর গেইটে পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশ করে। জোট সরকারের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহানগর জামায়াত এ সমাবেশের আয়োজন করে।

দুপুর ১২টা থেকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা মুক্তাঙ্গনের দিকে থেকে জামায়াতের অবস্থানের দিকে গুলি বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে অগ্রসর হতে থাকে। এসময় গুলিবিদ্ধ হয়ে দুজন জামায়াত কর্মী মারা যান। বিকেল তিনটায় কস্তুরী হোটেলের সামনে সংঘটিত হয় সবচেয়ে বিভৎস ঘটনাটি। এপ্রসঙ্গে পূর্বোক্ত দৈনিকটি লিখেছে। "ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলাকালে আওয়ামী লীগ কর্মীরা পল্টন মসজিদের গলির ভেতর ঢুকে শিবির নেতা মুজাহিদুল ইসলামকে ধরে নিয়ে হোটেল কস্তুরীর সামনে এনে বেদম পেটাতে থাকে। প্রায় ১০ মিনিট পর্যন্ত তাকে রাস্তায় ফেলে থাকে নির্মমভাবে শতশত কর্মী লাথি, কিল ও ঘুষি চালাতে থাকে। রক্তে তার সমগ্র শরীর ভেসে যায়। এক পর্যায়ে তার মৃত্যু ঘটলেও সাপ পেটানোর মতো পিটিয়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা মৃত্যু নিশ্চিত করে তাদেরকে করমর্দন ও চিৎকার করে উল্লাস করতে দেখা যায়"। সারা দেশে বিভিন্ন সংঘর্ষে এই দিন প্রায় ২০ জন লোক মারা যায়।

আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ বিশেষত: কস্তুরী হোটেলের সামনের বিভৎসতা দেখে বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে ঢাকার অন্য একটি দৈনিক লিখেছে 'ঢাকার রাজনৈতিক কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা করার দৃশ্য আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিএনএন, এবিসি, এনবিসি, সিবিএসসহ বিভিন্ন মিডিয়াতে পিটিয়ে হত্যার এই দৃশ্যটি বারবার প্রদর্শিত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটির টাইমস স্কোয়ারে রয়টার হেড কোয়ার্টারের উপর স্থাপিত বিশাল টেলিভিশন স্ক্রিনে ওয়ার্ল্ড নিউজের শিরোনামে বাংলাদেশ ঘটনাবলীর মধ্যে ওই দৃশ্যটি প্রদর্শিত হয়েছে বারবার। আমেরিকানরা এঘটনার বিভৎসতা দেখে বিস্মিত হন। বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ঘটনাটি ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়। নিউ ইয়ার্কের বাংলাদেশী অনেকেই তাদের সন্তান সন্ততিরা যাতে জীবন্ত মানুষ মারার দৃশ্য না দেখে সেজন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখাই বন্ধ রেখেছিলেন'। তাই গোয়েবলসীয় কায়দায় হলুদ সাংবাদিকতার অনুসারী কয়েকটি পত্রিকা ২৮ অক্টোবরের ঘটনার দায়ভার জামায়াত ও বিএনপি কর্মীদের উপর চাপানোর চেষ্টা করেও সফল হয়নি। দিবালোকে সংঘটিত এ ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীরা ছাড়াও যান্ত্রিক গণমাধ্যমে সুবাদে দেশবাসীসহ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। সর্বোপরি, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে জামায়াত নির্ধারিত সমাবেশ স্থল কিংবা এর আশ পাশে। আওয়ামী লীগের সভাস্থল পল্টন ময়দান কিংবা তার পার্শ্বস্থ এলাকায় নয়। এটিই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কারা ছিল আক্রমণকারিএবং কারা আক্রান্তহয়েছে। ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর ঘটনাবলীর জন্য কারা প্রধানত দায়ী সেটি জাতি যান্ত্রিক গণমাধ্যমের সুবাদে সাথে সাথে জেনে যাওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪দলীয় জোট দেশে বিদেশে ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়।



icsbook.info

আওয়ামীলীগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জন্মলগ্ন থেকেই দলটি লোকপ্রিয়তা অর্জনের জন্য গণতন্ত্রের কথা বললেও পাশাপাশি পেশী-শক্তি নির্ভর রাজনীতিকে উৎসাহিত করেছে। মাওলানা ভাসানীসহ প্রায় সব জাতীয় নেতা এ দলটির হাতে বিভিন্ন সময় নিগৃহীত হয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এ দলটির পেশীনির্ভরতা আরো বেড়ে যায়। লালবাহিনী ও নীলবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনী গঠন করে তারা সরকারের সমান্তরাল আর একটি প্রশাসনও দাঁড় করায়। রক্ষী বাহিনীসহ এসব বাহিনীর হাতে জাসদসহ অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রায় ত্রিশ হাজার নেতা কর্মী প্রাণ হারায়। এক নেতা, এক দল, এক দেশ স্লোগান দিয়ে কার্যতঃ তারা সকল ধরণের ভিন্নমতকে রুদ্ধ করে দেয়। পর্যায়ক্রমে তাদের এ ফ্যাসিবাদী মনোভাব আরও বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীয় মাধ্যমে বাংলাদেশে এক দলীয় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে এতোদিন তারা যে গণতন্ত্রের মুখোশ পড়েছিল সেটিও পরিত্যাগ করে। এ প্রসঙ্গে বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা আবুল মাল আব্দুল মোহিত লিখেছেন, "১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনী সংবিধানে আমূল পরিবর্তন আনে। এতে সংসদীয় ব্যবস্থা পরিহার করে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। একই সংশোধনী একটি জাতীয় দল স্থাপনেরও ব্যবস্থা করে। কিছুদিনের মধ্যেই সর্ব ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি এক দলীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুর্যোগের সূচনা হলো এই সময় থেকেই। ষড়যন্ত্রে রাজনীতি ও সামরিক শাসনের উন্মেষ হয় এই সংশোধনীর সুযোগ নিয়ে। আইনগতভাবে যথেচ্ছ শাসনের বীজ বপন করা হয় পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে। চতুর্থ সংশোধনী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত আদর্শবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী (বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐক্যমত, ১৯৯১, পৃ: ১০৯)। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবুল ফজল হকের মন্তব্য নিম্নরূপ– "চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সংসদ, মন্ত্রীসভা, বিচার বিভাগ এবং দল সবই রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ হওয়ায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের মূল প্রস্তাবে পরিণত হন। কার্যত একজন মার্কিন রাষ্ট্রপতি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং সোভিয়েত কমিউনিটি পার্টির সচিবের সকল ক্ষমতা একত্রিভূত হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির হাতে (বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থাও রাজনীতি, ১৯৮৮, পৃঃ ১১৮)।"

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা যে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয় তাতে আমৃত্যু আওয়ামী লীগের তৎকালিন প্রধান রাষ্ট্রপতির পদে আসীন থাকতে পারতেন। নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ শাসন ব্যবস্থায় কখনও অবদান ঘটতোনা। বিচার বিভাগকে পরিপূর্ণভাবে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাসহ সকল মৌল মানবাধিকার হরণ করা হয়। এভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা চিরদিনের জন্য কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা করেছিল আওয়ামী লীগ। ...বিধি বাম, ১৯৭৫ সালেই এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্রুত ও নাটকীয় পরিবর্তনসমূহ ঘটতে থাকে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরে বাংলাদেশ আবার গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসে। ১৯৯১ সালে পুনরায় এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়, চালু হয় নতুন ও অভিনব বিশেষ ধরনের



icsbook.info

অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। ১৯৯৬ সালে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ২১ বছর পর পুনরায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সুযোগ পায়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় আলোকে দেখা যায় যে, দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকলেও আওয়ামী লীগের মৌল চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৯৬-২০০১ সালের আওয়ামী লীগ শাসনামলে বাংলাদেশে তাদের সন্ত্রাস ও জোর জবরদস্তির শাসন পুনরায় প্রত্যক্ষ করে। সালিশ মানলেও তালগাছটি আমার মানসিকতাধারি আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাতেও সবসময় ক্ষমতায় যাওয়া নিশ্চিত না দেখে এটিকেও সংস্কারের নামে অকার্যকর করার প্রস্তুতি নেয়। ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে উদ্ভব ঘটে ১/১১ এর পরিস্থিতির। বাংলাদেশ রাষ্ট্র, সরকার ও এদেশের গণতন্ত্র আবারও নতুন করে সংকটের আবর্তে পতিত হয়। যে গভীর সংকট থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমানে দেশপ্রেমিক জনগণ, অন্তবর্তীকালীন সরকার ও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা জানি, নির্বাচিত সরকার মাত্রই গণতান্ত্রিক সরকার নয়। জার্মানীতে হিটলারের দলও নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় গিয়ে নাৎসীবাদ কায়েম করেছিল। বাংলাদেশেরও সব নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়নি। আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র যথাসম্ভব দোষত্রুটিমুক্ত হবে। বাংলাদেশে আর কখনও ২৮ অক্টোবর '০৬ এর বর্বরোচিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। ১/১১ এর শিক্ষায় আলোকিত হয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলসমূহ ক্ষমতায় যাওয়া ও ধরে রাখার জন্য গণতান্ত্রিক পন্থা ব্যতীত অন্য কোন বিকল্প পন্থা অনুসরণের চিন্তা পরিত্যাগ করবে। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ মৌল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তথা পারস্পরিক সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করবে। একদল অপর দলের নীতি আদর্শের প্রতি সম্মান জানাবে। কারণ আধুনিক উদার গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের সেই সরকার, যার পেছনে সংখ্যালঘিষ্টেরও অনুমোদন থাকে। আর সংখ্যালঘিষ্টও স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যতীত পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তাও পরিত্যাগ করবে। আর সেটি হলেই গণতন্ত্রের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের যে দীর্ঘদিনের আবেগজনিত দুর্বলতা সেটির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শিত হবে।

---

*লেখক : প্রফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থকার, কলাম লেখক ও সংগঠক।*



icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর
# নব্য জাহেলিয়াতের জ্বলন্ত রূপ

মতিউর রহমান আকন্দ

ইসলাম মানব জাতিকে আলোকিত জীবন গড়ার শিক্ষা দেয়। ইসলামের সুমহান আদর্শ ব্যক্তিকে অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে টেনে নিয়ে আসে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলাম পূর্বযুগে আরবজাতি জাহেলিয়াতের পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় এমন কোনো অপকর্ম নেই যা তারা করেনি। বিবাদ, বিসংবাদ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, লড়াই, অপহরণ, ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, জানমালের উপর অকথ্য নির্যাতন, হত্যা খুন, পৈশাচিক কায়দায় মানুষের উপর নিপীড়ন হেন কাজ নেই যা তারা করতোনা। নিজ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা তাদের স্বাভাবিক কাজ ছিল। মায়ামমতা ভালোবাসা পরোপকারিতা তাদের কাছে ছিল অতি তুচ্ছ বিষয়।

জাহেলিয়াতের মূল পরিচয় হলো এটি অকল্যাণ' অন্ধকার, ধ্বংসশীলা, জাহেলিয়াতের বন্ধনে আবদ্ধ যার জীবন। ন্যায়, অন্যায়, বৈধ, অবৈধ, ভালো-মন্দ, দয়া, নিষ্ঠুরতার কোনো প্রশ্ন তার মনে জাগ্রত হতে পারে না। জাহেলিয়াত নানাভাবে তার ভয়ংকর রূপের প্রকাশ ঘটায়। মাস্তানি প্রতারণা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, ওয়াদাভঙ্গ, হত্যা, লুণ্ঠণ, সন্ত্রাস বলপ্রয়োগ, মিথ্যা বানোয়াট, অপবাদ, জাহেলিয়াতের স্বাভাবিক পন্থা। জাহেলিয়াত চায় ভোগ বিলাস লালসা চরিতার্থ করতে, চায় ক্ষমতা অধিপত্যের দাপট। জাহেলিয়াত মুক্তি ক্ষমা নৈতিকতার পরোয়া করে না, মানবিকতার ধার ধারে না। জাহেলিয়াত নানা ভাবে তার বিভৎস রূপের প্রকাশ ঘটায়। বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন থেকে জাহেলিয়াত ভয়ঙ্কর রূপ বুঝা যায়। হযরত বেলাল (রা.), খাব্বাব (রা.), আয়েশা (রা.)-এর জাহেলিয়াতের নির্মমতার শিকার হয়ে যে করুণ পরিণতি বরণ করেছিলেন তা থেকেই জাহেলিয়াতের আসল রূপ উপলব্ধি করা যায়।



icsbook.info

জাহেলিয়াতের পরিচয় পাওয়া যায় কারবালার রোমহর্ষক ঘটনা থেকে। নবী পরিবারের সদস্যদেরকে যেভাবে ফোরাত নদীর তীরে নানা ধরনের কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করবে।

জাহেলিয়াত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করে থাকে। তবে জাহেলিয়াতের পরিণতি হলো তাকে পরাজয় ও পরাভূত হতেই হবে ইসলামের সুমহান আদর্শের নিকট। জাহেলিয়াত বার বার পরাজিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও পরাজিত হতে বাধ্য।

## ২৮ অক্টোবর ছিল জাহেলিয়াতের নবরূপ প্রকাশের এক ঐতিহাসিক দিবস

আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের হিংস্রতা বর্বরতা, বদরযুদ্ধে হযরত হামজার কালিজা চিবিয়ে খাওয়ার পৈশাচিকতা, কারবালার মরুপ্রান্তরে নবী পরিবারের সদস্যদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করার মর্মান্তিক ঘটনা, মানুষের হৃদয়কে যেমন যুগ যুগ ধরে আন্দোলিত করবে তেমনি ২৮ অক্টোবর পল্টন মোড়ে লগি-বৈঠা দিয়ে মানুষ হত্যা করে মৃত লাশের উপর নৃত্য করার দৃশ্য যে কোন বিবেকবান মানুষকে আহত করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৮ অক্টোবরের পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় জাহেলিয়াতের চরিত্রের কোনো ব্যতিক্রম নেই, এরা সর্বদাই নির্দয় নিষ্ঠুর।

জাহেলিয়াতের এ নিষ্ঠুরতার ছোবল নবী করিম (সা.) ও তার সাহাবীদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। রাসূল (সা.) এর পবিত্র শরীর থেকে রক্ত ঝরেছে, তায়েফ হোনায়েন, বদর, ওহুদ, খন্দকের রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে জাহেলিয়াত পরাজয় বরণ করেছে আর ইসলামের বিজয় হয়েছে।

বাংলাদেশে জাহেলিয়াতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয় যারা আবির্ভূত তারা চেয়েছিলে ২৮ অক্টোবর পল্টন মোড়ে ইসলামী আন্দোলনকে উৎখাত করে দেবে। তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। জাহেলিয়াতের এ সহিংস্রতার মোকাবেলায় সেদিন তরুণরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা স্মরণ করিয়ে দেয় দুনিয়ার কোন শক্তি এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারবে না।

মনে পড়ে শিপন ও মাসুমের কথা, যারা ২৮ অক্টোবরের নির্মম ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেছে। শিপন ও মাসুমের সাথে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। একইসাথে একই এলাকায় তারা বড় হয়েছে। তাদের বাল্যকাল কেটেছে হাসি আনন্দের মধ্য দিয়ে। তারা উভয়েই ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী ছিল। ২৮ অক্টোবর ওরা সহপাঠীসহ যখন বাসা থেকে বের হয়ে আসছিল তখন তাদের আব্বা-আম্মা ভাবছিলেন নিত্যদিনের মতো কাজ শেষে তারা আবার নিজ নিজ বাসায় ফেরত আসবে।

শিপন প্রস্তুতি নিয়ে মাসুমদের বাসায় এসেছিল, একসাথে পল্টনে যাওয়ার জন্য। তখন কারো সকালের নাস্তা হয়নি। মাসুমের মা তাদেরকে জোর করে সিদ্ধ ডিম খাইয়ে দিয়েছিল, আর এটাই ছিল তাদের জীবনের শেষ খাবার।

ওদের সাথে পাড়ার অনেক কম বয়সী ছেলেরাও পল্টনে এসেছিল লগি-বৈঠাধারিদের



icsbook.info

প্রচন্ড আক্রমণের মোকাবেলায়। যখন ভয়ানক পরিস্থিতি তখন শিপন ও মাসুম তাদের সাথে আসা ছোট ছেলেদেরকে রিক্সায় উঠিয়ে দিয়ে বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু তারা আওয়ামী লীগের আক্রমণকারীদের মোকাবেলায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আমার চোখের সামনে সে দৃশ্য এখনো ভাসছে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার দৃশ্য সকলের সামনে লম্বা করে যে ছেলেটি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সে মাসুম এক পর্যায়ে আক্রমণকারীদের বলয়ের মাঝে পড়ে যায়। তার মাথায় ইটের আঘাত লাগায় সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চতুর্দিক থেকে তার উপর শুরু হয় নারকীয় তাণ্ডবতা। তাকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে, তখনও পল্টনে চলছে অব্যাহত আক্রমণ।হঠাৎ একটা মোবাইল ফোন পেলাম, খালু আমি মাহবুব বলছি– মাসুমের বড় ভাইয়ের কণ্ঠ।

অনেকটা ব্যস্ত কণ্ঠে বললাম, কী খবর বল? তোমরা কোথায়? সে জবাব দিল 'মাসুম ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে, তার অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে, জ্ঞান ফেরেনি, তাকে ইবনে সিনার আইসিইউতে নেয়া দরকার।

আমি ফোনে কর্তব্যরত ডাক্তারকে অনুরোধ জানালাম ব্যবস্থা নিতে, ব্রেনে আঘাত তার অবস্থা আশংকাজনক সব জেনেও বড় ভাই দৃঢ় স্থির কণ্ঠে বলছে, 'খালু আপনি চিন্তা করবেন না আমি সাথে আছি' আল্লাহ হাফেজ।

পল্টনের রাজপথে দাঁড়িয়ে যখন আওয়ামী লীগের পৈশাচিকতার মোকাবেলা করছি তখন একে একে আমার চোখের সামনে মাসুমের অতীতের দিনগুলো ভেসে উঠছিল।

এইতো মাত্র দুদিন আগে ঈদের পরদিন আমার শ্বশুরালয়ে তার সাথে দেখা। সে নিজ থেকেই ঈদের কোলাকুলি সেরে নিতে এগিয়ে এলো। তার চেহারায় উজ্জ্বলতা পূর্বের চেয়ে অনেক বেড়েছে। অতীতের মতো সেদিনও সে বারবার বলছিল– খালু দু'একজন শহীদের ঘটনা বলেন।

তার সে আবেদনের মাঝে যে হৃদয়ে নিংড়ানো অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছিল তা আজও আমার হৃদয়ে দেদীপ্যমান, এসব ভাবনার মাঝেই ফোন এলো, ডাক্তার বলেছে– তার ব্যাপারটা অনিশ্চিত। এসময় শিপনের বাড়ি থেকে খবর এলো সে এখনো বাড়ি পৌঁছেনি। তার বড় ভাই দেখতে দেখতে মেডিক্যালের মর্গে চলে যায়। সেখানে শিপনের মরদেহ সনাক্ত করে সে। পিতামাতার প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শিপন ফেরে কাফনের কাপড় পরে। এর ৫ দিন পর দুনিয়ার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হয় মাসুম। দুজনকে একই গোরস্থানে পাশাপাশি কবর দেয়া হয়। বাল্যজীবনের সেই খেলার সাথী হিসেবে ওরা কেউ কাউকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারতো না, মনে হয় মহান রব তাদেরকে পাশাপাশি শয়নের ব্যবস্থা করে দুনিয়ায় উজ্জ্বল নমুনা রেখেছেন। মাসুমকে যখন কবরে নামানো হয় তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। কবরে তখন ঘোর অন্ধকার। মাসুমের লাশ কবরে নামানোর পর বলেছিলাম ওর কফিনের কাপড়টা একটু খুলে দাও, শেষ বারের মতো ওর চেহারাটা একটু দেখে নেই। কাফনের বাঁধন খুলতেই গোটা কবর অলোকিত হয়ে পড়লো দেখলাম মাসুমের চেহারা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। গোটা অন্ধকার



icsbook.info

কবরটি আলোয় ভরে উঠেছে, বেদনার মাঝে আনন্দে অন্তর ভরে উঠলো। এটাই শহীদের শাহাদাতের চিহ্ন। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত। মৃত মানুষের জন্য আলোর প্রয়োজন নেই, আলোর দরকার হয় জীবিতদের জন্য।

মাসুমতো মরেনি তাই তার আলোর প্রয়োজন আল্লাহ এভাবেই হয়তো শহীদদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করে থাকেন।

এর কিছুদিন পরে গিয়েছিলাম শহীদ শিপনের বাড়িতে। ওর মা বার বার বলছিল– 'আমি ভাবতেও পারিনা শিপন দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে। প্রতি রাতেই ভাবি এইতো শিপন দরজায় কাছে এসে বলছে মা দরজা খুলো, আমি এসেছি। এভাবেই রাত চলে যায়। তখন মনে হয় শিপনতো আর কোনো দিন আসবে না'।

২৮ অক্টোবর জাহেলিয়াতের হিংস্র থাবার ফাঁদে যাদের জীবন খসে গিয়েছে তারা আর কোনো দিন আসবে না, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী ৬টি লাশের বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীন বাংলাদেশের জমীনে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদিদের পরাজয় ঘটিয়ে দ্বীনের বিজয় দান করেছেন। এদেশের মানুষ নতুন করে চিনতে পেরেছে সত্য মিথ্যার দল কোনটি। বহু মানুষের বিবেকের দরজা খুলে গিয়েছে, অনেকের চেতনায় লেগেছে আঘাত, আওয়ামী লীগের শুধু মুখোশ উন্মোচিত হয়নি– তাদের পরাজয় ঘটেছে, পরাভূত হয়েছে তারা। লগি-বৈঠার আক্রমণের আলোচনা হয়েছে সারা বিশ্বে। শহীদের রক্তের বিনিময়ে সারা বিশ্বে দ্বীনের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের সহানুভূতি বেড়েছে, এ রক্তই একদিন নব্য জাহেলিয়াতের মূল্যোৎপাটন করবে।

---

*লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর ২০০৬
# একটি দুঃস্বপ্ন যেন!

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের

মানব জাতির ইতিহাসে সর্বাধিক রোমহর্ষক ঘটনা কোনটি ? এ প্রশ্নের জবাবে অনেকেই অনেক ঘটনার উল্লেখ করবেন ইতিহাস থেকে। আমরা সুদূর ইতিহাস থেকে ঘাটাঘাটি না করে বিগত ২০০৬ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। ৫ বৎসর পর ২৭ অক্টোবর ২০০৬ সংবিধানের বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী জোট সরকার দেশের প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ১৯৯১ সাল থেকে বিগত ১৬ বৎসর যাবত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এভাবেই এগুচ্ছিল। কিন্তু অক্টোবর ২০০৬ সালে জোট সরকারের বিদায়ের প্রাক্কালে এ ধারাবাহিকতার ছন্দপতন ঘটে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট ২৮ অক্টোবর '০৬ ঢাকাসহ সারা দেশে যে নারকীয় তান্ডবলীলা চালায় সভ্য সমাজে তার দৃষ্টান্ত বিরল। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় নেতাকর্মীদেরকে লগি-বৈঠা নিয়ে রাজপথ দখলের যে ঘৃণ্য নির্দেশ দেন এর ফলে সারা দেশে এক ভয়াবহ নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর নির্দেশ পেয়ে দলীয় নেতা কর্মীরা নিরীহ জনসাধারণসহ ৪ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের উপর উন্মত্ত হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হামলায় সেদিন ঢাকার রাজপথে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৭জন নেতাকর্মী শাহদাত বরণ করেন এবং শত শত নেতাকর্মী আহত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হন। রাজধানীতে আওয়ামী হায়নাদের এ বর্বরোচিত হামলা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে। সারা দুনিয়ার বিবেকবান মানুষ এ রোমহর্ষক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শিউরে ওঠে আর হামলাকারীদের ধিক্কার দেয়।



icsbook.info

ঢাকাসহ সারাদেশের ন্যায় সিলেটেও আওয়ামী দুর্বৃত্তরা নিরীহ জনসাধারণ, ব্যবসায়ী ও ৪ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের উপর বিনা উস্কানিতে লগি-বৈঠা নিয়ে হামলা চালায়। ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সকাল ১০টায় সিলেটের ঐতিহ্যবাহী কোর্টপয়েন্ট এলাকায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিটিং চলাকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের নগর সভাপতি ও সিটি মেয়রের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের সন্ত্রসীরা হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় মহানগর ছাত্রশিবির সভাপতি নুরুল ইসলাম বাবুলকে লগি-বৈঠা ও ইট দিয়ে মাথায় মারাত্মক ভাবে আঘাত করে। সন্ত্রাসীদের আঘাতে মেধাবী এই ছাত্রনেতা মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। তার অবস্থা জটিল হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ঢাকায় এ্যাপোলো হাসপাতালে জটিল অপারেশনের পর নূরুল ইসলাম বাবুল আশংকাজনক অবস্থা থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাকে বৎসর খানেক সময় পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিয়েছেন।

২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর মর্মান্তিক ঘটনাবলী আমাদের জাতীয় জীবনে বেদনাদায়ক ইতিহাস, এক দুঃস্বপ্ন বটে! সভ্য পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক পরিবেশে লগি-বৈঠা দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা অচিন্তনীয়, অবিশ্বাস্য। যারা এ ধরনের নির্দেশ দেন সভ্য সমাজে তাদের বসবাসের অধিকার নেই। এরা মানুষরূপী কোন হিংস্র প্রাণী। ২৮ অক্টোবরের হত্যাকান্ডের বিচার হবে এবং নির্দেশদাতাসহ দোষীদের যথাযোগ্য শাস্তি হবে এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। শাহাদাত বরণকারীদের আল্লাহ কবুল করুন এবং তাদের মর্যাদাকে আল্লাহ তায়ালা আরও বৃদ্ধি করুন, আমরা এ দোয়াই করছি। এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটুক, দেশ শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাক এ প্রত্যাশা ও কামনা আমাদের সকলের।

---

*লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# যে স্মৃতি বেদনা ও প্রেরণার

মজিবুর রহমান মন্‌জু

বহুদিন পর একটু অবসর পেয়ে সেদিন ঘর গোছানোর কাজে হাত দিয়েছিলাম। কাপড় রাখার ওয়ারড্রোব'টি পরিস্কার করতে গিয়ে শক্ত কাগজের একটি প্যাকেটের প্রতি দৃষ্টি আটকে গেল। খুলে দেখলাম খুব যত্ন করে প্যাকেটে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে আমার ২৮ অক্টোবরের স্মৃতি অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন চকলেট রংয়ের প্যান্ট। বুঝতে বাকি রইল না কাজটি কার।

৩ বছর পূর্বেকার একটি রাতের কথা মনে পড়লো, তখন প্রায় ১১টা। নির্জন রাতে রাজপথের কোল ঘেষে হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফিরছিলাম, সাথে সদ্য পরিচিতা একজন নারী, ২দিন পূর্বে যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। চলতে চলতে সাংগঠনিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা ও প্রশ্নোত্তর চলছিল, হচ্ছিল অনেক স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও প্রতিজ্ঞার কথা। হঠাৎ করেই আমি প্রশ্ন করলাম– আচ্ছা আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তুমি কি করবে? বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলেও কোন জবাব পেলাম না, বুঝলাম এ সরাসরি প্রশ্ন ঠিক হয়নি। পরক্ষণে কিছুটা সংশোধন করে বললাম, আচ্ছা তুমি কি শহীদের স্ত্রী হওয়া পছন্দ করবে না শহীদের মা? এবারো সহসা জবাব পেলাম না। পরিবেশটা আকস্মাৎ ভারী হয়ে গেল। আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না, ভাবনা থেকে উদ্ধার করলো সে নিজেই। ভারী অথচ দৃপ্ত কণ্ঠে বললো– প্রথমতঃ আমি নিজেই শহীদ হতে চাই আর দ্বিতীয়তঃ আমার চাওয়া শহীদের মা হওয়া, কোনভাবেই আমি শহীদের স্ত্রী হতে চাইনা। পরিবেশটা স্বাভাবিক করার জন্য আমি রাতের নির্জনতা ভেঙ্গে হে-হো করে হেসে উঠলাম।

## ২৮ অক্টোবরে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি

২৮ অক্টোবরের স্মৃতি কলম দিয়ে বর্ণনা করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু শিবিরের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক জীবন্ত শহীদ প্রিয়ভাই জাহেদুল ইসলামের পীড়াপীড়িতে এ কষ্টদায়ক কাজটিতে হাত দিতে আমাকে বাধ্য হতে হলো। যতদূর মনে পড়ে, আমার



icsbook.info

স্নেহময়ী মা'য়ের সাথে ঈদ শেষ করে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তানুযায়ী গতবছরের ২৭ অক্টোবর বিকেলে গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছালাম।

ঢাকায় পৌঁছাবার পর সকল ওয়ার্ড দায়িত্বশীলদের সাথে ফোনে কথা হলো পরদিনের বায়তুল মোকাররমের সমাবেশের প্রস্তুতি সম্পর্কে। বেশির ভাগ ভাইয়েরাই বলছিলেন, এখনো তাদের অধিকাংশ জনশক্তি বাড়ি থেকে ফেরেনি। উপস্থিতির যে টার্গেট তাদের দেয়া হয়েছে তা পূরণ করা খুবই কঠিন। থানা আমীর শ্রদ্ধাভাজন হেমায়েত ভাই উপস্থিতি নিয়ে খুব টেনশন করছিলেন, চারিদিক থেকে আওয়ামী লীগের মারমুখী প্রস্তুতির খবর তার কাছে আসছিলো। মহানগরী সংগঠন থেকে আমাদেরকে জানানো হলো দুপুর ২টার মধ্যে সকল জনশক্তি নিয়ে বায়তুল মোকাররম পৌঁছাতে হবে।

২৮ অক্টোবর সকালে ঘুম থেকে জাগতে গিয়ে পিঠে খুব ব্যথা অনুভব করলাম, নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াত শেষ করে আবার মোবাইল ফোন নিয়ে ওয়ার্ড দায়িত্বশীলদের সাথে কথা বলতে বসবো, ঠিক তখনই মহানগরী সেক্রেটারি হামিদ ভাইয়ের ফোন এলো। তিনি জানালেন পরিস্থিতি সুবিধার মনে হচ্ছেনা, কিছু দায়িত্বশীল ভাইসহ এখনই যাতে আমরা মহানগরী অফিসে চলে যাই। তাঁর নির্দেশ পেয়ে তৎক্ষণাৎ ধানমন্ডি থানার ৫১নং ওয়ার্ড সভাপতি এমদাদ ভাই ও ৪৯ (পশ্চিম) সভাপতি হান্নান ভাইকে ফোনে জানালাম তাঁরা যাতে ১০জন করে জনশক্তি নিয়ে সকাল ৭টার মধ্যে মহানগরী অফিসে পৌঁছে যান। থানা আমীর হেমায়েত ভাইকে জানিয়ে আমি সাথে সাথে পল্টন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

রাস্তায় নেমে ১০/১৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে রিক্সা ছাড়া আর কোন যান চোখে পড়লো না। রিক্সা ড্রাইভারেরা কেউই পল্টনের দিকে যেতে রাজি হলো না, টাকা বাড়িয়ে দেয়ার কথা বললে একজন ড্রাইভার বললো, স্যার জীবন বাঁচলে তো টাকার দাম, জীবনই যদি না থাকে টাকা দিয়ে কি হবে? বুঝতে পারলাম আজ সত্যি সত্যিই এক কঠিন দিন আমাদের জন্য।

দ্বিগুণ ভাড়ায় অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি রিক্সা ঠিক করলাম। পথে যেতে বিভিন্ন মোড় ও মহল্লায় লগি, বৈঠার ব্যাপক প্রস্তুতি লক্ষ্য করলাম। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না ঢাকার অন্যান্য থানা ও অঞ্চল থেকে আমাদের ভাইয়েরা বিভাবে বিকেলে সমাবেশে এসে পৌঁছবেন। তাছাড়া আওয়ামীলীগের যে, মারমুখি অবস্থান তাতে সমাবেশে আসার পথেই বিভিন্ন জায়গায় সংঘাত শুরু হয়ে যেতে পারে। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই পুরানা পল্টন এসে পৌঁছালাম।

কামারুজ্জামান ভাই, শ্রদ্ধেয় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগর পর্যায়ের অনেক নেতৃবৃন্দ মহানগরী অফিসে চলে এসেছেন। সবার সঙ্গে একসাথে নাস্তা সেরে ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সম্মুখে স্থাপিত মঞ্চ দেখতে গেলাম। পায়ের ব্যথায় আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। মঞ্চের আশেপাশে প্রায় তিনশতাধিক স্বেচ্ছাসেবক। এমদাদ ভাই, নূর মোহাম্মদ ভাইসহ আমাদের থানার জনশক্তিদের সাথে দেখা হল। সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল আমার প্রিয় দায়িত্বশীল হালিম ভাই আমাকে মঞ্চে ডেকে নিলেন, আমার শারীরিক অবস্থা দেখে বললেন– এখানে শুয়ে থাকুন, বেশি হাঁটাহাঁটির দরকার নেই। আমি মঞ্চে বেশিক্ষণ না থেকে শিবিরের কেন্দ্রীয় অফিসে চলে



icsbook.info

গেলাম। মহানগরী শিবিরের একজন দায়িত্বশীল আমাকে একটি ভলটারিন সাপোজিটরি এনে দিলেন। আমি একটা ডোজ নিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতির বিশ্রাম কক্ষে শুয়ে থাকলাম। সকাল সাড়ে ১০টায় ব্যথা অনেকটা উপশম হয়ে এলে কেন্দ্রীয় সভাপতির চেম্বারে পরিষদের অনেক ভাইসহ অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হলাম। সারাদেশ থেকে একের পর এক হামলা ও সংঘর্ষের খবর আসতে লাগলো। ভাই শফিকুল ইসলাম মাসুদ ফোনে সবাইকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন। পরিস্থিতি অনুধাবন করে কারোই বুঝতে বাকি রইলনা এক কঠিন পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পুরো দেশ।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলোনা। ঘড়িতে সম্ভাবত তখন সাড়ে ১০টা কি ১১টা। পল্টন মোড় থেকে ফোন এলো আওয়ামী লীগের একটি মিছিল বিজয় নগরের গলির মুখে আমাদের ভাইদের উপর হামলা করেছে। আমরা আর বসে থাকতে পারলামনা। সবাই দ্রুততার সাথে নিচে নামলাম। নিচে নেমেই দেখলাম কয়েকজন ভাই রক্তাক্ত অবস্থায় অফিসের দিকে আসছেন। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। রক্তে ভেসে যাওয়া একজন চিৎকার দিয়ে বলছিল– আমাদের ভাইয়েরা খালি হাতে অসহায়ভাবে মার খাচ্ছে। সামনে যতই এগুচ্ছিলাম– একের পর এক আহত ভাইদের দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

মনে হচ্ছে একদল মানুষের উপর দিয়ে যেন আকস্মাৎ রক্তঝড় বয়ে গেছে। তাই এদের সবার হাত, পা, মাথায় রক্তের আলপনা।

কয়েকজন আহত ভাই এসে বললো– পল্টন মোড়ের পূর্ব দিক থেকে এসে আওয়ামী লীগের বিশাল এক মিছিল আমাদের উপর আঘাত করেছে। উত্তর-দক্ষিণের রাস্তাও তাদের দখলে। মাথায় আর কোন কিছুই কাজ করছিলো না, যাদের মাথা আর বুক রক্তরাঙা তাদেরও যেন কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সবার সামনে শাহাদাতের মোহনীয় স্বপ্ন।

বাতিলের সাথে সরাসরি লড়াই করার সৌভাগ্য মহান আল্লাহ তার এ দুর্বল ও অক্ষম বান্দাকে বহুবার দিয়েছেন। নাগরিকত্ব লাভের পর অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রথম প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক ২৬ জুলাই ঘটনার একটি স্পটে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে চোখের সামনেই গুলীবিদ্ধ ভাইদের লুটিয়ে পড়া, রক্ত স্রোতে গড়াগড়ির দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল এটা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এটাই বাংলার বদর প্রান্তর। শাহাদাতের সৌভাগ্য সেদিনও খুব কাছ থেকে ফসকে গেছে। কিন্তু আজকের পল্টন ময়দানকে কি বলা যায়?

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য যে এটা অস্তিত্বের প্রশ্ন? আওয়ামী লীগের যে প্রস্তুতি ও মনোভাব, তাতে মনে হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে সারাদেশের ইসলামী আন্দোলন তারা নিশ্চিহ্ন করতে চায়। এগুলো ভাবতে গিয়ে শরীরের সমস্ত শিরদাড়ায় এক উষ্ণ স্রোত বয়ে যায়। আর ভাবনার মাঝে কখন যে পল্টনের ওভারব্রিজ পেরিয়ে বাসসের সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি বুঝতেই পারিনি। এ সময় কোন বোধ শক্তিই আর কাজ করছিলোনা। ইতোমধ্যে দু'একটি ইটের টুকরো পা এবং ডান বুকে এসে আঘাত করেছে। আমরা হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া বাকি প্রায় সবারই শরীর কোন না কোনভাবে আহত-রক্তাক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সেক্রেটারি ছোটভাই জোবায়েরের মাথা ফেটে অনবরত রক্ত ঝরছে, তবুও সে সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে



icsbook.info

নেতৃত্ব দিচ্ছিল। পল্টন মোড়ের সম্মুখভাগে এ-এক চরম অসম লড়াই, সামনে লগি, বৈঠা, রড, পাথর হাতে হাজার হাজার হায়েনার দল আর তার প্রতিকূলে সামান্য সংখ্যক সীমান্ত পাহারাদার। তাদের বেপরোয়া ইট বৃষ্টির মধ্যে প্রতি মুহূর্তে আমাদের ভাইয়েরা গুরুতর আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে। অন্যদিকে তিনদিক থেকেই তাদের লোকজন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে খবর পেয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদের কর্মী ভাইয়েরা যারা গুলিস্তান, রমনা, কাকরাইল এ সকল এলাকা দিয়ে আসছিলেন তারাও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে পথিমধ্যে হামলার শিকার হলেন অর্থাৎ শুধুমাত্র পেছনের মতিঝিল অঞ্চল ছাড়া আর সব পথ আমাদের জন্য রুদ্ধ।

এভাবে কতক্ষণ পল্টন মোড়ের প্রতিরোধ ব্যূহ ধরে রাখা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রতিপক্ষ তোপখানা রোড, বিজয়নগর সড়ক ও মুক্তাঙ্গনের বিভিন্ন ভবন ও আড়ালে শেল্টার নিয়ে অনবরত তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। আর থেমে থেমে গুলির আওয়াজ কানে আসছিল। বি.এস.এস-ভবনের পশ্চিম পাশ্বে নতুনভাবে নির্মিতব্য একটি ভবনের যে টিনের ঘেরাও ছিল আমাদের কিছু ভাই কৌশল করে সেখানে লাঠি দিয়ে আঘাত করে করে বিকট শব্দ তৈরি করছিলেন, যা শুনে অগ্রসরমান আওয়ামী লাঠিয়ালরা বার বার ভয়ে পিছু হটে যাচ্ছিল। একদল শিবির কর্মী কিছু কাঠখড় যোগাড় করে মোড়ের মাঝামাঝি জায়গায় বুদ্ধি করে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন, এতেও কিছুটা সুবিধা হলো, সচিবালয়ের পেছন কোণায় পুলিশ বক্সে শেল্টার নিয়ে যারা আমাদের উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণকরছিল তারা সেখান থেকে সরে গেল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো– পুলিশের দল ফুটপাতের সাথে লেপ্টে থেকে ঢাল দিয়ে নিজেদের আড়াল করে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকলো। আমাদের এ কৌশল কতক্ষণ টিকবে সে উদ্বেগে মনটা বার বার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। হঠাৎ মাথায় চিন্তা এলো, ভালোভাবে একটা ধাওয়া দিয়ে তাদের শেল্টারগুলো দখল করতে পারলে ভালো হত।

সাথে সাথে কিছু ভাইকে বললাম বেশি করে ইট পাথর যোগাড় করুন, আমরা আকস্মাৎ একটি ধাওয়া দেব। ডান পার্শ্বে বিজয় নগরের যে টার্নিং সেখানে সিটি কর্পোরেশনের একটি লম্বা লোহার গ্রিল আছে। আমি সেটাকে টার্গেট করলাম। এগিয়ে গিয়ে সেখানে যদি অবস্থান নেয়া যায় তাহলে সামান্য জনশক্তি নিয়েও আমরা কৌশলগত প্রতিরোধ রচনা করতে পারবো। ভাবনা এবং লড়াই সবই আমাদেরকে একসাথে করতে হচ্ছে। সময় ক্ষেপন করার সুযোগ নেই। মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। পেছন থেকে ভাইয়েরা বেশ কিছু ইট পাথরের যোগান দিলেন। আমরা দু'হাতে, শার্ট-প্যান্টের পকেটে যতটুকু পারা যায় পাথর ভরে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ১৫/২০ জনের একটি দল সামনে অগ্রসর হলাম। লগি-বৈঠাধারিরা সংখ্যায় অনেক। প্রথমাবস্থায় তারা দমলোনা। তাদের অজস্র পাথর আমাদের কারো কারো শরীরে আঘাত হানলো। কিন্তু তবুও আমাদের অগ্রসরতা অব্যাহত রাখায় তারা পিছু হটতে শুরু করলো। দৌড়াতে দৌড়াতে তারা প্রায় প্রেসক্লাব পর্যন্ত পৌছে গেল, আমাদের পাথর ও প্রায় শেষ, দ্রুত



icsbook.info

শেল্টার নিতে হবে, তাই আমরা বেশি দূর এগুলাম না। আমাদের ভাইয়েরা কেউ কেউ চাইলেন আরো এগুতে, আমাদের এ দ্বিধা দেখে প্রেসক্লাবের সম্মুখস্থ রাস্তায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা আবার সংঘবদ্ধ হতে লাগলো। সেই মুহূর্তে হাইকোর্টের রাস্তা ধরে হাজার হাজার উচ্ছৃঙ্খল লাঠিয়ালদের এক হিংস্র মিছিল সেখানে এসে যোগ দিল এবং পাল্টা ধাওয়া করলো আমাদের। আমরা মাত্র কয়েকজন বিজয়নগরের রাস্তায় লোহার গ্রিলে শেল্টার নিলাম। বাকিরা ফিরে গেল আগের জায়গায়।

লোহার গ্রিলের শেল্টারে আমাদের সংখ্যা এবং প্রস্তুতি যে খুবই দুর্বল তা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেয়ে গেল হিংস্র প্রতিপক্ষ। চতুর্দিক থেকে ইট পাথরের বর্ষণের মাঝে আমরা অনেকটা ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম। যে কয়েকজন ভাই সাথে ছিল পাশ ফিরে দেখি তারাও নেই। এ অবস্থায় পিছু হটা কাপুরুষতা না কৌশল, আমি বুঝতে পারছি না। মনে মনে কলেমা শাহাদাত পড়ে নিলাম। হঠাৎ মনে হলো বাম পাশের গলিটার শেষ প্রান্তে আমাদের একটি গ্রুপ আছে, সেখানে পৌঁছাতে পারলে ঐ গ্রুপটাকে অগ্রসর করে এনে এদিক থেকে কিছুটা মোকাবিলা করা যেত, কিন্তু সেখানে পৌঁছানো কি সম্ভব?

লোহার গ্রিলের কারণে আমার প্রতি নিক্ষেপিত পাথরগুলো বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, নতুবা অনেক আগেই চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যেত সমস্ত শরীর। আমি জানি পাশের গলিতে পৌঁছানোর পর আমার পক্ষে আর অক্ষত থাকা সম্ভব নয় তবুও ধীরে ধীরে আমি গলিটার কাছে পৌঁছালাম। বাম পাশের রাস্তা ধরে এগুনোর সাথে সাথে পেছন থেকে একটি গ্রুপ আমাকে ধাওয়া শুরু করলো। আমার লক্ষ্য এখন পল্টন মসজিদের গলি। আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু মাঝামাঝি পৌঁছেই সামনে আরেক দলকে 'জামাত-জামাত ধর' বলে আমার দিকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। আমি একটুও থামলাম না, আল্লাহু আকবর শব্দ ছাড়া আমার মুখে আর কোন শব্দ বেরুলোনা। সামনে পেছনে লাঠি, লগি'র বেপরোয়া আঘাত আসতে থাকলো। আমি দু'হাত দিয়ে মাথা আড়াল করে টলতে টলতে দৌড়াতে লাগলাম, কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলাম না। ৫-১০গজ এগুতেই একজন সামনে থেকে সজোরে আমার হাঁটুতে বৈঠা দিয়ে আঘাত করলো। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। কিল, ঘুষি ও বেধড়ক আঘাতে আমি আর টিকতে পারলাম না, হাল ছেড়ে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম আমার লাশ এখানে পড়ে থাকলেও কেউ খবর পাবেনা। আমি অপেক্ষা করছিলাম আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের মহেন্দ্রক্ষণের জন্য। মুখে বললাম আল্লাহ তুমি কবুল করো।

মুহূর্তের জন্য ১০মাসের শিশু পুত্র আর শহীদের স্ত্রী হতে অস্বীকারকারীনি আমার স্ত্রী'র মুখচ্ছবিখানি এক ঝলক হৃদয় পটে ভেসে উঠলো। মহান আল্লাহর অপার রহমতের কাছে মা ও সন্তানকে সঁপে দেয়ার প্রত্যাশায় কষ্ট করে মাথা কাত করে রাব্বুল আলামিনের বিশাল আসমানের দিকে দৃষ্টি দিতেই লক্ষ্য করলাম শত্রুরা তাদের নির্দয় প্রহার থামিয়ে দিল। কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো– এ আমাদের লোক, মকবুল ভাইয়ের লোক, থেঁতলে যাওয়া ডান বাহু দিয়ে আমি মাথাকে আড়াল করে রেখেছিলাম, কিছুক্ষণের জন্য হাত পিঠ এবং পা যুগলে আর কোন আঘাত এলোনা। তীব্র ব্যথায় আড়ষ্ট মাথাটি তুলতেই দেখলাম সামনে পল্টন মসজিদের সম্মুখস্থ রাস্তা।

যারা আমার উপর হামলে পড়েছিলো তারা পল্টন মসজিদের সামনে অবস্থানরত



icsbook.info

আমাদের ভাইদের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে করতে দৌড়ে গেল, আমি আর বিলম্ব করলাম না শরীরের সকল শক্তি জড়ো করে কোনমতে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার দৌড় শুরু করলাম, কিন্তু তাদের ইট বৃষ্টির মধ্যে বেশি দূর এগুতে পারলাম না। উপর্যুপরি ইট ও লাঠির আঘাতে জাফরান হোটেলের সামনে এসে পড়ে গেলাম। দূরে তাদের আক্রমণ মোকাবিলাকারি শিবিরের মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি রফিকসহ আরো কয়েকজন ভাই আমাকে দেখে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে অঝোর ধারার ইট পাটকেলের মুখেও দৌড়ে আসলেন। তাদের বেপরোয়া ভাব দেখে উন্মত্ত হামলাকারীরা পিছু হটে গেল, রফিক আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো। অন্যান্যরা মুহূর্তেই পাজাঁকোলা করে আমাকে কোলে তুলে পূর্ব দিকের রাস্তার প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান একটি রিক্সায় উঠিয়ে শিবিরের কেন্দ্রীয় অফিসে নিয়ে এলো। অনেকে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠেন, জালিমদের হাত থেকে বেঁচে আসার জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন কেউ কেউ, কিন্তু আমি বুঝিনা এটা আমার প্রতি আল্লাহর রহমত না অসন্তুষ্টি।

মুজাহিদের মা'য়ের যে সৌভাগ্য হলো আমার মায়ের তা হলো না। শহীদ হাবিবুর রহমান ভাইয়ের স্ত্রী যে, গৌরবময় কুরবাণীর অধিকারী হলেন। আমার স্ত্রী তা থেকে বঞ্চিত হলেন। আমি আর শহীদ শিপন আহত হয়ে একই হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। শিপন সেখান থেকে প্রভুর দরবারে পৌঁছে গেল আর আমি ফিরে এলাম কন্টকময় পরীক্ষারস্থল পার্থিব জঞ্জালে।

২৮ অক্টোবরে আমাদের প্রস্তুতিগত দৈন্যতা ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের যে দুর্বলগত দিকগুলো ছিলো তা এখনো স্মরণে এলে কষ্ট পাই। হারিয়ে যাওয়া সাথীরা, তাদের ব্যথিত পরিবার এবং আহত কর্মীদের কথা ভাবলে নিজকে খুব অপরাধী মনে হয়।

প্রতিদিন অফিসে আসা- যাওয়ার সময় পল্টন মোড় এবং জাফরান হোটেলের সম্মুখস্থ রাস্তার স্মৃতি মনে পড়ে। এ স্মৃতি সত্যি সত্যিই বেদনার, কিন্তু যখনই প্রবল পরাক্রান্ত এক হিংস্র শক্তির মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের রক্তমাখা ভাইদের বীরদর্পে লড়াই চালিয়ে যাবার দৃশ্যটি মনে পড়ে, তখন হৃদয় মাঝে অসামান্য যোজন যোজন প্রেরণার সৃষ্টি হয়। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে তা বদর ওহুদের আবেগকে স্পর্শ করে। বদরের সাথীরা যেমন ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ও বরণীয়, ২৮ অক্টোবরের মুজাহিদগণও শ্যামল সবুজ বাংলায় তেমন চির অম্লান উন্নত শির হয়ে থাকবেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কবুল কর। তোমার বদরের জামিনকে প্রসারিত করে পল্টন মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত করে দাও। আমিন!

---

*লেখক: সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# রক্তের ঋণ শোধ হয় না

মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান

ঐতিহাসিক ২৮ অক্টোবর নিয়ে লিখার কথা ভেবেছি অনেকদিন, লিখার প্রস্তুতিও নিয়েছি কিন্তু কেন যেন লেখা হচ্ছিল না। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মন আমাকে বলতো, যাদের নিয়ে লিখা তারা তো আমারই সামনে থেকে চলে গেল এক সাফল্যমণ্ডিত ঈর্ষণীয় শান্তির নিড়ে। আমাদের সামনে তাদের ওপর যেভাবে দানবীয় কায়দায় আক্রমণ করা হলো তাদের জন্য আমরা কী করতে পেরেছি? শাহাদাতের পর তাদের ইচ্ছা ও আকুতিগুলো এখনো তো আমাদের কানে ভাসছে, আমরা কি পারছি এ বিরাট বোঝা বহন করতে? অথবা আমরা কি আসলেও ততটা যোগ্য সে কাজের, যে মহান দায়িত্ব ওরা চাপিয়ে দিয়ে গেল আমাদের কাঁধে।

এই তো প্রথম ঈদুল ফিতর উদযাপিত হলো তাদের শাহাদাতের পর। পরিবারগুলোয় কেমন যেন খাঁখাঁ করছে, সেই চিরচেনা থাকার ঘর, পড়ার টেবিল, ভোর বিহানে মাকে সালাম করে ঈদগাহে যাওয়া, বিকেল বেলা বন্ধুদের সাথে আনন্দ ভ্রমণ, ঈদের মাঠে কুরআন-হাদিস সমৃদ্ধ বক্তব্য উপস্থাপন– এসবই এখন স্মৃতি।

এত বেদনার পরও সেদিন ময়দানে শুরু থেকে শেষ অবধি থাকার সৌভাগ্য অর্জন করায় নজরে আসা কিছু বিষয় লিখার তাগিদ অনুভব করছি নেহায়েতই ইতিহাস সংরক্ষণের স্বার্থে।

সে দিনের লগি-বৈঠার হিংস্র প্রদর্শনী সকাল বেলায়ই আমাদের চোখে পড়ে। বেলা সাড়ে দশটার মত হবে, আমি কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমতি নিয়ে পল্টন মোড়ের অবস্থা জানার জন্য সেখানে চলে আসি। এসেই চারিপাশ দেখেই দিনের ভয়াবহতা বুঝতে বাকি থাকলো না। আমাদের কর্মী ভাইয়েরা মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আর বিজয়নগরের দিক থেকে ২০০ জনের মত লোক নিয়ে ১৪ দলের একটি মিছিল মুক্তাঙ্গনমুখি। মোড়ে এসেই বৈঠাগুলো আমাদের ভাইদের দিকে ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল। এই শুরু হলো মারামারি, এর পরের ঘটনা তো সকলেরই জানা। এরপর তো একপাশে মানবঢাল আর অপরপাশে গুলি, বোমা ও অস্ত্র, ছোরা এবং বৈঠার তাণ্ডব। একে একে মুজাহিদ, মাসুম, শিপন, জসিম (১), জসিম (২) এর শাহাদাতের নজরানা, অসংখ্য ভাইয়ের হাত, পা, চোখ, মাথা, সারা শরীর গুলির আঘাতে জর্জরিত, শুধু রক্ত আর রক্ত! কারবালা আমরা দেখিনি কিন্তু ২৮ অক্টোবরে পল্টনে হত্যাকাণ্ড দেখেছি, মানবতার সবচেয়ে পৈশাচিক আচরণ লাশের ওপর দানবীয় নর্তন দেখেছি, গণতন্ত্রের করুণ মৃত্যু দেখার সুযোগ হয়েছে ১৪ দলীয় তথা আওয়ামী কসাইদের হিংস্র আক্রমণের ফলে।



icsbook.info

আমাদের প্রিয় মুজাহিদের শাহাদাতের খবর কানে আসতেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ভাইয়ের নিকট পুলিশী সহায়তার কথা বলতে যাই। সেখানে গিয়ে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। চিৎকার করে কান্নাকাটি করে বলছিলাম, 'আমাদের ভাইদের মেরে ফেলা হচ্ছে। প্লিজ পুলিশের ব্যবস্থা করুন।' আমার তখন জানা ছিল না মুজাহিদ ভাই ততক্ষণে অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। আমাকে জোরে ধমক দিয়ে বলছিলেন, 'জাহিদ! নেতাদের ভেঙে পড়লে চলে না।'

এত স্বাভাবিকভাবে তিনি কথাটি আমাকে বললেন যে, পরবর্তীতে চিন্তা করে বিস্মিত হয়েছি। নিজের সন্তানের চেয়েও প্রিয় সংগঠনের শত শত কর্মীর আহত হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করা, তাদের যন্ত্রণা কাতর শব্দ কানে শেলের মতো বিদ্ধ হওয়ার পরও এত স্বাভাবিক একজন মানুষ কিভাবে থাকতে পারে! পরক্ষণে অবশ্য বুঝেছি, একেই বলে দায়িত্বশীলের দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও নেতার গুণ।

যথারীতি খবর দিয়ে দৌড়ে চলে যাই পল্টন মোড়ে, সেখানে গিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে জানাই যে, নোয়াখালী হোটেলের গলিতে দু'দিক থেকে আক্রমণের শিকার হয়েছেন আমাদের ১২-১৪ জনের একটি গ্রুপ। কেন্দ্রীয় সভাপতির নির্দেশক্রমে আরও ক'জন দায়িত্বশীল ভাইকে সাথে নিয়ে ওদিকে চলে যাই। সেখানে যাওয়ার পথে দেখতে পাই ওপর থেকে পাথর নিক্ষেপ আর আহত, রক্ত রঞ্জিত ভাইদের সারি। ওহ্! আর বর্ণনা করা যায় না। সত্যিই সেদিন আমাদের নেতৃবৃন্দ যদি দৃঢ় এবং স্বাভাবিক না থাকতে পারতেন, ঘটনা আরও ভয়াবহ হতে পারতো।

আমাদেরকে জানানো হলো– পূর্ব ঘোষিত সময়েই সমাবেশ শুরু হবে এবং আমীরে জামায়াতও যথারীতি বক্তব্য রাখবেন। স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি সতর্কাবস্থান গ্রহণ করার জন্য সকল জনশক্তিকে বলে দিয়েছি। এর আগেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, আমীরে জামায়াত সমাবেশে আসার সাথে সাথে ১৪ দলের সকল শক্তির সমন্বয়ে চূড়ান্ত আক্রমণচালানো হবে। এত রক্ত, আহত, শাহাদাতের সংবাদ শোনার পর তাদের চূড়ান্ত হামলার কথা জেনে আমরাও স্বাভাবিক একটি খবর হিসেবে নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে অটল দাঁড়িয়ে থাকলাম ময়দানে।

যেই কথা সেই কাজ। আমীরে জামায়াতও দাঁড়িয়েছেন। আর শুরু হলো পল্টন মোড় থেকে দ্রিম দ্রিম বোমা বিস্ফোরণ। সে কী শব্দ, আর ধোঁয়া। একটি বোমার ধোঁয়ায় এলাকা ভরে যায়, সেই ধোঁয়া মিলিয়ে যাওয়ার আগে কখনো সাথে সাথে আবার আরও একটি বোমা।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই বোমার বিকট শব্দে আমাদের জনশক্তি সন্ত্রস্ত না হয়ে সেই ধোঁয়ার মধ্যেই বোমাবাজদের ধরার জন্য দৌড়ে সামনে যাচ্ছিল।

ওদিকে আমীরে জামায়াত তার স্বভাবসুলভ দৃঢ়চিত্তে দরাজকণ্ঠে সকল প্রকার উত্তেজনাকর শব্দ পরিহার করে সাবলীলভাবে গঠনমূলক বক্তব্য প্রদান করে যাচ্ছিলেন।

যখন তিনি বক্তব্য রাখছেন ততক্ষণে সেই ভোর থেকে চলমান হামলার মোকাবেলা করতে তার হাতেগড়া বাগানের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি গোলাপ ঝরে গেছে এবং আমীরে জামায়াতের নিকট খবর ছিল যে, শিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল শাহাদতবরণ করেছে। আমীরে জামায়াত ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীলদের যে কী পরিমাণ ভালোবাসেন তা কোন সময়ের দায়িত্বশীলই শত চেষ্টার পরও ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না। আর কেন্দ্রীয় সভাপতি, সেক্রেটারি জেনারেলের কথা তো বলাই বাহুল্য। একজন দায়িত্বশীলের শাহাদাতের সংবাদ শোনার পরও উত্তেজিত না হয়ে, প্রতিহিংসাপরায়ণতা পরিহার করে, বেআইনিভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ না করে, আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার মন্ত্রে উজ্জীবিত না করে, দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির কথা, গণতন্ত্র ও সুশাসন



icsbook.info

প্রতিষ্ঠার আহবান, সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা আর নিরাপত্তার কথা বলা, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলা, সংবিধান ও স্বাধীনতা রক্ষার আহবান জানানো সত্যিই কঠিন। এটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় নেতার ভাষণ। পরবর্তীতে সিডিতে যারা দেখেছেন, তারাও নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দেবেন দেশপ্রেম কাকে বলে তা আমীরে জামায়াতের সেদিনের বক্তব্যে বোঝা গেছে।

এ হামলা যে আসলে কোন নির্দিষ্ট দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নয় বরং সামগ্রিকভাবে দেশকে আবার পরাধীন বা পুতুল রাষ্ট্রে পরিণত করার এবং ইসলামের পক্ষে কথা বলার কণ্ঠগুলোকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যই যে পরিচালনা করা হয়েছিল তা মনে হয় আজকে সচেতন পাঠকের নিকট নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

যুগে যুগে ইসলাম এবং ইসলামের পক্ষে কথা বলার লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিজহাতে যেভাবে হেফাজত করেছেন, সেদিনের পল্টন ময়দানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ইতিহাসের এমন জঘন্যতম একটি হত্যাকাণ্ডের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও হত্যাকারিদের নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানো– বিচারের বাণী নিভৃতে ক্রন্দনের মতোই। এসবের কারণে আমরা যারা শহীদদের উত্তরসূরি তারা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দাবি তুলতে পারি যে, অমীমাংসিত প্রশ্নগুলোর মীমাংসা অতীব জরুরি।

২৭ অক্টোবর রাতে পুলিশের আইজিপি ঘোষণা করেন আগামীকাল মাঠপর্যায়ের সকল পুলিশ সদস্য জিরো টলারেন্সে (কঠোর অবস্থানে) থাকবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এমন একটি চূড়ান্ত ঘোষণার পরও পুলিশ সদস্যবৃন্দ নিষ্ক্রীয় থেকে হামলাকারিদের পক্ষাবলম্বন কেন করলো? তাহলে আইজিপি'র উপরেও কি কোন নির্দেশ ছিল? অথবা আইজিপি'কে টপকিয়ে কোন নির্দেশ কি মাঠ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তার নিকট ছিল?

মালিবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক দুলালকে দীর্ঘ ৬ বছর পর যে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা গ্রেফতার করে দক্ষতার পরিচয় দিলেন, তারা কি মাত্র এক বছরের পুরনো সন্ত্রাসী, খুনিদের গ্রেফতার করতে পারবেন না? তাদের তৎপরতায় শহীদদের পরিবার ও সাথীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন না কেন?

ক'দিন আগেও আমাদের মাননীয় সেনাপ্রধান আমেরিকায় একটি সমাবেশে বলছেন যে, ২০০৬ সালে ঢাকায় যেভাবে রাস্তার ওপর মানুষ হত্যা করা হয়েছে, আমার লাইফে কোন মানুষ কেন, কোন পশুকেও এ রকম নৃশংসভাবে হত্যা করতে দেখিনি।

এই বক্তব্য নিহতের পরিবারের প্রতি অবশ্যই গভীর সমবেদনা জ্ঞাপক। কিন্তু এই শহীদ পরিবার কি সেনাপ্রধানের নিকট তাদের সন্তানদের হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রত্যাশা করতে পারেন না? এ কাজটি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আদৌ কি কোন কঠিন কাজ?

শহীদের মায়েদের বলছি, যাদের আমরা মা বলার সাহস করি, যে সন্তানটি জন্মেছিল আপনার জঠরে, সে এখন দেশের কোটি মায়ের প্রিয়তম সন্তান, যে সোনামণিটি আপনার ঘরকে আলোকিত করবে বলে ভেবেছিল, সে আজ উজ্জ্বল সূর্য হয়ে এ ভূখণ্ডের প্রতিটি ঘরের আঁধার বিতাড়ন করছে; যে সন্তানটি আপনার চক্ষু শীতল করতো সে আজ গোটা মানবতা ও মনুষত্বের জন্য শান্তির দূত হয়ে ফিরছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

আমাদেরও মা এখন আপনি। আমরা জানি না আমাদের মা ডাক আপনাকে সান্ত্বনা দেয় কি না। আপনার অযোগ্য সন্তানদের কারো চেহারায় আপনার নাড়ির টান অনুভব করেন কি না। তারপরও এ অধমের বিনীত অনুরোধ, আপনাকে মা বলে ডাকার অধিকারটুকু থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

---

*লেখক: সেক্রেটারিজেনারেল, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# শহীদের কাতারে এক বঞ্চিত মানুষ

মুহাম্মদ রেজাউল করিম

২৮ অক্টোবর ২০০৬। অন্যান্য দিনের মত একটি দিন। একটি মাস। একটি বছর। এই দিনটি ঐতিহাসিক স্মরণীয়, কিন্তু বরণীয় নয়। দিনটি জাতীয় জীবনে একটি কালো অধ্যায়ের সংযোজন। জাতি হিসেবে আমাদের ললাটে কলঙ্কের তিলক। যদি সুযোগ থাকতো তাহলে বলতাম– আটাশে অক্টোবর, তুমি আর আমাদের মাঝে এসো না। দিনটি হয়তো এক সময় পল্টন হত্যা দিবস, মানবাধিকার লঙ্ঘন, লগি-বৈঠার তান্ডব কিংবা আওয়ামী বর্বরতা দিবস হিসেবে পালিত হবে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে হিরোসিমা-নাগাসাকি, ২৫ মার্চ-এর কালো রাত্রি, এপ্রিল ফুল কিংবা হালাকু খান ও চেঙ্গীসীয় বর্বরতার কথায় আমাদের স্মৃতিতে যেমনি এক বিভৎস চিত্র ভেসে উঠে, নাড়া দেয় বিবেককে– ঠিক তেমনি শত বছর পরেও ২৮ অক্টোবরকে স্মরণ করলে শিউরে উঠবে মানুষের শরীর, বাকরুদ্ধ হবে বিবেক, কেঁদে উঠবে মন। অভিশপ্তদের ঘৃণা করবে বিশ্বমানবতা। ২৮ অক্টোবরও সেই রকম দিবস গুলোর-ই একটি।

**ঘটনার শুরু যেভাবে :** সকাল ১০টা। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সেক্রেটারিয়েট সদস্য ভাইদের আসতে বলেছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি। দু'একজন করে আসছেন। হঠাৎ গেইটের সামনে চিৎকার শুনা যাচ্ছে। বেরিয়ে দেখি রক্তাক্ত একজন ভাইকে রিক্সায় করে আনা হচ্ছে। রক্ত দিয়ে ঢেকে গেছে গোটা শরীর। তাকে যেন চেনাই অসাধ্য। কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ আমরা কয়েকজন অফিস থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখছি অনবরত আহত ও রক্তাক্ত ভাইয়েরা আসছেন। গ্রান্ড আজাদ হোটেলের সামনে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে করণীয় ঠিক করা হচ্ছে। সবাই যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কেন্দ্রীয় সভাপতি মোবাইলে কথা বলছেন। সেক্রেটারি জেনারেল ও পরিষদের কয়েকজন ভাইও আছেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে কিছুটা বিষন্ন ও যন্ত্রণার চাপ অনুভব করলাম। যা অতীতে আর কোনদিন লক্ষ্য করিনি। কারণ এ সাহসী অকুতোভয় অবিচল আল্লাহর দ্বীনের জিন্দাদীল সৈনিককে দেখার সুযোগ হয়েছিল



icsbook.info

অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম, নির্যাতন আর ১৫জন শহীদের জীবন্ত ময়দান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। একদিন নয়, দু'দিন নয়, দীর্ঘ প্রায় ৮টি বছর। বুঝতে আর বাকি নেই পরিস্থিতি ভালো নেই। এদিকে এ ৫মিনিট যেন কয়েক ঘন্টার মর্মবেদনা। আহত ভাইদের সারি আস্তে আস্তে দীর্ঘ হচ্ছে। আর সহ্য করা যায় না। কেন্দ্রীয় সভাপতির হাতের ইশারায় অনুমতি নিয়ে দৌড়াচ্ছি পল্টন মসজিদের গলির দিকে। এ দিক থেকে কয়েকজন ভাই ডাকছে আসেন আসেন। তখনও বুঝতে পারেনি সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মনজু ভাইও এখানে আহত। কে যেন বলে উঠল– আহ্! মনজু ভাইকে শেষ করে ফেলল। আল্লাহর দ্বীনের এই নির্যাতিত মানুষটির গায়ে আবারও ওরা আঘাত করেছে। তারা তাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা নিয়ে তার উপর লগি-বৈঠার চরম আঘাত চালিয়েছে। লাঠি-বৈঠার আঘাতে জর্জরিত করেছে সারাটি দেহ। এর আগেও তিনি এরকম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কয়েকবার। যে আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি এখনও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারছেন না। এ দৃশ্য দেখতে না দেখতে জড়িয়ে পড়লাম পরিস্থিতি মোকাবেলায়। এদিকে আমরা ৪০-৫০ জন ভাই, অপরদিকে প্রায় সামরিক সাজে সজ্জিত চার থেকে পাঁচ হাজার সন্ত্রাসী অস্ত্রশস্ত্র, লাগি-বৈঠা, বোতল, বোমা ইত্যাদি দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। এমন কোন অস্ত্র নেই যা তারা ব্যবহার করেনি। যে ইটগুলো তারা আমাদের দিকে মারছিল সেইগুলো তুলে আমরা আবার তাদের দিকে ছুঁড়ে মারছি। কিন্তু এ যেন আল্লাহর বাণী– "অমা কারু অমা কারাল্লাহ আল্লাহু খায়রুম মাকিরিন"–এরই বাস্তবায়ন। এভাবে সন্ত্রাসীদের মারণাস্ত্রের হামলা এই নিরীহ মানুষগুলো ৭ঘণ্টা মোকাবেলা করেছিল। ওরা এক ইঞ্চি জায়গা থেকেও সরাতে পারেনি আল্লাহর দ্বীনের গোলামদের। এ তো আল্লাহর দ্বীনের পথে এগিয়ে যাবার এক ঐতিহাসিক দিক-নির্দেশনা। বাতিলের বিরুদ্ধে এক চরমপত্র। ১৪ দলের গালে একটি চপেটাঘাত। এ যেন জীবন দেয়ার প্রতিযোগিতা। ঈমানদারদের জন্য এটি উত্তম নসিহত। আগামীর পথে এক দুরন্ত সাহস। আর ভাড়া করা সন্ত্রাসীদের জীবন বাঁচানোর প্রতিযোগিতা। আমাদের মুখে ছিল নারায়ে তাকবীরের স্লোগান আর তাদের মুখে অশালীন ও অসভ্য কথা। সে দিনের পল্টন যেন বদর, ওহুদ আর খন্দকের এক খণ্ডিত চিত্র। এ যেন আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য দেখার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহর ঘোষণাতো তাই– 'অ-কানা হাক্কান আলাই-না নাসরুল মুমেনীন'। 'মুমীনদেরকে সাহায্য করা আমার জন্য ওয়াজিব'। এক সময় আমি নিজেও মনে করতাম অস্ত্রের মোকাবেলায় অস্ত্র ছাড়া টিকে থাকা যায় না। কিন্তু সে ভুল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুধরে নিয়েছিলাম, বাকিটুকু পরিশুদ্ধ করেছি ২৮ অক্টোবরে। আল্লাহর প্রত্যক্ষ মদদের বাস্তব সাক্ষী। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে। কেউ কেউ আহত হচ্ছেন নতুন করে, দু'একজন করে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের সংখ্যা খুব বেশি বাড়ছে না। আমরা যখন কয়েক ঘণ্টা পার করে ফেললাম তখন আমাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। কারণ 'বিজয় তো সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়'। এই হিম্মতেই আমরা টিকে ছিলাম সেদিন। এই ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মাঝে ওরা চিৎকার করে বলল– এই তোদের লাশ নিয়ে যা। তখনও বুঝতে পারিনি তারা প্রিয় ভাই মুজাহিদকে মেরে গলির মধ্যে ফেলে রেখেছে। আবার হঠাৎ চিৎকার টুটুল ভাইকে মারছে। একথা শুনে উপস্থিত ভাইদের উদ্দেশ্যে বললাম– আপনাদের মধ্যে যারা জীবন



icsbook.info

থাকা পর্যন্ত পিছিয়ে আসবেন না তারা হাত তুলুন এবং সামনে আসুন। ১৫-২০ ভাই এগিয়ে আসল। এ যেন শাহাদাতের অমীয় সুধার অতৃপ্ত বাসনা। এ যেন বিদায়ের প্রস্তুতি। আমার এখন মনে হচ্ছে যারা সেদিন এগিয়ে এসেছিল তারা শহীদ না হলেও শাহাদাতের চেতনায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহর দরবারে বিবেচিত হবেন। 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি দিয়ে যখন আমরা এগুতে লাগলাম তাদের ৪-৫ হাজার লোক পেছনে যেতে লাগল। আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করলে তার সাহায্য অনিবার্য। এটাই তার প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোন মুমিন মুজাহিদের জিহাদের ময়দানে নারায়ে তাকবীর বাতিলের মনে চার হাজার লোকের তাকবির উচ্চারণ সমপরিমাণ ভীতি সৃষ্টি করে'। ২৮ অক্টোবর হাতেনাতে তার প্রমাণ পেয়েছি। সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি গলির ভেতরে পড়ে আছে আমাদের প্রিয় ভাই শহীদ মুজাহিদের লাশ। এ যেন শহীদ হজরত হামজার মিছিলের পথযাত্রী। ধবধবে সাদা এক জান্নাতী মানুষ। হায়েনারা তাকে হত্যার পর ফেলে রেখেছে। কয়েকজন মিলে ধরে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। এ যেন মুজাহিদের দারুণ বাসনার পরিসমাপ্তি। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খার বাস্তবায়ন। কিন্তু রক্ত পিপাসু আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলা লাশের উপরও থেমে থাকেনি। লাশের উপর তারা ছুঁড়ে মারছে ইট, পাথর, বোতল, লাঠি। ১৯৯৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির অবতারণা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এমএসসি'র শেষ বর্ষের ছাত্র শহীদ রবিউল ইসলাম এর লাশে সেদিন আগুন লাগিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রমৈত্রীর সন্ত্রাসীরা চিৎকার করে বলছিল – 'হে শিবির, তোদের খোদা আজ কোথায়, কে তোদের রক্ষা করবে?' সে দিন তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ ভাইয়েরা জীবন বাজি রেখে তার লাশ উদ্ধার করে শহীদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।

মূলত মন্‌জু ভাইয়ের আহত হওয়া আর মুজাহিদের শাহাদাতের ঘটনা ছিল একই সময়। যে মুজাহিদ শাহাদাতের পূর্বে তার ডায়েরিতে লিখেছিল 'আমার প্রিয় দায়িত্বশীল মজিবুর রহমান মন্‌জু ভাই'। হযরত তালহা (রা.) রাসূল করিম (সা.)কে রক্ষা করার জন্য একাই নিজের শরীরে অসংখ্য তীরকে বরণ করেছিলেন। আর সেই চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের প্রিয় ভাই শহীদ মুজাহিদও নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছিল তার প্রিয় দায়িত্বশীলকে রক্ষা করতে গিয়ে। আর হয়তো শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে চিৎকার করে বলেছিল 'আমি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছি কিন্তু আজ এখানেই বিদায়!' এ পর্যায়ে দীর্ঘ ৫ঘণ্টার পর একটি গুলি আমার বাম পায়ে আঘাত হানল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। গাড়ির চাকা পাংচার হওয়ার মত লুটিয়ে পড়লাম হাঁটুর উপর ভর করে। জাহিদ হোসেন ভুঁইয়া ভাই ও আব্দুল মান্নান ভাইসহ কয়েকজন কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। পায়ের যন্ত্রণায় যতটুকু না কাতর তার থেকে বেশি কষ্ট লাগছে এই ধন্য মানুষগুলোর কাতার থেকে এই অধমের বিদায়। তখন নিজেকে খুব স্বার্থপরই মনে হচ্ছিল। সবাই যখন জীবনবাজি রেখে ভূমিকা রাখছে তখন আমি চলে যাচ্ছি অন্যের কাঁধে ভর করে। আমাদের কর্মী ভাইয়েরা যখন শহীদ হয়ে জান্নাতের দিকে রওনা হয়েছে, আমি তখন যাচ্ছি হাসপাতালের দিকে। এইতো আমার কপাল! আল্লাহর পছন্দনীয় শহীদের তালিকায় আমার নাম লেখা ছিল না। আল্লাহ! এমন সুযোগ যদি আর জীবনে একটিবারও আসে আমাকে আর বঞ্চিত করো না, এ মিনতি তোমার কাছে।



icsbook.info

পল্টনের পথ ধরে এখানে হাঁটতে গেলে এখনো মনে হয় শহীদের রক্তের উপরে পা পড়ছে। এখনো আহাজারি ও আত্মচিৎকার যেন কানে ভেসে আসছে, যে স্মৃতি আমাকে আজো কাঁদায়। গুলিবিদ্ধ পা-টি ঝুলছে আর রক্ত ঝরছে। কষ্টের মধ্যেও নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলাম। অনেক ভাই পেরেশান হয়ে গেল এবং দলবেঁধে আমার সাথে আসতে লাগল। কিছুটা ধমকের সুরে বললাম, 'এতজন কোথায় যাচ্ছেন, পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন'। সেখানে দায়িত্বশীল হিসেবে আমি, জাহেদ হোসেন ভুঁইয়া ভাই এবং শেখ নেয়ামুল করিম ভাই ছিলাম।

আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। এ যেন আরেক কারবালা। শহীদি কাফেলার ভাইদের মাঝে কঠিন পরিস্থিতিতেও দারুণ শৃঙ্খলা। এখানেও ইয়ামামার যুদ্ধের সেই সাহাবীদের একে অপরকে অগ্রাধিকারের দৃষ্টান্ত। নিজেদের কষ্ট হচ্ছে, রক্ত ঝরছে তবুও ডাক্তারকে বলছে ঐ ভাইকে আগে চিকিৎসা করুন। এখানেও যেন দায়িত্বশীলকে শ্রদ্ধা করার উত্তম নমুনা প্রত্যক্ষ করছি। আমার গুলিবিদ্ধ ঝুলন্ত পা দেখে সবাই যেন পেরেশান। এ যেন বুন্-ইয়ানুম মারসুস-এর উত্তম দৃষ্টান্ত। আনসার মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের জীবন্ত দলিল। কারো মুখে নিজের জন্য কোন কথা নেই। সবাই অন্যের জন্য ব্যাকুল। উখ্ওয়াত এর চরম পরাকাষ্ঠা। সে দিনের দৃশ্যে আমার শরীর এখনো শিহরে উঠে। অনন্দাশ্রু বিসর্জিত মনে বলতে ইচ্ছে করে আল্লাহ তুমি আমাদের এমনই নেয়ামতের সাথে সম্পৃক্ত করেছো তুমি কতই না মেহেরবান।

যোহরের নামাজ আদায় করলাম অপারেশন থিয়েটারে। গুলিবিদ্ধ পা প্লাস্টার করা অবস্থায় নিজের অজান্তেই ভাইদের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। পায়ে প্লাস্টার করছেন ডাক্তাররা। এক্স-রে রিপোর্ট ঝুলানো, দেখা যাচ্ছে পায়ের হাড় দিখন্ডিত হয়ে গেছে। আমি ভয় পাব বলে কেউ কিছু বলতে চেয়েও বলছেন না। আমি বললাম, এই গুলিটি আমার জন্যই আল্লাহ পাক বরাদ্দ করেছিলেন। গুলিটি আমার পায়ের নামেই লেখা ছিল। ডাক্তাররা আমার কথা শোনে মৃদু হেসে বললেন, বিজয় আপনাদের জন্য নিশ্চিত। এ বিশ্বাস থাকতে হবে আল্লাহর দ্বীনের প্রতিটি সৈনিকের। আর এই বিশ্বাসের ইমারতের উপর যে আন্দোলন গড়ে উঠে তার উপর আঘাতের পর আঘাত আসলেও এ আন্দোলনকে কখনো স্তব্দ করা যাবে না।

আজ হয়ত কেউ কেউ বলেন, আমাদের প্রস্তুতির কথা। কিন্তু আমি অন্ততঃ ২৮ তারিখের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করি। কারণ দীর্ঘ ৭ঘন্টা যারা আমাদের সাথে মারামারি করেছে, কি তাদের পরিচয়? দলে তারা আওয়ামী লীগ। ১৪ দলের লোক মূলত তারা ভাড়াটে সন্ত্রাসী, টোকাই, গার্মেন্টস কর্মী আর পতিতালয়ের হিন্দারা। মুখে রুমাল, কোমরে মাফলার, খালি গায়ে মারামারিতে অংশ নিয়েছে ওরা। কিন্তু আমরা কেউ তো এরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। না হলে হয়তো সেদিন তাদের লাশও পড়তো। আর এ ধরণের সন্ত্রাসী-টোকাই আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া, নামাজী আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকদের লাশকে সবাই সমানভাবে মূল্যায়ন করতো। হিসাব হতো কাদের লাশ কয়টি। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সেভাবেই মূল্যায়ন করা হতো। আল্লাহ তায়ালা অন্তত সে কলঙ্কের হাত থেকে এ আন্দোলনকে রক্ষা করেছেন। বিশ্বের মানুষ চিনতে পেরেছে উগ্র ও জঙ্গি কারা। আল্লাহ যা করেন তার মধ্যেই এই আন্দোলনের কল্যাণ নিহিত।



icsbook.info

আল্লাহ বলেন– 'আর বিপদ কখনো আমার অনুমতি ব্যতিরেকে আসে না'। এটিই চিরন্তন সত্য। আমাদের কারো হিসাবে যা বিপদ, তা কেউ নিচ্ছেন আবার পরীক্ষা হিসাবে। কেউ নিচ্ছেন পরিশুদ্ধতা হিসেবে। আবার কেউ মনে করেন, এটিই আমাদের পাওনা। এটিই ইসলামী আন্দোলন। ১৯৮৯ সালের ১৮ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিবিদ্ধ হন রোজাদার শহীদ শফিকুল ইসলাম। হাসপাতালে সবাই চেষ্টা করছেন তাকে সুস্থ করে তুলতে। কিন্তু সেদিন শফিকুল ইসলামের শেষ আকুতি ছিল এরূপ– 'ভাই আমি গুলিবিদ্ধ হয়েছি ঠিক, কিন্তু শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা অনেক দিনের। সুতরাং আমাকে রোজাদার অবস্থায় শহীদ হওয়ার সুযোগটুকু করে দিন।' একথা বলতে বলতে তিনি শাহাদাতের অমিয়সুধা পান করেছেন। এই তো তার প্রস্তুতি। আমি নামাজ পড়ে এমন মৃত্যুর জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছি।

আমি জানি না ২৮ অক্টোবরের ঘটনা ১৪ দল কিভাবে পর্যালোচনা করছে। ২৮ অক্টোবরের ঘটনায় ১৪ দলীয় জোট কিংবা তৎকালীন ক্ষমতাসীনরা কে কতটুকু জড়িত তা এ মুহূর্তে পর্যালোচনা থেকে বড় বিষয় হচ্ছে ইতোমধ্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেকে তার লাভ-ক্ষতি সুদে-আসলে পেতে শুরু করেছেন।

আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রচলিত আইনে হয়তো প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের কেউ কিঞ্চিত শাস্তি পেতেও পারেন অথবা চিরদিনই আড়াল থেকে যাবে প্রকৃত সন্ত্রাসী কিংবা মদদদাতারা। এই দুনিয়ার আইনের মারপ্যাঁচে তাদের অনেকে হয়তো ছাড়া পেলেও আল্লাহর আদালতে রেহাই পাবে না। তিনি তো 'আহ্কামুল হাকেমীন'। সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

এ সকল জিজ্ঞাসা যখন প্রকট তখন সরকারের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে বিদেশ যেতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। প্রায় দেশের সকল পত্র পত্রিকায় 'আমিও মা' শিরোনামে শেখ হাসিনা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কলাম লিখলেন।

আমি নিজেও তা পড়ে আবেগাপ্লুত হয়েছিলাম। মা হিসাবে তার এই অনুভূতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। তিনি নিজের সন্তানের নিকট আমেরিকায় না যেতে পেরে মায়া-মমতার আতিশয্যার বহি:প্রকাশ যেভাবে করেছেন, ২৮ অক্টোবর তার প্রত্যক্ষ নির্দেশে সারা দেশে যে অসংখ্য মায়ের বুক খালি করলেন– একজন মা হিসেবে তার কাছে আদৌ তার কোন জবাব আছে কি? এই পৈশাচিক ও বর্বরোচিত হত্যার হুকুম দিয়ে শেখ হাসিনা আমাদের মা জাতিকে কলঙ্কিত করেছে।

কিন্তু হায়রে নিয়তি! তিনি নির্জন কারাগারের অন্ধকার প্রকষ্টে নিজের আত্মীয়-স্বজন ছাড়াই ঈদ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপমানিত' কবিতার বিখ্যাত দুটি পংক্তি শেখ হাসিনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সমান।'

এই তো গেল ঈদুল ফিতর। শহীদ মুজাহিদ, ফয়সাল, শিপন, মাসুম, রফিক তাদের রোজা পালন শেষে ঈদের দিনে মায়েদের সালাম করার কথা ছিল। সহপাঠীদের সাথে ঈদের জামায়াতে অংশগ্রহণ, আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত সবই হওয়ার কথা ছিল।



icsbook.info

কিন্তু এসবই যেন এখন কল্পনা। আর কোন দিন ফিরে আসবে না তারা আমাদের মাঝে।

শহীদ মুজাহিদের ছোট বোন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া মালিহার জিজ্ঞাসা– 'তোমরা কেন আমার প্রিয় ভাইয়াকে মেরে ফেলেছ, সে যে আমাকে কোলে তুলে আদর করত'।

শহীদ ফয়সালের ছোট ভাই চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া নাকিব আজ যেন নিথর ও নিস্তব্ধ। সে কেঁদে কেঁদে বলে উঠে– 'ভাইয়ার আদর কী আমি আর কোন দিন পাব না?' এসবই যেন এখন স্মৃতি।

অন্য সবার মতো তারা উপভোগ করতে পারেনি ঈদের আনন্দ। এটি একদিন অথবা দুদিনের নয়, পৃথিবী যতদিন থাকবে তাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন বয়ে বেড়াবেন স্বজন হারানোর বেদনার এই শোকের পাহাড়।

তাদের মায়েদের বিনিদ্র রজনীর চোখের পানি আর সন্তান হারানোর আর্তনাদ, ভাইহারা বোনের হাহাকার কোনদিন বৃথা যাবে না। আর হত্যাকারীদের দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জাহানেই করবেন অপমানিত, লাঞ্ছিত।

## কিন্তু ২৮ অক্টোবরকে কে কিভাবে দেখছেন?

হাসপাতালে শত শত দর্শনার্থী। দর্শনার্থীর ধাক্কায় রোগি কাবু কিন্তু করার কিছু নেই। এটি ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। এই পৃথিবীতে ভালোবাসা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলেই আমরা মানুষ। হাসপাতালে আহতদের অবর্ণনীয় অবস্থা দেখে কেউ কেউ বলতে থাকেন– আহ্! সেদিনের প্রস্তুতি আরেকটু ভালো হওয়া দরকার ছিল। এতগুলো ফুটফুটে ছেলে আমাদের ভুলের কারণে বিদায় নিল। আচ্ছা আপনারা জানতেন না এভাবে হামলা হবে? আবার কেউ কেউ বলছেন, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।

আওয়ামী লীগ আবার ৭২, ৭৪ এর বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। আবার কেউ কেউ এ খবরও দিচ্ছেন– অনেক আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ দল ছেড়ে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একজন অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ করে অচেতন হয়ে হাসপাতালের ফ্লোরে পড়ে মাথা ফাটিয়ে আরেক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। এ হচ্ছে মানবীয় পর্যালোচনার হিসাব নিকাশ। আর আল্লাহর হিসাব ভিন্ন।

আজ যদি বলা হয়, এই দুনিয়ার বিবেচনায় ২৮ অক্টোবর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কে? কেউ বলবে, শহীদ মুজাহিদ, মাসুম, শিপন, রফিক, ফয়সালের পরিবার। কিন্তু না। এটি আপনার হিসাব হতে পারে, তবে শহীদ পরিবারের অনুভূতি তো ভিন্ন। কিন্তু তা অবিশ্বাস্য।

শহীদ মুজাহিদের মা অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এভাবে– 'আমি এমন এক মা, যে মায়ের কাছে তার সন্তান সব সময় একটি দোয়া চাইতো, আর তা হলো– মা, তুমি দোয়া কর আমি যেন আল্লাহর পছন্দনীয় পথে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি। আর তাই যখন শুনলাম– আমার আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ, আমার নাড়িছেঁড়া ধন, আমার স্বপ্ন, আমার অতি আদরের মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছে তখন আমার অতৃপ্ত বাসনা পূরণ হওয়ার



icsbook.info

জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। নিজেকে বড় ভাগ্যবান এক মা মনে হয়েছিল। কারণ মৃত্যু মানুষের এক অবধারিত নিয়তি। আর সে মৃত্যু যদি হয় আল্লাহর নির্দেশিত পথে তবে তার চেয়ে সার্থক মৃত্যু আর কী হতে পারে বলো?'

শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপনের মায়ের ফরিয়াদ– 'আল্লাহর দরবারে আমার স্বপ্ন ছিল আমি শহীদের মা হবো, আল্লাহ যেন আমাকে একজন শহীদের মা হিসেবে কবুল করেন। শিপন সবসময় সত্যকে সত্য জানতো, মিথ্যাকে মিথ্যা জানতো।'

শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুমের গর্বিত মায়ের আহ্বান– 'আমার জীবনের আশা ছিল আমার ছেলে খালিদ বিন ওয়ালিদ হবে, উমর হবে, অসত্যকে পরাজিত করবে। সমাজের আদর্শ ছেলে হবে, নিষ্পাপ হবে। আমার ছেলে হাসান-হুসাইন এর মত হবে। সবসময় দোয়া করতাম সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তারা যেন গাজী কিংবা শহীদ হয়। সত্যি আমার প্রার্থনা আল্লাহপাক কবুল করেছেন। আমি মনে-প্রাণে সর্বদা আশা পোষণ করতাম মাসুম যেন ময়দানে সবার আগে থাকে। আল্লাহ পাক আমার দোয়া কবুল করেছেন। আমি আমার সাইফুল্লাহর রক্তের বিনিময়ে এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক এই প্রার্থনা সবসময় করি।'

শহীদ ফয়সলের গর্বিত মা অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন ঠিক এভাবে– যাদের কথা শুনেই মনে হয় তারা সত্যিই ইব্রাহিম (আ.) এর উত্তরসূরি। হযরত ইসমাইল (আ.)কে আল্লাহর পথে কুরবান করে ইব্রাহিম (আ.) যেভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ঠিক তেমনি তিনি বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ। আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ আমার এই সুশিক্ষিত বিনয়ী ভদ্র, শান্ত, অমায়িক ও সুন্দর আচরণবিশিষ্ট সন্তানকে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। আমার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।'

শহীদ রফিকুল ইসলামের পিতার চাওয়া– 'আমার ছেলে আল্লাহর দরবারে শহীদ হিসেবে কবুল হয়েছে বলে আমি মনে করি। কুড়িগ্রামবাসী সবাই তার জন্য কেঁদেছে। জীবনে সে কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়নি। সে সবসময় সৎসঙ্গে মিশত এবং দ্বীনের পথে মানুষকে ডাকত, এটাই তার একমাত্র অপরাধ।'

আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যাদের পিটিয়ে হত্যা করেছে, লাশের উপর নৃত্য ও উল্লাস করেছে, ভেঙ্গে দিয়েছে দাঁত, উপড়ে ফেলেছে চোখ। সন্ত্রাসীরা হয়তোবা ভাবতে পারে এর মধ্য দিয়ে তাদের বিজয় হয়েছে! কিন্তু জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ এই পৃথিবীতেই শেষ নয়। বরং তোমাদের এক একটি আঘাত আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকদের করেছে জান্নাতের কাছাকাছি। আর তোমাদের অনেককে করেছে জাহান্নামের নিকটবর্তী। যারা আঘাতের পর আঘাত চালিয়েছে এ নিষ্পাপ মানুষের দেহে, তারা কি আজ উত্তর দিতে পারবেন হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপনের মায়ের জিজ্ঞাসার? 'কি অপরাধ আমার সন্তানের, যাকে হত্যা করা হয়েছে? তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। এ জন্য আমি গর্বিত। কিন্তু কেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার সন্তানের দাঁতগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে? এই মুখ দিয়ে তো সে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুখস্ত করেছে। যাদের বুকের উপরে নৃত্য ও উল্লাস করা হয়েছে, তারা কি জানে যে কপালে লাথি মারা হয়েছে সে কপাল দিনে পাঁচবার করে আল্লাহকে সেজদা করতো। পড়তো তাহাজ্জুত নামাজ। যে হাত ভেঙ্গে



icsbook.info

দেয়া হয়েছে সে হাত দিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতো। যে পা গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সে পা দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের পথে হেঁটে হেঁটে মানুষকে ডাকতো। যে চোখ অন্ধ করে দেয়া হয়েছে সে চোখ দিয়ে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করতো।' এ হাজারো জিজ্ঞাসার জবাব আজ তাদের কাছে আছে কি? যারা সেদিন আমাদেরকে পিছিয়ে দিতে এসেছে। কিন্তু না, তারা আমাদেরকে অনেক পথ এগিয়ে দিয়েছে। আরেকবার আমরা দেখে নিয়েছি আমাদের পরীক্ষিত নেতৃত্ব। যাদের সাহস আমাদের এগিয়ে দেয়। যাদের আল্লাহর উপর নির্ভরতা এ কাফেলার কর্মীদের আশান্বিত করে। যাদের ত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমরা দেখেছি তাদেরকে। আমরা দেখেছি তাকে, যাকে ঘিরে এ জনসভার আয়োজন। শ্রদ্ধেয় আমীর-ই জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেবকে। মুহুর্মুহু গুলি আর বোমা স্তব্ধ করতে পারেনি তার বলিষ্ঠ কণ্ঠকে। যা ছিল তেজদীপ্ত, নিশ্চল, অবিরত আর অবিচল। যে নেতা তার কর্মীদের শাহাদাত, হাজার হাজার নেতা-কর্মীর আহত ও রক্তাক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে উত্তম ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন, তা দেখে মনে হয় যেন 'অজাদিলুহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান'-এর উত্তম নমুনা। যিনি বাতিলের জুলুম নির্যাতন আর উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মাঝেও দেশ ও গণতন্ত্রের কথা বলেছেন তা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। এ যেন 'হুব্বুন ওয়াতানি মিনাল ঈমান'-এর প্রতিচ্ছবি। তিনি যেন মাওলানা মওদূদীর অবিকল সাক্ষী। এমনি এক জনসভায় অবিরাম গুলিবর্ষণ চলাকালে মাওলানা মওদূদীকে বসে পড়ার জন্য অন্যরা অনুরোধ করলে দৃঢ়তার সাথে তিনি বলেছিলেন– 'আমিই যদি বসে পড়ি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?' তাই বিশ্বাস– শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না, একদিন কথা বলবেই।

আমাদের প্রিয় নবী রাসূল করিম (সা.)ও মক্কা থেকে দ্বীনের যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি। হিজরত করেছেন মদিনায়। ইসলামকে অল্প সময়ের মধ্যে বিজয়ের মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের সূচনা করেছিলেন। সে অনুসারে ইসলামী ছাত্রশিবিরও ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত অনেক জুলুম নির্যাতনও থামিয়ে দিতে পারেনি আমাদের এ কাফেলার গতিকে। আজ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক সর্ববৃহৎ ও অপ্রতিরোধ্য সংগঠনের নাম বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। আমার বিশ্বাস, ২৮ অক্টোবর পল্টনের অসংখ্য ভাইয়ের শাহাদাত ও জুলুম নির্যাতন ঢাকার প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অলি-গলিতে মক্কা বিজয়ের মতো এ জমিনে বিজয়ের সূচনা করবে ইনশাআল্লাহ। হে বিস্তীর্ণ আকাশ ও জমিনের মালিক! তুমি আমাদের ফরিয়াদকে কবুল কর।

---

*লেখক : পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও*
*কেন্দ্রীয় দাওয়াহ ও সাহিত্য সম্পাদক,*
*বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।*
*mrkarim_ru@yahoo.com*



icsbook.info

# জান্নাতের পথের যাত্রী যারা

শেখ নেয়ামুল করিম

২৮ অক্টোবর। কেন্দ্রীয় কার্যালয়। সময়টা সঠিক বলতে পারব না, তবে ঘড়ির কাঁটা ১০টা গড়িয়ে সামনে এগিয়েছে। হঠাৎ সংবাদ এলো পল্টনে গণ্ডগোল, আমাদের ভাইদের ওপর হামলা করা হয়েছে। দ্রুত বাইরে চলে এলাম। কেন্দ্রীয় সভাপতি অফিস থেকে বের হয়ে গেলেন। বারবার আমরা তাকে অনুরোধ করছিলাম সামনে না এসে অফিসে অবস্থান করার জন্য। কিন্তু অনুরোধে কোন কাজ হলো না। ইতিমধ্যে দেখতে পেলাম রক্তাক্ত অবস্থায় আমাদের কয়েকজন কর্মীকে অফিসের দিকে নিয়ে আসছে তাদের সাথীরা। হঠাৎ দেখলাম কাফরুল থানা আমীর লস্কর মো: তাসলিম ভাইকে টকটকে লাল পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় নিয়ে আসা হচ্ছে। মাথায় আঘাত দেখে বুঝতে বাকি নেই– সাদা পাঞ্জাবিটা কেনই বা ছিল এত লাল। তার পেছনেই সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মনজু ভাইকে গুরুতর আহত অবস্থায় নিয়ে আসছে। তিনি তখনও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেননি। আমাদেরকে ইশারা দিয়ে দেখাচ্ছেন পল্টন মসজিদ গলির দিকে। কয়েকজন লোকের ডাকাডাকি ও আর্ত চিৎকার শুনলাম, ওরা পল্টন মসজিদ গলিতে প্রচণ্ড আক্রমণ করে 'রাঁধুনি'র সামনে পর্যন্ত চলে এসেছে। আমাদের বুঝতে আর বাকি রইল না– এবার ওদের টার্গেট কেন্দ্রীয় অফিসে হামলা ও পেছন দিক থেকে এসে মঞ্চ জ্বালিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন ভাইকে কেন্দ্রীয় সভাপতির সাথে থাকার অনুরোধ করে জাহেদ ভাই, রেজাউল ভাই ও আমি চলে গেলাম সামনের দিকে। সে গলিতে দেখতে পেলাম এক অভাবনীয় ও অকল্পনীয় দৃশ্য! হাজার লগি-বৈঠার সামনে মাত্র ১৬-১৭ জন ভাই খালি হাতে ওদের প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর সাথে আমরা যোগ দিলাম ৫-৬ জন। সব নিয়ে এখন আমাদের সংখ্যা ২৫ এর ঊর্ধ্বে নয়। পক্ষান্তরে তারা সকলেই রয়েছে লগি-বৈঠা, হকিস্টিক ও আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত। এ রকম ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যায়।

কারো কারো মাথার ওপরে উপর্যুপরি ইট-পাথরের প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ কানে আসছে। তাকিয়ে দেখি যাদের মাথায় ইট পড়েছে তারা তাদের নিজের দিকে না তাকিয়ে ইটটা কোথায় গিয়ে পড়ল সেটা খুঁজে বের করে আবার ছুঁড়ে মারছে শত্রুদের দিকে।



icsbook.info

ততক্ষণে দেখা গেল কারো মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে গড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে, হঠাৎ করে তখন সে হয়ত ঢলে পড়ছে। রাস্তা ও গলিসহ পিচ ঢালা কালো পথও তাজা রক্তে সিক্ত হচ্ছে। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওদের মুহুর্মুহু গুলি ও ইটের আঘাতে আমাদের যখনই এক একজন ভাই আহত হন এবং তার চিকিৎসার জন্য আমাদের লোক কমে যায় আরও একজন। এভাবে পর্যায়ক্রমেকমতে কমতে ওখানে অবস্থানরত মুষ্টিমেয় ভাইয়েরা যে লগি, ইট, পাথর ও বোতলের দ্বারা কতবার আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে তা কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে দেখা গেল আরও একজনকে রক্তাক্ত আহত অবস্থায় গলির মধ্যে পড়ে থাকতো। কেউ কেউ বলল, আমাদের টুটুল ভাই। উদ্ধার করার পর দেখা গেল সে তো টুটুল ভাই নয়, এতো আমাদের সেই ফুটফুটে ভাইটি যে বারবার সবাইকে পেছনে ফেলে অদৃশ্য কোন এক আকর্ষণে সামনের দিকে এগিয়ে যেত। বারবার তাকে ডাকা হলেও মনে হতো কোন শক্তি তাকে পিছু হটাতে পারত না, সেতো আর কেউ নয়– আমাদের প্রিয় ভাই মুজাহিদুল ইসলাম। মুজাহিদের রক্তাক্ত চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি আর দুনিয়াতে নেই। এবং শাহাদতের ঘটনায় যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছিল তা আর বর্ণনা করতে পারছি না।... তবে এটা ঠিক যে কারো চোখের দিকে তাকানোর মত কোন পরিস্থিতি তখন ছিল না। তার প্রায় আধা ঘণ্টা পরই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেলেন কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক (তৎকালীন) রেজাউল করিম ভাই। তার পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে রিকসার চাকা ভাঁজ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল। এরই ফাঁকে পেছন থেকে আরেকটি সশস্ত্র গ্রুপ আমাদের দিকে হামলা চালায়। প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে যখন আমাদের কর্মীদের ওপর গুলি ও বোমা ছুঁড়ছিল তখন আমাদের কর্মীরা কিছুটা হলেও ভরসা হারিয়ে ফেলেছিল বলে মনে হলো। এমতাবস্থায় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বললাম– ''দেখুন, মুজাহিদ ভাইয়ের রক্তকে সাক্ষী রেখে বলছি, তিনি আমাদের অফিস ও মঞ্চকে হেফাজত করার জন্যই শাহাদাতকে বরণ করে নিয়েছেন। আমরা বেঁচে থাকতে সেখানে শত্রুদের হামলা করার সুযোগ দিতে পারি না। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও আমরা অফিস ও মঞ্চ হেফাজত করবো– এই মর্মে সবাই শপথ নিতে পারি কি?" জবাবে সবাই হাত উঁচিয়ে শপথ করলেন।

ছোট কর্মী ছাদ বিন সুলতানকে আমার পাশে দেখে বললাম, আমরা আছি, তুমি চলে যাও। মনে হলো সে আমার কথায় রাগ করে তার অবস্থান আরও দৃঢ় করে। আর এক কর্মী বলল, 'আমি চলে যেতে পারি না, আমি শহীদ রায়হানের ছোট ভাই'। যাহোক সামান্য ক'জনকে নিয়েই আমরা প্রতিরোধের চেষ্টা করি। এ মুহূর্তে বিভিন্ন শাখা থেকে দায়িত্বশীলগণ ফোন করতে ছিলেন অবস্থা জানার জন্য। বাড়ি থেকে বড় ভাই-বোন ফোন করছিল। কিন্তু ওসব ফোন রিসিভ করার সময় কোথায়? এতে কেউ হয়তো বা কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যখন জীবনের মায়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিলাম তখন একটু ইচ্ছা করছিল অন্তত শেষবারের জন্য হলেও আম্মার কাছে একটা ফোন করে শেষ দোয়াটুকু চেয়ে নেব, কারণ....। কিন্তু সে সময়টুকুও পাওয়া যায়নি। জোহরের নামাজও সেদিন আসরের সাথে পড়তে হয়েছিল। এভাবে যখন বিকেল তিনটা গড়িয়েছে তখন থেকে আমাদের লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। সভা যথারীতি শুরু হয় কিন্তু হায়নাদের হিংস্রতা মোটেও কমেনি। আমীরে জামায়াতের বক্তব্য শুরু হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয় চূড়ান্ত হামলা। তাদের উপর্যুপরি বোমা ও গুলির আঘাতে আহত হন শত শত কর্মী। সেখানে এক এক করে শাহাদাতবরণ করেছিলেন গোলাম কিবরিয়া শিপন, জসিম উদ্দিন,



icsbook.info

হাবিবুর রহমান ও জসিম উদ্দিন (২)। প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মম লগি-বৈঠার আঘাতে পল্টন মোড়েই শাহাদাত বরণ করেন প্রিয়ভাই মো: জসিম উদ্দীন, শুধু সেখানে ক্ষান্ত হয়নি, লাশের উপর সাপ পেটানো স্টাইলে পিটিয়ে উল্লাস করেছে, যা বিশ্ববাসীকে করেছে হতবাক। শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম, শহীদ ফয়সাল ও হাবিবুর রহমানকে হারিয়ে তাদের স্বজনদের ক্রন্দনে আজ আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। যেভাবে প্রকাশ্যে দিবালোকে ঢাকার রাজপথে লগি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে তা অবর্ণনীয় ও অকল্পনীয়। সে দৃশ্য দেখলে শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোন মাতাই চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন নি। তাই তো এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান মইন উ আহমেদ নিউইয়র্কে এক মতবিনিময় সভায় একথা ঠিক এ ভাষায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ''আপনারা দেখেছেন মানুষকে কিভাবে পারিয়ে পারিয়ে হত্যা করা হয়েছে, আমি আমার লাইফে এভাবে মানুষকে কেন, কোন পশুকেও হত্যা করতে দেখিনি।"

এ সকল শাহাদাতের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেও আমরা যারা ময়দানে ছিলাম তাদেরকে পুরোপুরি Inform করা হয়নি। বাইরে থেকে মোবাইলে জানতে চাওয়া হচ্ছে শাহাদাতের সংখ্যা কত? আমরা সংখ্যা জানতে ফোন দিলাম সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান ভাইয়ের কাছে। তিনি বললেন, পল্টন মোড়ে কোন সমস্যা নেই, আপনি আপনাদের অবস্থানে ধৈর্য ধরে অবস্থান করুন। অর্থাৎ শাহাদাতের সংখ্যাটা যে এত বেশি তা কৌশলগত কারণে ময়দানে অবস্থানরত কর্মীদেরকে জানানো হয়নি। কর্মীরা জানতে পারলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, এই আশঙ্কায়ই হয়তোবা তিনি আমাদেরকে শাহাদাতের পুরো সংখ্যাটা তাৎক্ষণিকভাবে বলেননি। কিন্তু এত রক্ত ও লাশের পরও ওদের নেশা যেন পূর্ণ হচ্ছে না। তাদের নেত্রী কর্তৃক লেলিয়ে দেয়া বাহিনী যাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে বক্তৃতা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে; ইসলামী আদর্শবাদী শক্তিকে সম্পূর্ণ দমন করাই ছিল তাদের মূল এজেন্ডা। কিন্তু ওরা তো জানে না মহান প্রভুর সেই ঘোষণা- "তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে কিন্তু আল্লাহর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তিনি তার নূরকে প্রজ্জ্বালিত রাখবেনই, এটা কাফেরদের জন্য যতই অসহনীয় হোক না কেন"। (সূরা আছ-সফ, আয়াত- ৮)। মহান আল্লাহর এই ঘোষণার সফল বাস্তবায়ন সেদিন আমরা দেখেছিলাম পল্টন ময়দানে। অন্যথায় নিজেদের কাছেও ভাবতে অবাক লাগে, কী করে আমাদের ছোট ছোট কর্মীরা খালি হাতে রক্তের বিনিময়ে প্রতি ইঞ্চি জমিন শত্রুদের হাত থেকে হেফাজত করেছিল। আমরা যতটা না প্রতিরোধ করতে পারছি তার চেয়ে হানাদারদের মাঝে ভীতির পরিমাণ লক্ষ্য করছি অনেক বেশি। এর প্রকৃত কারণ আমরা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল আল্লাহর সেই বাণী, সেখানে তিনি ঘোষণা করছেন– "আর সেই সময়ে যখন তোমার রব ফেরেশতাদের ইঙ্গিত করেছিলেন এই বলে : আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা ঈমানদারদের অবিচল রাখ, আমি এখনই এ কাফেরদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিচ্ছি"। (সূরা- আনফাল : ১২)

তিন-চার দিন পরের কথা। প্রতিদিন দুই একটি শাহাদাতের সংবাদ এবং হাজারও আহতের আর্তচিৎকারে- আমাদের ভেজা চোখ শুকানোর সুযোগ পাচ্ছিল না। এমন সময় হাসপাতাল থেকে সংবাদ এলো হায়েনাদের আঘাতে আঘাতে মাথার মগজ গুঁড়িয়ে যাওয়া মারাত্মক আহত সাইফুল্লাহ মো: মাসুম ভাইয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ডাক্তার



icsbook.info

যেকোনো সময় দুঃসংবাদ শুনার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। খালাম্মাকে সংবাদটা জানানো জরুরি মনে করে কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ ভাইয়ের সাথে চলে গেলাম বাসায়। খালাম্মার কাছে কিভাবে যে সংবাদটা জানাবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মাসুদ ভাই সাহস করে সর্বশেষ অবস্থাটা বলেই ফেললেন। আমরা যখন খালাম্মাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলছিলাম, তখন ভেতর থেকে শুনতে পেলাম স্পষ্ট, সাহসী কিছু উচ্চারণ... "দেখ আমি শুনেছি, আমার ছেলে সবার সামনে থেকে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। আজ আমার ছেলে শহীদ হলে আমার কোন দুঃখ নেই। বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবো। আমি সবসময় আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা করতাম। আমার ছেলে সবসময় খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করে খাব্বাব-বেলালদের কাতারে সামিল হবে, এ প্রত্যাশা করেই আমি ওর নাম রেখেছি সাইফুল্লাহ মুহাম্মাদ মাসুম (এমন নিষ্পাপ বান্দা যে আল্লাহর তরবারি বহন করবে)। তবে তোমাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ছেলে শহীদ হতে যাচ্ছে, তার রেখে যাওয়া দায়িত্ব যেন তোমরা সঠিকভাবে পালন করতে পার। এর কোন ব্যতিক্রমহলেই শুধু আমি কষ্ট পাব"। খালাম্মার এ বক্তব্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মহিলা সাহাবী হানজালা (রা.) এর কথা। যুদ্ধের ময়দানে যখন তিনি রাসূল (সা.) এর আহত হওয়ার সংবাদ শুনতে পেলেন তখন তিনি পাগলপারা হয়ে ছুটছিলেন তার সংবাদ নেয়ার জন্য। পথিমধ্যে তিনি তার স্বামী, পিতা ও পুত্র যুদ্ধে শহীদ হওয়ার সংবাদ পেলেন। কিন্তু কোন সংবাদই তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। তিনি বলেছিলেন– "এ সংবাদ আমি জানতে চাইনি বরং আমি শুনতে চাই আমার নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কেমন আছেন"।

খালাম্মার কাছে জানতে পারলাম মাসুম কয়েকদিন ধরে জন্ডিসে আক্রান্ত থাকায় হাসপাতালে ভর্তি ছিল। বাসায় আসার একদিন পরই আহত হয়। ২৮ অক্টোবর মাসুম এবং শিপন একসাথেই বাসা থেকে বের হয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মাসুমের আম্মার দেয়া সিদ্ধ ডিম খেয়ে জনসভায় গিয়েছিল। যখন পরিস্থিতি অশান্ত দেখেছিল তখন ছোট ছোট কর্মীদেরকে নিরাপদে বাসায় যাবার জন্য রিকশায় তুলে দিয়েই শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত হয়ে সামনে এগিয়ে যায়। জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে উপর্যুপরি গুলি, বোমা আর পাথরের সামনে জীবন উৎসর্গ করে দিতে যেন এতটুকু বাঁধেনি। শাহাদাতের পর সাইফুল্লাহ মো: মাসুম ভাইয়ের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল নিজ হাতে লেখা বাণী– "শাহাদাত এনে দিবে মুক্তি"। নি:সন্দেহে এ বাণী শহীদি চেতনারই বহি:প্রকাশ। শহীদ মাসুমের কফিন যখন দাফন করছিলাম তখন হাজারো মানুষের অশ্রুভেজা কান্নায়ই প্রমাণ করেছিল তিনি কতখানি জনপ্রিয় ছিলেন।

আমরা দেখা করতে গেলাম শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপনের বাসায়। তার পিতার কথা শুনে রীতিমত অবাক হলাম। তিনি বললেন– 'আমার ৩টি ছেলে। বড়টাকে ডাক্তার, মেঝটাকে ইঞ্জিনিয়ার এবং ছোট ছেলেটাকে (গোলাম কিবরিয়া) বানিয়েছি কুরআনের হাফেজ। আর কুরআন প্রতিষ্ঠার জন্যই সে চলে গেল আল্লাহর সান্নিধ্যে। সে পাড়ার ছেলেদেরকে নামাজে ডাকতো, কুরআনের পথে আহ্বান জানাতো এবং অনেককে ফ্রি কুরআন শিক্ষা দিত। সে দাখিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১তম স্থান দখল করেছিল এবং ভর্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়। বিদেশে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে IELTS করে সম্মানজনক Score অর্জন



icsbook.info

করেছিল'। শহীদ শিপনের আম্মা বললেন– "শিপন সংগঠনের কাজে যেমনি আন্তরিক ছিল তেমনি বাসার খুঁটিনাটি কাজেও ছিল অগ্রগামী। এমনকি রান্নার কাজেও আমাকে সহযোগিতা করতো"। তাদের কথা শুনে বুঝতে পারলাম আল্লাহ তার বাগান থেকে সুন্দর ফুলটিকেই বাছাই করেছেন। বাগানের মালিক সবচেয়ে সুন্দর ফুলটিকেই হাতে তুলে নেবেন, এটাইতো স্বাভাবিক।

কথা বলেছিলাম মুজাহিদুল ইসলামের নানার সাথে। অশ্রুসিক্ত নয়নে আবেগময় কণ্ঠে তিনি বললেন– 'রাসূল (সা.) এর জন্মগ্রহণ তারিখে অর্থাৎ ১২ রবিউল আউয়াল সুবেহ্ সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুজাহিদ। ফুটফুটে এ সন্তানটি ইসলামের খেদমতে মুজাহিদের ভূমিকা পালন করবে এ প্রত্যাশায় আমরা নাম রেখেছিলাম হুসাইন মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম।' নামের সাথে হুসাইন শব্দটি যুক্ত থাকায় আমাদের মনে পড়ে গেল রাসূল (সা.)-এর প্রিয় নাতি হাসান-হুসাইন-এর কথা। যে ফোরাত নদীর তীরে হিন্দাদের উওরসূরি এজিদ বাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীরে করে কেড়ে নিয়েছিল রাসূল (সা.)-এর কলিজার টুকরা হোসাইন (রা.)-এর প্রাণ। কি অপরাধ ছিল হাসান-হুসাইন (রা.) ও তার সাথীদের। অপরাধ(?) ছিল একটাই তারা বহন করেছিল ইসলামের ঝাণ্ডা এবং প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল আল কুরআনের রাজ। হক ও বাতিলের এ চিরন্তন ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় ঠিক একই অপরাধে অভিন্ন কায়দায় নব্য হিন্দা শেখ হাসিনার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কর্মীরা এজিদের উত্তরসূরি হিসেবে লগি ও বৈঠা দিয়ে নির্মমভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেড়ে নেয় আমাদের প্রিয়ভাই হুসাইন মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলামের জীবন। ঠাণ্ডা মাথায় তারা হত্যা করে হাতের পাল্স দেখে মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা খোঁচাতে থাকে। এমতাবস্থায় পকেটে হাত ঢুকিয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোন, টাকা ও ঘড়ি ছিনিয়ে নিতে তারা ভুল করেনি। স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ'র ছাত্র মুজাহিদুল ইসলামের জন্মদাত্রী মাতা বললেন– ''মুজাহিদ আমাদের কুরআন-হাদিস পড়ে শুনাত, ইসলামী আন্দোলন করার গুরুত্ব বুঝাতো, ঠিকমতো পড়ালেখা করত, পাড়ার কোন ছেলেকে কষ্ট দিয়েছে এমন কোন রেকর্ড নেই, এমনকি ছোট ভাই-বোনদেরও কোনদিন মারত না। সকল দিক থেকেই ও ছিল ব্যতিক্রম"। সদা শান্ত প্রকৃতির মেধাবী এই ছাত্রটি সর্বদা পছন্দ করত শহীদি গান। তাই আগের সারারাত জেগে শুনেছিল শুধু শহীদি গান। ঐ দিন সকাল বেলা সে তার সাথীদেরকে বলেছিল– ''দেখ আজ যদি আমাদের ওপর ওরা কেউ হামলা করে তাহলে তোমরা ভয় পেয়ো না। মনে রেখ, আজ আল্লাহ যদি কাউকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন, তা হলে আমিই হব প্রথম শহীদ।" ঠিক সেদিন মহান রব সবার আগেই শহীদ হিসেবে কবুল করেছিলেন তাকে। তাই আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে চোখের সামনে থেকে চলে গেলেন জান্নাতের পথের এক যাত্রী হিসেবে। মুজাহিদের শাহাদাতের কিছুদিন পর তার ছোটবোন মালিহা স্বপ্নে দেখেছিল তার ভাইয়া তাকে এমন একটা ফল খাওয়াচ্ছে যা সে কোন দিন খায়নি এবং কখনো দেখেওনি। এ স্বপ্ন শাহাদাত কবুলের লক্ষণ নয় কি?

শহীদ ফয়সাল ভাইয়ের বাসায় গিয়ে তাকে নতুনভাবে আবিস্কার করতে পারলাম। পিতার অবর্তমানে তাকে একদিকে পারিবারিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হতো, অন্যদিকে টিউশনি করে নিজের পড়াশোনা ও ছোট ভাইদের পড়ালেখার খরচ বহন করতে হতো। এত শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সংগঠনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের



icsbook.info

ব্যাপারে ছিলেন আপসহীন। এ সকল প্রতিবন্ধকতা তাকে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বীনের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

রফিকুল ইসলাম ভাই ঈদ উপলক্ষে নানা ও খালা বাড়ি বেড়ানোর পর বাড়ি ফেরার পথেই যখন শুনতে পেলেন সমাবেশের দাওয়াত– তখনই তিনি আর অপেক্ষা না করে চলে গেলেন। মায়ের কাছে দোয়া চেয়ে সালাম পাঠিয়ে তার সাথে দেখা আর নাও হতে পারে একথা বলে চলে গেলেন। সেই ঘোষণাই হয়তোবা কবুল করেছিলেন মহান প্রভু। পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তিপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্র রফিকুল ইসলামের শাহাদাতের পর তার ডায়েরির প্রতিটি পাতা খুলে পাওয়া গিয়েছিল শহীদি কবিতাসহ অসংখ্য কবিতার ছড়াছড়ি এবং প্রতিদিন কবিতা লেখা ছিল তার রীতিমত অভ্যাস, যার প্রমাণ বহন করে তার নিজের লেখা নিম্নোক্ত কবিতাটি :

কিশোরকণ্ঠ

কিশোরকণ্ঠ কিশোরকণ্ঠ নিত্যদিনের সাথী
কিশোরকণ্ঠ এই সমাজের কিশোর প্রাণে বাতি।
কিশোরকণ্ঠ না পেলে কাটে না একটি দিন
কিশোরকণ্ঠ না পড়লে দেহ হয় প্রাণহীন।
কিশোরকণ্ঠ কিশোরকণ্ঠ রসে ভরা তোর পাতা
তাই প্রতিদিন রফিকুলের লেখা হয় ছড়া কবিতা।

শহীদ জসিম উদ্দিনের ব্যাপারে তার দায়িত্বশীল জানালেন ভিন্ন রকম অজানা তথ্য। জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ফান্ডে তিনি কিছু টাকা দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। তার বাবার সমুদয় ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপরে অর্পিত থাকা সত্ত্বেও তিনি সরাসরি নিজের আয় দিয়ে এ টাকা পরিশোধ করতে চেয়েছিলেন। এই প্রত্যাশায় কিছু খুচরা মালামাল ক্রয়-বিক্রয়করে কিছু টাকা লাভ করলেন। ঈদের আগেই সে টাকা পরিশোধের জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলেন। দায়িত্বশীল তাকে বলেছিলেন, আপাতত আংশিক পরিশোধ করে বাকিটা তার হাতে রাখার জন্য, কারণ ঈদের মুহূর্তে কোন সময় যেকোন প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু জসিম উদ্দিন ভাই ছিলেন নাছোড়বান্দা। শত কিছুর পরও তিনি টাকা পরিশোধের জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছিলেন। স্বভাবতই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ওয়াদা পূরণ না করে বরং ঋণের বোঝা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়াটা তার জন্য লজ্জাকর বলে মনে করেছিলেন বিধায়ই তিনি তা পরিশোধের জন্য এতটা আগ্রহী ছিলেন।

আহতদের দেখতে গিয়েছিলাম ঢাকা মেডিকেল, ইবনে সিনা, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন সহস্রাধিক আহত ভাইদের কাকে রেখে কার কাছে যাব– দিশেহারা। হঠাৎ চোখ পড়ল আমিনুর রহমান আমান ভ াইয়ের দিকে, যার শরীরে এমন কোন জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না যেখানে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। তাকে চেনাটাই ছিল রীতিমত কঠিন কাজ। তিনি যে আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন তা অনেকেরই ছিল কল্পনার বাইরে। শাহাদাতের সংখ্যা সর্বশেষ কত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে তা বলা যাচ্ছিল না। আবদুল মান্নান ভাই তার (আমান ভাইয়ের) কথা মুখ খুলে বলতে না পেরে, আশঙ্কা করছিলেন যে শাহাদাতের সংখ্যা পাঁচ হবে নাকি ছয়? কারণ স্বল্প সময়ের মধ্যে আমান ভাইও শামিল হয়ে যেতে পারেন শাহাদাতের কাতারে। এই আশঙ্কায় তিনি সেক্রেটারিয়েট



icsbook.info

বৈঠকে ২/১ দিন অপেক্ষা করে পোস্টার ছাপানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে বৈঠকেই কেন্দ্রীয় সভাপতি মুনাজাত করলেন ঠিক এভাবে– ''হে আল্লাহ- বৃদ্ধা মাতার একমাত্র পুত্রসন্তান (আমান)-কে সুস্থ করে তুমি প্রমাণ করে দেখাও যে, তুমি সবকিছু পার"। আল্লাহ হয়তোবা তার এ মুনাজাতকে কবুল করেই ১০-১২ দিন সংজ্ঞা হারানোর পরও ধীরে ধীরে সুস্থ করে তুললেন আমান ভাইকে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় এ জীবন্ত শহীদ, শহীদ পরিবারও পঙ্গু ভাইদেরকে সাক্ষী রেখে ২৮ অক্টোবরকে বলি–

আটাশ তোমার বর্বরতায় ভেঙেছে শতকোটি মানুষের অন্তর
হায়েনার নির্মমতায় পল্টনকে করেছ তুমি বদরের প্রান্তর।
তোমাকে খুঁজেছি মুজাহিদের নীরবতা আর জসীমের আর্তনাদে
আটাশ তুমি এসো না আর কোনদিন এ বিভৎস আকারে।

২৮ অক্টোবর, আমাদের কি নিয়েছে আর কি দিয়েছে তার হিসাব করার হয়তো সময় আসেনি। আর, সেদিকে যাচ্ছিও না। তবে এ কথা দিবালোকের মতো সত্য যে সেদিন এত অশ্রু, ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে যে অসহায় মানুষগুলো শুধুমাত্র হৃদয়ে কালিমা, কণ্ঠে তাকবির ধ্বনি, বুকে কুরআন আর মুখে হাসি নিয়ে যে ময়দানে সাহসের সাথে টিকে থাকতে পেরেছিল তার পেছনে অন্যতম নয় শুধুমাত্র ও একমাত্র কারণ ছিল আল্লাহর রহমত। আল্লাহ না করুন! সেদিন যদি বাতিলের সাথে সত্যের পরাজয় হতো তাহলে তারা শুধুমাত্র আমাদের দলীয় মঞ্চ ও অফিসই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সীমাবদ্ধ রাখতো না। বরং জোটের অন্যান্য দলের জনসভা ও অফিসে হামলা করে, সফলতা অর্জন করতে পারলে দেশব্যাপী হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের উৎসব পালন করা হতো। খালি হতে পারতো হাজারও মায়ের বুক। বিপন্ন হতে পারতো মানুষের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব, এ দেশের পতাকা ও মানচিত্র হতে পারতো হুমকির সম্মুখীন। সুতরাং আমরা সেদিন দিয়েছি অশ্রু, ঘাম, রক্ত আর জীবন। বিনিময়ে পেয়েছি মানচিত্র, পতাকা, সার্বভৌমত্ব আর মানুষের অধিকার, ত্যাগের আনন্দ, বিবেকের রায় তথা সত্যের বিজয়। তবে এ কথা সত্য যে এ বিজয় কিনতে হয়েছিল চড়া দামে। কারণ এতো কিছুর পরও আমাদের মায়েরা খুঁজে পাবেন কি কখনো তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে? ছোট ভাইবোনেরা কি চিরতরে বঞ্চিত হবে না বড় ভাইয়ের আদর ও সোহাগ থেকে? জাতি কি ফিরে পাবে আর এই সোনার ছেলেদেরকে? এই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, ভাইহারা বোনের চিৎকারে আকাশ বাতাস আজ প্রকম্পিত। বলুন! বলুন!! বলুন না দেশবাসী!!! এ নির্মমতার শেষ কোথায়? কতদূর গিয়ে থামবে এ জান্নাতের সিঁড়ি! কেনই বা কেড়ে নেয়া হলো তাদের জীবন? কি অপরাধে এই পাপী বান্দা শরিক হতে পারল না সেই শহীদি মিছিলে?

---

*লেখক : কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# যে স্মৃতি আজো দোলা দেয়

মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের উপর কয়েক যুগথেকে বহুত্ববাদিদের বিভিন্ন নির্যাতনের মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর মধ্যে যে ঘটনাটি আমাদেরকে সবছে বেশি পীড়া দেয় তাহলো ২৮অক্টোবর'০৬ এর রোমহর্ষক ঘটনাটি। ২৮ অক্টোবর এর অব্যাবহিত পরেই মনে হয়েছিল ঐদিনের ঘটনা ধারাবাহিকভাবে লিখব। কিন্তু ঐ ঘটনার নির্মমতা তুলে ধরার জন্য যে ভাষা-জ্ঞান প্রয়োজন সেই সীমাবদ্ধতার কারণেই মূলত লেখা হয়ে ওঠেনি। যা হোক সেদিন ছিল ২৮ অক্টোবর রোজ শনিবার। ৪ দলীয় জোট সরকারের ৫বছর পুর্তি উপলক্ষে যুগপৎ জনসমাবেশ এবং রাত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে পরিকল্পনা অনুযায়ী জামায়াত ঢাকা মহানগরী বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে সমাবেশের আয়োজন করে। সামাবেশের স্টেজ বানানোর জন্য সকাল থেকেই কিছু জনশক্তি উত্তর গেটে উপস্থিত হয়। সকাল ৮:৩০ এর দিকেই মুহ্তারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ ও সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুর রহমান ভাইসহ কলাবাগান থেকে পল্টনে কেন্দ্রীয় আফিসে রওয়ানা হই। প্রায় ৯:০০ টায় দিকে অফিসে পৌঁছে মুহ্তারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি উপস্থিত পরিষদ সদস্য ভাইদের নিয়ে তার রুমে বসার জন্য বললেন। কিছুক্ষণ পর মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি জামায়াত মহানগরী অফিসে গেলে জাহিদ ভাই বললেন– চলেন পল্টন মোড় থেকে ঘুরে আসি। প্রথমে পল্টন মোড় গিয়ে দেখলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা মহানগরীর কিছু সংখ্যক ভাইয়েরা পল্টন মোড়ে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালনের জন্য ২/৩ সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন পাশেই ইকবাল ভাই দাঁড়িয়ে ছিল, তার সাথে কথা বললাম। তখন পল্টন মোড় মুক্তাঙ্গন জিপিও এর দিকে লগি-বৈঠা এবং অস্ত্র হাতে হাজার হাজার আওয়ামী সন্ত্রাসী খুনের নেশায় নৃত্য করছিল। সেখান থেকে বায়তুল মোকাররমের পশ্চিমের রাস্তায় ঢাকা মহানগরী উত্তরের বর্তমান সভাপতি (তৎকালীন সেক্রেটারি) শামসুল আরেফিন হাসিব ভাই, মহানগরী পশ্চিমের ইমরোজ ভাইসহ কিছু ভাই দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাদের সাথে কথা বললাম। তখন বেলা প্রায় ১০টা আতিক্রম করছে। সেক্রেটারি জেনারেল আওয়ামী সন্ত্রাসীদের আলামত দেখে বললেন– আজকে বড়



icsbook.info

ধরণের আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিয়েই আওয়ামী লীগ মাঠে নেমেছে বলে মনে হয়। এ কথা বলে উত্তরগেটে স্টেজের দিকে রওনা হলাম। তখনই পিছন দিক থেকে (পল্টন মোড়) নারায়ে তাকবীর শ্লোগানের আওয়াজ ভেসে আসলো। পিছন ফিরে দেখলাম আমাদের ৪/৫ জন ভাইকে মাথায় মারাত্মক আঘাতজনিত সারাশরীর রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে আসছেন। সেক্রেটারি জেনারেলসহ মোড়ের দিকে এগিয়ে যেতে চাইলে সহস্র সন্ত্রাসীর সাঁড়াশি আক্রমণশুরু হলো নিরস্ত্র নিরপরাধ অপ্রস্তুত কিছু মানুষের উপর। তখন আমরা আযাদ প্রোডাক্টসের সামনের রাস্তায় অবস্থা খারাপ ভেবে কেন্দ্রীয় অফিসে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে ঘটনা জানাতে এলাম এবং কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ বেরিয়ে আসলাম। মুহূর্তেই কেন্দ্রীয় সভাপতি চলে গেলেন পল্টন মোড়ের দিকে। সেখানেই মোকাবেলা হচ্ছিলো বাতিলের পর্বতসমান আক্রমণের মুখে গুটি কয়েক মর্দে মোমেনের কিছু ইটের টুকরার মাধ্যমে। মনে হচ্ছিলো এই ইটের টুকরোগুলো আবাবিলের নিক্ষেপিত পাথরের মতই ভূমিকা রাখছে। ভাবতেও গা শিওরে ওঠে। এদিকে বহু ভাইদের আহত, রক্তাক্ত দেহ মহানগরী জামায়াত অফিসের শাহীন ভাইসহ আরো কয়েকজনে মিলে বাহন করে নিয়ে যাচ্ছে এবং ইটের টুকরো নিয়ে ফিরে আসছে। একই সাথে আলমগীর ভাই হোন্ডায় করে ইটের ঝাকা রেখে যাচ্ছেন এবং একই সাথে ২জন, মাঝে মাঝে ৩জন করেও আহত ভাইকে নিয়ে যাচ্ছেন। ঘটনার ভয়াবহতা এমন ছিল যে, যারা প্রত্যক্ষ করেছেন শুধু তারাই উপলব্দি করতে পারেন।

বেলা আনুমানিক ১২টার দিকে হঠাৎ মোবাইলে ফোন করেছেন আমার সম্মানিত বড়ভাই ধানমন্ডি থানা আমীর। স্বভাবসুলভ ভাবেই জিজ্ঞাসা– 'শাহীন কোথায়? কি অবস্থা?' ২/১ মিনিট পরেই আবু হানিফ ভাই ফোন করলেন, রিসিভ করতেই ওপাশের আর্তচিৎকার শুনলাম। মুজাহিদ ভাই আমাদের মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেছে। ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল কাকরাইলে আছে। আমি নির্বাক ছিলাম, কোন জবাব বা সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ২/১ মিনিটের মাথায় ঢাকা মহানগরী পশ্চিমের সভাপতি আব্দুল মান্নান ভাই ফোন করেছেন– 'মুজাহিদ ভাই, আমার মুজাহিদ নেই। বাবা মাকে কি জবাব দেবো?' আবার আবু হানিফ ভাই ফোন করলেন হাসপাতালে যাওয়ার জন্য। আমি শুধু এতটুকু বললাম– আরো ২জনের শাহাদাতের খবর এসেছে। কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক রেজাউল করিম ভাই, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি বুলবুল ভাই, মন্‌জু ভাই মারাত্মক আহত, শত শত ভাইয়েরা আহত হয়ে আসতেছেন, অবস্থা ভাল না। দোয়া করেন। একটু পরেই সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সেলিম ভাইয়ের ফোন– ডা. রোদোয়ান ভাইকে এখনই দেড় লক্ষ টাকা দিতে হবে। সিলেট মহানগরী সভাপতি নুরুল ইসলাম বাবুল ভাইয়ের অবস্থা আশংকাজনক। সিলেটেও মারামারি হয়েছে সেখানে বাবুল ভাইকে পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। তাকে ঢাকায় আনার জন্য হেলিকপ্টার ভাড়া করা হয়েছে'। আমি ডা. রেদোয়ানুর রহমান ভাইকে পল্টনের পরিস্থিতি জানিয়ে ম্যানেজ করে নিতে বললাম।

পল্টন মোড়, হোটেল কস্তুরী, নোয়াখালী হোটেলের গলি, বায়তুল মোকাররমের পশ্চিমের গলিতে ঐদিন জামায়াত-শিবির কর্মীরা যে মানব ঢাল রচনা করেছিল তা ইতিহাসে বিরল। বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, পুলিশের সামনেই সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকাত



icsbook.info

মানুষকে সাপের মত পিটিয়ে মেরে তার উপর আনন্দ নৃত্য করা হচ্ছে আর পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে তা প্রত্যক্ষ করলাম। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দোহাই দিয়ে পুলিশ বলেছে– তারা জিরো টলারেন্সে থাকবেন। একটানা আক্রমণচলতে থাকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। বেলা প্রায় ৫টায় আসর নামাজ পড়ার জন্য কেন্দ্রীয় অফিসের গেট পর্যন্ত পৌঁছলে দেখলাম, মুহতারাম আমীরে জামায়াতকে নিয়ে মীর কাশেম আলী ভাইসহ আরো কয়েকজন প্রোগ্রাম স্থলে যাচ্ছেন। মীর কাশেম আলী ভাই হাতের ইশারায় আমাকেও সাথে যেতে বললে আমিও স্টেজ পর্যন্ত যাই। আমীরে জামায়াত স্টেজে ওঠার সাথে সাথেই মনে হলো পশ্চিম দিক থেকে গুলি বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। মুহুর্মুহু গুলি বোমা উপেক্ষা করে দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব মুহতারাম আমীরে জামায়াত বক্তব্য শুরু করলেন। স্টেজের সামনে যারা দর্শক হয়ে বসেছিল মনে হয়েছিল শুধু লাশ হিসাবেই এদেরকে এখান থেকে সরানো সম্ভব, অন্যথায় নয়। আমীরে জামায়াতের বক্তব্য শেষ হলে সমাবেশ শেষ হয়। মাগরিব অত্যাসন্ন, হায়েনার তান্ডবতা থামলো।

মাগরিবের পর মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি বাম হাতে আঘাত প্রাপ্ত অবস্থায় সেক্রেটারিয়েটএবং পরিষদের ভাইদের নিয়ে বসলেন। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো। কয়েকটি কমিটি করে দেয়া হলো। আহতদের তালিকা তৈরি, চিকিৎসা, মামলা এবং শাহাদাত বরণকারী ভাইদের জানাজা এবং দাফন সম্পন্ন করার জন্য, আমাকে চিকিৎসা কমিটির সদস্য করা হলো। এবং বলা হলো মহানগরী জামায়াতের সাথে লিয়াজোঁ করে হাসপাতালের ভাইদের সার্বিক খোঁজ খবর নিতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে তালিকা করা হলো কোন কোন হাসপাতালে আহত ভাইয়েরা ভর্তি হয়েছেন। প্রথমেই গেলাম ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল শাহজাহানপুর শাখায়। সেখানে মনে হলো সাড়ে তিনশত থেকে চারশত লোক চিকিৎসার জন্য এসেছে। আমি চেষ্টা করলাম আহত সকলের সাথে সাক্ষাত করে আবুবকর ভাইকে রেখে কাকরাইলে যাওয়ার। কাকরাইল ব্যাংক হাসপাতালের দায়িত্ব শিশির মুহাম্মদ মনির ভাইয়ের এবং সার্বিক দেখাশোনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার। এরপর ইবনে সিনা হাসপাতলে যাই। এখানে মূমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন শহীদ ফয়সাল, শহীদ মাসুম, শহীদ হাফেজ শিপন, সিলেট মহনগরী সভাপতি নূরুল ইসলাম বাবুল, জামায়াতের রুকন জনাব ইমতিয়াজ, জামায়াত কর্মী জনাব এমদাদ, ঢাকা মহানগরী পশ্চিমের আমিনুর রহমান আমানসহ আরও ৫/৭ জন। ঢাকা মেডিকেলে যারা ছিল দ্রুত চিকিৎসার জন্য কয়েকজনকে এসব হাসপাতালে আনা হয়। ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় শহীদ মুজাহিদের দাফন হয় মিরপুর মাজার রোড জমিদার বাড়ি মসজিদ গোরস্থানে। কবরে নামানোর জন্য যখন খাট থেকে মাথার দিকে ধরে বাবার হাতে তুলে দিলাম মনে হয়েছিল আমরা তো যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। কিন্তু মুজাহিদ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন অনেক আগে।

## যে স্মৃতি আজো দোলা দেয়

শহীদ হোসাইন মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম বাবা মায়ের বড় সন্তান, স্টামফোর্ড বিশ্বিবিদ্যালয় বিবিএ ৫ম সেমিস্টার এর ছাত্র ছিলেন। ২০০৩ সালের মাঝামাঝি কোন



icsbook.info

এক সময়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী শপথ গ্রহণ করেন। ঢাকা মহানগরী পশ্চিমের সভাপতি থাকাকালীন সৌভাগ্য হয়েছিল মুজাহিদকে সাথী শপথ দেয়ার। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হওয়ার পূর্বে পরামর্শের জন্য এসেছিল, বাবা ঐখানে ভর্তি করাতে চান। কিন্তু Co-education হওয়ার কারণে পর্দা সমস্যা এবং সংগঠনের কাজ করা সম্ভব হবে কিনা এই টেনশন তার মধ্যে কাজ করেছে। আমি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলদের উদাহরণ দিয়ে বলে ছিলাম পরিবেশ কোন ব্যাপার না। এটা তোমার সিদ্ধান্তের বিষয়। গত ২৪ অক্টোবর '০৬ ঈদুল ফিতরের পূর্ব রাতে এলিফ্যান্ট রোডের আল্পনা প্লাজার নিচে অপেক্ষা করছিলাম বড় ভাই এবং ভাবী আসবেন, এক সাথে কেনা কাটা করবো। এই সময় ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মোবাইলে ম্যাসেজ পাঠিয়েছে শরীফুল ইসলাম জীবন মিরপুর থেকে, আমি ফোন করলাম শুভেচ্ছার জবার দেয়ার জন্য। জীবনকে জিজ্ঞেস করতেই বললো মুজাহিদ, মিলন, ইয়াসিনসহ সবাই এক সাথে আছে আমিও সবাইকে ঈদ মোবারক জানালাম। এক বছর পরে একথাগুলো হৃদয়কে বার বার দোলা দিচ্ছে এজন্য এবার ঈদের ৪/৫ দিন আগেই আমাদের সকলের সম্মানিত মা (শহীদ মুজাহিদের আম্মা) ৪টি প্যাকেট পিন আপ করে পাঠিছেন নাম লিখে এবং শর্ত হচ্ছে যার যার প্যাকেট সে খুলবে। বর্তমান ওয়ার্ড সভাপতি মিলন (কলাবাগান) প্যাকেটটি আমাকে দিলে আমি খুলতেই দেখলাম একটি পাঞ্জাবি। কেন্দ্রীয় সভাপতি, সেক্রেটারি জেনারেল, রেজাউল করিম ভাই, মঈন ভাই এবং আমার জন্য মায়ের পক্ষ থেকে ঈদের উপহার। আমরা সবাই ২৮ অক্টোবর একই সাথে ময়দানে ছিলাম। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা তো ব্যর্থ কিন্তু সান্ত্বনা এজন্য যে শহীদ মুজাহিদের রেখে যাওয়া আন্দোলনের প্রত্যেকেই কর্মী। আর হানাদারা, ব্যর্থ, ঘৃণিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত। যারা ২৮ অক্টোবর পল্টনে মুজাহিদ, শিপন, মাসুম, জামায়াত কর্মী হাবিবুর রহমান, জসিম উদ্দিন(১) জসিম উদ্দিন (২) রফিকুল ইসলাম (কুড়িগ্রাম) কে শহীদ করার মাধ্যমে ইসলামী নেতৃত্ব এবং আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনকে বাতিল শক্তি যতবেশি নির্বাপিত করতে চায় আল্লাহ তার দ্বীনকে তারচেয়ে বেশি প্রজ্বালিত করেন। মহান আল্লাহ যেন এই শহীদ ভাইদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশকে ইসলামী হুকুমাতের জন্য কবুল করেন। আমিন।

---

*লেখক : কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# শ্বাসরুদ্ধকর ক'টি ঘন্টা

মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

২৮ অক্টোবর '০৬ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দেখি মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। ঈদের ছুটিতে বাড়িতে এসেছি। ২৭ অক্টোবর শুক্রবার পারিবারিক অনুষ্ঠান থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ফরিদপুরে ফিরতে পারিনি। রাত্রেই মাকে বলে রেখেছি খুব ভোরে চলে যাব। তাই ছেলেকে দু'মুঠো গরমভাত খাওয়ানোর জন্যই হয়তো মায়ের এতো আয়োজন। আজ ঢাকাসহ সারাদেশে আওয়ামী নেতৃত্বাধীন চৌদ্দদলীয় জোটের সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচী। দেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। চারিদিকে শুধুই আতঙ্ক। চৌদ্দদলীয় জোটনেত্রীর আহ্বানে গতকাল থেকেই দেশের বিভিন্নস্থানে লগি-বৈঠার তান্ডবলীলা শুরু হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আব্বা-আম্মার নিষেধ সত্ত্বেও কোনমতে ম্যানেজ করে বেরিয়ে পড়েছি। রাস্তায় কোন গাড়ি চলছেনা যাওয়ার উপায় কি ? একটা ভ্যানে কোনমতে রাজবাড়ী এসে জেলা সভাপতিকে বললাম, মোটর সাইকেলে যতদূর পারাযায় এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে। আর ওদিকে ফরিদপুর রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কলেজ সভাপতিকে বললাম, মোটরসাইকেল নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে আসতে। রাস্তায় দেখলাম আতঙ্কিত মানুষের জটলা। আবার কোথাও ভাঙচুর করা বাসকে ঘিরে উৎসুক জনতা। যাক এভাবে ফরিদপুরে শিবিরের মেসে পৌঁছে সার্বিক খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করলাম। এখনও সব জনশক্তি ঈদ করে বাড়ি থেকে ফিরে আসেনি। অনেকে ফোন করে জানাচ্ছে, আব্বু-আম্মু আসতে বারণ করছে, কি করব ? জেলাআমীর ফোন করে জানালেন, বিকালে শহরে চৌদ্দদলের গণজামায়েত আছে, আমাদের সতর্ক থাকা দরকার, তুমি কিছু জনশক্তি নিয়ে ২টার মধ্যে জামায়াত অফিসে চলে আসো। এদিকে সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদ ভাই মোবাইলে সার্বিক খোঁজ-খবর নিয়ে কিছু পরামর্শ দিলেন এবং অঞ্চলের সকল শাখায় ম্যাসেজ পৌঁছাতে বললেন। একটু আগে আগেই রেডি হয়ে অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছি। টার্গেট মেসে রান্না না হওয়ায় কোন হোটেল থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া। কিন্তু দেখলাম ওদের লগি-বৈঠার আতঙ্কে হোটেলসহ অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ। বাধ্যহয়ে একটু দূরের হোটেলে গিয়ে



icsbook.info

দ্রুত খেয়ে জামায়াত অফিসে ছুটলাম। শহরের রাস্তায় রাস্তায় লগি-বৈঠা হাতে ওদের উস্কানিমূলক স্লোগান। ফরিদপুরের ঐহিত্যবাহী হাফেজ বিল্ডিংটি হচ্ছে জামায়াতের জেলা ও পৌরসভার অফিস। এই হাফেজ বিল্ডিংই হচ্ছে ফরিদপুর শহরে কোন মুসলমানদের প্রথম বিল্ডিং আর এই বিল্ডিং এর শুরু থেকেই জামায়াত এটাকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। ফরিদপুর শহরের প্রধান সড়কে এটি অবস্থিত হওয়ায় পলিটিক্যালি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একারণে যে কোন ইস্যুতেই অফিসে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হায়েনাদের জাতগত অভ্যাসে পরিনত হয়েছিল। জামায়াত অফিসে পৌঁছে দেখলাম জেলাআমীরসহ ১০/১২ জন নেতৃবৃন্দ বসে আছেন। রাস্তা দিয়ে ওদের খন্ড খন্ড মিছিল যাচ্ছে। মিছিলে জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল মুজাহিদ ভাই ও জামায়াত বিরোধী স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। বিশেষকরে জামায়াত অফিসের সামনে এসে যেন এ স্লোগান আরো জোড়ালো হচ্ছে। আর সব মিছিল থেকেই কম বেশি ইট পাটকেল জামায়ত অফিসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে ওদের আর ভুল হচ্ছেনা। আমাদের কিছু ভাই দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের মিছিল দেখছিল। তাদেরকে ভিতরে থাকার জন্য বলা হলো। ওদিকে ঢাকায় জামায়াতের সমাবেশে আওয়ামী লীগের বর্বর হামলার খবরে দায়িত্বশীলরা বেশ পেরেশান হয়ে পড়ছিলেন। কিছু ভাই টিভি রুমে বসে খবর দেখে আমাদের বৈঠকে এসে ইনফরমেশন দিচ্ছিলেন। ওদিকে গোপালগঞ্জ, মাদারী-পুর, শরীয়তপুরের ভাইয়েরা মোবাইলে তাদের অফিস বা মেসে হামলার খবর জানিয়ে করণীয় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। এছাড়া আরো অনেক জায়গার হামলার খবর আসছিল। মনে হচ্ছিল যেন, দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে আরো কিছু ভাই এসে উপস্থিত হয়েছে। সব মিলে হয়ত ৩০/৩৫ জন হবে। অফিসের নিচের মুসলিম বেকারির মালিক ফাখের ভাই এসে বললেন, অফিসে হামলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনাদের সাবধান থাকা দরকার। জেলাআমীর সবাইকে ডেকে দ্রুত আসরের নামায পড়ে নিতে বললেন। নামায শেষে কিছু ভাইকে নিচের মূল গেট আটকিয়ে অবস্থান নিতে বলা হলো, যাতে ওরা গেট ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। আমাদের কিছু ভাই গেটের কাছে অবস্থান নিতে না নিতেই একটা বড় মিছিল থেকে অফিসে আক্রমণশুরু হলো। নিচে ৪/৫ জন পুলিশকে দূরে নিরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। একটু দূরে জনতা ব্যাংকের মোড়ে অনুষ্ঠিত ওদের সমাবেশ থেকে মাইকে জামায়াত-শিবির বিরোধী বক্তব্য দিয়ে হামলা করার জন্য নেতাদের নির্দেশ দিতে শোনা যাচ্ছে। এরপর হাজার হাজার লোক জামায়াত অফিসের সামনের রাস্তায় অবস্থান নিয়ে একযোগে আক্রমণশুরু করল। অধিকাংশের হাতেই লগি-বৈঠা বৃষ্টির মতো ইট পাথর ছোঁড়া হচ্ছে জামায়াত অফিসের দিকে। বিল্ডিং এর নিচের দোকানগুলি আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জামায়াত অফিসের দোতালার রাস্তার দিকের জানালা দরজাও বন্ধ করা। দোকনের শার্টার এবং দোতালার দরজায় ইট পাথর পড়ে বিকট শব্দ হচ্ছে। দুই বিল্ডিং এর মাঝখানের মূল গেটে ওদের একদল এসে ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষ থেকে একটি ঢিলও ছোঁড়া হয়নি। কিন্তু দরজা ভেঙে ফেলার উপক্রমহলে দোতালার জানালা দিয়ে কিছু ইট পাথর ওদের উপর ছোঁড়া হলে ওরা গেট হতে কিছুটা পিছু হটে যায়। সামনের দিকে ওদের আক্রমণ আস্তে আস্তে



icsbook.info

তীব্র হচ্ছে। প্রথমে কিছুটা মনে হচ্ছিল ওরা হয়ত একটু পরে চলে যাবে। দেখা গেল নিচের দোকানগুলোর শার্টারগুলো ভেঙে ভিতরে ঢুকে লুটপাট শুরু করেছে। একপর্যায়ে ওরা পিছনের গাছ বেয়ে বেকারীর ছাপরার উপরে উঠে দোতালায় আক্রমণের চেষ্টা করে। কিছু ভাইকে দোতালার বারান্দায় ওদের প্রতিহত করার জন্য দাঁড় করিয়ে দিলাম। মূলগেটে দফায় দফায় আক্রমণকরছে কিন্তু দোতালায় জানালা দিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিহত করার জন্য ইট পাথর নিক্ষেপ করায় ওরা বেশিক্ষণ টিকতে পারছেনা। অফিসের পিয়ন তারা ভাইকে দেখলাম এক বালতি পানি নিয়ে দোতালা থেকে ছুঁড়ে মারতে। পলিটেকনিকের সদস্য বিপ্লব ভাইকে মাথায় রক্তাক্ত অবস্থায় গেট থেকে উপরে উঠে আসতে দেখলাম। এরপরই দেখি জামায়াতের নাসির ভাইয়েরও একই অবস্থা। এ দু'জনের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে কিছু ভাইয়ের মনটা দুর্বল হয়ে আসছিল বলে মনে হলো। আমি একটু হালকা ধমকের সুরে বললাম, আরে কিছুই হয়নি। এ পর্যায়ে প্রায় চারদিকে একযোগে আক্রমণচালাচ্ছে ওরা। নিচের ভাইয়েরা গেটে আরো লোক পাঠানের জন্য বলছে। একসাথে চারিদিকে আক্রমণপ্রতিহত কঠিন হয়ে পড়ে। মাত্র ৩০/৩৫ ভাই আর ওরা কয়েক হাজার। আর আমাদের একটা বড় অংশ হচ্ছে মুরব্বী। যাদের কারও হয়তো বসে বসে দুয়া করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলনা। গেটে শামীম আতাহার ভাইসহ বেশ কিছু ভাই জীবন বাজি রেখে শক্ত অবস্থান করায় আল্লাহর মেহেরবানীতে ওরা বার বার চেষ্টা করার পরও ব্যর্থ হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল গেট দিয়ে ওরা ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে বড় ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে। ওদিকে ৩/৪জন সামনের দোকানের শার্টার বেয়ে দোতালায় চলে আসে। ওদের হাতে হকিস্টিক, রামদা বা চাপাতি জাতীয় কিছু। আব্দুর রউফ ভাই এবং ফিল্কু ভাইকে দেখলাম দৌড়ে গিয়ে কিছু কিলঘুসি দিয়ে নিচে ফেলে দিল। এর ফলে পরে কেউ আর উপরে উঠতে সাহস করেনি। পিছনের বারান্দায় ইয়াছিন কলেজ সভাপতি ফারুক ভাই, মিন্টু ভাইসহ কয়েকজনকে বললাম, উচ্চস্বরে ধমক দিয়ে ইটের খোয়া ছুঁড়তে। ওরা পিছনে মই লাগিয়ে ছাপরার উপরে উঠে আসছে। আমরা একসাথে শোরগোল করে ঢিল ছোঁড়ায় ওরা অনেকটা ভয়ে নেমে গেল। চারিদিকে হাজার হাজার উৎসুক জনতা, অফিসের টেলিফোন লাইনটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এসপি ডিসি'কে ফোন লাগাচ্ছিলাম ফোর্স দিয়ে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু কোন সাড়া মিলছে না। শুনলাম ওসি সাহেবসহ কিছু পুলিশ এসে ওদের হাতে মার খেয়ে চলে গিয়েছে। চারিদিক থেকে শুধু ফোন আসছে ভিতরে কি অবস্থা, কি করছেন, বের হওয়ার চেষ্টা করেন। সামনে দিয়ে বের হলে ওরা পিটিয়ে মেরে ফেলবে। সেক্রেটারিজেনারেলকে ফোনে পরিস্থিতি জানালাম। উনি তখন পল্টনের সমাবেশের পাশ থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করছিলেন। আমি ফোনের মধ্যেই শোরগোল বোমা বা গুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। কি আর করা, আল্লাহর উপর ভরসা করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ছাড়া কিছুই করার ছিলনা। ভিতরের সবাইকে উজ্জীবিত রাখার জন্য উপর নিচ সব জায়গায় দৌড়াচ্ছিলাম। ওদের ছুঁড়ে মোরা ইট পাটকেল সংগ্রহের জন্য ঝুঁকি নিয়ে বারান্দায় যেতে হচ্ছিল। একটা পাথর জোরে আঘাত করল। ওসময় খেয়াল করার তেমন সুযোগ হয়নি। পরে দেখি রক্ত বের হচ্ছে। একপর্যায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে ওরা নিচতলায়



icsbook.info

পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন আস্তে আস্তে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ধুয়ায় ভিতরে আর টিকে থাকা যাচ্ছে না। ফায়ার সার্ভিসের গাড়িকে ওরা ঢুকতে দিচ্ছেনা। ওদের টার্গেট নেতৃবৃন্দসহ সবাইকে পুড়িয়ে মারা। ভিতরে সবার আগুন দেখে মন ভেঙে যাচ্ছে বলে মনে হলো। পৌরআমীর বদর ভাইকে দেখলাম সবাইকে উজ্জীবিত করার জন্য বলছে, প্রয়োজনে আমরা সবাই শহীদ হবো। মুরব্বীসহ অনেকের চোখে দেখলাম পানি। কাউকে দেখলাম ফোনে বাড়িতে শেষ দুয়া চাচ্ছেন। আমার মোবাইলটাও বেজে উঠল। দেখলাম বাড়ি থেকে মায়ের ফোন। স্বাভাবিক ভাবেই রিসিভ করলাম, কেমন আছো ঠিকমতো পৌঁছেছো? বললাম, ভাল আছি, অসুবিধা নেই, দোয়া করবেন। মোবাইলটা রাখার পরে মনে হচ্ছিল একটাই কি মায়ের সাথে শেষ কথা? বাইরে থেকে অনেক সুধী, খালাম্মা, সাথী, কর্মীদের ফোন করে কান্নাকাটি করতে দেখলাম। আগুন আস্তে আস্তে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নিচতলার জানালা দরজা ভিতরের আসবাবপত্র পুড়ে উপর তলার কোন কোন জানালা দরজায়ও আগুন লেগেছে। পুরনো দিনের বিল্ডিং হওয়ায় কাঠের উপর নিচতলার ছাদ করা ছিল। সে কাঠগুলিতেও আগুন ধরে চুন-সুড়কির ছাদ ঝুলে পড়েছে। বেকারির ছাপরায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। নেতৃবৃন্দকে বললাম, এ মুহূর্তে বের হওয়ার কোন সিদ্ধান্ত না নিলে সবাইকে পুড়ে যেতে হবে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় পিছনের দিকটা ওরা ছেড়ে চলে গেছে বলে মনে হলো। একজনকে বললাম দ্রুত পিছনের দিকটা ভাল করে দেখে আসতে। দেখে এসে জানালো, ওদের কাউকে দেখা যাচ্ছেনা। সিদ্ধান্ত হলো যত দ্রুত পিছন দিয়ে চলে যেতে। ওরা যে মই দিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করেছিল সেটা ওখানে ওভাবেই দেয়ালের সাথে লাগানো থাকায় নামতে সুবিধা হলো। যে ভাইয়েরা গেটের দায়িত্বে ছিলেন তাদের অন্য পাশ দিয়ে টেনে ছাপরার উপরে তোলা হলো। কারণ নিচ তলার সিঁড়ি তখন আগুন আর ধুয়ায় ভরপুর। সিরিয়ালে নামতে দেরী হওয়ায় ভাবলাম মাগরিবের নামায কাযা না করে অফিসে পড়ে যাই। সবার শেষের দিকে মই দিয়ে নামতে গিয়ে শার্টটা কোথায় যেন বেঁধে ছিঁড়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার আর পিছনে সেই নর্দমা। যেখানে রয়েছে সবার বাথরুমের ড্রেন বা পাইপের সংযোগ। কত বছর আগে থেকে ফেলা ময়লা আবর্জনা কাঁচ লোহার টুকরা তা কে জানে? নর্দমার গন্ধে অনেক সময় অফিসে বসা কষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আজকে তা মনে করার সুযোগ নেই। নেমে পড়লাম, এক পা দিয়ে উঠাতে না উঠাতে আরেক পা তলিয়ে যাচ্ছে। মনেহলো কাঁচের টুকরায় ডান পা খানিকটা কেটে গেল। কোনমতে পার হয়ে ওপারে গিয়ে কার বাসার পিছন দিয়ে যে উঠছি তা চেনার উপায় নেই। ওনারা বুঝতে পেরেছে আমরা কারা। এগিয়ে ঘরের ভিতরে নিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দিলে সারা শরীরের নর্দমার দুর্গন্ধযুক্ত কাদা হালকা মতো ধুয়ে নিলাম। বাড়ির মহিলারা এসে বলল, ভয় নেই এখানে কিছু সময় থাকেন। আমরা সুযোগমতো আপনাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিব। এখানে বেশি সময় থাকাটা নিরাপদ নাও হতে পারে ভেবে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় এসে দেখি লগি-বৈঠা হাতে ওদের একটা মিছিল যাচ্ছে। অন্ধকারে একটা ঘরের আড়ালে চলে গেলাম। পরে একটা রিক্সা ডেকে ভিতর রাস্তা দিয়ে মেসে না গিয়ে এক সুধীর বাড়িতে চলে গেলাম। পৌঁছে মোবাইলে সবার খোঁজ নিতে লাগলাম। ওদিকে



icsbook.info

অফিসের সামনে তখনও ওরা আগুনের তান্ডবতা দেখে উল্লাস করছে আর অপেক্ষা করছে কতজন পুড়ে মারা গেল তা দেখার জন্য। একপর্যায়ে প্রশাসনের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। ততক্ষণে নিচ তলার দোকানগুলি পুড়ে অনেকটাই শেষ। আর উপর তলার জানালা দরজা আলমিরাসহ অনেক কিছুই পুড়ছে। সেই সাথে আলমিরাতে রাখা কুরআন হাদীস ইসলামী সাহিত্যও রক্ষা পায়নি ব্রাহ্মন্যবাদী প্রেতাত্মা আওয়ামী বর্বরদের অভিশপ্ত আগুন থেকে। সবাই ঠিকমতো নিরাপদে পৌঁছে গেছে জেনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। বিকেল ৪টা থেকে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি বার বার মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল। আর মনে পড়ছিল সুরা বুরুজের ঐ আয়াতগুলির কথা– 'গর্তের মালিকরা ধ্বংস হয়েছে, যে গর্তে দাউ দাউ করে জ্বলা জ্বালানির আগুন ছিল। যখন ওরা ঈমানদারদের সাথে যা কিছু করছিল তা দেখছিল, ঐ ঈমানদারদের সাথে ওদের দুশমনীর এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিলনা যে, তারা এমন আল্লাহ প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি মাহাশক্তিমান ও যিনি কারো প্রশংসার ধার ধারেন না'।

---

*লেখক : কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# চলে গেলেন ফয়সাল ভাই

ডা. মুহা: হাফিজুর রহমান

২৮ অক্টোবর বেলা ৩টায় বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে জামায়াতের সমাবেশ মেডিকেল বিভাগের দায়িত্বশীল বলেছেন বেলা ২টায় নির্দিষ্ট জায়গায় চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রস্তুতি নিয়ে উপস্থিত থাকার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। ২টা অপারেশনের রোগি ছিল, তাই ১১টার দিকে অপারেশন শুরু করে দিলাম একটার মধ্যে শেষ করার নিয়তে। প্রথমটা হয়ে গেছে দ্বিতীয়টা প্রায় শেষের পর্যায়ে, বেলা তখন পৌনে একটার মতো। মহানগরী অফিস থেকে প্রথম ফোন এলো, আমাদের ভাইয়েরা আক্রান্ত হয়েছে এখনই মহানগরী অফিসে চলে আসুন। এরপর পরই আবার টেলিফোন সংবাদ। তাড়াহুড়া করে অপারেশন শেষ করে রওয়ানা দিলাম, ১:১০ এ মহানগরী অফিসে পৌছলাম। অবর্ণনীয় হৃদয়বিদারক দৃশ্য! সমানে আহত ভাইয়েরা আসছেন স্রোতের মতো সাড়ে তিন-চারটা পর্যন্ত একই গতিতে, জোহরের নামায আদায়ের ফুরসত পাচ্ছিলাম না। খন্দক যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল ঘটনাটা। ইতোমধ্যে হাসপাতাল থেকে ফোনে জানানো হলো ভাই মুজাহিদের শাহাদাতের কথা। সঙ্গে সঙ্গে তা জানানো হলো শিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল ভাই জাহিদুর রহমানকে।

৪টার দিকে যোহরের নামাজ আদায় করলাম। আহত ভাইদের আসা বন্ধ হয়ে গেল। একটু স্বস্তি নিয়ে বসে আছি। মাইকের আওয়াজ আসছে, ভাবলাম সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একটু পরেই আচমকা গুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ! অজানা আশংকায় আঁতকে উঠলাম। কিছুক্ষণ পর আবার সেই আহত ভাইদের স্রোত মাগরিব পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলল। পেরেশান হয়ে যাচ্ছি, বাইরে কী হচ্ছে কিছুই জানতে না পেরে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা/সাতটার দিকে আহত ভাইদের আগমন ধারা কমে আসল। হাসপাতালে ফিরে আসলাম। সেখানে আরেক কারবালা। ঢুকতেই শুনলাম ৪র্থ তলায় ভাই মুজাহিদ চিরনিদ্রায় শায়িত। দেখলাম ভাব ভাষা কোনটায় ছিলাম বর্ণনার মত নয়। ১১-১২ তলায় ছুটে গেলাম আহত ভাইদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য। ইতোমধ্যে হেড ইনজুরির এক ভাইয়ের মস্তিস্কের জরুরি অপারেশনের পর ইবনে সিনার



icsbook.info

আইসিইউতে পাঠানো হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল ও ফতুল্লার দিক থেকে ফোন আসল ২ভাই মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে আসছেন। ব্যবস্থা করার জন্য ফোনেই ইবনে সিনায় পাঠানোর কথা বলা হলো। আইসিইউ সাপোর্ট লাগবে এই ভেবে রাতে কেন্দ্রীয় ও মাহানগরী নেতৃবৃন্দ আসলেন আহতদের দেখার জন্য। রাত সাড়ে ১১টায় বাসায় ফিরলাম, রাতে কারোই ব্যক্তিগত পরিচয় জানতে পারলাম না।

## এক শহীদের মা

২৯ অক্টোবর সকালে হাসপাতালে আসলাম। অর্ধ শতাধিক ভর্তি ভাইদের চিকিৎসা ও এলাকা ভিত্তিক খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম, ফতুল্লার ২ভাই ছোট ভাই আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল ২৮ অক্টোবর এলাকায় আক্রান্ত সহোদর বড় ভাই ফাহাদ বিন আহসানকে বাঁচাতে গিয়ে হায়েনাদের হাতে আক্রান্ত হয়ে ইবনে সিনা আইসিইউতে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে আর সেই বড় ভাই ফাহাদ বিন আহসান মুমূর্ষু অবস্থায় আমাদের হাসপাতালে ১২১৪নং কেবিনে শায়িত। পাশে মা বসে আছেন, সান্ত্বনা দেবার ভাষা নাই। নেতৃবৃন্দ আসছেন, সেই মাকে নিয়ে সবার জন্য দোয়া করছেন। আইসিইউতে মুমূর্ষু ছেলের পাশে থাকার সম্ভব নয় বিধায় এই হাসপাতালেই অবস্থান নিলেন। ২-৩ দিন পর সকালে ভাই ফয়সলের শাহাদাতের খবর আসলো। এই ইবনে সিনা হাসপাতালেই বছর খানেক আগে প্রিয় বাবাজানকে বিদায় দিয়েছিল ভাই ফয়সাল। আজ নিজেই বিদায় নিল এ ধরাধামের হায়েনাদের নিষ্ঠুর আক্রমণের শিকার হয়ে। মা ছুটে গেলেন ইবনে সিনায়। কয়েক ঘন্টা পর শহীদের লাশ হাসপাতালে নিচ তলায় আনা হলো। ফাহাদ বিন আহসানকে হুইল চেয়ারে করে নিচে আনা হলো ছোট ভাইকে শেষবারের মতো দেখার জন্য, বিদায় জানানোর জন্য। নিয়তির কি পারিহাস। বড় ভাইকে বাঁচাতে এসে ছোট ভাই চিরবিদায় নিলেন। ভাই ফাহাদ বিন আহসান আরো ২-৩ সপ্তাহ ছিলেন হাসপাতালে, সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল এই যে, মা ও ভাইয়ের সবর ও সংযমের চরম পরাকাষ্ঠা! কখনই বুক চাপড়ানো চিৎকার করে কান্না বা আহাজারি পরিলক্ষিত হয়নি। এ যেন ইসলামের সোনালি যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আজো একই পথে মাহানগরী অফিসে যাই আমি। মনে হয় কোথায় কোন গলিতে যেন কোন ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে। বছর ঘুরে আবার সেই ভয়াল ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের ঘৃণ্যতম দিন ফিরে এসেছে। পরম করুণাময়ের কাছে একটাই আবেদন, আল্লাহপাক যেন আমাদের এই প্রিয় ভাইদের শাহাদাত কবুল করে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন। শত শহীদের রক্তাত ভূখন্ডকে সকল জাতীয়, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ভ্রুকুটি ছিন্ন করে নিজামে মোস্তফার জন্য কবুল করেন। আল্লাহুম্ম আমিন!

---

*লেখক: সুপারেন্টেডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল*



icsbook.info

# খুনিরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে

হাফেজা আসমা খাতুন

আমি দেশে বিদেশে যখনই কোনো মহিলা সমাবেশে বক্তব্য রেখেছি, মহিলাদের প্রধান প্রশ্ন ছিল, আমরা আমাদের সন্তানদের সমাজের এতো খারাপ পরিবেশ থেকে কিভাবে রক্ষা করবো? যেখানে সাড়া দেশে, গ্রামে-গঞ্জে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছেলেমেয়েরা ড্রাগ এডিকটেড হচ্ছে, মুসলমান ঘরের ছেলে-মেয়েরা নামাজ নেই। রোজা নেই, মেয়েদের পর্দা নেই, সিনেমা টিভিতে সর্বক্ষণ যৌনউস্কানিমূলক যুবক-যুবতীদের নাচ গানের, ঢলাঢলির দৃশ্য দেখানো হচ্ছে।

আমার জবাব ছিল, আপনার ছেলেমেয়েদের ভালো সঙ্গ দিতে হবে, যদি আপনি আপনার ছেলে সন্তানকে সমাজের এসব সর্বনাশা ক্ষতিকর কাজ থেকে রক্ষা করতে চান। কেননা প্রবাদই আছে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' বর্তমানে এ খারাপ পরিবেশ থেকে আপনার সন্তানকে রক্ষা করতে হলে আপনি আপনার সন্তানকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে বাংলাদেশের একমাত্র আদর্শিক সংগঠন, ইসলামী ছাত্র শিবিরে যোগদান করিয়ে দিন। বর্তমানে বাংলাদেশে তরুণ ও যুব সমাজের জন্য ইসলামী ছাত্রশিবিরের তরুণ যুবকরাই হচ্ছে আপনার সন্তানের জন্য একমাত্র ভালো সঙ্গ। শিবিরের তরুণরা, যুবকেরা প্রতিসপ্তাহে মহল্লার কোনো মসজিদে বা পরিচিত বাসায় একদিন সমাবেত হয়। তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাশাপাশি আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ ঐশিগ্রন্থ আল কোরআনের নৈতিক জ্ঞান, নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য এবং সর্বশেষ নবী, শ্রেষ্ঠনবী, মানবতার মুক্তিদূত, নারী মুক্তির দিশারী মহানবী (সা.) এর মহান শিক্ষার ভাণ্ডার আল হাদীসের জ্ঞানার্জনের জন্য এবং বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদদের জীবনী ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনায়, পর্যালোচনায়, প্রশ্নোত্তরে, সময় কাটায়। একত্রে সব তরুণরা, যুবকরা অজু করে নামাজ পড়ে। তাদের মতো তরুণ, যুবকদের মুখে আল কোরআনের নৈতিক শিক্ষামূলক জ্ঞানগর্ভ আলোচনায়, তাদের নম্র,



icsbook.info

ভদ্র ব্যবহারে, আচরণে তারা মুগ্ধ হয়ে শিবিরের নিয়মিত একজন সদস্য হয়ে যায়। এখন আর আপনার সন্তানকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না। দেখবেন শিবিরের উন্নত, নৈতিক চরিত্রের অধিকারী তরুণদের সাথে থেকে আপনার সন্তান একজন মুসলমান সন্তান হয়ে গড়ে উঠেছে। আপনার ছেলে এখন ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। আপনার ছেলের টেবিলে আপনি দেখতে পাবেন অর্থসহ কোরআন, অর্থসহ হাদীস, বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদদের লেখা ইসলামিক লিটারেচার। আপনার সন্তান এখন ক্লাসের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কোরআন হাদিসের জ্ঞানার্জনে, বড় বড় ইসলামিক বই পড়ে সময় কাটায়। এখন আপনার সন্তান টিভির খবর এবং ভালো কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো বাজে অনুষ্ঠান দেখতে মোটেও পছন্দ করে না। কারণ সে কোরআন সুন্নাহ থেকে এতটুকু নৈতিক জ্ঞানার্জন করেছে যে, নোংরা, নৈতিকতা বিবর্জিত ছায়াছবি দেখা হারাম। আপনার সন্তানকে আপনি লক্ষ্য করবেন এসব নোংরামী যৌন উস্কানিমূলক ছায়াছবি দেখলে সে চোখ নামিয়ে দেয় বা টিভি বন্ধ করে দেয়। এরাই হচ্ছে বর্তমান সময়ের খোদাভীরু, ইসলামিক আদর্শিক জ্ঞানে গুণান্বিত, পিতামাতা ও শিক্ষকের সবচেয়ে প্রিয় ছেলে, প্রিয় ছাত্র ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য তরুণেরা, যুবকেরা।

পিতামাতার ৩টি ছেলের মধ্যে যে ছেলে দু'টি শিবিরের সদস্য, তাদের সম্পর্কে পিতামাতার মন্তব্য– আমার এ ছেলে দু'টি খুবই ভালো। পড়াশুনায়, আচার-আচরণে, ব্যবহারে সবচেয়ে ভালো ছেলে আমাদের। আমাদের খুবই অনুগত ছেলে দু'টি আমার। আমাদের মনে কোনো সময় কোনো কষ্ট দেয় না।

শিবিরের ছেলেদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এরা নামাজ ও রমজানের ৩০ রোযা পালন করে নিষ্ঠার সঙ্গে। এরা কোনদিন শিক্ষকদের সঙ্গে বেয়াদবী করে না। পিতা-মাতার অনুগত সন্তান এরা। ভাই-বোনের প্রতি স্নেহশীল ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এরা, এরা বড়দের সাথে সালাম দিয়ে বিনয়নের সাথে কথা বলে। এরা নম্র, ভদ্র। এরা জীবনেও ড্রাগ এডিকটেড হবে না। কোরআন-সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞান এবং শিবিরের আদর্শিক নেতাদের সৎসঙ্গই এসব তরুণদের, যুবকদের সৎপ্রবণ, সৎকর্মশীল, নৈতিক, আদর্শিক চরিত্রবান যুবকে পরিণত করেছে। এদেরকে নিয়ে পিতামাতার ভাবনার কোনো কারণ নেই। শিবিরের সৎসঙ্গই আপনার সন্তানকে সমাজের যাবতীয় পাপ, অন্যায়, অনাচার, পাপাচার থেকে, সমাজের যাবতীয় খারাবী থেকে আপনার কলিজার টুকরা সন্তানকে রক্ষা করবে।

আমার জিজ্ঞাসা জাতির কাছে, শেখ হাসিনার কাছে– আওয়ামী নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে শিবিরের এমন চরিত্রবান, এমন পিতামাতার অনুগত, পাড়া প্রতিবেশীর প্রিয় ছেলেগুলোকে লগি-বৈঠা দিয়ে সাপের মতো পিটিয়ে হত্যা করল তার সোনার ছেলেরা, কোন্ অপরাধে? তাদের কি অপরাধ ছিল, শেখ হাসিনা বলবেন কি? শিবিরের তরুণেরা, যুবকেরা আল্লাহকে একমাত্র প্রভু মেনে নিয়েই তার নির্দেশ মতো জীবন-যাপনের পথ বেছে নিয়েছে এবং আদর্শ মানব, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করে জীবন পথে চলতে চায়, এই কি তাদের অপরাধ? এই অপরাধেই তাদের হত্যা করা হয়েছে। তাদের আর কোনো অপরাধ ছিলো না। এই অপরাধে যাদের হত্যা করা হয় তারাই প্রকৃত শহীদ। এসব শহীদের সম্পর্কেই আল্লাহতায়ালা পবিত্র



icsbook.info

কোরআনে এরশাদ করেছেন– 'এদেরকে তোমরা মৃত বলো না, এরা জীবিত। এরা আল্লাহর কাছ থেকে রিজিক পাচ্ছে। তোমরা বুঝতে পার না।' –(সুরা আল বাকারা)।

আল্লাহর পথে শহীদদের সম্পর্কে মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'এদের মৃত্যুকষ্ট পিঁপড়ের কামড়ের মতো। এরা মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করে না। এসব শহীদরাই একমাত্র বিনা বিচারে জান্নাতে যাবে।' সুবহানাল্লাহ। আল্লাহতালা তাদের এত সম্মানীত করবেন মৃত্যু পরবর্তী জীবন আখেরাতে। আর খুনি শেখ হাসিনা আর তার সোনার ছেলেদের মৃত্যুরপর কি অবস্থা হবে তারা ভেবে দেখছেন কি?

শহীদদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে– 'তাদেরকে দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই জনপদের কাহিনী শুনিয়ে দাও। সেখানে রাসূলগণ এসেছিল। আমি তাদের কাছে দু'জন রাসূল পাঠিয়ে দিলাম এবং তারা দু'জনকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। তখন তাদের সাহায্যার্থে আমি তৃতীয় জনকে পাঠিয়েছিলাম। তারা সবাই বলেছিল, তোমাদের কাছে রাসূল হিসাবে আমাদের পাঠানো হয়েছে।' জনপদের অধিবাসীরা বলল, আল্লাহ কোনো কিছুই নাজিল করেননি। তোমরা মিথ্যা বলছো।

রাসূলরা বললেন, আমাদের রব জানেন আমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের কাছে রাসূল হিসাবে পাঠানো হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের উপর আর কোনো দায়িত্ব নেই। জনপদের অধিবাসীরা বলতে লাগলো, আমরাতো তোমাদেরকে আমাদের জন্য অমঙ্গলজনক মনে করি। তোমার যদি বিরত না হও তাহলে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো। আমাদের হাতে তোমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। ইতিমধ্যে নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো এবং বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা। তোমরা রাসূলদের কথা মেনে নাও তারা তোমাদের কাছে কোনো পরিশ্রমিক চায় না এবং তারা সঠিক পথের অনুসারী, তাদের কথা মেনে নাও। লোকটি বলতে লাগলো, কেন আমি এমন সত্তার বন্দেগী করবো না, কেন তার আদেশ মেনে চলবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। কেন আমি তাকে বাদ দিয়ে অন্য উপাস্য বানিয়ে নেব? আমি তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি তোমরাও আমার কথা মেনে নাও। শেষ পর্যন্ত তারা লোকটিকে হত্যা করে ফেললো এবং বলল যাও প্রবেশ কর জান্নাতে। তখন লোকটি বললো, হায় আমার জাতি যদি জানত, আমার প্রতিপালক আমার সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে কত মর্যাদাশালী লোকদের মধ্যে সামিল করে নিয়েছেন। (সুরা ইয়াসীন, আয়াত-১৩-২৭)।

আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে, আল্লাহর কথা বলতে গিয়ে যারা আল্লাহর দুশমনদের হাতে নিহত হয়, তাদের সব অপরাধ আল্লাহতালা মাফ করে দেন এবং বিনা হিসাবে, বিনা বিচারে তাদের চিরস্থায়ী সুখের জান্নাতে স্থান দেন। এরাই আল্লাহর পথের শহীদ। তখন এসব শহীদরা খুশি হয়ে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে, আমরা যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম, আবার শহীদ হতে পারতাম, তিনবার তারা একথা বলবে। এতো শান্তির নিবাস তারা লাভ করবে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার বিনিময়ে। মাসুমের মা বললেন– আমার ছেলে ছোটবেলা থেকেই খালাত ভাইয়েরা মারলে কাঁদত। কিন্তু কোনোদিন পাল্টা মার দিতে জানতো না। আমি বলতাম, তুই কাঁদিস কেন? তুই



icsbook.info

মার দিতে পারিস না?' তিনি আরো বললেন, 'আমার ছেলের মুখের দিকে তাকালে তাকেতো কেউ মারতে পারে না। আমার ছেলের চেহারা কত সুন্দর, নম্র, ভদ্র। এর গায়ে কারা, কেমনে হাত তুলতে পারলো! কেমনে মারতে পারলো।' এই ছিল মাসুম শহীদের মায়ের আকুতি। শহীদ মাসুমের বোনটা ভাই-এর নৃশংস হত্যার দৃশ্য দেখে বোবার মতো হয়ে গেছে। কিছুই বলতে বলতে পারে না। কেমন জানি স্তব্ধ, নীরব হয়ে গেছে। কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না ভাই-এর হত্যাকাণ্ডের নৃশংস দৃশ্য। পাড়ার লোকেরা মাসুমের জন্য কত আফসোস করে। বলে ওর মতো ছেলে হয় না। ওর মতো ছেলেকে কেমনে মারতে পারলো তারাও বুঝে উঠতে পারেন না। আল্লাহর দুশমনদের প্রাণ পাষাণ, কঠিন তারা সবই পারে।

শিবিরের নেতা-কর্মীরা নৈতিক চরিত্রবান, খোদাভীরু, পিতামাতার এত অনুগত সন্তান, শিক্ষকদের প্রিয়ছাত্র, এদেরকে এমনভাবে, এমন নৃশংসভাবে লগি-বৈঠা দিয়ে সাপের মতো পিটিয়ে হত্যা করতে পারল শেখ হাসিনার সোনার ছেলেরা? শেখ হাসিনা এমন নম্র, ভদ্র, সুন্দর আচরণের অধিকারী নামাজী ছেলেগুলোকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মারতে নির্দেশ দিতে পারলেন কেমন করে? উনার কি দশা হবে? আল্লাহর কাছে উনার অপরাধের কি জবাব দেবেন তিনি?

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে বিনা অপরাধে একটি মানুষ খুন করলো, সে যেন সারা দুনিয়ার মানুষকে খুন করলো সাড়া পৃথিবীর মানুষের হত্যার দায় তার কাঁধে বর্তাবে। যে একটি নিরাপরাধ মানুষের জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সারা দুনিয়ার মানুষের জীবন রক্ষা করলো।' –(হাদিস)।

শেখ হাসিনার নিজের আত্মসমালোচনা করে দেখা উচিত, তিনি জীবনে কত মানুষের হত্যার নির্দেশ দিয়ে কত মানুষের হত্যার দায় নিজের কাঁধে বহন করেছেন। তিনি কিভাবে এ দায় থেকে মুক্ত হবেন? দুনিয়ায় যদি তিনি এ হত্যার দায় থেকে কোনো ফাঁক ফোঁকরে বেঁচে যেতে পারেন; আল্লাহর হাত থেকে একটুও বাঁচতে পারবেন না। যদি না তিনি অনুতপ্ত হয়ে এ হত্যার রাজনীতি পরিহার না করেন, আল্লাহ কাছে তার কৃত অপরাধের জন্য কেঁদে কেঁদে মাফ না চান।

২৮ অক্টোবর ২০০৬ সাল। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক চরম কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হয়েছে। আওয়ামী নেত্রী, খুনি শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী ডাকে সেদিন তার অনুগত কর্মীরা লগি-বৈঠা নিয়ে মিছিলে যোগ দেয় এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখ হাসিনার নির্দেশেই জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্রশিবিরের ওপর হামলা চালায়।

এরপর যেভাবে লগি-বৈঠা দিয়ে সাপের মতো পিটিয়ে জামায়াত-শিবিরের নির্দোষ নিরপরাধ, নিরস্ত্র, ছেলেগুলোকে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে লাশের উপর উল্লাসে নৃত্য করেছে, তা জাতিসংঘসহ বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে এবং ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে– এসব রাম, বাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিদের তাণ্ডব দেখে। এরা যে মানুষ নয়, এরা যে মানুষ নামের অযোগ্য, পাষণ্ড, খুনি পশুর চেয়ে অধম। এদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় শয়তানও ভয়ে পালিয়েছে। এদের লগি-বৈঠা দিয়ে পিটানোর দৃশ্য, লাশের ওপর উল্লাসের নৃত্যরত অবস্থায় এদের চেহারা, এদের



icsbook.info

মাথার চুল, এদের মুখ হাত, সুস্পষ্টভাবে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। এদের শুকনো হাত, লম্বাচুল, শুকানো লম্বা মুখ দেখেই মনে হয়েছে এরা নিশ্চয়ই ড্রাগ এডিকটেড। এদের গায়ের শার্ট, শার্টের রঙ, চেক সবই সুস্পষ্টভাবে দেখা গেছে। এ নৃশংস, নির্মম ঘটনার পর এব চিহ্নিত খুনিদের এখনো ধরা হচ্ছে না, এটা শহীদ পরিবারের জন্য এবং নীরিহ জনগণের জন্য খুবই মর্মান্তিক। যে খুনি, তাকে তো কোনো দলের বলে ছাড় দেয়া যাবে না। খুনিদের পরিচয় এরা খুনি, এরা মানুষ খুন করে। এদের আর কোনো পরিচয় নেই। এরা সব সময় খুনের নেশায় থাকে। পয়সা পেলেই এরা মানুষ খুন করবে।

খুনিরা যদি আল্লাহর কিতাব আল কোরআনের আইন অনুযায়ী কোরআনে বর্ণিত খুনের বদলা দিয়ে শহীদ পরিবারের কাছে মাফ না চায়, তাহলে খুনিরা কোনো দেশের কোনো আইনেরই ক্ষমা পেতে পারে না।

শহীদ পরিবারের সদস্যরা, সচেতন দেশবাসী এবং বিশ্বের সকল মানুষ, যারা স্বচক্ষে এ নৃশংস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে, তারা সবাই গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে এসব পাষাণ্ড খুনিদের বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য। এসব পাষাণ্ড খুনিদের বিচার করে দেশকে খুনিদের হাত থেকে মুক্ত করা, নাগরিকদের জীবনে শান্তি, স্বস্থি ফিরিয়ে আনা, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্ব।

এসব খুনিদের সমাজে বিচরণ করতে দিলে কোনো দিন সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না। খুনিরা দেশকে সামরিক শাসনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কাজেই সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে, নির্বাচনের আগে সমস্ত চিহ্নিত খুনিদের বিচার নিস্পন্ন করা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেশকে এ সমস্ত খুনিদের হাত থেকে রক্ষা করুন। শহীদের পরিবারের সদ্যদের অন্তরে শান্তি ফিরিয়ে দিন। শহীদের আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করুন, আমীন।

*লেখক: সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য*



icsbook.info

# পূণ্যভূমি সিলেটে
# ২৮ অক্টোবর ২০০৬

সিরাজুল ইসলাম শাহীন

ঘন্টা খানেক পর এসে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির সামনে আবারও সেই হোন্ডাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, তোফা ভাই এখনও বসে রয়েছেন। গতকাল কয়েকবার তাকে এভাবেই দেখেছি। ব্যস্ততম এ মানুষটিকে এখন বড় অবসর মনে হচ্ছে। মোবাইলেও যাকে পাওয়া মুশকিল, এমনকি মাসিক নেছাব আনার জন্য পাড়ার কর্মীরা যার সাক্ষাতে ব্যর্থ হন, তিনি আজ কয়দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের সাথে রাজপথে অবস্থান করছেন। কাজির বাজারের জিয়াউল ভাইকেও দেখলাম, মুচকি হাসি দিয়ে চিরাচরিতভাবে মাথা দুলিয়ে হোন্ডায় করে চক্কর দিচ্ছেন। ইউনিটের বৈঠক উনার অফিসে রাখলেও সময় হয়না জিয়াউল ভাইর বৈঠকে বসার। সেই ৮৮-৮৯ এর তুখোড় নেতাকে অনেক অনেক দিন পর ময়দানে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম, আর বসে থাকতে পারলেন না, দেলোয়ার ভাই। জবাবে মাথা নাড়লেন, চোখের কোণায় যেন পানি চিক চিক করে উঠল। ২৮ অক্টোবর '০৬ এভাবেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মী/শুভাকাঙ্খিদের ঘর থেকে বের করে এনেছিল। সকল ব্যস্ততা, ক্লন্তি, পিছুটান ভুলে গিয়ে হাজার হাজার জনতা অবস্থান নিয়েছিল রাজপথে, বুকে ছিল শাহাদাতের আকাঙ্খা আর মুখে ছিল স্লোগান– আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে পারেনা, মাযহার ভাইয়ের কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে।

## ২৮ অক্টোবর ০৬ সকালের সিলেট

২৭ অক্টোবর রাত সাড়ে বারটায় যখন সিলেটের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র কোর্টপয়েন্ট থেকে বাসায় ফিরি। তখন সিদ্ধান্ত ছিল ছাত্ররা সকাল ৮ঘটিকায় এবং অন্যরা সকাল ১০টায় ফিরে আসবেন। যথারীতি সকালে কোর্টপয়েন্টে ছাত্ররা উপস্থিত হওয়া শুরু করে। সকাল সাড়ে আটটার সময় দক্ষিণ সুরমা থেকে কিন ব্রিজ পেরিয়ে লগি বৈঠা বাহিনী অতর্কিত তাদের উপর হামলা চালায়। এখানে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির



icsbook.info

সিলেট মাহানগরী সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য মেধাবী ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম বাবুলের উপর আওয়ামী হায়েনাদের হিংস্রতা পশুত্বকেও হার মানায়। মাথার খুলীর ভিতরে প্রায় ১২টি ফ্রাকচার দেখে অভিজ্ঞ সার্জনরাও আঁতকে উঠেন। মুমূর্ষু অবস্থায় হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় নিয়ে ইবনে সিনা ও এ্যাপোলো হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে তিনি এখনও শতভাগ সেরে উঠেননি।

কোর্টপয়েন্টে পৌঁছার পূর্বে এ হিংস্র বাহিনী মাত্র ঘন্টা দেড়েকের অভিযানে অবিশ্বাস্য ধ্বংসলীলা চালায়। এ যেন ঝড়ের তান্ডবতা, যে দিকে গিয়েছে সব চুরমার করে দিয়েছে। কোর্টপয়েন্টের ঘটনার পর আরো কিছুটা সময় এরা সুযোগ পেলে পূণ্যভূমি সিলেটের অবস্থা যে কত ভয়াবহ করে তুলতে পারতো তা ভেবে আঁতকে উঠতে হয়। অবশ্য শাহজালালের উত্তরসূরীরা তাদের সে সুযোগ দেয়নি।

## জনতার প্রতিরোধ

শিবির সভাপতি আহত হওয়ার খবর বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ জনতা ঘর ছেড়ে আসতে থাকে। মাত্র ঘন্টা খানেকের ব্যবধানে চৌহাট্টা থেকে সহস্র বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল জিন্দাবাজার পয়েন্ট পাড়ি দিয়েই লগি-বৈঠা বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতার স্রোতের তীব্র প্রতিরোধের মুখে আওয়ামী হায়নারা মুহূর্তের মধ্যেই পালিয়ে যায়। সিলেট মহানগরীর রাজপথ তখন থেকেই আওয়ামী মুক্ত হয়ে ওঠে। আর বেঁচে যায় নগরীর সহায়-সম্পদসহ সাধারণ জনগণ। এ দিন রাজধানীর বায়তুল মোকারমের উত্তরগেটে পৈশাচিক হত্যাকান্ডসহ দেশব্যাপী আওয়ামী তান্ডবতা বিক্ষুব্ধ জনতার হৃদায়ে আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়ার মতো হয়ে ওঠে। দিনের পর দিন জনতা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসহ সিলেটের রাজপথে অবস্থান নিয়ে সিলেটসহ দেশব্যাপী লগি-বৈঠা বাহিনীর তান্ডবের প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু আওয়ামী মহলের রাজপথে ফিরে আসার সুযোগ হয়ে ওঠেনি দীর্ঘ দিন।

## রাজনীতির পরিহাস

স্মরণকালে রাজনৈতিক ইতিহাসে সিলেটের অনেক অঘটন থাকলেও শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সরাসরি অংশগ্রহণে এমন তান্ডবতা নজিরবিহীন। দুঃখজনক হলেও সত্য, ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এ ধ্বংসলীলায় নেতৃত্ব দেন মহানগর আওয়ামীলীগ এর সভাপতি ও সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, জেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি আ.ন.ম শফিকুল হক, আওয়ামীলীগ নেতা এডভোকেট মিছবাহ উদ্দিন সিরাজসহ সিলেটের আওয়ামী শীর্ষ নেতৃত্বের প্রায় সকলেই। প্রযুক্তির সুবাদে ভিডিও চিত্রে কোর্টপয়েন্টে ছাত্রনেতা বাবুলের উপর হামলাসহ প্রতিটি স্পটের তান্ডবতায় আওয়ামী শীর্ষ নের্তৃত্বের ভূমিকা দেখে হতবাক হতে হয়। অথচ আগের দিন বিকেলে মাত্র শ'খানেক লোকের জঙ্গি ট্রাক মিছিল নিয়ে মেয়র সাহেবসহ আওয়ামী নেতৃবৃন্দ চার দলীয় জোটের সুবিশাল মিছিলের পাশ ঘেঁষে ক্ষোর্টপয়েন্ট নিরাপদে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরের দিন ভোর থেকে আওয়ামী নেতৃত্বের এ ডিগবাজী ও সিলেটের দীর্ঘ দিনের রাজনীতির শিষ্টাচারের লঙ্ঘন তাদেরকে রাজনীতির খলনায়কে পরিণত করেছে। হটকারী রাজনীতি যে কত সুদূরপ্রসারী ক্ষতি ডেকে আনতে পারে আওয়ামী নেতৃত্বের এতদিনে তা বুঝে উঠার কথা।



icsbook.info

অপর দিকে চার দলীয় জোট তথা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এদিনের আওয়ামী তান্ডব শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছিল। তারা স্বতস্ফূর্ত হাজার হাজার জনতাকে সাথে নিয়ে দিনের পর দিন রাজপথে একের পর এক সফল কর্মসূচী পালন করেছে। ছয় বছর আগের শা.বি নামকরণ বিরোধী আন্দোলনে বিজয়ের মাধ্যমে যেভাবে ২০০১ সালের নির্বাচনে ৪ দলীয় জোটের বিজয়ের সোপান রচিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি আওয়ামী হিংস্র রাজনীতি পূন্যভূমি সিলেটবাসীর কাছে ২০০৬ সালে ধরাশায়ী হয়েছিল যা দেশব্যাপী তৎকালীন অরাজকতার বিরুদ্ধে ছিল প্রথম সফল প্রতিরোধ।

মহানগরী আমীর ড. শফিকুর রহমান ভাই ঘটনার কয়েক দিন পর একটি টেলিফোন রিসিভ করছিলেন– "শফিক ভাই, ২ বছর আগের আমার কথাটি আজ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আপনার জবাব আমি পেয়ে গিয়েছি। আপনারাই পারবেন।"

দুই বছর আগে এই ভদ্র লোকের সাথে উনার কথোপকথনটা ছিল–

"শফিক ভাই, আপনারা আগের মত আর ময়দানে ভূমিকা নিতে পারবেনা না"

"কেন ?"

" আগে আপনাদের সম্পদ ছিলনা, এখন টাকা হয়েছে, আর পারবেন না "

" আমি এ প্রশ্নের জবাব এখন দিবনা, সময়মত জবাব পেয়ে যাবেন"

সিলেটের রাজপথে জনশক্তির স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, আবেগ ও ত্যাগ দেখে এই ভদ্রলোকের মত সচেতন সিলেটবাসী ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। ২০০৬ সালের অক্টোবরের শেষ এবং নভেম্বরের শুরুর এই উত্তাল দিনগুলোর কর্মী/শুভাকাঙ্ক্ষীদের চেহারাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলে মনে হয়ে যায় আল কুরআনের সেই আয়াতটি– "তোমরাই আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে পারো, যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করতে প্রস্তুত আছো।"

---

*লেখক : সাবেক দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# আওয়ামী লীগের রাজনীতি
# গঠনমূলক না ধ্বংসাত্মক!

মুহাম্মদ শামসুল আরেফিন হাসিব

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১৯৫০ সালে জন্ম নেয়া বাংলাদেশের সবচাইতে পুরনো এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বাদানকারী দল। যার নেতৃত্বে একসময় ছিল হোসেন শহীদ সহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা, এ.কে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মতো উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ। যদিবা তখন আওয়ামী লীগের নাম আওয়ামী লীগ ছিল না- ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় আওয়ামী লীগ। ৭মার্চের ভাষণে শেখ মুজিব সাহেব জাতিকে সাম্ভাব্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে কোনো এক অদৃশ্য কারণে পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে অসহায় বাংলাদেশীদের বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে পাকিস্তান চলে যান। এরপরের ইতিহাস হলো বীরত্ব গাঁথা। যা রচনা করেছে আমাদের বীর দামাল ছেলেরা, কৃষক-শ্রমিক, কুলি-মজুর, ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষ এতে সহযোগিতা করেছে যার যার সাধ্য অনুযায়ী। মা তার সন্তানকে, স্ত্রী তার স্বামীকে দেশ মাতৃকার জন্য পাঠিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে এবং লক্ষ শহীদ ও মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি লাল-সবুজের পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি দেশ নাম তার বাংলাদেশ। ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনার পর দেখা গিয়েছিল বাঁধ ভাঙা সিপাহী-জনতা উল্লাস। যাহোক দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একে একে আওয়ামী লীগের যে সমস্ত নেতারা ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা ধীরে ধীরে চোরের মতো বাংলাদেশে আসতে থাকে। এদেশের সাধারণ মানুষ তাদের এই ন্যক্কারজনক কাজের পরেও ক্ষমা করে দিয়েছিল। কারণ এদেশের মানুষ চেয়েছিল সকলে মিলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে দেশকে পরিচালিত করার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে উঁচু করে দাঁড় করাতো। তাই এদেশের মানুষ সকল দুঃখ-ব্যথা ভুলে



icsbook.info

গিয়ে আওয়ামী লীগের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসার পর দেশের সাধারণ মানুষের ভালোবাসাকে দুর্বলতা মনে করে দেশ গঠন করার পরিবর্তে নিজের দলীয় লোকদের পুনর্বাসনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ব্যাপক পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, শিল্প-কারখানায় ধ্বংসযজ্ঞ, ব্যাংকসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুটতরাজের ঘটনা। এ ঘটনার সাথে তার পরিবারের সদস্যদেরও জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগ পাওয়ার পরেও তিনি তা আমলে নেননি। '৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের কথা কে না জানে? পরিকল্পিতভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের হত্যা, মানুষের ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও সহায়-সম্পদ লুট করা ইত্যাদি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেক্যুলার রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে শেখ মুজিব সরকার জঘন্য কিছু কাজ করে। যার মধ্যে সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' উচ্ছেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কুরআনের আয়াত 'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক', সলি-মুল্লাহ মুসলিম হলের নাম পরিবর্তন করে সলিমুল্লাহ হল, কবি নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলামকে বাদ দেয় তারা। নিজেদের এই অপশাসনের বিরুদ্ধে কেউ যেন কথা বলতে না পারে তার জন্য দলীয় আজ্ঞাবহ মাত্র ৪টি পত্রিকা রেখে বাকি সব পত্রিকা বন্ধ করে বাক স্বাধীনতাকে হরণ করেন তিনি। শুধু তাই নয় ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ করে এবং দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে ভুলণ্ঠিত করে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করার মধ্যদিয়ে গণতন্ত্রের কফিনে মেরে দেন শেষ পেরেক। যার অনিবার্য বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। বাংলাদেশে যেন এক নতুন সূর্যোদয় হয়। যদিও ১৫ আগস্ট যে ঘটনা হয়েছে তা দুঃখজনক কিন্তু এদেশের মানুষের বোধ হয় এর থেকে ভালো বিকল্প তাদের সামনে ছিলো না।

৭৫ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যা আমাদের দেশের সকল মানুষের কাছে স্পষ্ট। এর মধ্যে ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের ঘটনা সকলেরই জানা আছে। জেনারেল জিয়াউর রহমানকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে সিপাহী-জনতা মুক্ত করে ক্ষমতায় বসানোর পর থেকে শুরু হয় বাংলাদেশের নতুন এক অধ্যায়। দেশ এগোতে থাকে উন্নয়ন, শান্তি ও সম্মৃদ্ধির পথে। সংবিধানে সংযোজিত হয় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, সকল রাজনৈতিক দলকে রাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু থেমে থাকেনি আওয়ামী লীগের চক্রান্ত। আওয়ামী লীগের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে বিপথগামী কিছু উচ্চাভিলাসী সামরিক কর্মকর্তা ১৯৮১ সালে মে মাসে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে। পরবর্তী পর্যায়ে সামরিক জান্তা জেনারেল এরশাদের রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের কাছ থেকে অন্যায় ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যদিয়ে দেশে আবার অশান্তির ছায়া হাজির হয়। এই স্বৈরশাসকের সাথেও ছিল আওয়ামী লীগের সহযোগিতার হাত। যখন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে এবং এদেশের সকল রাজনৈতিক দলসমূহ এরশাদকে হটানোর জন্য প্রস্তুত– ঠিক সেই সময় ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের এক জনসভায় ঘোষণা করলেন যারা স্বৈরশাসকের অধীনে সাজানো নির্বাচনে অংশ নিবে তারা হবে 'জাতীয় বেঈমান'। কিন্তু দেখা গেলো মাত্র ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে নিজের দেয়া ঘোষণাকে জলাঞ্জলি



icsbook.info

দিয়ে ঢাকার এসে রাতের অন্ধকারে তিনি এরশাদের নির্বাচনে অংশ নিলেন। জনগণ কিন্তু তখন তাকে তার দেয়া 'জাতীয় বেঈমানের' খেতাব ঠিকই পরিয়ে দিয়েছিল। '৯১ সালের নির্বাচনের পর তৎকালীন সরকারকে সহযোগিতা করার পরিবর্তে লাগাতার হরতাল, অবরোধ, সংসদ বর্জন এমনকি সরকারি আমলাদের নিয়ে 'জনতার মঞ্চ' তৈরি করার মধ্যদিয়ে গণতান্ত্রিক ধারাকে ব্যাহত করতে থাকে তারা। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে মাথায় পট্টি ও হাতে তসবিহ নিয়ে অতীতের ভুল-ত্রুটির জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে মাত্র একটিবারের জন্য তাকে ভোট দেয়ার জন্য আবেদন জানান। তিনি নিজেকে একজন ধর্মনিরপেক্ষ নেত্রী হিসাবে পরিচিত করার পাশাপাশি যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করে তাদের প্রতিহত করতে চান, সেই নেত্রীর ১৯৯৬ সালের এই আচরণ তার দলের অনেকের সাথেই দেশের সচেতন নাগরিকগণ মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু দেশের সাধারণ জনগণ তার এই ধোঁকায় পড়ে যায়। সেই সঙ্গে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী শক্তি আলাদা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কারণে দেশবাসী ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তারপরেও তারা আওয়ামী লীগকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে দেয়নি। বরং তারা তাদের ভোট ভাগাভাগি করে দিয়েছে। যাহোক, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ, এরশাদের জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য ছোট-খাট কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা নিয়ে সরকার গঠন করে। এদেশের জনগণ ভাবে এই আওয়ামী লীগের সাথে ৭২-৭৫ এর আওয়ামী লীগের অনেক পার্থক্য আছে। তাই তাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। ২১ বছর পর ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয় অতীতের ধারাবাহিকতায় নির্লজ্জ দলীয়করণ আর আত্মীয়করণ, জেলায় জেলায় গডফাদার তৈরি করার মাধ্যমে সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী প্রশ্রয় দিতে থাকেন তিনি। ফেনীর জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের আবু তাহের, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, বরিশালের আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, গফরগাঁওয়ের আলতাফ গোলন্দাজসহ আরো অসংখ্য গডফাদারের অত্যাচার আর নির্যাতনের কথা শুধু বাংলাদেশের মানুষ নয় গোটা পৃথিবীর মানুষ জানতো। গণতন্ত্রের মানসকন্যা খ্যাত শেখ হাসিনা তাদের কাজের সার্টিফিকেট দিয়ে বলেন, 'দেশের প্রত্যেক জেলায় একজন করে জয়নাল হাজারী থাকলে নাকি তার জন্য দেশ চালাতে সুবিধা হতো।' চট্টগ্রামে যেয়ে বলেন, 'একটার পরিবর্তে দশটি লাশ চান তিনি' তার আমলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদি দল হরকাতুল জিহাদ, যাদের নেতৃত্বে চালনো হয় আত্মঘাতি বোমা হামলা। এছাড়া সারা দেশে অনেক জায়গায় বিশেষ করে যশোরের উদীচীর অনুষ্ঠানে, নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ অফিসে, রমনার বটমূলে বোমা হামলা চালানো হয় যার কোনো একটিরও কূল-কিনারা করতে পারেনি আওয়ামী লীগ সরকার। বোমার স্প্লিন্টার দেখে সনাক্ত করা হয়েছিল এগুলো এসেছে পার্শ্ববর্তী একটি দেশ থেকে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ইসলামী দলসমূহের উপর এর দায়ভার চাপিয়েছে এই বোমা হামলার জন্য। টার্গেট ছিল একটিই– পিতার মতো বাকশালী কায়দায় এদেশ থেকে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা। সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা-মামলা ও জুলুম-নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়েছে তারা জনগণের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য তৈরিকৃত তথাকথিত 'জননিরাপত্তা আইন' সংসদে পাস করানোর মাধ্যমে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম শায়খুল



icsbook.info

হাদিস মাওলানা আজিজুল হককে জেলে দিয়েছে মানুষ খুন করার মিথ্যা অজুহাতে, জেলে দিয়েছে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মুফতি ফজলুল হক আমিনীসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদেরকে। তারা তাদের লালিত পেটুয়া বাহিনী আর পুলিশ-আনসার বাহিনীকে দিয়ে বিরোধী দলসমূহকে দমন করার পাশাপাশি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমকেও তারা পুলিশের বুট দিয়ে পাড়িয়ে অপবিত্র করেছে। ৫ ও ৬ এপ্রিল ২০০১ সালে বায়তুল মোকাররম উত্তরগেট ও বায়তুল মোকাররম মসজিদের ভেতর থেকে সহস্রাধিক নিরীহ মুসল্লিকে ধরে নিয়ে জেলে পুড়েছে। মুসলমানদের সুন্নতি টুপিকে পর্যন্ত তারা কুকুরের মাথায় পরিয়েছে। এই হলো আওয়ামী লীগের আসল চেহারা যা দেশের মানুষ দেরীতে হলেও বুঝতে পেরেছিল।

এতে কিছুর পরও তারা যখন ২০০১ সালে ১৩ জুলাই রাত ১২টায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তখন তাদের ছিলো সাজানো বাগান। রাষ্ট্রপতি তাদের দলীয়, প্রধান বিচারপতি কমিশনারসহ সকল কমিশনারবৃন্দ তাদের দলীয় লোক, প্রশাসনে তাদের আজ্ঞাবহ লোকের ছড়াছড়ি। তাই তারা ভেবেছিল জনগণ যে দিকেই থাকুক না কেন তারা পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে। তাইতো দেখা যায়, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনের দিন রাত ৮টা পর্যন্ত শেখ হাসিনা বললেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে। কিন্তু যখনই দেখলেন তাদের প্রার্থীদের ভরাডুবি এবং নির্বাচনের ফলাফল তার বিপক্ষে তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে 'স্থুল কারচুপি' হয়েছে। জনগণের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে চারদলীয় ঐক্যজোট দুই-তৃতীয়াংশ আসন সরকার গঠন করলো। কিন্তু তিনি বললেন, নির্বাচন মানিনা, শপথ নিব না, সংসদে যাবো না এবং একদিনের জন্যও এই সরকারকে শান্তিতে থাকতে দিবো না। সত্যিই শেখ হাসিনা চারদলীয় জোট সরকারকে শান্তি থাকতে দেয়নি।

সরকার গঠনের পর থেকেই শুরু হয় সরকার এবং দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার লক্ষ্যে কথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পকাহিনী তৈরি এবং তা নিয়ে বিদেশে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্প-কাহিনীর নায়ক শাহরিয়ার কবীর ধরা পড়ে গেলে দেশবাসীর কাছে তা ফাঁস হয়ে যায়। অথচ জোট সরকার যে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে কত আন্তরিক তা বিগত শাসনামলে দিকে থাকলে বুঝা যাবে। জোট সরকারের সময় এক সাথে রোজা ও পূজা পালিত হয়েছে কিন্তু কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে কেউ তা বলতে পারবে না। বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রমাণের জন্য চেষ্টা করা এবং বিদেশীদের কাছে যেয়ে দেশের দুর্নাম করা এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা। লক্ষ্য ছিলো, দেশে যেন একটি হামিদ কারজাই মার্কা সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। দেশে জঙ্গি আমদানি করে আদালত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা করে সাধারণ জনগণের মাঝে ভীতি তৈরিতে তারা ছিলো অত্যন্ত তৎপর। স্বাভাকিভাবেই এর দায়-দায়িত্ব ইসলামী দলগুলোর ওপর চাপানোর কৌশল গ্রহণ করে তারা। কিন্তু সকলেই জানে এর মূল হোতা কারা! আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মির্জা আযমের আপন ভগ্নিপতি হলো শায়খ আব্দুর রহমান। জোট সরকার যখন তাদের কঠিন হস্তে দমন করে বিচার কাজ আরম্ভ করলো তখন তারা বেহায়ার মতো বলতে থাকে এগুলো নাকি জোট সরকারের সাজানো নাটক। জাতি তখন উপলব্ধি করতে পারে



icsbook.info

তাদের অতীত ইতিহাসের কথা। তাদের এ কার্যকলাপ দেখে মনে হয় সেই কথা 'ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাই না।' অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবিতে একের পর এক হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ পালন করে সরকারকে এক বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চেষ্টা করে তারা। গার্মেন্টস শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য একের পর এক পরিকল্পিতভাবে গার্মেন্টসসমূহের শ্রমিক অসন্তোষের নামে একদিকে যেমন কোটি কোটি টাকার ক্ষতি সাধন করে অপরদিকে বিদেশী বাজার হারানোর সর্বত্মক প্রচেষ্টা চালায়। দেশের কল-কারখানা ধ্বংস করার মধ্যদিয়ে তারা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার সাথে সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী একটি দেশের বাজার বানাতে চায় এদেশে। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যখন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে সামনের দিকে এগুচ্ছিলো তখন তারা দেশে এমন এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো যাতে বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। সংবিধানের বিরোধী দলের ভূমিকার কথা বলতে বলা হয়েছে বিরোধী দল হলো ছায়া সরকার। তারা সংবিধানের এই কথাকে তোয়াক্কা না করে সরকারকে সহযোগিতার পরিবর্তে কেবলই অসহযোগিতাই করেছে। নিজেদের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা যাতে বন্ধ না হয়ে যায় এজন্য কালে-ভদ্রে সংসদে যেয়েও সংসদ অকার্যকর করার চেষ্টা করেছে। অসম্মাজনক কথা বলার রাণী শেখ হাসিনা বিনা কারণে বারবার সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছে।

চারদলীয় ঐক্যজোটের ক্ষমতা হস্তান্তর যাতে নির্বিঘ্নে না হয় এ জন্য সকল আয়োজন করে রাখে তারা। সংবিধান অনুযায়ী সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধানবিচারপতি কে.এম হাসানকে তারা বিতর্কিত করে তুলে এবং কর্মকাণ্ড করে যার ফলে কে.এম হাসান ক্ষমতা গ্রহণের অপরাগতা প্রকাশ করে। ২৮ অক্টোবর থেকে লাগাতার অবরোধের কর্মসূচি চলার সময় সম্পূর্ণ অন্যায় ও বিনা উস্কানিতে জামায়াতে ইসলামীর সামবেশে হামলা চালিয়ে ৬ জন নেতা-কর্মীকে লগি-লাঠি ও বৈঠা দিয়ে অমানবিক ও পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করে। যা হিটলার ও নাৎসির বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। মাত্র দুই/একদিনের ব্যবধানে তারা গোটা দেশে ৭২ জন বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীদের হত্যা করে। এর মধ্যদিয়ে তারা প্রমাণ করেছে তারা কত ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক। রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সাহেব সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার পরেও তারা তাদের অযৌক্তিক দাবি উপস্থাপন করতে থাকে। লক্ষ্য একটাই দেশে যেন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারে। যদিও তারা মুে বারবার বলে যে, তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। যদিও এখন তারা নির্বাচনে আসার ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু তার আগে তাদের দাবি ছিল অসংখ্য। তাদের দাবিসমূহ ছিল যথাক্রমে কে.এম হাসান প্রধান উপদেষ্টা হতে পারবেনা, যখন তিনি বিব্রতবোধ করলেন তখন তারা দাবি করলো এম.এ আজিজ প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকলে তারা নির্বাচনে আসবে না, এম.এ আজিজ ছুটিতে গেলে তারা বলল নির্বাচন কমিশনার স ম জাকারিয়াকে সরে যেতে হবে আর ভোটার লিস্ট সংশোধন করে দেশের সকল রিটার্নিংঅফিসে টানিয়ে দিতে হবে যা অতীতে নিজেরা তো করেইনি এবং কখনই এটা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ এই দাবিসমূহ ঠিকই আদায় করে নিয়েছে কিন্তু তার বিনিময়ে দেশ এবং দেশের মানুষকে দিতে হয়েছে ২২ দিনের দুর্বিসহ



icsbook.info

হাজতবাস, প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি ও বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট, ৫৭টি তরতাজা জীবন, অসংখ্য আহত-পঙ্গুত্ব, রাজনৈতিক সংঘাত সংঘর্ষ। কিন্তু এতকিছুর পরেও দেশের মানুষকে বোকা ভেবে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ আমেরিকান চেম্বার্স অব কমার্স আয়োজিত সেমিনারে বললেন, দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রের জন্য এরকম কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়, আর আওয়ামী লীগ যদি ক্ষতায় আসতে পারে তাহলে নাকি ব্যবসায়ীদের এই ক্ষতি পুষিয়ে দিবেন। কিন্তু কোত্থেকে দিবেন, কিভাবে তা কিন্তু ব্যবসায়ীদের তিনি বলেননি।

আওয়ামী লীগ বারবারেই বলে তারা নির্বাচনের দল। কিন্তু নির্বাচনে তখনই তারা অংশগ্রহণ করে যখন মনে করে নির্বাচনে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। ৫৬ বছরের আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশকে কি দিতে পেরেছে এখন সেটাই প্রশ্ন। দুইবার তারা এদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিল ৭২-৭৫ সালে ও ৯৬-০১ সালে। তাদের শাসনামলে তারা দেশটিকে বানিয়েছিল তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ, দুর্ভিক্ষ, সন্ত্রাস আর গডফাদার পরিপূর্ণ। যখনই তারা ক্ষমতায় এসেছে তখনই দেশের মানুষকে জিম্মি করে তাদের স্বার্থ হাসিল করেছে। মসজিদ-মাদরাসা ধ্বংস করেছে, আলেম-ওলামাদের কষ্ট দিয়েছে, দেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এখনো তারা বলছে আবার ক্ষমতায় আসতে পারলে দেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানাবে। '৭২ এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। এখন দেশপ্রেমিক জনতাকে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সজাগ রাখতে হবে। কি তাদের আসল চেহারা। এরা আসলে কি চায়! ক্ষমতায় আসতে পারলে দেশকে ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত করতে তারা সামান্যতম কুণ্ঠিত হবে না, যেমনি হয়নি '৯৬-০১ সালে। ভারতে যেয়ে বারবার যাকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেয়ার পরও যিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় তার কাছ থেকে দেশের কি কল্যাণ আসতে পারে। যেই দল বা নেত্রীর দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর ওপর সামান্যতম আস্থা নেই, যিনি দেশের মানুষ এমনকি নিজ দলের নেতা-কর্মীদের বিশ্বাস করতে পারেন না সেই নেত্রী বা দলের এদেশের জন্য কতখানি প্রয়োজন তা দেশের মানুষের কাছে আজ পরিষ্কার। আজ সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেয়ার। সঠিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনের বাংলাদেশের ভবিষ্যত। আমাদের বিশ্বাস ৫২ ভাষা আন্দোলন, '৭১ স্বাধীনতা সংগ্রাম, '৭৫ ৭ নভেম্বর, '৯০ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং ২০০১ সালে নব্য স্বৈরাচারদের বিরুদ্ধে দেশ-প্রেমিক জনতা যেভাবে তাদের অবস্থানকে পরিষ্কার করেছেন আজও তার ধারাবাহিকতায় এদেশের জনগণ সেই জবাব আরেকবার দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আমরাও তাকিয়ে আছি সেই সোনালী দিনের প্রত্যাশায়।

---

*লেখক : সভাপতি- ঢাকা মহানগরী উত্তর, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# স্মৃতির পাতায়
# ২৮ অক্টোবর

ডা: মো: ফখরুদ্দিন মানিক

বেশ কিছুদিন থেকে রাজনৈতিক ময়দান ছিল উত্তপ্ত, আওয়ামী লীগের ইস্যুবিহীন হরতাল অবরোধ, ডেডলাইন, ট্রাম্প কার্ডের ঘোষণাগুলো যখন দেশকে অকার্যকর ও অস্থিতিশীল করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং সরকার পতন আন্দোলনে ও জনগণের সমর্থন আদায় করতে পারছে না, তখন তারা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে তাদের নেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণার আলোকে রাজধানীতে লগি বৈঠা এবং লাঠি নিয়ে আসার কর্মসূচী তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে নতুন মাত্রার যোগ করেছে। ২৮ অক্টোবর চার দলীয় জোটের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তারা বিভিন্ন জায়গায় দলীয় সমাবেশের আয়োজন করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইট, বিএনপি মুক্তাঙ্গনে সমাবেশের ঘোষণা দেয়। ঠিক একই সময়ে আওয়ামীলীগ পল্টন ময়দানে তাদের সমাবেশের ঘোষণা দেয়। কিন্তু পল্টন ময়দানে বিএনপি'র একটি অংগ সংগঠনের পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশ থাকায় কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারি করে দু'দলকে সমাবেশ করতে নিষেধ করে।

আওয়ামী লীগ তাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পল্টন ময়দানে সমাবেশ করতে গিয়ে পুলিশ কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তাঙ্গনে অবস্থান নিয়েছে। তবে বিএনপি মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ করার কথা থাকলেও কার বা কিসের ইঙ্গিতে তাদের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ স্থানান্তর করেছে এবং সেই সমাবেশের কার্যক্রম চালাচ্ছে।

বেলা তখন প্রায় ১১টা। এই স্পটটাতে দেখি আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের সবাইকে সারিবদ্ধভাবে পশ্চিম দিকে মুখ করে পল্টন মসজিদের সাথে রাস্তাটিতে দাঁড়াতে বলছি। এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যেন খাব্বাব (রা.), বেলাল (রা.), খালিদ (রা.) এর প্রতিচ্ছবি যারা জ্বলন্ত কয়লার উপর শুয়েও ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়নি, উত্তপ্ত বালুর পাথর চাপা দেয়ার পরও যে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়নি, ঠিক তেমনি আমাদের ভাইয়েরা এই ইস্পাত কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে



icsbook.info

দাঁড়িয়ে আছে। আওয়ামী ফ্যাসীবাদি শক্তির কাছে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের এতটুকু অমার্যাদা হতে দিবেনা। সবাইকে দাঁড়াতে বলে কিছু নির্দেশনা দিচ্ছি, ঠিক এমন সময় দেখি একটি বিশাল মিছিল হাতে লগি-লাঠি-বৈঠাসহ কিছু উত্তেজনাকর শ্লোগান দিতে দিতে কাকরাইলের দিক থেকে মুক্তাঙ্গনের দিকে যাচ্ছে, আমাদের সবাইকে ঐ দিকে না তাকিয়ে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য বললাম, ইতিমধ্যে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন মহানগরী পূর্বের সেক্রেটারি রফিক ভাইয়ের নেতৃত্বে ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক। এই দশ জনসহ সবাইকে দাঁড়ানোর জন্য বলছি ঠিক এমন সময় মেইন রাস্তা থেকে আওয়ামী লীগের মিছিলের একটি অংশ গলিতে ঢুকে আমাদের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে করতে এগিয়ে আসে, প্রাথমিক অবস্থায় আমরা কিছুটা পিছনে সরে আসি, তাদের নিক্ষিপ্ত ইটগুলো কুড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলে তারা পিছনের দিকে পালিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের মিছিলের ১ম অংশটি পল্টন মোড়ে আসামাত্রই আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের উপর আক্রমণ করে। আমাদের এখান থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে সবাইকে আবার সংগঠিত হওয়ার জন্য বলছি। দেখি আওয়ামী লীগের আরো একটি বিশাল মিছিল এডভোকেট সাহারা খাতুনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে, এই মিছিলটিও আমাদের গলিতে ঢুকে পড়ে। শুরু হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া- যতদূর সম্ভব আমি এবং রফিক ভাই সবাইকে নিয়ে আমাদের অবস্থান থেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। হাজার হাজার উন্মাদ লাঠি-বৈঠাধারী মানুষের সামনে আমরা ৩০/৩৫ জন তাদের নিক্ষিপ্ত ইট ও লাঠি দিয়ে মোকাবেলা করছি। এরমধ্যে আমাদের বেশ কিছু ভাই আহত হয়ে পড়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার পর দেখি আমাদের বেশ কিছু ভাই আহত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছু ভাইকে জামায়াত অফিসের পাঁচ তলায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আর কিছু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোন দিকে গিয়েছে বলতে পারিনা। তবে হিসাব করে দেখলাম আমরা যারা ছিলাম তার অর্ধেক ভাই নাই, অধিকাংশ ভাই এখানে যারা আছেন তারাও মাথা, মুখ ও হাতে জখম ও রক্তাক্ত অবস্থায়। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি আমাদের একজন ভাই রাস্তায় পড়ে আছে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে একটু তাকিয়ে চিনার চেষ্টা করি। তার সমস্ত মুখমন্ডল রক্তাক্ত। চেনা যাচ্ছে না, জামা কাপড় দেখে চিনতে পারলাম তিনি আমান ভাই। যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থেকে আমাকে সাহস দিচ্ছিলেন। লোকজনকে ডাকার জন্য সামনে আগানোর জন্য বলছিলেন খুব বেশিক্ষণ তাকানোর সুযোগ পেলামনা। তাকে ৩/৪ জন ভাইয়ের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা যে কয়েকজন আছি তাদেরকে নিয়ে মসজিদের সামনে অবস্থান করছি। এর মধ্যে সোহাগ ভাই বললেন, পল্টনের মোড় ছেড়ে দিয়েছে আমাদের পিছনে আসা দরকার। পুনরায় সবাইকে নিয়ে পিছনে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের প্রায় ২০/৩০ হাত সামনে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ এবং ১৪ দলের কর্মীরা লাঠি-বৈঠা নিয়ে লম্ফঝম্প করছে বৃষ্টির মত ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছে। হঠাৎ সামনের দিক থেকে দেখি একজন লোক আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। কাছাকাছি আসার পর দেখি সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি । খুব আশ্চর্য হলাম কিভাবে ওদের মধ্য দিয়ে দৌড়ে আসছেন। পরক্ষণেই জানতে পরলাম মঞ্জু ভাই তাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন, কোন রকম আল্লাহ তাকে রক্ষা করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে এনেছেন, ভাইয়ের মুখ থেকে শুনলাম তিনি যখন তাদের মধ্যে



icsbook.info

পড়ে গিয়েছিলেন, তখনই জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে মুখে কলেমা পড়া শুরু করেছেন। পরে তাদের মধ্য থেকে কে যেন নিজেদের লোক বলায় ছেড়ে দিয়েছে। দীর্ঘ ১১/১২ থেকে ২ ঘন্টা এই অসম সংঘাতের মধ্যে তাদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কোন দিকের কি অবস্থা খোঁজ নেওয়ার সুযোগ পাইনি। তবে এতটুকু জানতে পারলাম সকল দিকে আওয়ামীলীগ তাদের গোলা বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের ভাইদের উপর আক্রমণ করছে, দায়িত্বশীলদের সাথে কোন রকম যোগাযোগ করতে পারছিনা। আমার সাথে যারা ছিল অনেকেই আহত হয়ে চলে গিয়েছে, বাকি যারা আছে তারাও ক্লান্ত এবং আহত। কিন্তু এতটুকু ভীত নয়। রাস্তার উপর আমাদের ভাইদের রক্ত পড়ে আছে। তারপরও নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সবার মুখ গলা শুকিয়ে এসেছে কথাও বেরুচ্ছেনা। চিন্তা করছিলাম আল্লাহ আমাদের কি ধরণের পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। মনে মনে আল্লাহকে বললাম, আমাদের ভাইয়েরা অনেকে আহত বাকি যারা আছে তারাও শুধু আহত নয় জীবন দিতে প্রস্তুত তবুও ইসলামী আন্দোলনকে বাতিল শক্তির কাছে পরাজিত/অপমানিত করোনা। সবাইকে নিয়ে অবস্থান করছি এবং সামনের দিক থেকে আসা ইটগুলো থেকে বাঁচার চেষ্টা করছি। হঠাৎ একটি ইট এসে পড়লো বুকের উপর। নিশ্বাস বন্ধ করে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলাম। এর কিছুক্ষণ পর আরো কয়েকটি ইট এসে পড়লো মাথায়। হঠাৎ মাথা কেমন ঘুরে উঠলো। হাত দেয়ার সাথে সাথেদেখি রক্ত হাত বেয়ে নিচের দিকে পড়ছে। ২/১ জন আমাকে ধরে জামায়াত অফিসের ৫ তলায় নিয়ে আসলো পথে আরো অনেককে দেখলাম রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে আসছে। ৫ তলায় ওঠে দেখি আরো ভয়ংকর এবং বিভৎস অবস্থা, ছোট একটি রুমের মধ্যে প্রায় ১০০/১২০ ভাই আহত রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আর মেডিকেলের ভাইয়েরা তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে। অনেককে দেখলাম নিজের আহত অবস্থা নিয়ে অপর ভাইকে সেবা করছে, আমি ওঠার সাথে সাথে আমাদের কয়েকজন অমার দিকে এগিয়ে এসে আমার ক্ষতস্থান মুছে দিচ্ছে।

চোখ মুখে তাদের হালকা খোঁজ খবর নিলাম, সবাই এসে আমার আহত হাত মুছে দিচ্ছে, মাথা ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে। বসার পর অনুভব করলাম শরীরের অনেক জায়গায় ব্যথা করছে, দুই হাতের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন, রক্ত জমে আছে। পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখলাম। অনেকগুলো মিস্‌ড কল। কোন সময় ইট পড়ে স্কিন ফেটে গিয়েছে খেয়াল করিনি। কয়েক জায়গায় ফোন করে সবাইকে আশ্বস্ত করলাম এবং খোঁজ খবর নিলাম। তখন পর্যন্ত সঠিক জানতে পরিনি আমাদের আহত কি পরিমাণ অথবা কোন শহীদ হয়েছে কিনা, মোবাইলে ফোন আসলো হানিফ ভাইয়ের কাছ থেকে, ফোন করে হানিফ ভাই জিজ্ঞেস করলেন মুজাহিদ কোথায়, প্রশ্নটা শুনে চিন্তা করলাম মুজাহিদ, জীবন, ইয়াছিন, নাঈম, মারুফসহ প্রায় সবাই এক সাথে ছিল। তারাও হয়তো কোন জায়গায় আহত হয়ে ফিরে এসেছে। আহতদের সবাই ইবনে সিনা, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতল, জামায়াতের মহানগরী ৫ম তলায় চিকিৎসা নিচ্ছে। কিন্তু হানিফ ভাইয়ের পরবর্তী কথায় মনে হয় যেন বুকে বিরাট এক পাথর চাপা পড়লো, হানিফ ভাই বললেন কে যেন মুজাহিদের নাম্বার থেকে ফোন করে বলল, মুজাহিদকে আমরা মেরে ফেলে



icsbook.info

রেখেছি এখান থেকে নিয়ে যান...। হানিফ ভাইয়ের ফোনের জাবাবে খোঁজ নিচ্ছি, এই কথা বলে ফোন রেখে দিলাম। মহানগরীর সভাপতিসহ বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীলকে ফোন করে বিষয়টি নিশ্চিত হলাম। একই খবর জানার জন্য অনেকে ফোন করলেও দায়িত্বশীলদের নির্দেশে বিষয়টি গোপন রাখলাম। দীর্ঘ ২-৩ঘন্টা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মধ্য থেকে সামান্য ক্লান্তি আসেনি, পাশে আহত রক্তাক্ত ভাইদেরকে দেখেও কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য বিচলিত হয়নি। হঠাৎ এই খবরটি শোনার সাথে সাথে পুরো বিল্ডিংটা কেমন যেন নড়ে ওঠলো। হাত পা যেন সব শক্ত হয়ে গেল, নাড়তে পারছিনা, বুকের কষ্টগুলো চোখের পানি হয়ে বেরিয়ে আসলো। কোন রকম চোখ মুখ মুছে স্বাভাবিক হয়ে নিচে নেমে আসলাম। তখনও আহত ভাইদের মিছিল ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলো। কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা অনুমান করতে পারছিনা। ভয়ে কারো মুখের দিকে তাকাচ্ছিনা। মনে হচ্ছে যেন তাকালে সবাই জিজ্ঞেস করবে। আমাদের মুজাহিদের কি খবর? কোথায় সে আছে? সে কি আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসবে?

আস্তে আস্তে এসে আযাদ প্রডাক্টস এর সামনে দাঁড়ালাম, মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে দায়িত্বশীল ভাইরা সামনে যেতে দিলেননা। এখানে একটি লাঠি নিয়ে অবস্থান করছি। মহানগরী সভাপতি মান্নান ভাইকে ফোন করে জানলাম তিনি ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হসপিটালে মুজাহিদের সাথে আছেন, ততক্ষণে মুজাহিদের বাবা, মামা, মামীরা এসে হাজির। মান্নান ভাই কথা বলতে পারলোনা, তার কন্ঠ খুব ভারী শোনাল।

তায়াম্মুম করে কোন রকম বসে যোহরের নামাজ আদায় করলাম। যথাসময়ে মহাসমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মাইকে সবাইকে ধৈর্য্য ধারণ করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য নেতৃবৃন্দ অনুরোধ করছেন, আওয়ামীলীগের আক্রমণের তীব্রতা তখনও কমেনি। এদিকে আওয়ামী লীগসহ চৌদ্দ দলের সশস্ত্র ক্যাডার। লাঠি, বৈঠা হাতে হাজার হাজার কর্মীবাহিনী অপরদিকে নিরস্ত্র নিরপরাধী জামায়াত-শিবিরের সমাবেশে আগত কর্মীবৃন্দ আর মধ্যখানে বাংলাদেশ সরকারের আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী নীরব দর্শকের মত তামাসা দেখছে, অথচ ২৮ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্তও ক্ষমতায় ছিল জোট সরকার, স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিল বিএনপি এর প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, দলীয় বিবেচনায় নয়, ক্ষমতার বিবেচনায়ও নয়, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালাচ্ছে তার মোকাবেলায় সেদিন ঐ মন্ত্রণালয়ের পুলিশ, ডিজিএফআই, এনএসআই, এসবি এদের অনুভূতিগুলো কেন যেন ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। আহত মজলুম মানুষের চিৎকার, আর্তনাদগুলো আকাশ বাতাসকে ভারী করছে। ওদের যেমনিভাবে বিবেককে নাড়া দেয়নি আওয়ামী সন্ত্রাসীদের মানবতা ও মানুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হয়নি, ঠিক তেমনিভাবে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হয়নি আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর মধ্যে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে কয়েক জনকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে আমাদের ভাইয়েরা তাদেরকে ধরে জিজ্ঞাসা বাদ করছিল, তাদের কথায় অসংলগ্নতা প্রকাশ পাওয়ায় নিশ্চিত হলাম এরা Informer হিসেবে ওখানে আসছে। কয়েকজন তাদের কে মারতে উদ্যত হওয়ায় সেক্রেটারিজেনারেল এসে তাদেরকে বাঁধা দিয়ে বললেন আমরাও যদি তাদের মত আচরণ করি তাহলে আমাদের আর তাদের পার্থক্য থাকলো কোথায়? একথা বলে তিনি ওদেরকে ছেড়ে দিলেন।



icsbook.info

আমরা যে যার মত নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, স্টেজে সর্বশেষ আমীরে জামায়াত বক্তব্য দিচ্ছেন, আমীরে জামায়াতের বক্তব্যের শেষ দিকে তারা তাদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে হামলা করলো, তখন আমাদের ভাইয়েরা তাদের অধিকাংশ বোমার আঘাতে আহত হয়। গুলিবিদ্ধদের মধ্যে ধানমন্ডি থানার সভাপতি ওবায়দুল্লাহ আনসারী যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমার সাথে কথা বলে সামনের দিকে গিয়েছে। programme শেষ হলো, আমরা তখন দায়িত্বশীলদের নির্দেশে দাঁড়িয়ে আছি, সন্ধ্যার পর পুলিশ এসে সবাইকে সরিয়ে দিল। আমরাও অফিসের দিকে চলে এলাম, মহাগরী সভাপতি মান্নান ভাইকে ফোন দিলাম, মান্নান ভাই আমাকে কেন্দ্রীয় অফিসে আসতে বললেন। সাবাইকে নিয়ে দাঁড়ালাম। সামনে যারা আছে কম বেশি সবাই আহত। আমাদের আহত এবং শহীদ কতজন সবাই জানতে চাইলো। মুজাহিদের অবস্থা সবাই জিজ্ঞেস করছে। ইতোমধ্যে শিপন, জসিম, মুজাহিদ ভাই যে শাহদাত বরণ করেছে তা সবাই জেনে নিয়েছে। নিজকে সংযত রেখে সবাইকে দায়িত্বশীল ভাইদের সাথে চলে যাওয়ার জন্য বললাম, কিছুক্ষণ পর মান্নান ভাই কেন্দ্রের অন্য দায়িত্বশীল ভাইরাসহ কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারি জনারেল আসলেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি সার্বিক খোঁজ খবর নিয়ে আগামী দিনের জন্য করণীয় ঠিক করে বিদায় দিলেন, কেন্দ্রীয় সভাপতি নিজেও আহত ছিলেন, কপাল এবং হাতে আঘাত লেগেছে, পুরোদিনে যারা আহত হয়েছে তাদের কেউ ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, কেউ ইবনে সিনায় ভর্তি আছে, আমাদের অধিকাংশ ইবনে সিনা হাসপাতালে থাকায় সাবেক সেক্রেটারীজেনারেল মঞ্জুরুল ইসলাম ভূইয়া ভাই, মান্নান ভাই, রফিকুন্নবী ভাই ও শহীদ ফারুকী ভাইসহ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

আমরা আমাদের শিপন, জসিম, মুজাহিদ ও আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম হাবীব ভাইকে হারিয়েছি। বাকি যারা আহত আছে তাদেরকে আমাদের মাঝে দ্রুত ফিরিয়ে দাও। সেখান থেকে আসলাম আইসিইউ'তে যেখানে মূমুষু অবস্থায় আছে মাসুম, সিলেট মহানগরীর সভাপতি বাবুল ইসলাম ভাইসহ আরো বেশ কয়েকজন। তারপর এক এক করে, রেজাউল ভাইসহ সবাইকে দেখে মুজাহিদের বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

মুজাহিদের নানার বাসার সামনে সোহাগ ভাইসহ মিলন, সাইফুল, মনির, অভিসহ সবাই দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আসার পর মুজাহিদের নানা গেইট খুললেন। ভিতরে ঢোকার পর খুব হৃদয় বিদারক দৃশ্য চোখে পড়লো। মুজাহিদের বয়োবৃদ্ধ নানা মুজাহিদের কথা বলছেন আর শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। আজকে সকালেই নানা হজ্জ থেকে ফিরেছেন। মুজাহিদের নানাকে রিসিভ করার কথা থাকলেও দায়িত্বের খাতিরে সারা রাত থানা অফিস পাহারা দেয়ার পর নানার দেয়া প্যান্ট ও ফতুয়া পরে পল্টনে চলে আসেন। আর সেইখানে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সবাইকে পিছনে ফেলে আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। নিজেকে সামিল করলেন হামজা (রা.), হানজালা (রা.), আব্দুল্লাহ বিন রাওয়া, শহীদ মালেক, হামিদ, সাব্বির, আইয়ুব, জব্বারের কাতারে।

মুজাহিদের ছোট ভাই রাফি নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে, তাকে কাছে ডেকে জড়িয়ে ধরলাম, মানুষের খুব কষ্টের মুহূর্তে আমি তেমন কোন সান্ত্বনা দিতে পারিনা। এখনও তাই হলো, রাফীকে জিজ্ঞেস করলাম মুজাহিদের জন্য কষ্ট হচ্ছে, মাথা নেড়ে রাফি জবাব দিল, সর্বশেষ বললো-ভাইয়া আমার জন্য দোয়া করবেন। মুজাহিদকে প্রথম দেখেছি



icsbook.info

যেদিন সে সাথী হিসাবে শপথের জন্য এসেছে। সেদিন তার শপথ হয়নি। তাই কিছুটা মন খারাপ, নাসির ভাই তাকে বলছেন আগামী Contact ভাল করে প্রস্তুতি নিয়ে এসো, কিছুটা আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে সে ফিরে গেল। তাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে যখন সে আমার চক্রের সদস্য ছিল। আমি তাকে পূর্ণ্য আনুগত্যশীল জনশক্তি হিসাবে পেয়েছি। আমি তাকে যে কয়টি programme এর কথা বলেছি সবগুলোতে যথা সময়ে পেয়েছি কোন programme এ আসতে না পারলে সে সরাসরি আমার কাছে ছুটি চায়নি বরং তার সমস্যার কথা বলে পরামর্শ চেয়েছে। একদিন তার ওয়ার্ডে গিয়ে সকল সঙ্গীদের খোঁজ-খবর নিচ্ছি। মুজাহিদ তখন ওয়ার্ডের বায়তুলমাল সম্পাদক ছিল। তার খোঁজ-খবর জানলাম তার সদস্য হওয়ার জন্য অনেকগুলো প্রস্তুতি সম্পন্ন কিন্তু মহানগরী চক্রেযাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি চক্রেযাচ্ছনা কেন। মুজাহিদ বলল, মহানগরী চক্রেযাওয়ার আগে নিজেই কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি যাতে চক্রে বেশি দিন থাকতে না হয়। সত্যিই মুজাহিদকে মহানগরীর চক্রে বেশিদিন থাকতে হয়নি। ৬ মাসের মধ্যে সদস্য প্রার্থী এবং সদস্য শপথ গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, মুজাহিদ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যে তামান্না নিয়ে এই সংগঠনের শপথ নিয়েছে আল্লাহর মুহসিন বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে আমাদের সবাইকে পিছনে রেখে মহান রবের সান্নিধ্যে চলে গিয়েছে, সত্যিই মুজাহিদ আমরা তোমার কাছে হেরে গেলাম।

মুজাহিদকে কখনও রাগ করতে বা মন খারাপ করতে দেখিনি। সাংগঠনিক কাজের জন্য কোন সময় বকা দিলে, মাথা নিচু করে বসে থাকতো, কোন বিষয়ে যখন কোন পরামর্শ দিতাম তখন থেকে মানার চেষ্টা করতো, একবার তাদের ওয়ার্ড অফিসে সকল সাথীকে নিয়ে ওয়ার্ডের খোঁজ খবর নিচ্ছি। সাথীদের মধ্যে মিলন, ইয়াছিন, জীবন, মুজাহিদ পরস্পর পরস্পরের দায়িত্বশীল হলেও বয়স অথবা পড়াশুনা অথবা একই এলাকায় হওয়ার কারণে একজন আরেকজনকে তুই এবং নাম ধরে কথা বলতো। বিষয়টি বড় ধরণের সমস্যা না হলেও সাংগঠনিকভাবে শ্রুতিকটু মনে হওয়ায় মুজাহিদকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, তোমাদের সম্বোধন পরিবর্তন করা যায় কিনা, তখন থেকে মুজাহিদ আমার সামনে যখন কথা বলতো তাদেরকে ভাই এবং আপনি করে কথা বলতো, যেকোন পরিবেশে নিজকে মানিয়ে নেয়ার এবং মানুষকে Convince করার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল মুজাহিদের।

মুজাহিদের সামগ্রিক কর্মকান্ডে কোরআনের সেই বাণীটি প্রতিফলিত হয়েছে, "ঈমানদারদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে।"

---

*লেখক : সভাপতি- ঢাকা মহানগরী পূর্ব, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# কুরআনের বাণী প্রতিধ্বনি হয় যার কথায় ও কাজে

ডা. মঈন উদ্দিন

বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় এক দ্যুতিময় লাবন্য তার চেহারায়, লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ়তা তার চোখে মুখে, স্বল্পভাষী, দেখলে মনে হয় কোন বড় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বদা চিন্তিত কিন্তু চিন্তিত নয় মোটেও। কাঁধের ব্যাগটি দেখলেই বুঝা যায় কর্মের ব্যস্ততা তাকে তাড়া করে ফিরছে অহরহ। তাঁর চেহারার দুধ-আলতা মেশানো রঙ, বলিষ্ঠ দেহের গড়ন আর Smartness দেখলে অনুমান করার কোন উপায় নেই যে- এ তরুণটি জাহেলিয়াতের বিষবাষ্পে আচ্ছাদিত পরিবেশে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও সকল প্রকার পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। নিজের অযোগ্যাতার কথা ভেবে সেদিন খারাপ লেগেছিল যেদিন দেখেছিলাম ওয়ার্ড সভাপতির দায়িত্বের বোঝা কাঁধে আসার পর সে ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে একান্তে যোগাযোগ করছে, হাতে আছে কোরআনের একটি খন্ড। কারণ জিজ্ঞাসা করে বুঝতে পারলাম দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদেরকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খোদার নির্দেশগুলিকে চোখে দেখিয়ে দেওয়াটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি তো কখনো এ সুন্দর আকর্ষণীয় পদ্ধতির কথা ভাবিনি। শহীদের পরিবার থেকে একটা বিষয় শুনে মনে হল এতো কোরআনের ঐ কথারই প্রতিধ্বনি যেখানে বলা হয়েছে- "তোমরা মন্দের জবাব ভাল দিয়ে দাও, দেখবে তোমার প্রাণের শত্রুও পরম বন্ধুতে পরিণত হয়েছে"। (হা-মীম আস-সিজদা : ৩৪) তাঁর আম্মা বলেছেন- "সে কখনো কারও দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলে তার প্রতিশোধ নিতো না বরং তার সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতো।" একজন প্রকৃত দা'য়ীর যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহ কোরআনে বর্ণনা করেছেন- তাঁর ভিতরে সে বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় ছিল। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন- "যার ভিতর শাহাদাতের তামান্না নেই। তার মৃত্যু মোনাফিকির মৃত্যু"।

নাম তার মুজাহিদ

সত্যিই আল্লাহ তাঁর জন্মের পর নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই হয়তো পরিবারের মাধ্যমে তার নাম রাখিয়েছিলেন- হোসাইন মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম।



icsbook.info

যোগ্য সংগঠক, আদর্শ দায়ী হিসাবে পরিচয় পাওয়া গেলেও মুজাহিদ হিসাবে তার পরিচয় পাওয়ার সুযোগ খুব একটা হয়নি গত পাঁচ বছরে জোট সরকারের সুবাদে। তারপরও সরকারের শেষ দিকে এসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আন্দোলনকে নিয়ে বন্ধুপ্রতীম ছাত্র সংগঠনসহ সকল ইসলাম বিরোধী শক্তি যখন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, আক্রমণ করেছিল ছাত্রশিবিরের উপর তখন সেই অভিযানে মুজাহিদ অংশ গ্রহণ করে আহত হয়ে গাজী হিসাবে ফিরে এসেছিল। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী আন্দোলনের মর্যাদা।

দ্বিতীয় এবং শেষবারের মতো মুজাহিদ হিসাবে লড়লেন তিনি ২৮ অক্টোবর পল্টন মসজিদ সংলগ্ন কস্তুরী হোটেলের কাছে। ২০-২৫ জনের একটি ছোট গ্রুপকে পাঠানো হয়েছে পল্টন মসজিদ সংলগ্ন গলিটিতে, যাতে করে কোন দুস্কৃতকারি, সন্ত্রাসী, লগি-বৈঠাধারি এই গলি দিয়ে প্রবেশ করে জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব ঘোষিত মিটিং বানচাল করতে না পারে, মঞ্চ আক্রমণ করতে না পারে। নেতৃবৃন্দ যাতে স্বাচ্ছন্দে মিটিং শেষ করতে পারেন। এই ছোট গ্রুপটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তরুণ-যুবক মুজাহিদকে। মুজাহিদ যথানিয়মে তার বাহিনীকে সজ্জিত করে তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, আর কাজ সম্পর্কে নসীহত করছে অভিজ্ঞ সেনাপতির মতো। নবী, রাসূল, সাহাবায়েকেরামদের আন্দোলনের ইতিহাস শুনিয়ে শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত করছে সকলকে। সব শেষে আবার সবাইকে অভয় দিয়ে বলছে– "তোমরা ভয় কর না, এখানে যদি শহীদ হতে হয় তবে আমিই আগে শহীদ হব"। সত্যিই মুজাহিদ শহীদ হলো।

---

*লেখক : সভাপতি- ঢাকা মহানগরী পশ্চিম, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# রক্তাক্ত চট্টগ্রাম

গোলাম মাওলা শিমুল

২৮ অক্টোবর ২০০৬! অবাক বিশ্ব; বিস্মিত দেশবাসী। নির্বাক তাকিয়ে থাকা মজলুম অসহায় কিছু মানুষের। প্রকৃতির সকল চঞ্চলতা নিথর, হতবাক জাতির করুণ জিজ্ঞাসা কেন এমন হলো?

জাতীয় মসজিদের পার্শ্বস্থান রক্তাক্ত, শাহাদাতের মিছিলে ভরপুর, জাহেলিয়াতের নগ্নতার চূড়ান্ত রূপের উন্মোচন করে হত্যাযজ্ঞের নেশায় মেতে উঠা কিছু যুবকের উল্লাস ধ্বনি, লাশের উপর নৃত্য আর মুজাহিদ, জসিমের নির্মম মৃত্যু কোন সভ্য জাতির নিকট গ্রহণীয় নয়, কাম্যও নয়।

প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে সচিত্র দৃশ্যাবলী যে কোন মানব মনকে আহত করে। অবর্ণণীয় নির্যাতন, লগি-বৈঠার সাঁড়াশি আক্রমণ প্রমাণ করে যেন কোন এক বহি:শক্তির সাথে মুক্তিযুদ্ধের এক আওয়ামী নগ্ন অভিযান। দৃশ্যের ভয়াবহতায় বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ হৃদয়ের গভীর থেকে ঘৃণা আর ক্ষোভই প্রকাশ করেনি বরং আওয়ামী চরিত্রের মূল চেহারটা আরেকবার কালের আয়নায় দেখে নিল। নব প্রজন্মের কাছে এই বিধ্বংসী আওয়ামী রূপ শুধু শোক জাগানিয়া স্মৃতিই বহন করে চলতে থাকবে অনাদিকাল।

ঢাকায় জ্বালিয়ে দেয়া লেলিহান অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে ছড়িয়ে দেয়া হয় প্রিয় বাংলাদেশের প্রান্তরে প্রান্তরে। একে একে ঝরতে থাকে অসংখ্য প্রাণ। টিভির রিমোটে বোতাম চাপ দিলেই চলে আসে নির্মম সব হত্যাকান্ডের সংবাদ। ২৮ অক্টোবর শুরু হওয়া হত্যাযজ্ঞের ধারাবাহিকতায় ২১ নভেম্বর বন্দরনগরী চট্টগ্রামেও ঘটে নারকীয় তান্ডব। নগরীর অলংকার মোড়ে শান্ত সমাবেশ চারদলীয় জোটের। যোহর নামাযের বিরতী। চট্টগ্রাম মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি মু জাহেদুল ইসলাম তার সাথীদের নিয়ে নামায আদায় করেন। তারপর একটু উত্তেজনা লক্ষ্য করে চারদলীয় জোটের মঞ্চে আসেন। এমন সময় আওয়ামী লীগের ট্রাক মিছিলের জঙ্গিবাহিনী ধারালো কিরিচ আর অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রসহ আসতে থাকে অলংকার মোড়ের দিকে। অত:পর কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে শিবির নেতা জাহেদুল ইসলামের উপর। কিরিচ, দা, রড, আর হাতুড়ি দিয়ে থেঁতলিয়ে দেয়া হয় মাথার পেছনভাগ আর জাহেলিয়াতের নগ্নতাকে হার মানিয়ে নির্মম ভাবে কেটে দেয় দু'পায়ের রগ। অসহায় হয়ে পড়ে থাকেন আহত শিবির নেতা। নিষ্ঠুরতার ভয়াবহতায় স্তম্ভিত হয়ে যায় প্রকৃতি, নি:শব্দ মানুষের করুণ



icsbook.info

জিজ্ঞাসা-এরাও কি মানুষ? পুলিশ প্রশাসনের নীরব ভূমিকা হতবাক করেছে সচেতন মহলকে। তারপর চমেক হাসপাতালে নেয়া হয় জাহেদুল ইসলাম ভাইকে। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে। জনশক্তি আর শুভাকাঙ্খিরা আসতে থাকে তাদের প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য। ধীরে ধীরে লোকারণ্য হয়ে যায় মেডিকেল চত্বর। অশ্রুসজল নয়নে সকলেই প্রতিশোধের মুষ্টিবদ্ধ হাত উচ্চকিত করেছে বার বার। একটু পরেই শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। "জাহেদ ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে পারে না"। স্লোগানে শেস্লাগানে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে মিছিল। যে মিছিলের শুরু আছে শেষ নেই। মুহূর্তের মাঝেই বন্দর নগরী পরিণত হয় প্রতিবাদ মিছিলের নগরীতে।

স্বপ্নিল এক সোনালী পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে ছাত্রশিবিরের পথ চলা। আমাদের স্বপ্ন শুভ্রতা দিয়ে ঘেরা। শুদ্ধতার অভিযানে আমরা অগ্রসেনানী। অবিন্যস্ত, জরাগ্রস্ত সভ্যতাকে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। সত্য প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে এ ধরনের নির্মম আঘাত সহজাত, তবে অগ্রহণযোগ্য। আমরা দ্বিধাগ্রস্ত নই, কুণ্ঠিতও নই, তবে সর্তক পদক্ষেপে আমাদের এগিয়ে চলা। আওয়ামী চক্রের ঘৃণ্য হামলা আর উচ্ছৃঙ্খল আচরণে আমাদের যাত্রা পথে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি, পারবেও না ইনশাআল্লাহ। মাঝপথে কিছু হামলা আওয়ামী লীগের পতনকেই শুধু তরান্বিত করেছে।

প্রশাসনের নিকট আবেদন, শিবির নেতা জাহেদুল ইসলাম ভাইয়ের আহত করার ঘটনায় যারা দোষী তাদেরকে গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে সে দিনের প্রশাসনের নীরব ভূমিকার প্রায়শ্চিত্য করবেন।

এক ঐতিহাসিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– ইতিহাস কেন লিখা হয়? ঐতিহাসিক উত্তরে বলেছিলেন– ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। ঐতিহাসিককে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয়া হয়? ঐতিহাসিক বলেছিলেন– ইতিহাসে যা ঘটেছে তার চাইতে ভয়াবহ কিছুর জন্য অপেক্ষা কর। ঐতিহাসিকের এই উক্তির যথার্থতা আওয়ামী গোষ্ঠীর মাঝে লক্ষ্য করা যায়। দলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি অসংখ্য ন্যক্কারজনক কর্মকান্ডের জীবন্ত সাক্ষী। হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানি, নির্যাতন আর নিস্পেষণের গাঁথুনি দিয়ে দলটির অবয়ব তৈরি। ইতিহাসের বাছ-বিচার তাদের আইনে গ্রহণযোগ্য নয়। অপরাধ করা আর জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া তাদের নিত্য দিনের আচরণ। অশ্লীল আর অশালীন উচ্চারণ তাদের ব্যবহারিক জীবনের অন্যতম অংশ। নৈতিক সভ্যতার উত্থানে তারা ছিল সব সময় প্রতিবন্ধক শক্তি।

ইতিহাসের বিচার অনুযায়ী আওয়ামী লীগ অসংখ্যবার কালের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এরপরেও তারা আবার অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়েছে বহুবার। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া বা না নেওয়া তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তবে তাদের হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন আর নিস্পেষণ পরিচালনা করতে দেয়া যায় না। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ২৮ অক্টোবরের নির্লজ্জ হত্যাকান্ড ও অসংখ্য ভাইকে আহত করার অপরাধের বিচার চায়। আওয়ামী লীগের জেনে রাখা উচিৎ– লগি-বৈঠার আক্রমণে মানুষ হত্যা আর রগ কেটে দিয়ে মানব জীবনকে অসহায় করে দিয়ে দলকে ক্ষমতায় বসানো যায় না বরং ক্ষমতা যোজন যোজন দূরে সরে যায়। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বসে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধান আশা করি এই শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

---

*লেখক : সভাপতি- চট্টগ্রাম মহানগরী দক্ষিণ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# অমাবস্যার অন্ধকারে
# আটাশে অক্টোবর ও দু'টি দিন

অধ্যাপক আশরাফ জামান

এক.

১৯৬৯ সালের ১২ আগস্ট রেডিও থেকে প্রচারিত খবরে জানতে পারলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র আবদুল মালেক রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী ছাত্রলীগের কতিপয় সন্ত্রাসীর দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। ঐ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের সমাবেশে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আয়োজিত সেমিনারে বক্তৃতা করছিলেন। কয়েকদিন আগে এয়ার মার্শাল নূর খানের আহ্বানে 'পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিৎ' এ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব ছাত্র ও জনমত গঠনের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এ দায়িত্ব দেয়া হয় নিপার উপর। পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে শহর শাখার সভাপতি আবদুল মালেক ভাই এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। টিএসসিতে আয়োজিত সেমিনারে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও অংশ গ্রহণ করে। মালেক ভাই তাঁর বক্তব্যে ইসলামী আদর্শভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করার প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় উপস্থাপন করেন। অবশ্য নিপার হল ঘরেও ইতোপূর্বে বক্তব্য পেশ করেছেন।

শিক্ষানীতির উপর বলতে গিয়ে মনীষি মিল্টনসহ বিশ্বের অনেক দার্শনিক ও শিক্ষাবিদের উদ্ধৃতি তুলে ধরে আদর্শভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তার ফলে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের আদর্শহীন নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শিক্ষার্থী মহলে অসার বলে প্রমাণিত হয়। এতে ঐসব তথাকথিত ছাত্রনেতৃবৃন্দ যুক্তিতর্কে হেরে গিয়ে তাকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার পরিকল্পনা করে। সভা শেষে টিএসসিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সন্ত্রাসীরা মালেক ভাই ও অন্যান্য কর্মীদের উপর হামলা চালায়। মালেক ভাই বেরিয়ে আসেন সঙ্গে ছিল একজন কর্মী।



icsbook.info

ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারিরা এরপর রেসকোর্সে মালেক ভাইকে রড ও ইট দিয়ে আক্রমণ করে। মালেক ভাই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ইট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে মগজের ভেতরে লোহার রড ঢুকিয়ে দেয়। তারপর মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে চলে যায়। হাসপাতালে ৩ দিন অজ্ঞান থাকার পর ১৫ আগস্ট শহীদ হয়ে তিনি আল্লাহর রাহে চলে যান। বিখ্যাত মস্তিষ্ক চিকিৎসক ড. জুম্মাকে পাকিস্তান থেকে আনা হয়েছিল। তিনি সকল চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

পরদিন এ হত্যার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমদসহ ছাত্র ইউনিয়নের কতিপয় ছাত্রনেতা সরাসরি এর সঙ্গে জড়িত ছিল। সারা পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মালেক ভাইর হত্যাকান্ডের জন্য দু:খ প্রকাশ করে ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, দেশের আলেম সমাজ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী দু:খ প্রকাশ করেছেন। দৈনিক ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, দৈনিক জাসারাত, জংসহ দেশের সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয় লিখে দ:খ প্রকাশ করেছেন। সেদিন দু:খ বা শোক প্রকাশ করেননি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আফসোসও করেননি।

শহীদ আবদুল মালেক ভাই মাত্র তিনদিন আগে সাংগঠনিক সফরে এসেছিলেন টাঙ্গাইলে। সঙ্গে ছিলেন ময়মনসিংহের ছাত্রসংঘ নেতা আশরাফ ভাই। ৯ আগস্ট রাতে এলেন আমাদের বাসা বিশ্বাস বেতকাস্থ জামান লজ' এ। আমার আব্বা মরহুম আবু আহমদ রশিদুজ্জামান জামায়াতে ইসলামীর টাঙ্গাইল শহর আমীর। আমরা ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই উৎসাহী ছিলাম। সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি তাই রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহ রয়েছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই। এলাকার স্কুল-কলেজের কয়েকজন ছাত্র তখনই ডেকে আনলাম। সাত-আটজন একত্রিত হলাম। দু'জনেই বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা ও পাকিস্তানের রাজনীতি ও বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখলেন। শিক্ষা আন্দোলনের ব্যাপারেও বললেন। শেষে মো: জিল্লুর রহমানকে সভাপতি ও আমাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে টাঙ্গাইলে প্রথম ইসলামী ছাত্রসংঘের শাখা গঠন করে দিলেন। পরদিন তিনি ফিরে গেলেন ঢাকায়। আমার আব্বা ১২ তারিখ রাতে বাসায় ফিরে রেসকোর্সের মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের জানালেন এবং খুব দু:খ করলেন।

## দুই.

১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারি। আমরা চারদিন আগে টাঙ্গাইল থেকে জন দশেক ছাত্রসংঘ কর্মী মতিঝিলে হোটেল ইডেনে গিয়ে উঠেছি কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে। টাঙ্গাইলের কর্মীদের মধ্যে জিল্লুর রহমান, রইসউদ্দীন এসলাহীসহ অন্যান্যরা ছিল। হোটেলের ভেতরের মাঠে সুদৃশ্য প্যান্ডেলের নিচে বিছানা ফেলেছি। পূর্ব



icsbook.info

ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী এসে যোগ দিয়েছে। সংঘের কেন্দ্রীয় প্রধান নাজেমে আলা ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী ভাই ও সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ ইউনুস ভাই। দারসে কোরআন, দারসে হাদীস, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা, বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা, পাকিস্তানের রাজনীতির বর্তমান অবস্থা, ছাত্র রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জামায়াত ও ছাত্রসংঘ নেতৃবৃন্দ অনেকগুলো আলোচনা, সেমিনার ও কর্মী সমাবেশে বক্তব্য পেশ করলেন। জামায়াত নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বজনাব মওলানা আব্দুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, মওলানা একেএম ইউসুফ, আবদুল খালেক ও ছাত্র নেতা সর্বজনাব মতিউর রহমান নিজামী, মো: ইউনুস, মো: নূরুল ইসলাম, ইস্কান্দার আলী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ আরো অনেকে অনুষ্ঠানগুলোতে বক্তব্য রাখেন। পূর্ব পাকিস্তান সংঘ সভাপতি ছিলেন মো: নূরুল ইসলাম ভাই ও সেক্রেটারিইস্কান্দার আলী ভাই। আমরা মফ:স্বল থেকে গিয়ে এ সকল অনুষ্ঠান দেখে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছি কারণ এ জাতীয় অনুষ্ঠান জীবনে প্রথম দেখছিলাম।

১৭ জানুয়ারি আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন। বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক ও সাহিত্যিক সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীকে প্রথম দেখলাম। তিনি ঢাকা বিমান বন্দরে এসে নামলে। আমরা ট্রাকে করে গিয়েছিলাম তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হলো তেজগাঁ বিমানবন্দর। 'শতাব্দীর মুক্তি দূত মওলানা মওদূদী'। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখে আমার মনে কেমন যেন অনুভূতি সৃষ্টি হলো। তাঁর সফেদ দাড়ি, গৌড়বর্ণ মুখ সাদা শেরওয়ানী, চোস্ত পাজামা পরিহিত বস্থায় দেখে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে হলো আসমান থেকে এক ফেরেশতা যেন মাটির ধরায় এসে নামছেন। ঐ দিন দৈনিক সংগ্রাম প্রথম প্রকাশ পেলো।

রাতে ইডেনে মওলানা মওদূদীর প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার ব্যবস্থা। কোন এক সময় ভিড় ঠেলে গিয়ে এক সুযোগে হাত মুসাফা ও কোলাকুলি করে দীল ঠান্ডা করলাম। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আল্লাহর একজন ওলী আওলাদে রসূলের সঙ্গে বুক মিলাতে পারলাম। এ ছিল আমার এক বিস্ময়কর উপলব্ধি।

পরদিন ১৮ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামী জনসভা পল্টন ময়দানে। প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীরে জামায়াত মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী। আমরা সংঘ ও জামায়াত কর্মীরা মাঠে শৃঙ্খলার দায়িত্বে ছিলাম। নামাজ শেষে দুপুর দুটোর সময় যথারীতি জনসভার কাজ শুরু হলো নেতৃবৃন্দের বক্তব্য দেয়া শুরু হলো মাঝে মাঝে বিপ্লবী স্লোগান। মঞ্চ থেকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে অল্পক্ষণের মধ্যেই বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার মওলানা মওদূদী অল্পক্ষণের মধ্যেই সভাস্থলে এসে পৌছবেন এবং মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন। ঢাকা মহানগর আমীর অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার বক্তব্য পেশ করছিলেন। এ সময় অর্থাৎ তিনটার দিকে ময়দানের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে হঠাৎ ঢিল ছুঁড়লো কিছু সংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল লোক। তারপর লাঠিসোটা নিয়ে সরাসরি আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা, সঙ্গে যোগ দিল বামপন্থি দলগুলোর কর্মীরা। ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগলো জনসভায় আগত সাধারণ



icsbook.info

শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে। মাঝে মাঝে পটকা ও হাত বোমার বিকট শব্দ। উপস্থিত জনতা দিগ্বিদিক ছুটতে লাগলো। উত্তর দিক বন্ধ একমাত্র খোলা পূর্বদিক। তবুও পাঁচফুট পর্যন্ত উঁচু দেয়াল টপকাতে হয়। আমরা সন্ত্রাসীদের দেয়া ঢিল তাদের দিকে ছুঁড়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করলাম। শেষে সন্ত্রাসীদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো এক পর্যায়ে তারা ভেতরে ঢুকে পড়ে নিরীহ সমর্থক কর্মী বা শ্রোতাদের লাঠিপেটা করতে লাগলো। পালানোর সময় দেখলাম আমাদের সামনে সত্তর বছরের এক বিহারী বৃদ্ধকে বেদম প্রহার করছে আর বলছে এটাই মওদূদী মার-মার।

আমরা কোন রকমে পালিয়ে এসে ইডেন হোটেলের প্যান্ডেলে গিয়ে উঠলাম। সন্ধ্যার পর সন্ত্রাসীরা হাজার হাজার লোক নিয়ে হামলা করলো প্যান্ডেলে। গ্রামের নিরীহ ছেলে আমরা যে যেদিকে পারলাম পেছন দিয়ে পালিয়ে গেলাম। আমি গিয়ে উঠেছিলাম আমার বড় ভাইয়ের থাকার আবাসিক হল শহীদুল্লাহ হলে। রাতে হলে পালিয়ে থেকে ভয়ে ছিলাম জড়োসড়ো। একটু পরেই ভার্সিটি এলাকায় সন্ত্রাসীদের লাঠিসোটা নিয়ে মিছিল দেখলাম। সারা শহর জুড়ে তাদের অত্যাচার-নিপীড়ন চলছিল। পুলিশ বা সরকারি প্রশাসন এ ব্যাপারে নিরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। এ নির্মম অত্যাচারে শাহাদাত বরণ করলেন ইসলামী আন্দোলনের চার কর্মী আর আহত হয়েছিলেন অন্তত: পাঁচ শতাধিক।

## তিন.

আমরা স্বাধীন বাংলাদেশেও দেখলাম আওয়ামী নারকীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর। একটি ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিন। চারদলীয় সরকারের বিদায়ের দিন জাতীয়তাবাদী দল নয়া পল্টনে ও জামায়াতে ইসলামী বায়তুল মোকাররমের উত্তর পাশে জনসভার আয়োজন করেছে। সমাবেশ দুটিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগসহ ১১ দলের নেতা-কর্মীরা পুরানা পল্টন, মুক্তাঙ্গনসহ ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় প্রতিবাদ ও সমাবেশের আয়োজন করেছে। বিশেষ করে জামায়াতের সভাকে বানচাল করার জন্য পল্টন এলাকায় লাঠি-বৈঠাসহ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় সমাবেশে। দখল করার চেষ্টা করে সভাস্থল। ইতোপূর্বে নেত্রী শেখ হাসিনা কর্মীদের প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, সারাদেশের কর্মীরা যেন ঐদিন ঢাকায় আসে লগি-বৈঠা নিয়ে। তাই সেভাবেই আওয়ামী লীগ ১১ দলীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা এসেছে। তারা নিয়ে এসেছে শ্রমিক, ফুটপাতের টোকাই, শহরের উচ্ছৃঙ্খল বখাটে মাস্তানদের। উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হাঙ্গামা করে নষ্ট করে দেয়া। পাঁচ বছরের চারদলীয় শাসনামলে বহু বার ঘোষণা দিয়েছে, আর ক্ষমতায় থাকতে দেবে না। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ট্রাম্পকার্ড দিয়েছেন সরকারকে। দুপুর বারোটা থেকে জামায়াতের সমাবেশের পশ্চিম দিক থেকে লাঠি, লগি, বৈঠা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলো শত শত আওয়ামী সন্ত্রাসী। পুলিশ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখলো। তাদের ধারণা ছিল, যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে তাদের উপর আবার শোধ নেয়।



icsbook.info

আশে পাশে যেখানে জামায়াত-শিবির কর্মী পেলো তাদের উপর চললো পাশবিক নির্যাতন। ইট ভেঙে ঢিল ছুঁড়লো সভার উপর। জামায়াত ও শিবির কর্মীরা শুধু তাদের ফেরাতে চেষ্টা করছিল। টিভি চ্যানেলগুলোতে সরাসরি দেখানো হচ্ছিল সে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দু'জায়গায় দু'জন ছাত্রকে ঘেরাও করে বৈঠা আর লাঠি দিয়ে পেটানো হচ্ছে। নির্মম সে আক্রমণে পাঞ্জাবি-পাজামা ছিঁড়ে যাচ্ছে রক্ত ঝরছে। একসময় নিরব নিথর হয়ে গেলো। তখন সে লাশের উপর উঠে মানুষরূপী পিশাচরা নাচতে লাগলো। এ পৈশাচিক দৃশ্য দেখে আইয়ামে জাহেলিয়াতের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে আমার প্রিয় নবীর ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা। এমনিভাবে এদেরই মত পশুদল হামলা করেছে বিশ্ব নবীর (সা.) উপর। তাঁর প্রিয় চাচার মৃত দেহকে টুকরো টুকরো করে যেভাবে নির্যাতন করেছিল তার কথা। মনে পড়ে কারবালা প্রান্তরে রাসূলের প্রিয় বংশধরদের উপর এজিদ বাহিনীর নির্যাতনের ঘটনা, মনে পড়ে গ্রীক সাহিত্যে হোমারের ইলিয়ড মহাকাব্যে পড়েছি যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু সৈন্যকে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করে তার লাশের উপর জুলুম করতো সে কাহিনী। কিন্তু এখানে এই সভ্য জগতে একুশ শতকে ঢাকার রাজপথে যে হত্যাযজ্ঞ করলো তাতো কোন যুদ্ধ ছিল না।

২৮ অক্টোবরের সমাবেশ বোমা হামলা, গুলি, লাঠি, বৈঠার আক্রমণে বন্ধ হয়নি। যথারীতি নেতৃবৃন্দ বক্তব্য পেশ করেছেন। দুনিয়া দেখেছে আওয়ামী গুন্ডাদের সন্ত্রাসী কান্ড। ইখওয়ানুল মুসলেমিনের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ হাসানুল বান্নার ভাষায় : "আমরা নিরব হবো না নিথর হবো না যতক্ষণ না আল কোরআনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারবো।"

সাত ঘন্টার নরপিশাচদের হিংস্র আক্রমণে শাহাদাত বরণ করলো ছাত্রশিবির কর্মী মাসুম, মুজাহিদ, শিপন, রফিক ও ফয়সাল। আর আহত হয়েছিল অন্তত: পাঁচ শত কর্মী। ■



icsbook.info

# দিগন্তে আলোর রেখা

সাইমুম আহাম্মেদ রায়েফ

আদিকাল থেকেই আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগিয়ে মানবজাতি জ্ঞানের উৎকর্ষতার সাধন করেছে এবং মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। নিজেকে উত্তোরণ করতে পেরেছে অন্ধকার জগত থেকে। সময়ের আবর্তনে মানুষ নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সভ্যপ্রাণী রূপে। কিন্তু রাগ, হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে নিজেদের সভ্যতা হারিয়ে আবার আদিকালের সেই জ্ঞানহীন ও বর্বর চেহারায় নিয়ে যায়। এই অতি সত্য কথাটির প্রমাণ হয়েছে ২৮ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে ঢাকার পল্টন মোড়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর আওয়ামী লীগসহ বাম রাজনৈতিক দলগুলোর মিলিত বর্বোরচিত হামলা দ্বারা। এই দিনে বাংলাদেশ ও বিশ্ববাসীর সামনে আওয়ামী লীগ ও বাম দলগুলোর খোলস উন্মোচিত হয়ে আসল রূপ চেহারা বেরিয়ে পড়ে। সেদিন তাদের সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণকে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিতে হয়েছে।

আদর্শিক মত পার্থক্যের কারণে হিংসা-বিদ্বেষ ও রাগের বশবর্তী হয়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থি দলগুলো দিশেহারা অবস্থায় দেশের শান্তিকামী গণতান্ত্রিক ইসলামী শক্তির আলোকে চিরতরে নিভিয়ে ফেলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নীল নকশা তৈরি করে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা বায়তুল মোকাররম উত্তরগেটে জামায়াত ইসলামী কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত শান্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন সমাবেশে পাশবিক হামলা চালিয়েছিল ২৮ অক্টোবর পুরো দিনব্যাপী প্রায় ১০ ঘণ্টা যাবত। তাদের ভাড়াটে গুন্ডা ও মাস্তানদের লগি-বৈঠার নির্মম ও রোমহর্ষক আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৩ জন মেধাবী ছাত্র মুজাহিদ ভাই, শিপন ভাই ও মাসুম ভাইসহ জামায়াত ইসলামীর ৩ জন নিবেদিত প্রাণ কর্মী মোঃ হাবিবুর রহমান, মু. জসিম উদ্দিন-১, মোঃ জসিম উদ্দিন-২। তাদের ঐ লগি-বৈঠার নিষ্ঠুর আঘাতের দৃশ্য দেখে কোন সুস্থ মানুষ সহ্য করতে পারবে না। তারপর সেই প্রাণহীন লাশের উপরে উঠে তাদের উল্লাস নৃত্য দেখে হতভম্ব হয়ে যায় বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ ও বিশ্ববাসী। এ দৃশ্য আদিকালের জ্ঞানহীন অসভ্য



icsbook.info

বর্বর মানুষগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। হত্যার পর রক্তমাখা দেহকে বিকৃতি করার চেষ্টা ও লগি-বৈঠা দিয়ে নিথর দেহের প্রাণ পরীক্ষা করার দৃশ্য সভ্যযুগের যে কোন মানুষের বিবেককে নাড়া দেয় এবং হৃদয়কে কম্পিত করে তোলে। এই ঘটনা আমাদের বদর যুদ্ধের ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেখানে হযরত হামযা (রাঃ)কে শহীদ করার পর তার শরীর বিকৃত করে কলিজা চিবানো হয়েছিল।

আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের এই পাশবিক হামলার মধ্য দিয়ে দুপুর ৩ ঘটিকায় নির্ধারিত সমাবেশ অতি সতর্কতার সাথে শুরু হয়। কিন্তু এই হামলার মধ্য দিয়ে যথারীতি সমাবেশ দেখে আওয়ামী নেতারা মরিয়া হয়ে ওঠে এবং তাদের খুনের নেশায় পেয়ে বসে। এরপর তারা পল্টন মোড় থেকে সমাবেশ লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি, বোমা ও ককটেল মারতে থাকে। এতে শাহাদাতের অতি সৌভাগ্যের তালিকায় স্থান করে নেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৩ জন মেধাবী ছাত্র ও ৩ জন জামায়াত কর্মী।

"আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত বলো না, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না," –[সূরা বাকারা]

নির্দয় পাষাণ হত্যাকারীরা মুজাহিদ ভাই ও জসিম ভাইকে বিশ্ববাসীকে স্তব্ধ করে দিয়ে সকল কল্প কাহিনীকে হার মানিয়ে অমানবিক আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে সকলের সামনে তাদের সম্ভাবনাময় জীবনের আলো নিভিয়ে ফেলে। এই মহা সঙ্কটময় অবস্থায় বিকাল ৫টার দিকে সমাবেশের প্রধান অতিথি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সমাবেশকে সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহ করার জন্য মঞ্চে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করার জন্য উঠে দাঁড়ালে আওয়ামী নেতারা তাদের মেজাজ হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়ে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ ও নিরস্ত্র জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীদের উপর। পল্টন মোড়ে অবস্থান নেয়া আওয়ামী ও ১৪ দলের চিহ্নিত ও প্রশিক্ষিত ক্যাডার বাহিনী পার্শ্ববর্তী র‍্যাংগস টাওয়ার উঁচু ভবন থেকে পুলিশের নির্বাক ভূমিকার সুযোগ নিয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেবের ৫-৬ মিনিট বক্তৃতার মধ্যে অন্তত ১৫-২০টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা এবং বিরামহীন গুলি বর্ষণ করে। তাতে গোলাম কিবরিয়া শিপন, জসিম-১ ও মোঃ হাবিবুর রহমানসহ অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন উক্ত তিনজন। মোঃ হাবিবুর রহমান ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। সাথে সাথে মারাত্মক আহত হন অসংখ্য সাহসী শিবির কর্মী ও পিতা সমতুল্য জামায়াত নেতাকর্মী। তাদের ছোঁড়া ইটে মাথায় আঘাত পেয়ে মারাত্মক হয়ে হাসপাতালের ICU Section এ ৫ দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে শহীদ হন সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুমের মত একজন সুদর্শন তরুণ। ইটের আঘাতে মাথায় প্রচন্ড জখম হন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাবেক সভাপতি নরুল ইসলাম বুলবুল ভাই। এছাড়াও আওয়ামী বাহিনীর নিষ্ঠুর লগি বৈঠার আঘাতে মারাত্মক আহত হন ছাত্রশিবির আরেক জন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মনজু ভাই। ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক রেজাউল করিম ভাই পায়ে মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হন। এছাড়া প্রায় ২৫-৩০ জন জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মী গুলিবিদ্ধ হন। এই অবস্থার মধ্যেই জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীরা সাহস না হারিয়ে চরম ধৈর্য্য সহকারে তাদের প্রতিরোধ করতে থাকে।



icsbook.info

স্বাধীন দেশের একটি গণতান্ত্রিক দলের উপর বর্বোরচিত হামলা শুধু একটি দলের বিরুদ্ধে হামলা নয়। এটি দেশের ইসলামী জাগরণকে মুছে ফেলার চেষ্টা মাত্র। কারণ মানব মতবাদে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ ও বামপন্থি দলগুলো ইসলামী জাগরণকে সহ্য করতে পারে না। ফলে ইসলামের অগ্রগতি তাদের হিংসা ও বিদ্বেষ পরায়ণ করে তোলে। তাই তারা এই নিকৃষ্ট হামলা চালিয়ে আমাদের আদিকালের বর্বরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ হামলা দিয়ে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল প্রমাণ করেছেন তারা এদেশে শান্তি কল্যাণ চায় না। এ হামলার মধ্য দিয়ে তারা দেশের মানুষের শান্তি নষ্ট করে বড় ধরনের সহিংসতার জন্ম দিয়েছিলো। বাংলাদেশের জনগণ এই নিকৃষ্টতম হামলাকে মেনে নেয়নি এবং বিশ্ববাসী এ হামলাকে ঘৃণা সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী বা ১৪ দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে কোন দু:খ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেননি বরং উল্টো হামলার শিকার দলটির উপর দোষারোপ করার চেষ্টা চালায়। এই হামলা বাস্তবায়নের অন্যতম অংশিদার এবং ১৪ দলের অন্যতম শরীক দল ওয়ার্কার্স পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন একটি দৈনিক পত্রিকার (যুগান্তর) প্রবন্ধ কলামে তার লেখনীতে ২৮ অক্টোবর ঘটনায় এ উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন "জামায়াতের ইটবাহিনী ও লাঠিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে ১৪ দল প্রতিরোধ করেছিল মাত্র।" একজন বিবেকবান মানুষ এ কথাটির একটু পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করলেই কথাটি সত্য না কি অসত্য সেটা বুঝতে পারবেন। যদি আমরা কথাটির এভাবে বিশ্লেষণ করি– সরকারের সফল ৫ বছর পূর্তি বা কোন দিবস পালনের জন্য দরকার হয় বক্তার কিছু বক্তব্য এবং তার সাথে কিছু হাততালি। এ জন্য লাঠি সোটা, ইট পাটকেল বা বোমা ককটেলের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আওয়ামী নেত্রী শেখ হাসিনার কিছু বক্তব্য যেমন, "একটা লাশের বদলে দশটা লাশ", "কেউ খালি হাতে আসবেন না, লগি-বৈঠা সাথে নিয়ে আসবেন" এবং দেশ দখলের হুমকি কে বাস্তবে পরিণত করতে লাঠি সোটা, লগি-বৈঠা, গুলি, বোমা, ককটেলের প্রয়োজন পড়ে। আসলে বোঝা যায় এরা নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য এবং আসল দোষীদের আড়াল করার জন্য এই সব তালবাহানা।

অথচ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এই ভয়াবহ গুলি ও বোমা হামলার মধ্যে অপরিসীম ধৈর্য্য ধারন করে শান্ত ও ধীর মেজাজে বলেছেন, "বাংলাদেশের জনগণ এ হামলার জবাব ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে দেবে ইনশাআল্লাহ"।

একথাতে তার গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটেছে। কোন রকম প্রতিশোধমূলক অথবা আক্রমণাত্মকভাব তার কথায় ফুটে উঠেনি। এরপরও জামায়াতে ইসলামী এ ধিক্কারজনক জঘন্য বিষয়কে ক্ষমার মনোভাব নিয়ে দেখেছে। সেই সাথে নিজেদের প্রমাণ করেছে একটি সৎ, সংযমী ও আদর্শ দল হিসেবে। তবুও নাকি জামায়াত ইসলামীকে মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের সাথে তুলনা করা হয়। অনেকে আবার জামায়াত ইসলামীর সাথে জঙ্গিবাদ সম্পৃক্ততা প্রমাণের জন্য নিজের পুরো সময় ব্যয় করে ফেলেন।

এ যেন তাদের, "প্রখর রৌদ্রে বটের ছায়ায় আঁধারের খোঁজ।"

ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তির বাণী অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া ইসলাম ধর্মের প্রধান



icsbook.info

কাজ। এর মাধ্যমে ইসলাম সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। শান্তির বাণী অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ায় বা কল্যাণ কামনাই যদি একজন মানুষের অপরাধ হয়ে যায় তাহলে এ সুন্দর পৃথিবী এবং পৃথিবীতে সর্বোত্তম প্রাণী হিসেবে মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজন হতো না। কোরআনের ভাষায়– "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত; মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। –[সূরা আল ইমরান : ১১০]

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চলার পথ ফুলসজ্জিত নয়। আল্লাহ্ তার বান্দাদের বিভিন্ন সময় বিপদ মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। তবে এ পরীক্ষা বান্দার কল্যাণের জন্যই। অতীতে যারা ইসলামী আন্দোলন করেছেন, তারাই বিপদ মসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন, হয়েছেন নির্যাতনের শিকার। এ সবই আল্লাহর পরীক্ষা মাত্র এবং এ পরীক্ষার মাধ্যমে সফলতার দ্বার খুলে যায়। ২৮ অক্টোবর '০৬ পল্টন মোড়ে জামায়াত ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের উপর বিনা উস্কানিতে আওয়ামী লীগের অতর্কিত আক্রমণ এমনই একটি পরীক্ষা। এ নির্যাতন ইসলামী আন্দোলনের একটি সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। তাই এ হামলায় হতাশ বা নিরাশ না হয়ে বরং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই নির্যাতন ও অত্যাচার আমাদের কল্যাণ বলেই বিবেচিত হবে। কারণ এ রকম হজারো নির্যাতনের মধ্য দিয়ে ইসলামের বিজয় আসে। আমাদের সামনে আলোর রেখাগুলি উঁকি দিচ্ছে। সেই পথ ধরেই আমাদের পাড়ি দিতে হবে বহুদূর। পৌঁছাতে হবে কাঙ্খিত মঞ্জিলে। আমাদের বিজয় আসবেই ইনশাআল্লাহ্। ■



icsbook.info

# শাহাদাত ও মুমিন জীবন

মো: আরিফুর রহমান

ইমানী চেতনায় দীপ্ত না হয়ে কেউ শাহাদাতের কামনা করতে পারে না। আর শাহাদাত কামনাকারি কখনো জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটতে পারে না। কারণ আল্লাহর পথে সংগ্রাম ছাড়া শাহাদাতের আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

## শাহাদাত শব্দের অর্থ

শাহাদাত শব্দের অর্থ সাক্ষ্য। এ শব্দ থেকে শহীদ ও শাহেদ শব্দ এসেছে। শাহেদ মানে দেখেছে বা সাক্ষ্য দিয়েছে। সাক্ষী সেই দেয় যে নিজে স্বচক্ষে দেখেছে। 'আশ শহিদ' মানে আমি দেখার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি। কুরআন মজিদে শাহাদাত শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সাক্ষ্য অর্থে, অপরটি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান কুরবান করার অর্থে। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী– "এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হতে পার।" –(সূরা বাকারা : ১৪৩)

অন্য আরেক আয়াতে বলা হয়েছে– "যাতে রাসূল (সা:) তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পার।" –(সূরা হাজ্ব : ৭৮)

আর জীবন দান অর্থে শহীদের ব্যবহার করা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নং আয়াতে। এতে বলা হয়েছে– "এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ইমানদার, আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান।" তবে সরাসরি জীবন দান অর্থে খুব বেশি একটা আয়াত পাওয়া যায় না। তবে যুদ্ধে যাওয়া এবং নিহত হওয়া সম্পর্কে, কুরআনের বহু জায়গায় শহীদের কথা বলা হয়েছে। আর এ সকল বলা হয়েছে ওহুদ যুদ্ধের পরে। বদরের যুদ্ধের পর মুসলমানরা ওহুদ যুদ্ধে গিয়ে পরাজয় বরণ করে। এতে মুসলমানরা ঘাবড়ে যায়, তখন মহান আল্লাতায়ালা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন– 'তোমরা বদরের যুদ্ধে আঘাত দিয়েছ আর ওহুদ যুদ্ধে কিছু আঘাত পেয়েছ। এতে ঘাবড়াবার কি আছে? তোমরা সত্যিকার মুমিন হলে চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে'।

'আল্লাহ তোমাদের মাঝে মাঝে পরাজয় দেন এ উদ্দেশ্যে, তোমাদের মধ্যে কার



icsbook.info

কার মজবুত ইমান তা দেখার জন্যে আর তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়ার জন্য'। এখানে শাহাদাত শব্দটা উল্লেখিত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত শহীদ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। সাক্ষী দিলেও শহীদ, আর জীবন দিলেও শহীদ। মূল অর্থ হলো সাক্ষী। আর যে আল্লাহর পথে নিহত হয় সে জীবন দিয়ে সাক্ষী দিল আর যে সত্যিকার অর্থে সে দ্বীনকে আকড়ে ধরেছে।

## মুমিন জীবন

মুমিন জীবনের লক্ষ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা পাব যে, আখিরাতের সাফল্য। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের কৃষিভূমি। কৃষক যেমন জমিতে ফসল বুনে বাড়িতে ভোগ করে তেমনি মুমিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে ফসল বুনে আমল করে আর আখিরাতে তা ভোগ করে। অন্য আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) একদা, হযরত আয়েশা (রা.)কে বলেন, "এমনভাবে আমল করো যেন হিসাব ছাড়াই বেহেশতে যেতে পারো।' কেননা হিসাব দিতে গেলেই মুছিবত। সে জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টিই হল আখিরাতের সাফল্য।

দুনিয়ার জীবন হলো খেলার মত। ব্যক্তির জীবনে খেলাধুলারও প্রয়োজন আছে কিন্তু সারাটা জীবনই খেলা নয়, খেলা হলো সামান্য কিছু সময়ের জন্য ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার জীবনটাকে মর্যাদার দিক থেকে খেলার মত নেয়া প্রয়োজন।

আমরা যেমন লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজ কর্মের ফাঁকে অবকাশ হিসেবে কিছু সময় খেলাধুলা করে থাকি। তেমনি দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাসও আখিরাত কামাই এর আসল কাজের ফাঁকে খেলার মত মনে করতে হবে। কেননা একমাত্র শহীদই দুনিয়া থেকে এ নিশ্চয়তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে যে, জান্নাত তার জন্য অবধারিত। ইখওয়ানুল মুসলিমুন এর অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চে শাহাদাত বরণ করে ইসলামের সোনালী যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। এভাবে যদি আল্লাহ মৃত্যুদণ্ড নির্ধারন করে থাকে, তাহলে কারো সাধ্য নেই মৃত্যুকে ঠেকায়। প্রত্যেক যুগে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন এবং থাকবে। যারা মানুষকে মৃত্যু ভয় থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করবেন।

## শহীদের মর্যাদা

মহান আল্লাতায়ালা শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা হাজ্জ এর ৫৮ নং আয়াতে পেশ করেন– "যারা হিজরত করল আল্লাহর পথে তারপর নিহত হল কিংবা এমনিতেই মারা গেল আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযিক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ উৎকৃষ্ট রিযিক দাতা"।

## শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে

১। আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদের আমল কোন ক্রমেইনষ্ট হবে না।

২। আল্লাহ তাদের সোজা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেবেন, মাঝখানে দাঁড়িপাল্লার ব্যাপার নেই।

৩। তাদের অবস্থা সব দিক থেকেই সুসংহত বা ঠিকঠাক করে দেবেন।

৪। তাদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তার পরিচয় আগে থেকেই দেয়া



icsbook.info

থাকবে। দুনিয়াতে যে জান্নাতের খোঁজ খবর দেয়া হয়েছে সেখানেই প্রবেশ করানো হবে। আর মহানবী (সা.)বলেন– "জেনে রেখো জান্নাত হল তলোয়ারের ছায়া তলে।"

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কত লোক শহীদ হলেন, কিন্তু বদর যুদ্ধ থেকে শুরুকরে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সকল যুদ্ধে শরীক থাকা সত্ত্বেও চারজন সত্যপন্থী খলিফাগণ কোন যুদ্ধে শহীদ হননি। কিন্তু তাঁরা শাহাদাতের কামনা করতেন বলে যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই তাঁরা শাহাদাত লাভ করেছিলেন। যারা শাহাদাত পাওয়ার খাঁটি কামনা করে তাদের জন্য রাসূল (সা.) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, "তারা বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাদের সে মর্যাদা দেবেন।" শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য খাঁটি মুমিন হওয়া এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ জীবনের লক্ষ্য হওয়া শর্ত। আল্লাহ যেন আমাদেরকে শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য দান করেন। আমীন। ■



icsbook.info

# আলোকিত মৃত্যু

গুলশান আরা (কেয়া)

২০০৬ - ২৮ অক্টোবর। টিভি সেটের সামনে বসলাম খবর শুনতে। হঠাৎ টিভির পর্দায় ভেসে উঠল একটি মর্মান্তিক ছবি। সেটা শুধু ছবি নয় জীবন্ত মানুষ পিটিয়ে মারছে মানুষরূপী একদল হায়েনা মেতে উঠেছে তার পশুত্বের পরিচয় দেওয়ার জন্য। লগি-বৈঠাধারিরা তাদের বিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় জানিয়ে দিল বিশ্ববাসীকে। হিংসা আর পরশ্রীকাতরতা মানুষকে কোথায়, কত নিচে নামাতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহারণ ২৮ অক্টোবর পল্টন হত্যাকাণ্ড। আর এর মাধ্যমে জন্ম হল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক ঘৃণ্যতম অধ্যায়। এই দিনটি মিথ্যা গণতন্ত্র চর্চাকারি গলাবাজদের ঘৃণা জানাবার দিন। ২৮ অক্টোবর যেনো আজও আমার চোখ থেকে পানি ঝরায়, আর বুকে জাগে সন্তান হারা মায়ের বুকের ব্যথা। আমার খুব ইচ্ছা করে আমার যে বোনের বুকের ধন হারিয়ে গেছে, যে মায়ের সন্তান শহীদ হয়েছে, তাকে যদি একবার কোনভাবে আমার সহানুভূতিটুকু জানাতে পারতাম তবে আমার বুকের ব্যথা কিছুটা হলেও হালকা হত। আজ এই লেখার মাধ্যমে কিছুটা হলেও লাঘব হবে। কিন্তু যে মায়ের বুকের মানিক হারিয়ে গেছে সে কিসে সান্ত্বনা পাবে আর কিসেই বা ব্যথা লাঘব করবে। আমরা সারা বিশ্ববাসী মিলে চেষ্টা করলেও মায়ের কলিজা ঠাণ্ডা করতে পারব না। তাইত, আল্লাহ রাব্বুল আলমীন তার সন্তানহারা মায়ের জন্য ওয়াদা করেছেন। "বায়তুল হামদ"। হাদীসে আছে যখন কোন বান্দার সন্তান অকালে দুনিয়ার বুক থেকে ঝরে পড়ে তখন, আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে বলেন– "তোমরা কি আমার বান্দার কলিজার টুকরা ছিঁড়ে এনেছো"? ফেরেশতারা জবাব দেন– 'হ্যাঁ'। তখন আল্লাহ বলেন– "আমার বান্দা কি বলল?" ফেরেশতাগণ বলে বান্দা বলল– "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন খুশি হয়ে বলেন– "আমার ঐ বান্দা-বান্দীর জন্য জান্নাতের মধ্যে একটা সুন্দর ঘর তৈরি করে দাও যে ঘরের নাম হবে "বায়তুল হামদ"। অর্থ-প্রশংসিত ঘর। মুজাহিদের বাবা-মাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সবখানে বহুগুণে মর্যাদা বাড়িয়ে দিক। আমরা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি। আমীন।



icsbook.info

আর সেই সব মুজাহিদ-এর প্রতি

"জীবন বাজি রেখে যে মুজাহিদ
আল্লাহর রাহে ঢালে খুন,
দুনিয়া আখেরাত সব খানে তাঁর
মর্যাদা বাড়ে বহু গুণ।"

সত্যি লগি-বৈঠার সেই মিছিলে আল্লাহর পথের মুজাহিদরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তিল তিল করে প্রিয় জীবনকে নিঃশেষ করেছে। সেই ছবি সেই স্মৃতি দেখে কোটি কোটি মানুষ চোখের পানি ফেলেছে। আর দোয়া করেছে। আর ধীক সেই সব লগি-বৈঠাধারি আবু জেহেল ও আবু লাহাবদের প্রতি।

শহীদেরা চিরদিন রয় বেঁচে রয়
জীবন মানে তার নয় পরাজয়,
শহীদি জীবনই থাকে অম্লান
সুরভিত পুষ্প ফাগুন।

২৮ অক্টোবরের শহীদেরা সত্যি ভাগ্যবান। তারা সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে সারা জীবন বেঁচে থাকবে। তারা মানুষের চোখের সামনে শহীদ হয়েছে। তাদের এ আত্মত্যাগ আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য জীবন উৎসর্গের প্রেরণা হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে।

এক ফোঁটা রক্ত ঝরতেই মাটিতে
মুছে যায় শহীদের পাপ কালিমা,
জান্নাত থেকে আসে আহার পানি
আরশে লেখা হয় তার মহিমা।

এ এক সম্মানিত মৃত্যু। যারা এই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন তারা সত্যিই ভাগ্যবান। এমন মৃত্যু ক'জনার হয়।

এ মৃত্যুতে তাই আমরা যেমনটি শোকাভিভূত তেমনটি আনন্দিত। কারণ, আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা– "যারা দ্বীন কায়েমের জন্য মৃত্যু বরণ করেছে তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না"।

আলোকিত হয় সে আল্লার নূরে
ফেরেশতারা গান গায় সুরে সুরে,
ঘুমন্ত জনপদ জেগে ওঠে
জ্বালিয়ে স্রোতের আগুন।

আল্লাহ্পাক আমাদের সবাইকে তাঁর নূরের আলোতে আলোকিত করুক। আগামীতে যেনো আমরা সবাই মিলে একটি আলোকিত সমাজ গঠন তথা বিশ্বের দরবারে আলোকিত দেশের নাগরিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে পারি। আর তাতেই ২৮ অক্টোবরের ত্যাগের মহিমা উদাহারণ হয়ে থাকবে ইনশাল্লাহ। ■



icsbook.info

## লগি-বৈঠার তান্ডব
# আজও কাঁদায়

সামছুল আরেফীন

"এ কোন শয়তান মানুষের চরম সত্তাকে করে পরিহাস– কোন আজাজিল আজ লাথি মারে মানুষের শবে।" না, কবি যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন ২৮ অক্টোবরের তাণ্ডবতা তার চেয়েও ভয়াবহ, পাশবিক ও সভ্যতাবিনাশী। অন্ধকার যুগের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে একুশ শতকের বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের বর্বর পাষণ্ড নেতা-কর্মীরা। লগি, বৈঠা, লাঠি, পিস্তল ও বোমা হামলা চালিয়ে যেভাবে মানুষ খুন করা হয়েছে, তা মনে হলে আজও শিউরে ওঠে সভ্য সমাজের মানুষ। সাপের মতো পিটিয়ে মানুষ মেরে লাশের উপর নৃত্য উল্লাস করার মতো ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। এই পৈশাচিকতা ও বর্বরতার হাত থেকে রেহাই পায়নি মায়ের কোলের শিশু, নারী, বৃদ্ধ এবং নিরীহ জনগণ।

লগি-বৈঠার তাণ্ডবের নির্মম শিকার শহীদ মুজাহিদের মা মাহমুদা মুন্নী আজও খুঁজে বেড়ান তার ছেলের স্মৃতি। আদরের ছোট বোন মেহজাবিন ভাইয়ার পথ চেয়ে মন খারাপ করে বসে থাকে দিনের পর দিন। মানুষকে ভালো পথে ডাকা কি অপরাধ? ভালো কাজের দিকে ডাকা কি অপরাধ? এভাবে আর কত মায়ের বুক খালি হবে? নরপিশাচ হায়েনাদের কি কোন বিচার হবে না? এসব প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পায়নি শহীদ মুজাহিদের পরিবার।

শহীদ মুজাহিদের পুরো নাম মুজাহিদুল ইসলাম ফাহিম। গত বছরের ২৮ অক্টোবর পল্টন এলাকায় লগি-বৈঠা বাহিনী একের পর এক পিটিয়ে হত্যা করে তাকে। মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা মুজাহিদকে লগি-বৈঠা দিয়ে আঘাত করতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ রাজপথে তার লাশ পড়েছিল। ২ ভাই ১ বোনের মধ্যে মুজাহিদ ছিল সবার বড়। মুজাহিদ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ (অনার্স) ৩য় বর্ষের ছাত্র ছিল। তার ছোট ভাই রফিকুল ইসলাম ৮ম শ্রেণী ও একমাত্র বোন মেহজাবিন ১ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে।

১৯৮৫ সালের ২৬ নভেম্বর মুজাহিদের জন্ম। সেদিন ছিল ১২ রবিউল আউয়াল।



icsbook.info

ঠিক সুবহে সাদেকের সময় মুজাহিদের জন্ম হয়। একারণেই ওর নাম রাখা হয় মুজাহিদ। জানালেন মুজাহিদের নানা বীর মুক্তিযোদ্ধা মনসুর আহমদ। তিনি স্মৃতি চারণ করে বলেন, মুজাহিদের নামাজ ছিল খুব ধীরস্থির। শহীদ হবার আগে ওর চেহারা খুব সুন্দর হয়েছিল। শহীদ মুজাহিদের নানী হাসিনা মানসুর জানান, মুজাহিদ শহীদ হয়েছে ঠিকই কিন্তু যে পরিস্থিতিতে তাকে শহীদ করা হয়েছে তা মেনে নেয়া যায় না। অস্ত্রের মুখে নিরস্ত্র মুজাহিদের কিছুই করার ছিল না। আর কোন মুজাহিদ যাতে এভাবে নিহত না হয় সেজন্য সবার কাছে আবেদন জানান তিনি।

শহীদ মুজাহিদের পিতা দেলোয়ার হোসেন ব্যবসা করেন। মাতা মাহমুদা মুন্নী দেলোয়ার। মুজাহিদের মা মাহমুদা মুন্নী বলেন, আমার মুজাহিদ সৎসাহসী এক তরুণ। যদি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কোন ইচ্ছা তার থাকতো তাহলে এভাবে নির্মমভাবে শহীদ হতো না। দুশমনদের কয়েকজনকে খতম করে শহীদ হতো। তিনি বলেন, আল্লাহ যে ওকে আগেই কবুল করেছিলেন আমার তা বুঝতে বাকি ছিল না। অন্যান্য দিন বাইরে যাবার আগে আমাকে বলে দোয়া নিয়ে যায় আর আমি তাকে আল্লাহর উপর আমানত করে দেই। সেদিনও দ্রুত বের হবার জন্য আমাকে বলেছে, হালকা নাস্তাও খেয়েছে আর বলল, 'মা আমি ওদেরকে এগিয়ে দিয়ে আসছি'। আমিও দ্রুত এগিয়ে দেখি বের হয়ে পড়েছে। আর ওকে আল্লাহর আমানতে দেয়া হয়নি। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার মুজাহিদের মত যাতে আর কোন কাউকে নির্মমভাবে নিহত হতে না হয়। আর কোন মায়ের বুক এভাবে যেন খালি না হয়, এটা খেয়াল রাখতে হবে। আওয়ামী হায়েনাদের যেন যথোপযুক্ত শাস্তি হয় এজন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ছোট বোন মালিহা মেহজাবিন বলেন, ভাইয়া আর নেই, এজন্য খুব খারাপ লাগছে। প্রতিবেশী ফজলুর রহমান তার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াব্যক্ত করে বলেন– আওয়ামী হায়েনাদের দ্বারা এমন চৌকস, সৎ, যোগ্য ও মেধাবী একজনকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে, যা কোনভাবে মেনে নেয়া যায় না। তিনি বলেন, সেদিন আওয়ামী লীগ যে ঘটনা ঘটিয়েছে তাতো কোন সভ্য সমাজের চিত্র হতে পারে না। তিনি এর যথোপযুক্ত বিচার দাবি করেন। অপর এক প্রতিবেশী নুরুল ইসলাম বলেন, ভাবতে অবাক লাগে যে, মুজাহিদের মত এমন একজন আদর্শ যুবককে এভাবে হারাতে হবে। মাতা-পিতার কোল খালি করবে। আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্যই দেবে। কিন্তু তার মৃত্যুর ঘটনাটি মেনে নেয়া যায় না।

## উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাওয়ার আশা পূরণ হলো না শিপনের

IELTS পরীক্ষা দিয়ে ৫.৫ স্কোর করেও বিদেশ যাওয়া হলো না শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপনের। সে স্বপ্ন আর কোনদিনই পূরণ হবে না। গত ২৮ অক্টোবরের লগি-বৈঠার তাণ্ডবে চিরতরে হারিয়ে গেলো গোলাম কিবরিয়া। বাবা-মা তাকে হাফেজও বানিয়েছিলেন। যেন তারা মারা গেলে তাদের ছেলে নামাযে জানাযা পড়াতে পারে। কিন্তু পিতাকেই তার ছেলের লাশ বহন করতে হলো। ভাই নেই আজও মেনে নিতে পারছে না শহীদ শিপনের একমাত্র বোন তাকিয়া। সদা হাস্যোজ্জ্বল শিপনকে হারিয়ে তার পরিবার আজও স্বাভাবিক হতে পারেনি। ক্ষণে ক্ষণে মায়ের বুক খালি হবে? আর কত বোন তার ভাইকে হারাবে? আর কত পিতা তার সন্তানকে হারাবে? যারা প্রকাশ্য দিবালোকে পৈশাচিক কায়দায় মানুষ হত্যা করলো তাদের কী কিছুই হবে না?

শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন ৩ ভাই ১ বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। বড় ভাই ডাক্তার। ছোট ভাই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তার একমাত্র বোন তাকিয়া ৫ম শ্রেণীতে



icsbook.info

পড়ছে। শিপন ঢাকা কলেজে বিএসসি ফিজিওলজিতে অনার্স ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত ছিল। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যাওয়ার জন্য সে IELTS সম্পন্ন করেছিল। তার স্কোর হয়েছিল ৫ দশমিক ৫। তার পিতা তাজুল ইসলাম চাকরিজীবী। মা মাহফুজা খাতুন গৃহিণী। তার মা জানান, শিপন ২৭ অক্টোবর রাতে বাইরে যেতে চাইলেও তাকে যেতে দেয়া হয়নি। তাই পরদিন সকালে শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম (যিনি একই ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন) এসে ডাক দিলে সে আর বিলম্ব না করে বলে, আম্মা আমাকে রাতে যেতে দেন নাই কিন্তু আজ আর আমাকে নিষেধ করতে পারবেন না। এরপর সে হালকা একটু সেমাই খেয়ে ঘর হতে বের হয়ে যায়। চলে আসে পল্টন এলাকায়।

১৪ দলের লগি-বৈঠা বাহিনীর নারকীয় হামলার সময় শিপন ছিল বায়তুল মোকাররম উত্তরসড়কে ওভার ব্রিজের কাছে। এক পর্যায়ে হামলার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তার স্কুল পড়ুয়া ৩ কর্মীকে রিকশা ভাড়া দিয়ে এই বলে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় যে, "এখানকার পরিস্থিতি খুব খারাপ, আওয়ামী লীগ চতুর্দিক দিয়ে আমাদের আক্রমণ করছে, তোমরা বাড়িতে চলে যাও।" আর শিপন ছুটে যায় সামনের দিকে। লগি-বৈঠা বাহিনী শিপনকে ঘিরে ফেলে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। তার মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাণ্ডব অব্যাহত রাখে। শহীদ শিপনের মা কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন– নরপিশাচরা নারকীয়ভাবে লাঠি-বৈঠার আঘাতে তাকে হত্যা করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখে, যা ইতিহাসের সকল বর্বরতাকে হার মানায়। তিনি বলেন, আমার ৩ ছেলের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে মেধাবী, যোগ্য ও মানবিক গুণসম্পন্ন। তাই তাকে কোরআনের হাফেজ বানিয়েছিলাম। এলাকার অনেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ও মহিলারা তার কাছে বিশুদ্ধভাবে কোরআন শরীফ শিখেছে। অনেক গরীব ছেলে-মেয়ের বাসায় গিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে কোরআন পড়তো। শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপনের পিতা তাজুল ইসলাম জানান, আওয়ামী লীগের রক্ত মাংসের সাথে অরাজকতা ও শয়তান মিশে আছে। তারা যুগে যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর এভাবে আঘাত হেনে আসছে। তিনি খুনিদের শাস্তি দাবি করে বলেন, এভাবে যেন আর কেউ মানুষ মারার রাজনীতি করতে না পারে। তিনি জানান, আমরা মারা গেলে সে আমাদের নামাযে জানাযা পড়বে এ জন্য তাকে হাফেজ বানানো হয়েছে। আর আমি তার লাশ বহন করেছি, জানাযা পড়েছি। তিনি বলেন, আমার মন তা মেনে নিতে পারছে না। আমার মনে হয় সে জীবিত। সে কোথাও বেড়াতে গেছে।

শহীদ শিপনের ফুফা আজো আপ্লুত হয়ে বলেন, পৃথিবীতে মানুষ আছে কিনা ভাবতে অবাক লাগে। কারণ, মানুষ মানুষকে এভাবে যে মেরে ফেলে তা কখনো দেখিনি। শিপনের মতো এতো সৎ, মেধাবী ও সচেতন কিশোরকে যারা খুন করলো তাদের কঠিন শাস্তি দিতে হবে।

খুনিদের বিচার চেয়ে শিপনের একমাত্র বোন তাকিয়া বলে, আমার ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। আমার ভাইকে যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার করতে হবে।

শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপন ১৯৮০ সালের ১৪ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার পূর্ব বাসাবোতে তাদের বাসা। গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের মতলব উপজেলার মাথাভাঙ্গা গ্রামে। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী এবং সবুজবাগ থানার ২৭নং ওয়ার্ডের অর্থসম্পাদক ছিলেন। তার প্রিয় গান–

"কোন একদিন এ দেশের আকাশে কালেমার পতাকা উড়বে।"



icsbook.info

## শহীদ জসিম উদ্দিন

### সাপের মতো পিটিয়ে হত্যার পর যার লাশের উপর নৃত্য উল্লাস করে নরপিশাচরা

আযানের ধ্বনি শুনে ক্ষণিকের জন্যও বসে থাকতেন না। আশপাশের সবাইকে ডেকে নিয়ে চলতেন মসজিদের দিকে। ভালো কথা বলতেন। ভালো কাজের দিকে মানুষকে ডাকতেন। মানুষের মঙ্গল কামনাই ছিল একমাত্র ধ্যানধারণা। তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন গত অক্টোবরে লগি-বৈঠা বাহিনীর নির্মম শিকার লালবাগের শহীদ জসিম উদ্দিন। সেদিন লগি-বৈঠাধারি সন্ত্রাসীরা তাকে শুধু সাপের মতো পিটিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, লাশের ওপর উঠে পৈশাচিক নৃত্য উল্লাস করেছে, করেছে আনন্দ উল্লাস। কী অপরাধ ছিল জসিমের? কেন তাকে মরতে হলো? এ প্রশ্নের জবাব আজো খুঁজে পায়নি তার বোন আয়েশা। সৎ-মা রেখা বেগম জসিমকে হারিয়ে পাগল প্রায়। তার প্রশ্ন এ নরপিশাচদের বিচার কি এদেশের মাটিতে হবে না?

শহীদ জসিম উদ্দিনের পিতা আবদুর রশিদ খান। জসিম ২ ভাই ৫ বোনের মধ্যে সবার বড়। মাত্র আড়াই বছর বয়সে তার মা মারা যায়। শহীদ জসিমের পিতা আবদুর রশিদ খান জানান, মানুষের সংসারে কত সমস্যা থাকে। কিন্তু আমার পরিবারে কোনদিন সমস্যা হয়নি। জসিমের মা আড়াই বছর বয়সে মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করি। কিন্তু একজন সৎ-মা হিসেবে জসিমের সাথে কোনদিন কোন ব্যাপারে বিরোধ হতে দেখিনি। জসিম তার পিতাকে ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু কোনদিন না বলে ক্যাশ থেকে একটি টাকাও নেয়নি বলে জানালেন আবদুর রশিদ খান। জসিমের প্রতিবেশী লুৎফর রহমান জানান, জসিম ছিলেন আনুগত্যপরায়ণ এক ত্যাগী কর্মী। সাংগঠনিক কোন কাজে তার কোন কষ্ট ছিল না। যার ফলে কোন প্রোগ্রামের ব্যাপারে পিছপা হতেন না।

গত বছরের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠা বাহিনীর তাণ্ডবে যারা প্রাণ হারায় তাদের মধ্যে জসিম উদ্দিন শাহাদাত বরণ করেন নির্মমভাবে। বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ থেকে দেখা যায়, লগি-বৈঠা বাহিনী জামায়াত কর্মী জসিম উদ্দিনকে দীর্ঘক্ষণ ধরে পিটায়। মাঝে-মাঝে সে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করে। আবার টেনে ধরা হয়। পুরো শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তার শরীরের জামা ছিঁড়ে ফেলা হয়। লগি-বৈঠা দিয়ে তাকে পিটানোর পর মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে লাশের ওপর উঠে নৃত্য করতে থাকে নরপিশাচরা। এ দৃশ্য স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের বদৌলতে প্রচারিত হওয়ার পর হতবাক হয়ে যায় বিশ্বের মানুষ। সভ্যতার এ যুগে মানুষ মানুষকে এভাবে সাপের মতো পিটিয়ে হত্যা করতে পারে? তারপর লাশের ওপর উঠে নৃত্য উল্লাস? এরা কী মানুষ? শহীদ জসিম উদ্দীনের বোন আয়েশার প্রশ্ন– এভাবে মানুষ কী মানুষকে পিটিয়ে মারতে পারে? যেভাবে আমার ভাইকে মেরেছে। আল্লাহ যেন তাদের বিচার করেন।

শহীদ জসিমের সৎ-মা রেখা বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার জসিম ছাড়া আমি থাকতে পারছি না। জসিমকে আমি আড়াই বছর বয়সে মা হারা অবস্থায় পেয়ে কোলে নিয়েছি। তিনি বলেন, আমার গর্ভে না জন্মালেও জসিম আমার সবচেয়ে প্রিয়। সে কোনদিন চেয়ে খেতো না। মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতো না। মানুষের সাথে জসিম এতো সুন্দর ও অমায়িক ব্যবহার করতো যাতে যে কেউ সহজেই আপন হয়ে যেতো। তিনি খুনিদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন। জসিমের পিতা আবদুর রশিদ খান বলেন, তার মতো অল্পে তুষ্ট এমন মানুষ কখনো দেখিনি। সে কখনো অহেতুক কথা বলতো না।



icsbook.info

জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি। তিনি বলেন, সে সর্বদা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতো। দোকানোর আশপাশের সবাইকে নামাযের সময় ডাকতো। তিনি লগি-বৈঠা সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে বলেন, জসিমকে যারা হত্যা করেছে তারা দেশ ও জাতির শত্রু। মানুষ হয়ে মানুষকে এভাবে হত্যা করতে পারে তা কল্পনাও করা কঠিন। তিনি এর যথার্থ শাস্তি দাবি করেন। শহীদ জসিমের বোন আয়েশা বলেন, আমার ভাই এর কোন অপরাধ ছিল না। তার একমাত্র অপরাধ সে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতো এবং নিজে আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা করতো। মানুষের সাথে জসিম এতো সুন্দর ও অমায়িক ব্যবহার করতো যাতে যে কেউ সহজেই আপন হয়ে যেতো। যে বাড়িতে শহীদ জসিমের পরিবার ভাড়া থাকে সেখানে দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত বৃদ্ধ দারোয়ান আবু বকর। তিনি বলেন– ভাতিজা যে কি ভাল মানুষ ছিল! এতো ভালো মানুষ যে, পৃথিবীতে যার কোন তুলনা হয় না। তিনি বলেন, ভাতিজা জসিম আযান হলেই আমাকেসহ বাজারের সবাইকে নামাযের জন্য ডাকতো। মানুষকে সত্যের পথে চলার জন্য বুঝাতো, বিভিন্ন পরামর্শ দিতো। যে শয়তানরা তাকে মেরেছে তাদের বিচার চাই।

শহীদ জসিম উদ্দিন ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ও ৬৬নং ওয়ার্ডের মিটফোর্ড ইউনিটের সভাপতি ছিলেন। লালবাগের মিটফোর্ড রোডে তাদের বাসা। গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কলমা ইউনিয়নের ভরাকর গ্রামে।

## পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে দেশে এসে নিজেই লাশ হলেন জসিম উদ্দিন

দেড় বছরের শিশু নাওফি এখনও পথ চেয়ে থাকে কখন তার আব্বা আসবে। খাবার নিয়ে বসে থাকে আব্বুর জন্য। আদর করে খাইয়ে দেবে তাকে। কিন্তু সে জানে না তার আব্বু আর কোন দিনই ফিরে আসবে না। ২৮ অক্টোবরের লগি-বৈঠা বাহিনীর পৈশাচিকতায় চিরতরে হারিয়ে গেছেন তিনি। শহীদ জসিম উদ্দিন তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে মার্চে দেশে ফিরেছিলেন। চলে যেতেন নভেম্বরে। কিন্তু পিতার লাশ দেখতে এসে নিজেই লাশ হয়ে গেলেন। স্বামীহারা নারগিসের প্রশ্ন– এভাবে কত মানুষকে লাশ হতে হবে? খুনিদের কি কোনই বিচার হবে না? সরকারের কাছে শহীদ জসিম উদ্দিনের পরিবারের দাবি অবিলম্বে খুনের দ্রুত বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন।

শহীদ জসিম উদ্দিন ৪ ভাই ২ বোনের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। বড় ভাই ১৯৯৯ সাল থেকে আমেরিকা অবস্থান করছেন। অপর দুই ভাইও আয়ারল্যান্ডে অবস্থানরত। শহীদ জসিম উদ্দিন ১৯৯৬ সালে সিঙ্গাপুর যান। সেখানে তিনি ২ বছর অবস্থান করেন। ২০০১ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০০২ সালে সৌদি আরব ও ২০০৫ সালে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে গত বছরের মার্চে তিনি দেশে আসেন। ১২ নভেম্বর পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকা চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২৮ অক্টোবর সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। লগি-বৈঠা বাহিনীর বুলেটের আঘাতে লাশ হতে হলো শহীদ জসিম উদ্দিনকে।

জসিম উদ্দিনের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ২৮ অক্টোবর সাড়ে ১১টার দিকে তিনি ঘুম থেকে উঠেন। ১২টার দিকে স্ত্রী নারগিস ও শিশুকন্যা নাওফিসহ একত্রে বসে নাস্তা করেন। তারপর শিশুকন্যা নাওফির সাথে মোবাইল নিয়ে লুকোচুরিও খেলেছেন। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ফোন আসে। জানানো হয় রোগির হাতে পচন ধরেছে।



icsbook.info

আজই অপারেশন করতে হবে। এ রোগি তার রক্তের সম্পর্কের কেউ নন। তার বাসার কাছে বস্তিতে থাকতো সে। রোগিটি ৭ বছরের একটি শিশু। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি জুরাইনে একটি বিদ্যুৎ ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণে মেয়েটির হাত ঝলসে যায়। গুরুতর অবস্থা দেখে জসিম উদ্দিনই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। সাড়ে ১২টার দিকে জসিম উদ্দিন বাসা থেকে বের হন। মেডিকেলে কাজ সেরে যানবাহন না পেয়ে হেঁটেই রওনা দেন। বিকেল ৪টায় স্ত্রী নারগিসের সাথে মোবাইলে কথাবার্তা হয়। এর কিছুক্ষণ পর প্রচার মাধ্যমে জসিম নামে একজনের মৃত্যুর সংবাদ শুনে শিউরে ওঠেন নারগিস। পরে তিনি নিশ্চিত হন এ জসিম অন্য মানুষ। তারপরও মন মানে না। নারগিস মিস্‌ড কল দিলেন তার প্রাণের মানুষটিকে। সাথে সাথেই জসিম উদ্দিন কলব্যাক করলেন। জানালেন, "রাস্তায় কোন যানবাহন নেই তাই হেঁটে হেঁটেই আসছি। চারদিকে ভিষণ গোলযোগ। চিন্তা করো না। আমি ৫টার মধ্যে বাসায় পৌছতে পারবো।" কে জানে এটাই জসিমের শেষ কথা স্ত্রী নারগিসের সাথে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত নারগিস অপেক্ষা করে তার প্রিয় মানুষটির জন্য। তর সইছিল না। এক অজানা আশংকায় বুক ধরফর করছিল। সোয়া ৫টার দিকে নারগিস তার স্বামীকে ফোন করে কিন্তু রিং হচ্ছে না। বার বার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু কোন সাড়া পাচ্ছে না। স্ত্রীর ভাবনা জসিম তো কখনো সময় দিয়ে বিলম্বে বাসায় আসে না। এদিকে টেলিভিশনে ঢাকা শহরের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কথা প্রচারিত হচ্ছে। নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। এমনি এক অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটতে থাকে জসিম উদ্দিনের পরিবার। হঠাৎ বাসার সামনে এম্বুলেন্স এসে থামে। নামেন নারগিসের বড় ভাই। প্রথমে নারগিস মনে করে হয়তো তার প্রিয় মানুষটি আহত হয়েছে। চিকিৎসা শেষে তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে। ক্ষণিক পরেই বুঝতে পারে তার প্রাণের মানুষটি আর নেই। লগি-বৈঠা বাহিনীর বৈঠার আঘাত আর গুলিতে চিরতরে হারিয়ে গেছেন তিনি। পুরো পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায় নারগিসের। বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন তিনি। পুরো পরিবারে শুরু হয় শোকের মাতম। পরদিন শহীদ জসিমকে তাদের গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

জসিমের স্ত্রী নারগিস এখনো বাকরুদ্ধ প্রায়। দেড় বছরের শিশু নাওফি এখনো খুঁজে ফিরে তার বাবাকে। কখন আসবে আর আদর করে খাওয়াবে তাকে। শহীদ জসিমের স্ত্রী নারগিস বলেন– 'আমি একজন শহীদের গর্বিত স্ত্রী হিসেবে অবশ্যই ভাগ্যবান। তবে যখন নাওফির দিকে তাকাই তখন আমার সমস্ত অনুভূতি লোপ পায়।' তিনি জানান, তাদের দাম্পত্য জীবনের অল্প সময়ে জসিমের কাছ থেকে যে সহযোগিতা ও ভালবাসা পেয়েছেন তা বলে শেষ করা যাবে না।

শহীদ জসিমের মা ফাতেমা বেগম একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। তিনি জানান, কোন মানুষ তার সন্তানের ব্যাপারে তার কাছে কোনদিন একটি অভিযোগও দিতে পারেনি। তিনি মনে করেন আল্লাহ তার ছেলেকে কবুল করে নিয়ে গেছেন।

তার ছোট ভাই শামছুজ্জামান সরকারের কাছে অবিলম্বে এ খুনের দ্রুত বিচার ও দোষিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

শহীদ জসিম উদ্দিন ১৯৭২ সালে চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার সুদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি স্নাতক সম্পন্ন করেন। ২০০৪ সালে ২৩ জুলাই চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার মনিপুর গ্রামের নারগিস আক্তারের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০০৫ সালের ১৫ মে তিনি কন্যাসন্তানের জনক হন।



icsbook.info

## মাসুম আর কোন দিনই মসজিদে নিয়ে যাবে না খেলার সাথীদের

২৮ অক্টোবরে লগি-বৈঠা বাহিনীর তাণ্ডবে শিকার শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুমকে কাঁদতে দেখেনি কেউ, রাগ কিংবা ক্ষোভ প্রকাশও করতে দেখা যায়নি। প্রাঞ্জল মাসুম কাজ করে যেতেন নিরবে। সদা হাস্যোজ্জ্বল এ মাসুম আর কোন দিনই ফিরে আসবে না। মানুষকে ডাকবে না খোদার পথে। ক্রিকেট খেলে খেলায় সাথীদের নিয়ে যাবে না মসজিদের দিকে। মাসুমের মা শামসুননাহার আজও খুঁজে ফিরেন তার ছেলেকে। কেঁদে বুক ভাসান দিনের পর দিন। কেন আমার ছেলেকে এভাবে যেতে হলো? শত অসুখের মাঝেও যে কখনো রোযা ভাঙ্গেনি তাকে কেন ওরা বাঁচতে দিলো না? এর কি কোন বিচার নেই? এসব প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পাননা তিনি।

শহীদ মাসুমের পুরো নাম সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম। ২ ভাই ৩ বোনের মধ্যে মাসুম ছিল ৩য়। তার পিতা মাহতাব উদ্দিন আহমেদ সাবেক সরকারি কর্মকর্তা। মাতা শামসুননাহার রুবি একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল। মাসুমের জন্মের পর তার নানু নাম রেখেছিলেন 'মাসুম'। কিন্তু মাসুমের আম্মা নানীর রাখা নামের সাথে যোগ করেন সাইুল্লাহ। তার পুরো নাম হয়ে যায় সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম। মাসুমের আম্মা প্রায়ই দোয়া করতেন– "হে আল্লাহ! ঢাকা শহরে কত সন্তান বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে, আমার সন্তান যেন বিপথগামী না হয়। সে যেন 'শাহাদাত' এর পথে চলতে পারে। কে জানতো এ দোয়ই একদিন আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে।

ভয়াল ২৮ অক্টোবর সকালে শহীদ মাসুম ও শহীদ শিপন একসাথে বাড়ি থেকে বের হয়। কেউ কি জানাতো তাদের এই বের হয়ে যাওয়াই শেষ বের হওয়া। মাসুমের আম্মা উভয়কে বাসায় দাঁড় করিয়ে রেখে দুটো সিদ্ধ ডিম খাইয়ে ছিলেন। আর এটাই ছিল তাদের জীবনের শেষ খাবার। তারা সরাসরি চলে আসেন বায়তুল মোকাররম উত্তর সড়কে। ইতোমধ্যে ১৪ দলের লগি-বৈঠা বাহিনী তাদের তাণ্ডব শুরু করে দেয়। জামায়াতে ইসলামীর সভা মঞ্চ দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। কিন্তু মানব ঢাল অতিক্রম করে কিছুতেই এগুতে পারছিল না তারা। বৃষ্টির মতো ইট আর বোমার মুখে সবার সামনে ছিলেন শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম। অসীম সাহসিকতা আর ঈমানী দৃঢ়তায় অটল থাকেন তিনি। খানিক ক্ষণের মধ্যেই একের পর এক ইট এসে পড়তে থাকে তার উপর। বড় একটি ইট এসে পড়ে তার মাথায়। সাথে সাথে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। তার পাশেই ছিলেন তার বড় ভাই শামসুল আলম মাহবুব। কী এ মর্মান্তিক দৃশ্য!

মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পরপরই তার বড় ভাইসহ অন্যান্যরা তাকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে নেয়ার পর তার অপারেশন হলো। সেখান থেকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) রাখার জন্য নেয়া হয় ইবনে সিনা হাসপাতালে। ৫ দিন সঙ্গাহীন অবস্থায় ছিলেন মাসুম। ২ নবেম্বর ভোর ৪টায় মহান আল্লাহর শাশ্বত আহ্বানে সাড়া দিয়ে শাহাদাত বরণ করেন সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম।

শহীদ মাসুমের লাশ যারাই দেখেছেন তারা আর ঠিক থাকতে পারেননি। জানাযা শেষে এক নজর তাকে দেখার জন্য লোকজনের ভিড় ছিল সীমাহীন। মৃত্যুর পর তার চেহারায় যে উজ্জ্বলতা দেখা যাচ্ছিল, তাতেই বোঝা যায় তিনি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেছেন। জীবন্ত মাসুমের চেহারা আর মৃত মাসুমের চেহারার মাঝে তফাৎ ছিলো



icsbook.info

অনেক। তার সুন্দর, নিষ্পাপ চেহারাটি যেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছিল। শহীদ মাসুমকে কেউ কখনো রাগ, ক্ষোভ বা অসন্তুষ্ট হতে দেখেনি। পারিবারিক পরিমণ্ডলে অনেক কিছু নিয়েই মতবিরোধ হয়, মনে অভিমানের সৃষ্টি হয়। অনেকে পারিবারিক অনেক ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়, আর প্রতিক্রিয়াও নানাভাবে ব্যক্ত করে। কিন্তু শহীদ মাসুমকে তার ২৩ বছরের জীবনে কখনো পারিবারিক কোন বিষয়ে বিরক্ত হতে কেউ দেখেনি। সবকিছুই হাসিমুখে বরণ করে নিতেন তিনি। ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন শহীদ মাসুম। গত ঈদুল ফিতরের পূর্বে তাকে নতুন জুতা কেনার জন্য তার পরিবার থেকে টাকা দেয়া হয়েছিল। তিনি এ টাকা দিয়ে জুতো না কিনে ইফতার মাহফিল আয়োজনে ব্যয় করেছিলেন। তিনি ঈদের জন্য পুরানো জুতা সেলাই করে ব্যবহার করেন। তাকে একটি নতুন পাঞ্জাবি কিনে দেয়া হয়েছিলো। পাঞ্জাবিটার রং ছিলো লাল। এ পাঞ্জাবিটাও তার এক সাথীকে উপহার দিয়েছিলেন তিনি। আর নিজে ঈদ করেছিলেন পুরনো কাপড় দিয়ে। ত্যাগের কী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

মানুষকে ভালো কাজের দিকে ডাকতে সদা তৎপর ছিলেন শহীদ মাসুম। ক্রিকেট খেলা ছিল তার অন্যতম হবি। পাশাপাশি ফুটবল বা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টেরও আয়োজন করতেন। কিন্তু এ খেলার সময়ও তিনি ব্যস্ত থাকতেন মানুষকে খোদার পথে ডাকতে। খেলা নিয়ে সময় নষ্ট করা নিয়ে তার মা মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। কিন্তু এসব খেলাকে তিনি দাওয়াতী কাজের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিরবেই কাজ করে যেতেন। শহীদ মাসুমের ধ্যানে মনে চলে এসেছিল শাহাদাতের কামনা। শহীদি গান তিনি শুনতে পছন্দ করতেন। তার শাহাদাতের পর তার ব্যক্তিগত ডায়েরি খুঁজে দেখা গেছে, সেখানে স্বহস্তে বড় করে লেখা রয়েছে– "শাহাদাত এনে দিবে মুক্তি"। শহীদ মাসুমের খালু ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ বলেন– সত্যিই শাহাদাতের জন্য সে ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। প্রায়ই সে আমাকে বলতো, আপনি আমাকে এমন একটা শহীদের ঘটনা শুনান যা শুনে আমি আমার জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারি।

ছাত্র হিসেবে শহীদ মাসুম ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও সম্ভাবনাময়। ৩টি বিষয়ে লেটারসহ এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পড়াশুনা করেছেন বিএএফ শাহীন কলেজে। এরপর উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ পাড়ি জমাতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার লন্ডন প্রবাসী খালাতো ভাই তাকে সেখানে লেখাপড়ার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। IELTS পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কে জানতো উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে না চিরতরে পরপাড়ে পাড়ি জমাবেন তিনি!

মাসুমকে হারিয়ে তার মা আজ পাগলপারা। চোখের পানি ঝরাচ্ছেন দিনে রাতে। বাবা মাহতাবউদ্দিন অনেকটা নিরব হয়ে গেছেন। তাদের পরিবার থেকে বিদায় নিয়েছে হাসি, আনন্দ আর উল্লাস। হারিয়ে গেছে আনন্দ উচ্ছ্বাস। তাদের বিষাদময় জীবনে হয়তো আর কোন দিন ফিরে আসবে না সুখ শান্তি আর আনন্দ। মাসুমের বড় ভাই শামসুল আলম মাহবুব জানান– আমাদের পরিবারের একটি উজ্জ্বল আলো নিভে গেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে আমার ভাইকে মারা হলো। এখনো সন্ত্রাসীদের ধরা হচ্ছে না। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন– শুনতে পাচ্ছি সরকার 'সন্ত্রাসী গডফাদার'দের ধরছে। যারা প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষকে নারকীয় কায়দায় পিটিয়ে মেরেছে, তারা কী সন্ত্রাসীর কাতারে পড়ে না?



icsbook.info

শহীদ মাসুম আর শহীদ শিপন ছিলেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। তারা বাল্যকাল থেকেই এক সাথে চলাফেরা করেছেন। সংগঠনও করেছেন এক সাথে। মাসুম ছিলেন ওয়ার্ড সেক্রেটারি আর শিপন ছিলেন একই ওয়ার্ডের বায়তুল মাল সম্পাদক। শাহাদাত বরণ করেছেনও এক সাথে। কবরও তাদের পাশাপাশি। শহীদ সাইফুল্লাহর মা শামসুন নাহার জানান, মাসুম অসুস্থ অবস্থায়ও রোযা ভাঙ্গেনি। সে শখের জুতা কেনার টাকা ইফতার মাহফিলের জন্য দিয়েছিল। এরকম নিষ্পাপ ছেলেকে কেন ওরা বাঁচতে দিলো না? শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুমের বাসা সবুজবাগ থানার মাদারটেকে। তিনি ১৯৯৭ সালে শিবিরে কর্মী ও ২০০৫ সালে সাথী হয়েছিলেন। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখায় ২৭নং ওয়ার্ড দক্ষিণের সেক্রেটারিছিলেন। তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)। প্রিয় মানুষ মা-বাবা আর নানা-নানু। প্রিয় দায়িত্বশীল মতিউর রহমান আকন্দ। প্রিয় খাবার নানুর হাতের রান্না করা খাবার। প্রিয় পোশাক লাল রঙের ফতুয়া, কারুকাজ করা কালো রং এর পাঞ্জাবি। আর প্রিয় গান "ঐ চাঁদের আলো আর লাগে না ভালো কেন জানি না।"

## ফয়সালকে হারিয়ে সংক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

২৮ অক্টোবরে লগি-বৈঠার তাণ্ডবে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া নারায়ণগঞ্জের শহীদ আবদুল্লাহ আল-ফয়সালকে আজও খুঁজে ফিরে তার স্বজনরা। স্বাভাবিক হতে পারেনি মা, ভাই ও বোনেরা। বিনয়ী, মেধাবী আর পরিশ্রমপ্রিয় ফয়সালের শূন্যতা আজ সর্বত্র। সংক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তারা লগি-বৈঠা সন্ত্রাসীদের সামাজিকভাবে বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন।

গত বছরের ২৮ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের চিটাগাং রোডে ছাত্রশিবিরের মিছিলে হামলা চালায় লগি-বৈঠা বাহিনী। উল্লাসের সাথে লগি-বৈঠা সন্ত্রাসীরা আঘাত করতে থাকে নেতা-কর্মীদের উপর। এ সময় শহীদ আবদুল্লাহ আল-ফয়সালের বড় ভাই ফাহাদ বিন আহসানকে লগি-বৈঠা বাহনী ঘিরে ধরে পিটাতে থাকে। কাছেই ছিলেন ফয়সাল। ভাইকে বাঁচাতে এগিয়ে যান তিনি। লগি-বৈঠার আঘাত এসে পড়তে থাকে তার উপর। একপর্যায়ে মাথায় আঘাত খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। দুইভাই জ্ঞান হারান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। পরদিন রাত সাড়ে ৮টায় ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আবদুল্লাহ আল-ফয়সাল। আর গুরুতর আহত অবস্থায় দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন বড়ভাই ফাহাদ। ভাই আহত হওয়ার খবর শুনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটে আসেন ছোটভাই ফাহমিদ। ঢাকায় এসে ফয়সালকে পাননি, পেয়েছেন তার কফিন। তিনি বলেন, ভাইয়া আজ নেই, সে শূন্যতা আমাকে ভিষণ পীড়া দেয়। অতি ছোটবেলা থেকেই আমরা খেলার সাথী ও পড়ার সাথী ছিলাম। আজ ভিষণ মনে পড়ছে তাকে। তিনি যথার্থ বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করে বলেন, তারা যেভাবে ভাইয়ার উপর আঘাত হেনেছে তা কোন মানুষের হতে পারে না, এটা কসাইকেও হার মানিয়েছে।

শহীদ ফয়সালের মা হাসনা বানু আজও স্বাভাবিক হতে পারেননি। তিনি জাতির কাছে তার ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে বলেন, যারা আমার সন্তানকে এরকম নির্মমভাবে হত্যা করলো তাদের সঠিক বিচার হতে হবে। আর কোন মায়ের বুক যেন এভাবে খালি



icsbook.info

না হয়। ফয়সালের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ফয়সাল অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলো। সে বাসায় থাকলেও বোঝা যেতো না। অল্পতে তুষ্ট ফয়সাল ছিলো খুবই বিনয়ী।

ফয়সালকে হারিয়ে শুধু তার পরিবারই নয়, কেঁদেছে পুরো এলাকার মানুষ। তার এক খালা জানান, ফয়সালের মতো এতো বিনয়ী, ভদ্র ও চরিত্রবান যুবক এ যুগে পাওয়া যাবে না। এলাকার এমন কোন মানুষ নেই যারা তার জন্য কাঁদেনি।

ফয়সাল খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন স্থানীয় হাজী শামসুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম জানান, ফয়সালের মতো একজন অমায়িক বিনয়ী ও ভদ্র ছেলে পাওয়া কঠিন। সে কখনো কাজকে ভয় পেতো না। সে এতো সৎ ও চরিত্রবান ছিল– যে কারণে আল্লাহ তাকে তাড়াতাড়ি কবুল করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, তার শূন্যতা এখন শুধু স্কুলেই নয়, পুরো এলাকায়। এ যুগে তার মতো ছেলে পাওয়া দায়। তিনি হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাসীরা যেভাবে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ফয়সালকে হত্যা করেছে তার যথাযথ বিচার হওয়া জরুরি। তিনি জাতির উদ্দেশে বলেন, আসামীদের সমাজ থেকে বয়কট করুন।

স্কুলের শহীদ ফয়সালের এক সহকর্মী জানান, ফয়সাল এমন ভালো মানুষ ছিলো যে, তার তুলনা হয় না। সে একজন বড় মাপের মানুষ ছিল। তার কোন তুলনা হয় না। সে একজন বড় মাপের সৎ ও চরিত্রবান মানুষ ছিল। তিনি জানান, যেদিন ফয়সাল স্কুলে আসতো না সেদিন শিক্ষকদের মাঝে যেন কোন এক শূন্যতা বিরাজ করতো। এতো মিশুক বিনয়ী ভদ্র শিক্ষক আর কোন দিনই আসবে না।

স্কুলের ছাত্র সাকিব বলে, আজ আমাদের ফয়সাল স্যার নেই। স্যার আমাদের খুব বেশি আদর করে কথা বলতেন। স্যারকে যারা খুন করেছে আমরা তার বিচার চাই।

শহীদ আবদুল্লাহ আল-ফয়সালের বাসা নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার সানারপাড়ের পাইনাদী মোস্তফানগর। তার পিতা মরহুম মাওলানা আহসানুল হাই। মা হাসনা বানু গৃহিনী। ৫ ভাই ২ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত ছিলেন। পাশাপাশি স্থানীয় হাজী শামসুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী ছিলেন।

## চিরতরে হারিয়ে গেলেন মেহেরপুরের আব্বাস
## বিয়ের বছর না ঘুরতেই বিধবা হলেন সাদিয়া আফরীন

জীবিকার সন্ধানে কুয়েতে পাড়ি জমিয়েছিলেন মেহেরপুরের আব্বাস আলী। কিন্তু নাড়ির টানে ৩ বছরের মধ্যেই ফিরে আসেন দেশে। বিয়ে করলেন। গড়লেন একটি সাজানো গোছানো সংসার। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই চলছিল আব্বাস-আফরীনের দাম্পত্য জীবন। পাখির কলকাকলীতে প্রতিদিন ঘুম ভাংতো তাদের। দিনের ব্যস্ততা শেষে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যেতেন তারা। আফরীন কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলেন বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাকে বিধবা হতে হবে। লগি-বৈঠার নৃশংসতা কেড়ে নিবে তার একান্ত আপনজনকে। সাজানো গোছানো স্বপ্নের সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কী অপরাধ ছিল তার স্বামীর? কেন তাকে দুনিয়ায় বাঁচতে দিলো না ঐ নরপাষান্ডরা? এর বিচার করার কী কেউ নেই? আজও এর উত্তর খুঁজে বেড়ায় সাদিয়া আফরীন।



icsbook.info

১৯৭৮ সালের ১৩ জানুয়ারি মেহেরপুর জেলা সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ আব্বাস আলী। ৩ ভাই ২ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন তিনি। ২০০২ সালে পাড়ি জমান কুয়েতে। ৩ বছর চাকরি করে দেশের মায়া ছাড়তে না পেরে ২০০৫ সালে ফিরে আসেন তিনি। কয়েক মাস পরেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন একই উপজেলার রাজাপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের মেয়ে ১৮ বছরের সাদিয়া আফরীনের সাথে। সচরাচর চোখে পড়া অবিন্যস্ত ছিলো না জহির উদ্দিন ও আসেরা খাতুনের ছোট ছেলে আব্বাস আলীর জীবন। তাই নিশ্চিন্তে নিজের মেয়েকে আব্বাস আলীর কাছে সঁপে দিয়েছিলেন জাহাঙ্গীর আলম। কিন্তু কে জানতো বছর না ঘুরতেই তার মেয়ে বিধবার ভাগ্যবরণ করবে?

গত বছরের অক্টোবরে ঈদে বেড়াতে এসেছিলেন আব্বাস আলী। ২৮ অক্টোবর বিকেলে বেরিয়েছিলেন বাজারে যাওয়ার জন্য। তিনি শহরের পূবালী ব্যাংকের সামনে এলে লগি-বৈঠাধারী সন্ত্রাসীরা ঘিরে ধরে তাকে। হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। একের পর এক লগি-বৈঠার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে আব্বাস আলীকে। মৃত্যু নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তারা পিটাতে থাকে আব্বাসকে। এর আগে গুলিও করে সন্ত্রাসীরা। এ সময় পুরো এলাকা জুড়ে চলছিল লগি-বৈঠার তান্ডব।

ছোট ছেলের মৃত্যুতে মা আসেরা খাতুন আর বৃদ্ধ বাবা জহির উদ্দিন আজ বাকরুদ্ধ। ধুলো মাটিতে ছোট থেকে বড় হতে দেখলো যে ভাইটিকে তার লাশ দেখে পাগলপারা হয়ে পড়েন বোন মরিয়ম আর মনোয়ারা। প্রাণপ্রিয় মানুষটিকে হারিয়ে দিশেহারা আফরীন। চোখে পানি আর আব্বাসের স্মৃতি রোমন্থন করেই সময় কাটে তার। তিনি বললেন, আমাদের অল্পদিনের দাম্পত্য জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল অনেক। আব্বাসের মতো এমন ভালো মানুষ আর হয় না। সে সর্বদা আমাকে খুশি রাখার চেষ্টা করতো। ভিষণ মিশুক ও সত্য নিষ্ঠাবান এক যুবক ছিলেন আব্বাস। একজন শহীদের স্ত্রী হিসেবে আমি গর্বিত কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, আমার জীবন সাথীকে এভাবে হায়েনাদের হাতে জীবন দিতে হলো কেন? এর কেন এখনো কোন বিচার হচ্ছে না?

প্রাণের ছোট ছেলেটিকে হারানোর বেদনা সহ্য করতে পারছেন না আব্বাসের বৃদ্ধ পিতা-মাতা। তাদের উভয়ের একই উচ্চারণ, আমাদের আব্বাসের মতো এতো ভালো মানুষ পৃথিবীতে কম আছে। সে সর্বদা সত্য কথা বলতো। কোনদিন আমাদের অবাধ্য হতে দেখিনি। কারো সাথে মনোমালিন্য হতে দেখা যায়নি কখনো। তারা আব্বাস হত্যাকারীদের যথোপযুক্ত বিচার দাবি করেন। মরিয়ম ও মনোয়ারার একই কথা। আমাদের ভাইকে কোন দিন অন্যায় করতে দেখিনি। কোন মানুষের ক্ষতি করতে দেখিনি। কিন্তু আমাদের ভাইকে এভাবে হারাতে হলো কেন?

আব্বাস আলীর বড় ভাই নাজমুল দক্ষিণ আফ্রিকা ও মেজো ভাই আশরাফ মালয়েশিয়ায় কর্মরত আছেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর একটি ইউনিট সভাপতি ছিলেন।

---

*লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক*



icsbook.info

# আরেক মালেক

জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর

"দেখ, দেখ এই ছেলেটা আমার ভাইয়ার সাথে স্টামফোর্ডে পড়তো, ওর মৃত্যুতে আমার ভাইয়া যা কেঁদেছে না...." তাড়াহুড়ো করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে ঢুকতে যাবো এমন সময় শুনলাম একটি মেয়ে তার বান্ধবীকে উপরোক্ত কথা বলছে, ৫ জন ছাত্রনেতার শাহাদাত শিরোনামে যে পোস্টারটি বেরিয়েছে সেটির দিকে ওদের দৃষ্টি। শুনতে পেলাম ওরা বলছে, ইস কত নিষ্ঠুর ভাবে পিটিয়ে মেরেছে ওদের। আমি হলফ করে বলতে পারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঐ পোস্টারটি ইসলামী আন্দোলনের জন্য এত বেশি সাড়া জাগিয়েছে যা মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের পরে আর কিছুতেই হয়নি। কেউ যদি ক্যাম্পাসে একটু চোখ-কান খোলা রেখে চলা-ফেরা করেন তার কানে এরকম অসংখ্য আফসোসের কথা ভেসে আসবে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় বাংলাদেশের প্রতিটি ক্যাম্পাসে এই পোস্টারটি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। শুধু ক্যাম্পাসে কেন দেশের প্রতিটি প্রান্তে এমনকি বিদেশের মাটিতেও এই পোস্টারটি মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে।

ভার্সিটির হলে বসে ২৮ অক্টোবরের সি.ডি দেখে আমরা প্রায় নির্বাক হয়ে যাই। এত নিষ্ঠুরতা কেউ কখনো দেখেনি। মানুষ এত অমানবিক হতে পারে আমাদের জানা ছিলনা। সবচেয়ে কষ্ট লাগে যখন দেখি আওয়ামী লীগ বানোয়াট পোস্টার করে মিথ্যাচারের ষোলকলা পূর্ণ করে।

সেদিন ক্লাসে বসে হঠাৎ মনে পড়ে যায় মুজাহিদের কথা। মুজাহিদওতো আমাদের মত এরকম ক্লাস করতো। Assignment-Presentation ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকতো তার বুকেও তো আমাদের মতোই স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন ছিল তার মায়ের বুকে। ছোট্ট ভাইয়ের বুকে।

আমি বড় অবাক হয়ে প্রায়ই ভাবি, ওর নামটি কি ওর নানা স্বপ্নে পেয়েছিলেন? কত অদ্ভুত মিল তার নামে ও কর্মে।

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে মালেকের পরে আর কারো শাহাদাত বোধ হয় এত বেশি সাড়া জাগাতে পারেনি। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুজাহিদের শাহাদাত ব্যাপকতর সাড়া জাগিয়েছে। ২৮ অক্টোবরের শাহাদাত আর অন্যান্য রাজনৈতিক হত্যার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। এটি সাধারণ হত্যা নয়। আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ কুরবানী। মানুষের মাঝে যে সাড়া জেগেছে তাকে কাজে লাগানো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। মুজাহিদদের কাছে আমাদের জবাবদিহী করতে হবে। হে আল্লাহ এই শাহাদাত তুমি কবুল করো। ■



icsbook.info

# সেদিন যা দেখেছিলাম

মুহাম্মদ ইসমাঈল

"জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে উঠে যবে জিন্দেগানি"

কবির উক্তিটি সঠিক সময়ে আমাদের মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে। কত স্বপ্ন ছিল মানুষের মত মানুষ হয়ে সমাজকে উপহার দিবে সুন্দর সকাল যেখানে থাকবেনা হানাহানি, যেখানে থাকবেনা সন্ত্রাস, যেখানে থাকবে না প্রতিহিংসার রাজনীতি। এর আগ মুহূর্তে মহান আল্লাহ তাঁর দরবারে নিয়ে গেলেন সত্যের সৈনিকদেরকে।

নোবেল পুরস্কারে ভূষিত বাংলাদেশ যখন বিশ্বের দরবারে এক নতুন ইমেজে অধিষ্ঠিত। ঈদ যেখানে আনন্দ নিয়ে এল এত খুশি যখন আমাদের দুয়ারে। আওয়ামী পেশীশক্তি তখন প্রতিহিংসার রাজনীতিতে মত্ত। দিশেহারা হয়ে তারা সেদিন বাংলাদেশে পেশী শক্তি দিয়ে খুনের পর খুন করে রক্ত দিয়ে হলি খেলেছিল।

সারা দেশে ২৬জন ভাই শাহাদাতের নজরানা পেশ করলেন। পাঁচ জনই করেছিল পল্টন ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায়। শহীদ হলেন (১) শহীদ মুজাহিদ (২) শহীদ ফয়সাল (৩) শহীদ শিপন (৪) শহীদ হাবিবুর রহমান ও (৫) শহীদ জসিম।

২৮ অক্টোবর মা আমাকে বলেছিল, বাবা তুমি ঢাকা যাবেনা। মার কথা অমান্য করে একটি পত্রিকার গাড়িতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। গজারিয়া থানা পর্যন্ত গাড়ি আসে। গাড়ি থেকে দেখতে পেলাম লগি, বৈঠা, বাঁশ উঁচিয়ে ওদের আসতে আর সবকিছু ভাঙ্গতে। ভাঙ্গার দৃশ্য দেখে কারো চোখের পানি না এসে পারে না। এমনকি সাধারণ পথিক ঐদিন আওয়ামী তান্ডব থেকে রেহাই পায়নি। হুন্ডা দিয়ে বউকে নিয়ে যাচ্ছিল এক লোক। পথিমধ্যে পথ রোধ করে বউকে নামিয়ে হুন্ডা জ্বালিয়ে দিয়ে তারা উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তাদের উল্লাসের মাতামাতি পথের মধ্যে যা দেখেছি তা বলে শেষ করা যাবে না।



icsbook.info

ঢাকায় এসে পল্টনের ঘটনা পুরোপুরি অবলোকন করেছি। পল্টনের আহাজারিতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। বাতাস ভারী হয়েছিল কিন্তু আওয়ামী হায়েনার দলের বুক কাঁপেনি। বরং উল্লাসে ফেটে পড়েছিল তারা। সারাদিন যুদ্ধ চলছিল তাদের সাথে আল্লাহর সৈনিকদের। কিন্তু আল্লাহর সৈনিকরা সীসাঢালা প্রাচীরের মত জালিমদেরকে শক্তভাবে মোকাবেলা করেছে। আওয়ামী হায়েনার আঘাতে আঘাতে ছয়শত ভাই আহত হয়েছিল। পাঁচ জন শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করেছিল তবুও ধর্মনিরপেক্ষ কুফরিশক্তি ময়দান দখল করতে পারেনি। আল্লাহর ময়দান আল্লাহ হেফাজত করেছেন।

ছোট বেলায় শুনেছি আওয়ামী হায়েনার দল একটি ফ্যাসিবাদী দল, সন্ত্রাসী, খুনি, চাঁদাবাজ, ধর্ষণকারি। বিশ্বাস তেমন করিনি। যখনি তারা ক্ষমতার মসনদে বসে তখনি তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। তারা ৭২ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনী দিয়ে নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল। বিগত সালে মসজিদে হামলা, মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া, একশত ধর্ষণ করে সেঞ্চুরি পালন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ এমন কোন কাজ নেই যা তারা করেনি।

ক্ষমতার লোভে মাত্র তিন দিনে যারা ২৬ জন মানুষ খুন করতে পারে, যারা এখনো ক্ষমতায় নাই তাতেই তারা অত্যাচার চালিয়ে পুরো দেশকে বিভীষিকাময় করে তুলেছে। ক্ষমতার মসনদে বসলে তাদের হাতে কত মায়ের বুক খালি হবে? আমরা আর কোন মায়ের বুক খালি দেখতে চাইনা। আমরা চাই না আমাদের ভাই মুজাহিদের মত আমাদের ছেড়ে আর কেউ চলে যাক। আমরা ভোটের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটিয়ে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে চাই।

আর আল্লাহর কাছে বলবো– হে আল্লাহ, খালিদের মত, হামজার মত শহীদ মুজাহিদকে ও অন্যান্য শহীদদেরকে তুমি শহীদ হিসেবে কবুল কর। ■



icsbook.info

# স্মৃতিতে আঠাশে অক্টোবর

সাব্বির

1 missed call. সকালবেলা মোবাইলের দিকে নজর পড়তেই স্ক্রিনে দেখা গেল লেখাটি। দেখলাম মাসুম ভাইয়ের দেওয়া মিস্‌ড কলটি। বুঝলাম আমাকে যেতে হবে এখনি ঢাকার পল্টনে। হ্যাঁ, ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর কথাই বলছি। ঐদিন পল্টনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সমাবেশ ছিল। আমি তখন নারায়ণগঞ্জে নানার বাসায় ছিলাম। যানবাহন ২৭ অক্টোবর রাত থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। পল্টনে যাওয়ার চিন্তাই মূলত মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল পূর্বের দিন রাত থেকেই। বাসায় নিষেধাজ্ঞা বাইরে বের হওয়া যাবেনা, ঢাকাতো পরের কথা। কিন্তু মন পল্টনে থাকলে নিষেধাজ্ঞা কি আর মানা যায়, নানা-নানীকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে কৌশল অবলম্বন করে (বললাম, রাস্তার অবস্থা খারাপ দেখলে চলে আসব) রওয়ানা হলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। পথে কিছু পথ গাড়িতে চড়ে, কিছু পথ পায়ে হেঁটে এবং ভ্যানে চড়ে অবশেষে সমাবেশ স্থলে পৌঁছালাম। সমাবেশ বিকাল ৩টায়, কাজেই আমরা গুটি কয়েক স্বেচ্ছাসেবক যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, আর সবাই সবার কুশল বিনিময় করছি। কিন্তু মনে কেমন জানি এক অজানা আশংকার নাড়া দিলো। কারণ পথে দেখেছিলাম হায়েনাদের নারকীয় উল্লাস, জ্বালাও পোড়াও। শনিরআখড়া ও বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দেখেছিলাম লগি-বৈঠাধারিদের দানবীয় চিৎকার।

বেলা প্রায় পৌনে বারটা। হঠাৎ দেখি পল্টন মোড়ের দিকের ভাইয়েরা দৌড়িয়ে আমাদের দিকে আসছে এবং ব্রিজের নিচের দিকের ভাইয়েরা তাদের সহায়তা করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দক্ষিণ গেট অভিমুখী লাইনটা কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এরপর যে কি হল তা আর গুছিয়ে লেখা হয়ত সম্ভব হবেনা। দেখলাম হায়েনাদের পৈশাচিক উল্লাস আর আমাদের ভাইদের আহত হবার দৃশ্য। রক্তখেকো নরপিশাচরা লগি-বৈঠা এবং অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর আমাদের ভাইয়েরা খালি হাতে তাদের প্রতিহত করছে।



icsbook.info

একে তো লোক খুব কম, তার উপর লাঠিও তেমন নেই হাতে। গোনা গুটিকয়েক ছোট লাঠি ছাড়া এই চরম বিপদের সময় প্রয়োজনীয় ইটের টুকরাও তেমন খুঁজে পাওয়া গেলনা। মূলত এই ছিল আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এভাবে চলল প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত । মাঝে মাঝে অবলোকন করলাম সেইসব অসহায় মুরব্বীদের, যারা আমাদের পানি পান করিয়েছিল। তাদের দেখে খুবই মায়া লাগল। মনে মনে আল্লাহকে ডাকছি আর প্রার্থনা করছি, আমার মনে হয় সকল ভাইয়েরা এই প্রার্থনাই করছিল, "হে আল্লাহ, তোমার দ্বীনের সৈনিকরা আজ বড়ই অসহায়। রক্ত নিয়েছ নাও, প্রয়োজনে আরও নাও তবুও তুমি তোমার দ্বীনের কাফেলার সৈনিকদের এই জমি ঐ জালিমদের হাতে তুলে দিওনা।" আশ্চর্য্য হয়েছিলাম কেউ পিছু হটছে না দেখে এবং সবাই নিজের জীবনের সর্বোচ্চ কুরবানী দিতে প্রস্তুত। এরই মধ্যে পুলিশ দু'দলের মধ্যে ব্যারিকেড দিয়ে দাঁড়াল। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হল। আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ ভাই সবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আর আমরা কিছু ভাই সেদিকে ছুটে গেলাম। সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুর রহমান ভাইয়ের নির্দেশে আমরা পুরানা পল্টনের এক গলির মুখে দাঁড়িয়ে গেলাম। সেখানে আমাদের সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন ভাই এবং ঢাকা মহানগরী পশ্চিম সেক্রেটারি ফখরুদ্দীন মানিক ভাই। মানিক ভাই আগেই আহত হয়েছিলেন। তার মাথায় ব্যান্ডেজ ছিল। অবশ্য এরই মধ্যে জামায়াতের সমাবেশ সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। হঠাৎ সন্ধ্যার কিছু আগে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। হায়েনারা আবারও ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমাদের ভাইদের উপর। এবার লগি-বৈঠা নিয়ে নয়, আক্রমণ করছে গুলি ও বোমা নিয়ে। কাজেই এবার আহতের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল। কত আহত ভাইকে ভ্যান গাড়িতে, কাউকে ধরা ধরি করে কিংবা কেউ নিজেই কেন্দ্রীয় অফিসের দিকে যাচ্ছে। গা শিউরে ওঠার মত অবস্থা। হয়ত এরই মধ্যে ছিলেন আমাদের কোন হারিয়ে যাওয়া শহীদ ভাইটি।

মনে মনে আল্লাহর কাছে তার জমিন রক্ষার প্রার্থনা করছি। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসল। শুনলাম ময়দান বিডিআর দখলে নিয়েছে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি মাসুদ ভাইকে হাত ব্যান্ডেজ অবস্থায় ময়দান ত্যাগ করতে দেখলাম। ইসলামী আন্দোলনের এক সংগ্রামী বীর, অকুতোভয় সিপাহসালার এবং নির্ভীক সেনাপতিকে আহত অবস্থায় দেখে যে কি কষ্ট পেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা সবাই কেন্দ্রীয় অফিসে সমবেত হলাম। পরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার ভাইয়েরা যার যার এলাকার লোকজন নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে ফিরে গেলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ আমার মনে হল আজ যেন কত তারিখ? ওহ, আজ আটাশ তারিখ। ভাবলাম হে আটাশ অক্টোবর! তুমি এভাবে এলে আমাদের জীবনে, কেন ক্ষত-বিক্ষত করে দিলে আমাদের শরীর ও মনকে। মনে মনে বললাম, হয়ত এটাই তোমার কাছে বুঝি আমাদের পাওনা ছিল। ■



icsbook.info

# মুজাহিদ

মিজান আহমেদ

শহীদ মুজাহিদের স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে সেদিনটির কথা, যেদিন ছাত্রলীগ নামধারী হায়েনারা তাদের রক্ত পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরস্ত্র শিবির কর্মীদের উপর পৈশাচিক হামলা চালায়। সেদিন অন্যান্য কর্মী ভাইদের পাশাপাশি আমার ভাগ্নে মুজাহিদও নির্মম লাঠি-পেটার শিকার হয়েছিল। সেদিন আছর নামাজের পর আমি মসজিদ হতে বের হয়ে দেখি মুজাহিদ হাঁটতে পারছেনা, খোঁড়াচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোকে কে মেরেছে?" জবাবে সে বলে, মামা তেমন কিছু না, পায়ে সামান্য আঘাত পেয়েছি। তার উত্তর এড়িয়ে যাওয়া দেখে, আমি তাকে আরও চড়া গলায় ধমক দিলাম এবং বললাম তাতো আমি দেখতেই পাচ্ছি, তুই শুধু বল কে করেছে?

এমতাবস্থায় তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমার ভাতিজা জীবন বলে, কাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়েছে।

আমি তখন তাকে বললাম, আজ থেকে তোর রাজনীতি করা বন্ধ। তোর মত বোকাদের দিয়ে আর যাই হোক রাজনীতি হবে না, কখন দৌড়াতে হয় তুই তাই জানিস না। এর জবাবে সে বেশ আহত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে, "মামা আপনি কি জানেন আমার স্বপ্ন কি?"

আমি তখন তাকে প্রশ্ন করি, "বল কি তোর স্বপ্ন?"

সে তখন বললো, "মামা, আমার স্বপ্ন হলো আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য শহীদ হওয়া।"

জানিনা, তখন কেন জানি অজানা এক শঙ্কায় আমার সমস্ত অন্তর ভয়ে কুঁকড়ে গেল এবং আমি মুজাহিদের দিকে তাকালাম– সে চেহারায় নেই কোন দ্বিধা, নেই কোন ভয়, এক প্রচন্ড সংকল্পের আভাস, যা আমার ভয় আরও বাড়িয়ে দিলো। এখানে উল্লেখ করা



icsbook.info

প্রয়োজন, বিগত পাঁচ বৎসর আমি দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য ঔষধ কোম্পানিতে মার্কেটিং সেক্টরে কর্মরত ছিলাম, যার কারণে কারও চেহারার অভিব্যক্তি পড়া আমার জন্য দুর্বোধ্য কোন বিষয় ছিল না। আমি তখন ওর হাত ধরে এক প্রকার জোর করেই টানতে টানতে বাসার দিকে আসতে থাকলাম। ওর পায়ে যে ব্যথা সে কথা তখন আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার ব্যাকুলতা দেখে মুজাহিদ বললো– মামা আপনি পাগলামি করছেন কেন? হাত ছাড়েন আমার পায়ে ব্যথা লাগছে।

আমি বললাম লাগুক, আগে তুই বল এই ধরণের কথা তুই আর কখনও বলবি না। মুজাহিদ তখন স্মিত হাসে এবং বলে– মামা Please হাতটা ছাড়েন।

আমি বললাম পরে, আগে বাসায় যেয়ে নেই। বাসায় ঢুকেও আমি ওর হাত ধরে রেখেছি, এই অবস্থায় ও বলে– মামা এবার তো আমি বাসায়, এখন ছাড়েন।

এরই মধ্যে ওর গর্বিত মা এবং আমার মাতৃতুল্য বড় বোন উপস্থিত হয় এবং আমি তখন বলি– বড়পা, আজ হতে মুজাহিদের শিবির করা নিষেধ। ওকে আর বাসা হতে বের হতে দিবি না।

বড়পা তখন প্রশ্ন করে কেন? কি হয়েছে?

আমি তখন বলি– বড়পা, ও বলে ওর স্বপ্ন নাকি শহীদ হওয়া। তুই বলে দে আমরা এই বয়সে ভাগ্নের লাশ গ্রহণ করতে পারবো না, তুই ওকে বোঝা।

আপা তখন বলে– ও সবসময় আমাকেও এই কথাই বলে।

এই সময় মুজাহিদ বেশ উদাসীনভাবেই বলে ওঠে– "মামা শহীদ হতে হলে অনেক বড় ভাগ্যের প্রয়োজন, আমার কি এতবড় সৌভাগ্য হবে?"

ওর এই কথা, যে কথা ও বলেছিল ওর হৃদয়ের গহীন হতে দুচোখ ভরা আকুতি নিয়ে যা মহান আল্লাহ পরবর্তী সময় কবুল করেছেন। এখন আমি বুঝতে পারছি সেদিন মুজাহিদের সেই গলা শুনে কেন আমি তখন এতো ভয় পেয়েছিলাম। ■



icsbook.info

# ঝরে যাওয়া এক প্রস্ফুটিত গোলাপ

মাহমুদা বেগম

বদরের প্রান্তর। মুসলিম বাহিনী এবং অমুসলিম বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি। রাসূল (সা.) এর হাতে একটি তীর। সেটির সাহায্যে তিনি কাতার সোজা করছিলেন। এসময় তীরের ফলা সা'য়াদ ইবনে গামিয়ার পেটে একটুখানি লাগলো। সা'য়াদ তৎক্ষণাৎ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। বদলা নিতে দিন। নবী (সা.) নিজের পেটের ওপর থেকে জামা সরিয়ে বললেন, নাও প্রতিশোধ নাও। সা'য়াদ প্রিয় নবী (সা.) কে জড়িয়ে ধরে তাঁর পেটে চুম্বন করলেন। নবী (সা.) বললেন, ছা'য়াদ তুমি এমন কাজ করতে কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলে? সা'য়াদ বললেন, আমার প্রচন্ড ইচ্ছা হলো যে, আপনার ঘনিষ্ঠতা যেন আমার জীবনের শেষ স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকে। আপনার পবিত্র দেহের সাথে আমার দেহের সংস্পর্শ যেন জীবনের শেষ ঘটনা হয়। সা'য়াদ ইবনে গামিয়া যেমন ইসলামের বিজয়ের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়ার পরিপূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বদর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আমাদের শহের মুজাহিদও তেমনি ২৮ অক্টোবরের সমাবেশে শহীদ হওয়ার অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে পল্টন প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছিল।

মৃত্যুর আগের রাতে সাহসিকতার সাথে থানা অফিস পাহারা দেয়া এবং জিহাদের গান শুনা, মায়ের কাছে দোয়া চেয়ে বিদায় নেয়া, পথে একজনের কাছে শহীদ হওয়ার দোয়া চাওয়া, দায়িত্ব পালনের জন্য বন্ধুদের থেকে আলাদা হওয়ার সময়– "আল্লাহ হাফেজ, জান্নাতের সিঁড়িতে দেখা হবে" বলা আর এসব স্মৃতিময় কথাগুলোয় তারই প্রমাণ মেলে। সকাল থেকেই সে অস্থির হয়ে গিয়েছিল পল্টন ময়দানে যাওয়ার জন্য। বন্ধুদের ধীর প্রস্তুতি দেখে সে বলেছিল– "তোরা যদি কেউ না যাস, তবে আমি একাই যাবো"। এভাবেই উৎসাহ দিয়ে বন্ধুদের সাথে করে সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিল।

আমি যখন মুজাহিদের মায়ের কাছে গেলাম তখন দেখি মুজাহিদের রেখে যাওয়া ব্যাগটি বুকে চেপে ধরে খাঁটের কোণে পাথর হয়ে বসে আছে, মনে হচ্ছিল যেন শিশু মুজাহিদকে বুকে আগলে বসে আছে। আমি যখন তাকে জড়িয়ে ধরলাম তখন সে বলল– আলহামদুলিল্লাহ; খালাম্মা। আল্লাহকে তখন বললাম– হে আল্লাহ! এ মায়ের সবরকে তুমি কবুল কর, কবুল কর। মুন্নী হাশরের মাঠে তুমি শহীদের মা হিসাবে কত মর্যাদাই না পাবে, তোমার ছেলে তোমার জন্য সুপারিশ করবে, তুমি কত ভাগ্যবান।



icsbook.info

মুজাহিদের নানুর (হাসিনা মনসুর) কাছে গেলাম। তিনি ২৮ অক্টোবর উমরা শেষে সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মুজাহিদের শহীদ হওয়ার খবর পান। তাঁর চোখের পানি যেন ফুরাতে চায় না। কারণ তাঁর আদরের নানুভাই যে তাকে চোখের পানি ফেলে এয়ার পোর্টে বিদায় দিয়েছিল। তিনি বলেন কাবাঘর তাওয়াফ করতে করতে আল্লাহকে বলেছিলাম– "হে আল্লাহ আমার নানুভাই মুজাহিদকে আখেরাতেও মুজাহিদ হিসাবে কবুল করো।" বেশ ক'মাস আগে হাসিনা আপা হাসতে হাসতে বলেছিলেন– জানেন আপা, আমার নানুভাই মুজাহিদ শিবিরের সদস্য হয়েছে। সেদিন আমিও যে কত খুশি হয়েছিলাম! সে খুশি আল্লাহ পাকের একজন আনসার বেড়ে যাওয়ার জন্য (হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।)

কারবালার প্রান্তর, ফোরাত নদীর তীরে ৯ মহররমের রাত। ক্লান্ত, শ্রান্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন হোসেন (রা.) স্বপ্ন দেখেছেন রাসূল (সা.) তাঁবুতে ঢুকলেন, হাতে এক গ্লাস বেহেশতী সরবত। তিনি বললেন– "হোসাইন তোমরা যে (জীবন দিব তবু ইয়াজীদের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করবোনা) সিদ্ধান্ত নিয়েছো তাতে আল্লাহ তোমাদের উপর খুশি। আমিও তোমাদের সিদ্ধান্তে খুশি। আগামীকাল মাগরিবের পূর্বে তোমাকে এ সরবত পান করাবো।"

মুজাহিদের নানাভাই নিজ হাতে আদরের নাতিকে পরম যত্নে গোসল করালেন, বড় শখ করে আনা দামী ঘড়িটা নাতিকে পরাতে পারলেন না, তবে ইহরামের কাপড় দিয়ে আদরের নাতির শহীদি দেহটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন।

তায়েফের প্রান্তর। সমাজপতিদের লেলিয়ে দেয়া বখাটে ছেলেদের এক বিরাট দল রাসূল (সা.) এর আগে পিছে গালি দিতে দিতে, হৈ চৈ করতে ও পাথর ছুঁড়ে মারতে মারতে চলতে লাগলো। পাথরের আঘাতে আঘাতে নবী করীম (সা.) আচল হয়ে বসে পড়লেন। কিন্তু তায়েফের গুন্ডারা তাঁর বাহু টেনে ধরে দাঁড় করাচ্ছিল এবং পুনরায় পাথর মেরে হাত তালি দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। ততক্ষণে ক্ষতস্থানগুলো থেকে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছিল।

২৮ অক্টোবরের পল্টনের পৈশাচিক দৃশ্যগুলো আমাদেরকে তায়েফের সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মর্মান্তিক দৃশ্যগুলো দেখে সবাই মর্মাহত হয়, দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে আর অবচেতন মনে বলে উঠে– কেন ওদের মারছে? কি তাদের অপরাধ, ওরা কি করতে চায়?

ওদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- "তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সমর্থন দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।" (সূরা হজ্ব-৪১)

রাসূল (সঃ) তার সাথীদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন– "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ অবশ্য তার দ্বীনকে বিজয়ী, তাঁর বাণীকে পূর্ণাঙ্গ এবং তার দ্বীনের সাহায্য করবেন"।

মহান আল্লাহপাক তার সত্য দ্বীনের বিজয় এনে দিয়েছিলেন। তবে দ্বীনের বিজয়ের বিষয়ে আল্লাহর একটা নিয়ম আছে। সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- "অবশ্য আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবো, যাতে করে তোমাদের মধ্যে সত্যিকার মুজাহিদ এবং দৃঢ়তা ও সবর অবলম্বনকারী কে তা আমরা দেখে নিতে পারি এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি।" –(মুহাম্মদ : ৩১)

আমরা যখন এ পরীক্ষার স্তরগুলো পার হতে পারবো তখনই দ্বীনের বিজয় আসবে। আর তখনই শত মুজাহিদের রক্ত দেয়া স্বার্থক হবে। ■



icsbook.info

# মনে পড়ে তোমাকে

আবু সালেহ মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

২৭ অক্টোবর শুক্রবারজুম্মার নামাজ আদায় করে, আমি আমার মাদরাসা হোস্টেলে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। আর কি যেন ভাবছিলাম। হঠাৎ কে যেন দরজা নক করল। দরজা খুলে দেখি আমাদের ২৭নং পূর্ব ওয়ার্ডের সভাপতি সবুজ ভাই, তিনি আমার সাথে সালাম বিনিময় করে বললেন, মাসুম বিল্লাহ ভাই আজ বিকাল তিনটায় জামায়াত অফিসে প্রোগ্রাম আছে। যেহেতু আমাদের মাদরাসা ওয়ার্ডের তরিক ভাই ঈদের ছুটি কাটাতে দেশের বাড়িতে গিয়েছেন সেহেতু থানা সভাপতির অনুরোধক্রমেদাওয়াতী কাজটা সবুজ ভাইকেই করতে হলো। আমি ঠিক তিনটায় জামায়াত অফিসে গেলাম। গিয়ে দেখলাম জামায়াত অফিসে তালা ঝুলছে। আমি মনে মনে বললাম তিনটায় প্রোগ্রাম এখনো লোকজন আসছেন না কেন? হঠাৎ আমার পিছন দিকে কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখল। আমি চমকিয়ে উঠলাম। চেয়ে দেখি সালাহউদ্দিন ভাই। আমি ওনাকে বললাম সালাহউদ্দিন ভাই সাড়ে তিনটা বাজে এখনো যে লোকজন আসছেনা। আমাদের প্রোগ্রাম কিসের তিনি আমাকে এ সর্ম্পকে কিছুই বললেন না। আমি ওনার কাছে বললাম, একটু থানা সভাপতির কাছে মোবাইল করেন। তিনি থানা সভাপতির মোবাইলে কল করলেন। কিন্তু লাভ হলো না থানা সভাপতির মোবাইল ব্যস্ত। এখন ওনাকে বললাম, আমি একটু মাদ্রাসা থেকে আসি। যেহেতু আমার মাদরাসাটা জামায়াত অফিসের সাথে। আমি পৌনে চারটায় জামায়াত অফিসে ফিরে আসলাম। পথে রাস্তার পাশের দোকানে দুই মিনিট খেলা দেখলাম। তখন পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা চলছিলো। সেটা ছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একটা উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ। আমি জামায়াত অফিসে প্রবেশ করলাম আমাদের এই অফিসে দু'টি রুম রয়েছে। আমি অফিসে ঢোকার সময় প্রথমে ছোট রুমটি পরে। সেখানে বসা ছিলেন জামায়াত কর্মী বাশার ভাই ও মনির ভাই। আমি তাদের সাথে সালাম বিনিময় করলাম। এবং অনুমতি নিয়ে ভিতরে বড় রুমটিতে প্রবেশ করলাম, সেখানে সাধারণত সভা-সেমিনার হয়ে থাকে। আর এই রুমটিতে বসা ছিলেন, সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম, সালাহউদ্দিন, রনী প্রমুখ ভাইয়েরা। আমি প্রথমে তাদেরকে



icsbook.info

সালাম প্রদান করে মোসাফাহা করলাম আর কোলাকুলিটা শুধু সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম ভাই-এর সাথে করলাম। যেহেতু ঈদের দিন ও ঈদের পরে আমি মাসুম ভাই এর সাক্ষাৎ পাইনি। অত:পর আমি পাশের একটি চেয়ার নিয়ে বিনয়ের সাথে বসে পড়লাম। অত:পর আমি শুধু মাত্র মাসুম ভাইকে উদ্দেশে করে বললাম দক্ষিণ আফ্রিকার তো অবস্থা খারাপ ৬০ রানে ৫ উইকেট নিয়েছে পাকিস্তানী বোলাররা। তিনি আমাকে রসিকতা করে বললেন– আরে ভাই বাসা থেকে দেখে আসলাম ৪২ রানে ৫ উইকেট খুইয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ঠিক তখনি আসরের আযান পড়ল। আমরা তখন নামাজ পড়ার জন্য মসজিদ পানে রওয়ানা হলাম। আসরের নামাজ আদায় করে পুনরায় জামায়াত অফিসে ফিরে আসলাম। অত:পর আমি মাসুম ভাইকে বললাম, পাঁচটা বাজে এখনো যে প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে না। তিনি আমাকে বললেন এখানে বসে থাকাই আমাদের প্রোগ্রামের কাজ। কারণ এ দিন ছিল বিএনপি-জামায়াত সরকারের পাঁচ বছর ক্ষমতার শেষ দিন। যাতে জামায়াত অফিসের সামনে বিরধী দলের নেতা-কর্মীরা অপ্রীতিকর কোন ঘটনার জন্ম না দিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখাই আমাদের দায়িত্ব। এবং মাগরিবের নামাযের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি। মাগরিবের নামাজ শেষে আবার জামায়াত অফিসে যাই। হঠাৎ এক লোক এসে বলল, আমার মাদরাসা হোস্টেলে নাকি একজন মেহমান আসছে। আমি বাশার ভাই এর কাছ থেকে ছুটি নিলাম। পথিমধ্যে দেখলাম মাসুম ভাই ও রনী ভাই কি যেন পান করছিলেন। আমি তাদের দৃষ্টি গোচর হলে তারা আমাকে ডাকলেন এবং মাসুম ভাই আমাকে সেভেন আপ নামক পানীয় পান করতে একটা বোতল ধরিয়ে দিলেন। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা পান করতে হলো। আমি ওনাকে বললাম মাসুম ভাই আমি একটু বাহির থেকে আসি। তৎক্ষণাৎ সেখানে থেকে বিদায় নিলাম এশার নামাজ এর পর এসে ওনাকে আর পাইনি।

২৮ অক্টোবর বাইতুল মোকাররম মসজিদের উত্তরগেটে জামাতের প্রোগাম। থানা সভাপতি সাইফুল্লাহ ভাই এর নির্দেশক্রমেআমরা দৈনিক বাংলা মোড়ে ৩০ জন কর্মী ও সাথী অবস্থান নেই। সেখানে মাসুম ভাইও উপস্থিত ছিলেন। থানা সভাপতি আমাদের উদ্দেশ্যে করে বললেন, আমরা মিছিল নিয়ে মঞ্চের সামনে যাব। মাসুম ভাইকে স্লোগান দিতে বললেন। আমি সব সময় স্লোগান শেখার আশায় আশায় ওনার পাশেই অবস্থান নিতাম। তখন পশ্চিম দিক থেকে এক ভাই এসে বললেন– আপনারা এখনো মিছিল করছেন। পল্টন মোড়ে আমাদের ভাইরা শহীদ হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মাসুম ভাই এর মত পারলাম না। ওনার শহীদি জযবা ওনাকে এমনভাবে নাড়া দিল যার দরুণ তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। আমরা দেখেছি ওনার উপর নর-পিপাসুরা বৃষ্টির মত পাথর নিক্ষেপ করেছে। তারপরও তিনি দমে যান নি। হঠাৎ একটি বড় প্রস্তর খন্ড এসে ওনার মাথায় আঘাত করে, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পরেন। থানা সভাপতিসহ আমাদের অন্যান্য ভাইয়েরা ওনাকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলেন। পরে ওনাকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। অনেক কাকুতি-মিনতি করে থানা সভাপতির সাথে ওনাকে দেখার জন্য হাসপাতালে যাই কিন্তু ভাগ্যের নির্মম



icsbook.info

পরিহাস ওনাকে দেখার মত সুযোগ আর হলো না। কারণ দায়িত্বশীল ব্যতীত ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে আসি মাদরাসায়। দীর্ঘ পাঁচ দিন ওনাকে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছিল। গত দুই তারিখে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে শাহাদাতের স্বাদ গ্রহণ করেন। মাসুম ভাই সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমার পূর্ব থেকেই কম ছিলনা। কারণ তিনি ছিলেন সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী একজন সুন্দর যুবক। তার চন্দ্রিমা উজ্জ্বল মুখায়বয়বে ছিলনা কোন পাপের চিহ্ন, সেখানে অমাবস্যার ঘোর অমানিশা কোন দিন দৃষ্টিগোচর হয়নি। আমি বুকে হাতদিয়ে বলতে পারি। ওনার সামনে যদি পঞ্চাশ জন যুবক এনে দাঁড় করানো হতো। তাহলে হয়তো তিনিই সবার নজর কাড়াতেন। ওনার ছিল সুগঠিত বাহু, বিশাল বক্ষ, সু-উচ্চ নাসিকা এবং দৃষ্টিন্দন চাহনি। তিনি ছিলেন দেশ প্রেমীক, অসীম সাহসের অধিকারি একজন বিপ্লবী ছাত্রনেতা। এলাকার মধ্যে শত শত তরুণদের চেয়েও খোদাভীরুতা, ন্যায়পরায়নতা, উদারতা ও আদর্শের দিক দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে। ওনার সৎ সাহসের বর্ণনা এই সামান্য লেখায় প্রকাশ করতে পারবনা। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন বিপ্লবী অন্য দিকে তেমন ছিলেন অসহায়দের প্রকৃত বন্ধু। ভাবতে অবাক লাগে। কি আশ্চর্য সৎ গুনাবলীর এক অদ্ভূত মানুষ তিনি। তাকে দেখলেই আমার মনে হত। He was more successful Mazahid on the way of Allah in his area. সেদিন দুই তারিখে যখন ওনার লাশের কফিন জানাযা নামাজের জন্য আব্দুল আজিজ স্কুল মাঠে আনা হয়েছিল। ওনার শহিদী মুখখানা দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। লেবুর রসের মত ঝর ঝরিয়ে আমার চোখ থেকে অশ্রু বের হচ্ছিল। কারণ গত অক্টোবরের ২৭ তারিখ পুরোটা বিকাল আমি জামায়াত অফিসে ওনার সাথে কাটিয়েছিলাম। ওনার সেই হাসি খুশি মুখখানি আজও যেন আমার চোখে ভাসছে। এবার আপনারা বলুন সেইদিন যারা এই জঘন্যতম কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছিল তারা মানুষ না মানুষ নামের রক্ত পিপাসু জানোয়ার। সেই দিন তারা আমাদের ভাইদেরকে লগি-বৈঠা দিয়ে খুঁচিয়ে, খুঁচিয়ে সাপ পেটার মত পিটিয়ে হত্যা করেছিল। অনেকে এই বর্বরোচিত হামলার দৃশ্য টিভি চ্যানেলে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ছিল। এই ভাবে যদি রক্ত পিপাসুরা মানুষ হত্যা করতে থাকে তাহলে হয়তো অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। এবং বাংলাদেশ একটি তাবেদার মরুভূমি রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আসুন আমরা সবাই দেশ ও বাঙালি স্বার্থে এদের চিহ্নিত করে আইনের হাতে তুলে দেই। ■



icsbook.info

# আওয়ামী সন্ত্রাস
# প্রশ্নবিদ্ধ মানবতা

মু. মায়াজ

'ওরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়।' এই মহান বাণীটি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর অমীয় বাণী মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে বর্ণিত আছে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ যুগে যুগে ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই। ইসলাম প্রচার করার কারণে অনেক নবী-রাসূলকে অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। অনেকের জীবন দিতে হয়েছে, বিশেষ করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম প্রচারে মাক্কী যুগের ঘটনাকে স্মরণ করলে আমরা দেখতে পাই অসংখ্য অত্যাচার, নির্যাতন ও প্রাণহানির মাধ্যমেই নবী ও তার সাহাবীরা ইসলামের বিজয়ী ঝান্ডা উড়াতে সক্ষম হন। ইসলামের কট্টর বিদ্বেষী কাফির নেতা আবু জেহেল, ওতবা, শায়বা ও তাদের উত্তরসূরীরা কুরআনের বাণীকে মুছে দিতে চেয়েছিলো। তাদের অনুসরণ করে বাংলাদেশেও ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতির মধ্যে রুখে দাঁড়ায় আবু জেহেলের নাতি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিরা। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালে, ১৯৭০-৭১ সালে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিরা অসংখ্য চেষ্টা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করেছে। ১৯৭৭ সালে ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর আজ পর্যন্ত ১৩১ জন তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে সেক্যুলারিজমের হায়েনারা।

১৫ বছর পূর্বে রাসুলের (সা.) সাহাবীরা যেমনিভাবে আবু জেহেলের কাফির বাহিনীর শত সহস্র বাধা-বিপত্তিকে মোকাবেলা করে ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়েছেন। সেই ঝান্ডা বাংলাদেশেও উড়ন্ত অবস্থায় দেখার লক্ষ্যে যখন এগিয়ে যাচ্ছে ছাত্র জনতা, তখনই মানুষরুপী হায়েনার আঘাতে ঝরে যায় কয়েক তাজা প্রাণ। কিন্তু ইসলাম প্রিয় ছাত্র জনতা যখন জীবন দিয়ে হলেও ইসলামের ঝান্ড উড়ানোর দৃপ্ত শপথ নেয়, তখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সারা শরীরে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। তারা হিংস্র নরপশুতে পরিনত হয়। রক্ত ও জীবন নিয়ে মেতে উঠে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের।



icsbook.info

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাইয়েরা বিশ্রাম না নিয়ে অবিরাম সংগ্রাম করার জন্য শপথবদ্ধ হয়, বাতিল পন্থীদের রক্ত চক্ষুর মুখে সত্যের ঝান্ডা বাহকরা হতাশ হয়নি। বরং শহীদি লাশের রক্তে নতুন করে শপথ নিচ্ছে। ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে নিজেদের রক্ত ও প্রাণ দিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। শহীদি লাশের মাঝে এগিয়ে যাচ্ছে ইসলামের অনুসারিরা।

২০০১ সালে নির্বাচিত জোট সরকারের মেয়াদ পুর্তি যখন ঘনিয়ে আসছে। এমনি মুহূর্তে নিষ্ঠুর ও নির্দয়ের মত ওহুদের ময়দানে হযরত হামযার (রা.) কলিজা চিবিয়ে খাওয়া হিন্দার উত্তরসূরী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার হৃদয় বিষিয়ে ওঠে। তিনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে রাজপথে পিটিয়ে হত্যা করার জন্য তার লালিত-পালিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীদেরকে লগি-বৈঠা ও যার কাছে যা আছে সব নিয়ে মাঠে-নামার নির্দেশ দেন। শেখ মুজিব তনয়া হাসিনার আহবান ছাত্রলীগের গুন্ডারা সানন্দে গ্রহণ করে এবং রক্ত খেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার রাজপথে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ জোট সরকারের মেয়াদ পুর্তি উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে জনসভা আহবান করে। নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন পল্টনে ১৪৪ ধারা জারি করে। এতে বিএনপি তাদের জনসভা ডাকে নয়া পল্টনে এবং আওয়ামী লীগ ডাকে মুক্তাঙ্গনে।

গত ২৭ অক্টোবর ২০০৬ সালের বিকেল থেকেই আওয়ামী লীগ গোটা দেশে অব্যাহত ভাবে হত্যা, খুন, লুটতরাজ সন্ত্রাস আর রোমহর্ষক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বিশেষ করে গত ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সালের আওয়ামী তান্ডবালীলা যেভাবে চলেছে সেটা হিংস্র জন্তু জানোয়ার কিংবা মগ জলদস্যুদেরকেও হার মানিয়েছে। তাদের পূর্ব পরিকল্পিত রণসাজে সজ্জিত দৃশ্য মিডিয়ার বদৌলতে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু তখনও জনগণ জানতেন না আওয়ামী লীগ কতটা ভয়ঙ্কর রক্তলোলুপ নরপিশাচ, ২৮ অক্টোবর সন্ত্রাসীদের মদদদাতা হাজী সেলিম, ডা. এইচ ইকবালের নেতৃত্বে প্রকাশ্যেই আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে হামলা পরিচালনা করা হয় জামায়াতের সমাবেশের ওপর। সকাল ১০টা থেকেই লগি-বৈঠা, বাঁশের লাঠি, পিস্তল, চাকু, রামদা, কিরিচ, পাইপগান বিস্ফোরক দ্রব্যে সজ্জিত আওয়ামী হায়েনারা একেরপর এক হামলা করতে থাকে। দিনভর হামলা চালিয়ে তারা পৈশাচিকতাকেও হার মানিয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে কয়েকজনকে হত্যা এবং গুরুতরভাবে আহত করে সহস্রাধিক জামায়াত-শিবিরের নেতা কর্মীকে, ভাংচুর ও লুটপাট করে ধ্বংস করে দেয় মানুষের কর্মসংস্থান, ঠিক একইভাবে তারা রাজধানীর অন্যান্য এলাকাসহ গোটা বাংলাদেশকে হত্যা, খুন ও লুটতরাজের রামরাজ্যে পরিণত করে।

আওয়ামী লীগ সমগ্র দেশবাসীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তাদের আদর্শের সাথে, স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তৎকালীন ক্ষমতাসীন থাকাকালীন হত্যা, খুন আর রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়ার মাধ্যমে তারা কিভাবে দেশব্যাপী নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। যারা ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৫ সালে আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী বাকশালী রোমহর্ষক বিভীষিকাময় সেই স্বৈরাচারী দু:শাসন দেখেননি, যারা ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আওয়ামী দুরাচার ও দুর্বৃত্তের আবর্তে ঢাকা এক ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন



icsbook.info

বাংলাদেশের ইতিহাসকে ভুলতে বসেছিলেন। তাদের জন্য আওয়ামী লীগ সেটা দেখার আবারও সুযোগ করে দিলো। তাদের এমন কিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিক আচরণ দেখে পরবর্তী যুব সমাজ ও তরুণরা কী শিখবে। এই আওয়ামী লীগের মিথ্যাচারিতারও শেষ নেই। রণসজ্জিত আওয়ামী বাহিনীর পৈশাচিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, যখন তারা লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করে লাশের উপর নৃত্য করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি কলঙ্কজনক দিন। যেদিন ঢাকার রাজপথে লগি-বৈঠার নির্মম আঘাতে কয়েকজন যুবককে হত্যা করে রক্তাক্ত লাশের উপর উল্লাসে নেচে ওঠে অন্য একদল মানুষ্য পিশাচ। এমন নিষ্ঠুরতা ইতিহাসে বিরল, যা গোটা মানবতাকেই কারেছে প্রশ্নবিদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে দিনটি ছিলো আওয়ামী লীগের বর্বরোচিত ও পৈশাচিক কায়দায় মানুষ হত্যার একটি ভায়াবহ ও নোংরা অধ্যায়। সারা পৃথিবী এই বিভৎস নারকীয় তান্ডবে শিহরিত হয়ে ওঠে। দু:খজনক বিষয় হলেও সুশীল সমাজ তথা বুদ্ধিজীবীরা সারা জীবন মানবাধিকার নিয়ে কথা বললেও এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তারা নিশ্চুপ ছিলেন। তারা যেন তখন পৃথিবীতে ছিলেন না। কেন এই পরিবর্তন? যেখানে বিশ্বব্যাপী মানুষ এটাকে গ্রহণ করতে পারেনি। সেখানে সুশীল সমাজ কোন কথা বলাতো দূরে থাক 'টু' শব্দটিও করেনি। অভিজ্ঞ মহলের ধারনা এই যে, এই ঘটনার জন্ম দিয়েছে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ নেত্রীর একটি দায়িত্ব জ্ঞানহীন উন্মাদের মত ঘোষণা। কিন্তু সন্তান হারানো মায়ের আর্তনাদ, বাপ হারানো সান্তানের আহাজারী, ভাই হারানো বোনের কান্না কী বৃথা চলে যাবে! এটার কী কোন বিচার হবে না। পুলিশ প্রশাসনের আইন অমান্য করে যত কর্মীই ঐদিন ১৪দল লগি-বৈঠাসহ মাঠে নামিয়েছিলো তাদের ছবি ক্যামেরার ফুটেজই আছে। তাদের তো শাস্তি হওয়া উচিত। এবং তাদেরকে যে নেতা-নেত্রীরা হুকুম প্রদান করেছে সে যত উচ্চ পর্যায়েরই হোক, তারাতো হুকুমের আসামী। তাই তাদের বড় ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত। কারণ আইনের চোখে সবাইকে সমান ভাবা সরকারের উচিত। আসামীদেরকে যথাযোগ্য শাস্তি না দিলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। নতুবা এই নরপাশুরা আরও মানুষ হত্যা করতে কুষ্ঠিত হবে না। বর্তমান যুগের তরুণদেরকে সৎ ও যোগ্য করে গড়তে হলে এই রাজনীতিবিদদের থেকে দূরে রাখুন। দেশের শান্তি বজায় রাখতে এই মনুষ্য পিশাচদেরকে সমাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলুন। আজ জাতিকে শপথ করতে হবে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের মত আর একটি দিন বাংলাদেশের ইতিহাসে আসতে দেয়া যাবে না। ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার সাধ মেটানো যাবে না। ■



icsbook.info

# একদল নর-পিশাচ ও মানব প্রাচীর

অধ্যাপক খন্দকার আব্দুর রাজ্জাক

"আল্লাহ তো ভালবাসেন সেই লোকাদেরকে যারা তাঁর পথে এমন কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন ইস্পাত নির্মিত প্রাচীর"। –(আল কুরআন)

২৮ আক্টোবর ২০০৬ হঠাৎ করে আমার বড় ছেলে খালিদ রংপুর থেকে মোবাইল করে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওর মা'র কাছে জানতে চায় "আব্বা কোথায়! ঢাকায় জামায়াতের জনসভায় যাননি তো! আমরা কিন্তু টিভি চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছি জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীদেরকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলের বাম জোট নরপশুরা লগি-বৈঠা, টেঁটা ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করছে।"

আমার স্ত্রী আমিনা অসহায় নিরস্ত্র জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীদের সাহায্যের জন্য অযু করে দ্রুত অশ্রুসজল নেত্রে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেল সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর কাছে– তার সমগ্র সত্তা বিলীন করে। আমি দৌড়ে যাচ্ছিলাম জামায়াত কর্মী জুয়েল ভাইদের বাসায় আর কায়মনো বাক্যে মজলুমদের জন্য দোয়া করছিলাম মহান রবের দরবারে। পথে ঘাটাইল কলেজের একজন প্রবীণ অধ্যাপকের সাথে দেখা। আমার সালামের জবাব দিয়ে তিনি অত্যন্ত আবেগ ভরে বল্লেন– "ইস! আজ যদি জামায়াত-শিবির কর্মীদের হাতে অন্তত লাঠিও থাকতো!....তবু ওরা খালি হাতেই বীরত্বের সাথে লড়ছে- রক্ত দিচ্ছে।" জবাব দিবার বা আলোচনা করার মানসিকতা আমার ছিল না। সালাম বলে দ্রুত হাজির হলাম জুয়েল ভাইদের বাসায়। সেখানে জড়ো হয়েছেন জামায়াতের আরো ক'জন ভাই। সকলের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের ছাপ। ওখানে টিভি চ্যানেলে নিজ চোখে দেখলাম– মানুষের উপর নর-পিচাশদের নির্মম নিষ্ঠুর অবর্ণনীয় জঘন্যতম আচরণ। কীভাবে ফুলের মতো নিষ্পাপ এক যুবককে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে অনেকগুলো পশু নেচে নেচে উল্লাস করে রাজপথে ফেলে সাপ মারার মতো পিটাচ্ছে। রক্তে ভেজা শহীদের অচেতন লাশের বুকের উপর পৈশাচিক কায়দায় নৃত্য করছে। কীভাবে অপর এক তরুণ-সুর্দশন ছাত্রকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে কালো পিচ-



icsbook.info

ঢালা রাজপথে ফেলে তার প্রস্ফুটিত জান্নাতি পুষ্পের মতো মুখমণ্ডলে ওরা টেঁটা-বল্লম বিদ্ধ করছে। দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না মানুষ এতটা নিচ, ওরা পশুকেও হার মানাতে পারে। জুয়েল ভাই ছট-ফট করছিলেন আর বুক চাপড়িয়ে বলছিলেন– "আল্লাহ! তুমি মজলুমদের হেফাজত কর। আমাদের ভাইয়েরা জীবন দিচ্ছে- আমরা কেন বেঁচে আছি। আমাদের কেন জানানো হলো না?" এমন সময় জামায়াতের জনসভার ভিতর থেকে জুয়েল ভাইয়ের ছোট ভাই যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তিনি মোবাইল করে আমাদের কাছে দোয়া চেয়ে বল্লেন– "আমরা আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় জোটের সশস্ত্র ক্যাডারদের দ্বারা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়েছি। নেতাদের নির্দেশে শহীদ হওয়ার নিয়ত করে মানব বন্ধন গড়ে তুলেছি। প্রতি মুহূর্তে আমাদের ভাইয়েরা আহত-নিহত হচ্ছে। পুলিশ ও বিডিআর সদস্যরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এখন আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। প্রাণ খুলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন সত্যিকার অর্থে শহীদ হতে পারি। মা-কে ক্ষমা করতে বলবেন। এ খবর আসার পূর্বেই জুয়েল ভাইয়ের মা-পরিবারের অন্যান্য মহিলা সদস্যদের নিয়ে আল্লাহর হুজুরে সিজদায় পড়ে কাঁদছিলেন। কারণ মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে বলে রেখেছেন– "তোমরা নামায ও ধৈর্যের মাধ্যমে আমার সাহায্য চাও।" অন্যত্র বলেছেন "নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন।"

অবশেষে মুসলিম মা-বোনদের হৃদয় নিংড়ানো আকুতি, পিতাদের আবেগঘন দোয়া, ইসলামপন্থিদের আহাজারি আর ফরিয়াদ আল্লাহ কবুল করলেন।

বদর-ওহুদের মতো আল্লাহর সাহায্য নেমে এলো এবার বায়তুল মোকাররমের আশে পাশে লাশ আর অগনিত মজলুম মানুষের রক্ত দেখে হায়েনার দল ঘাবড়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ ওদের মনে ভীতি সৃষ্টি করে দিলেন। অপরদিকে শাহাদাত লাভের নেশায় পাগলপারা মর্দে মুজাহিদেরা আল্লাহু-আকবর বলে বুক টান করে শির উঁচু করে দাঁড়ালেন। আল্লাহর বাণী আবারও বাস্তব ময়দানে সত্য প্রমাণিত হলো– "তোমরা ভয় পেয়ো না, ঘাবড়িও না, তোমরাই হবে বিজয়ী যদি তোমরা দৃঢ়প্রত্যয়ী হও"। হ্যাঁ "সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত" মিথ্যার বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে।

মুজাহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল-ফয়সল, হাফেজ গোলাম কিবরিয়া, শিপন, সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম, রফিকুল ইসলাম, শাহজাহান আলী, রুহুল আমীন, হাবীবুর রহমানসহ আরো অনেকে বুকের তপ্ত তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদত বরণ করে অমর হলেন। বাংলার শ্যামল মাটি শহীদদের রক্তে অবগাহন করে আরো একবার উর্বরতা লাভের সুযোগ পেল। শহীদের রক্তভেজা জমিতেই ইসলাম বিজয়ী হয়।

"ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় / হর কারবালা কি বাদ।

শহীদদের অমর আত্মাগুলো আল-কোনআনের রাজ কায়েম হয়েছে দেখার জন্য পূর্বসূরীদের মতো উন্মুখ হয়ে আছে। এখন আমাদের পরীক্ষা আর কর্ম সম্পাদনের পালা।

মহান আল্লাহ বলেছেন "ওরা (কাফির-মুশরিকরা) মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায় অথচ আল্লাহর ইচ্ছে হলো তিনি তার নূরকে (ইসলাম) বিস্তৃত ও প্রসারিত করবেনই, কাফিরদের (ইসলাম বিরোধী চক্র) পক্ষে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।" ■



icsbook.info

# কারবালা থেকে পল্টন

ওবায়দুল্লাহ মনসুর

জগত প্রত্যক্ষ করলো পল্টনে, ২৮ আক্টোবর ২০০৬ ঈসায়ীতে, আল্লাহ-দ্রোহী হায়েনাদের সুপরিকল্পিত অতর্কিত লগি-বৈঠার উপর্যুপরি হিংস্র থাবার সম্মুখে ঈমানদার যুবকের অসম শৌর্যের প্রদর্শনীটি। যদিও হতাশাবাদীরা এ ভিষণ কান্ডখানি দেখে নিজ বাসগৃহের চার দেয়ালের নিশ্ছিদ্র বেষ্টনে ঘাপটি মেরে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিবেকবান মানুষ মাত্রেই ঈমানী চেতনায় ঋদ্ধ হতে পেরেছে যে কোন সময়ের চেয়ে ঢের বেশি। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

"এরা নিজেরা বসে থাকলো এবং এদের ভাই বন্ধু যারা লড়াই করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলো তাদের সম্পর্কে বলেছিলো : যদি তারা আমাদের কথা মেনে নিতো তাহলে মারা যেতোনা। ওদের বলে দাও তোমরা নিজেদের কথায় যদি সত্যবাদি হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের নিজেদের মৃত্যু যখন আসবে তখন তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে দেখাও।"

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করোনা। তারা আসলে জীবিত।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৮-১৬৯)

"এবং যেসব ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখানো সেখানে পৌছায়নি, তাদের জন্য কোন ভয় এবং দু:খের কারণ নেই, একথা জেনে তারা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। তারা আল্লাহর পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভে আনন্দিত ও উল্লাসিত।" (সূরা আলে ইমরান : ১৭০-১৭১)

তিনি ঈমানদার যুবক-ছিলেন একা, শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত। আর তারা (বিরুদ্ধবাদি ঘাতকেরা) ছিলো অসংখ্য। তারা ছিলো লগি-বৈঠার শক্তিতে বলীয়ান (Armed and daugerous)। তাঁর ছিলো 'লা-শরিক আল্লাহ' সম্বল। তারা ছিলো কতক মনগড়া শব্দ ও ভূঁয়া নামের দাসত্বের চেতনায় উজ্জীবিত। তাঁর ছিলো আল্লাহর রাসূলের জীবনে পরিস্ফুটিত হওয়া সুন্দরতম আদর্শের চেতনায় নিজেকে উৎসর্গ করার অদম্য আকাংখা। যা হবার তা-ই হলো লুটিয়ে পড়লেন বীরশ্রেষ্ঠ রণক্ষেত্রে, যেভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি



icsbook.info

র মেধাবি ছাত্র আব্দুল মালেক ১৯৬৯-এর ১৫ আগস্টে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রড-হকিস্টিক-ড্যাগার-এ সুসজ্জিত তোফায়েল বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণের সম্মুখে খালি হাতে, একা, জীবনের শেষ প্রশ্বাস পর্যন্ত ইসলামের কলেমাকে সমুন্নত রেখেছিলেন।

"কাফির হ্যে তো শমসির পে করতা হ্যে ভরসা
মু'মীন হ্যে তো বেতেগ ভি লড়তা হ্যে সিপাহী"

–আল্লামা ইকবাল

[রণক্ষেত্রে কাফেরের ভরসা তার সুতীক্ষ্ম তরবারি
মু'মীন লড়তে পারে তরবারি ছাড়াই অসম সাহসে]

আর যেভাবে কারবালার প্রান্তরে হযরত ঈমাম হোসেইন মিথ্যার সঙ্গে কোন আপোষ-রফা না করে ইসলামী শৌর্যের পূর্ণ প্রদর্শনীর মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

"গরীব সাদা ও রঙিন হ্যে দাস্তানে হেরেম
ইমতেহা যিসকি হোসেইন হ্যে ইবতেদা হ্যে ইসমাঈল"

–আল্লামা ইকবাল

কে-না জানে ঈমাম হোসাইনের ভাড়াটে শিরোচ্ছেদকারি আল্লাহর দুশমন এ-জগতের ইতিহাসে বিজয়ীর খাতায় নাম লিখাতে পারেনি। বরং ঈমাম হোসেইন-ই হয়ে গেলেন সকল কাল-বিজয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ঈমাম হোসেইন জীবন দিয়েও মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে গেলেন মানবের ইতিহাসে তাঁর প্রিয় দ্বীন ইসলামকে একটি সকল কাল-বিজয়ী জীবন বিধান হিসেবে প্রমাণ করে দিয়ে।

"ক্বাতলে হোসেইন আস্‌লে মরগ্যে ইয়াযিদ হ্যে
ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যে হর কারবালা কি বাদ"

–মাওলানা মোহাম্মদ আলী

[আসলে ইয়াযিদ মরেছে; হোসেইন যিন্দা যুগে যুগে
ইসলাম যিন্দা হয় এভাবে রক্তস্নাত কারবালায়]

২৮ আক্টোরের পল্টনের হোসেইন- স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির BBA ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র (বিগত ৩ সেমিস্টারে বৃত্তিপ্রাপ্ত) হোসেইন মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম কারবালার হোসেইনেরই যোগ্য উত্তরসূরী মাত্র। ভেবে দেখুন– তিনি একা; চারিদিকে শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত। চারিদিকে কারবালার সেই আমর, সীমার, যিয়াদ প্রমুখ ইসলাম-বিদ্বেষী কমান্ডাররা হয়ত ছিলোনা, তবে কারবালার ফোরাত-তীরে অবরোধকারী অন্ধকার জগতের প্রেতাত্মারা পল্টন মসজিদের গলিতে বিশ্বামনবতাকে অপমানিত করার প্রেরণার দিক দিয়ে কোন অংশেই কম ছিলোনা। শাহাদাতের কাঙ্খিত ক্ষণটি এলো, আর আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ তা কবুল করলেন তাঁর প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।

"গিরাত হ্যে ঘোড়সওয়ারি ময়দানে জঙ্গ ম্যে
ও কিয়া খাক্ গিরেঙে যো ঘোটনে কো বাল চলা করতে হ্যে"



icsbook.info

[লুটিয়ে পড়ে বীর রণক্ষেত্রে কেননা সে সাহসী সওয়ারি
তার কি-বা আসে যায়- যে হয়নি সওয়ারি কোন কালে]

জালিমেরা ভেবেছিলো শহীদ আব্দুল মালেকের হত্যার মাধ্যমে বাংলার মানুষের মন থেকে আল্লাহর রবুবিয়তের চেতনাকে মুছে ফেলা যাবে। তা কখনো হবার নয়। পল্টনের মসজিদের গলি সাক্ষ্য দিচ্ছে– এক আব্দুল মালেকের শাহাদাত আজ বাংলাভূ-ভাগে লক্ষ শাহাদাতকামী যুবকের জন্ম দিয়েছে। শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম ও তাঁর সাথীরা আমাদের চেতনার ধন। আমাদের অহংকার।

কি দোষ ছিলো শহীদ হোসেইন মুহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলামের? তাঁকে কেনো হত্যা করা হবে? তিনি তো চেয়েছিলেন আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে। মুসলমানদের দেশে এটাতো বিবেকসম্মত দাবি। সৎলোকের শাসনের বিপরীতে অসৎলোকের শাসন কি কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ চাইতে পারে? আর সৎলোক তৈরি করার কোন কার্যকরী পদ্ধতি না থাকলে সৎ লোকগুলো কি আকাশ ভেঙে 'মান্না-সালওয়া'র মতো মাটিতে এমনিতেই পড়তে থাকবে? বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সেই সত্যনিষ্ঠ দল যে সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে সৎলোক যোগান দেয়ার Power Hose হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে, যার কর্ম পদ্ধতিটি আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল (সা.) প্রদর্শিত। সেই শিবিরের সদস্যদের অন্যতম একজন ছিলেন আমাদের হোসেইন মোহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলাম। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সম্বন্ধে যে কথা না বল্লেই নয়, প্রিন্ট মিডিয়ার লাগাতার অপপ্রচারের মুখেও, সাধারণ মানুষের কাছে মর্যাদার (Value) দিক দিয়ে শিবিরের মূল্যায়ন হলো- ১ জন শিবির-কর্মী ছাত্রদল বা ছাত্রলীগের ২০ জন সদস্যের সমান। আবার ১জন শিবির-সদস্য ৪০ জন শিবির- কর্মীর সমান। সে হিসেবে ১ জন শিবির-সদস্য কম-বেশি ৮০০ জন ছাত্রদল বা ছাত্রলীগ সদস্যের সমান। সবকিছু মিলিয়ে মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, শঠতা, দাগাবাজির সঙ্গে বিন্দু পরিমাণ সম্পর্কও যার নেই তার নাম 'শিবির'। বাংলাদেশের ছাত্র-রাজনীতিতে সবচে চৌকস শব্দ 'শিবির'। এই প্রতীতিতে বলা যায়, শিবিরের এহেন সদস্যের শাহাদাতে শিবির বারুদের মতো জ্বলে উঠবে এটাই স্বাভাবিক।

সত্য পথের পথিকদের ধ্যান-জ্ঞান-চেতনায় কেবল আল্লাহরও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই বসত গড়তে পারেনা। অপর পক্ষে, মিথ্যাপন্থিরা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিচ্ছৃঙ্খল (বহুমুখি) হওয়ার কারণে তার কোন কেন্দ্রীয় চেতনা থাকেনা, কেবল মাত্র সত্যপন্থিদের বিরোধিতা করা ছাড়া। আমাদের এই আলোচনায় পল্টনের শহীদের হত্যাকারীরা আওয়ামী ছাত্রলীগ না জাসদ ছাত্রলীগ তা নিশ্চিত করা মুখ্য নয়। ওদের পক্ষে 'মিথ্যাপন্থি' পরিচয়টিই যথেষ্ট।

"হাকিকতে আবদি হ্যে মাকামে শাব্বিরি
বদলতে রহতে হ্যে আন্দাজ কুফি ও শামি"
[ঈমাম হোসেইনের অভিযাত্রা যুগে যুগে এরই লক্ষ্য পানে
কুফা ও শামের পথ মোড় নেয় কোন বাঁকে কে জানে]

■



icsbook.info

# জোড়া মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়

নিয়াজ মাখদুম শিবলী

২১-২৬ অক্টোবর '০৬ সাংগঠনিকভাবে ঈদুল ফিতরের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকায় অবস্থানরত আমাদের অনেক জনশক্তি, যারা সারাবছরের অন্যান্য সময়ে ইচ্ছা থাকলেও পড়াশুনা এবং সাংগঠনিক দায়িত্বেরকারণে গ্রামে যেতে পারেন না, তাদের ঈদ উপলক্ষে ছুটি দিতে হবে। দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামে যাওয়া আমাদের সাংগঠনের ঐতিহ্য। কিন্তু এবার ঈদের ৩য় দিন অর্থাৎ ২৮ অক্টোবর ২০০৬ চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর হবে, তাই ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটিতে আমরা সবাই যাতে একত্রে ৫ বছর পুর্তি উৎসবের সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে পারি, এ জন্য সবার মাঝে এ রকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল অনেক আগে থেকেই।

রমজানের শেষের দিন; ২৪ অক্টোবর ২০০৬। দুপুর ১২টার দিকে মৌচাকের আয়শা শপিং কমপ্লেক্সে গেলাম পাঞ্জাবি কিনতে। ফেরার পথে শামসুল আলম মাহবুব ভাইয়ের সাথে দেখা। তিনি এসেছিলেন তার বাবার জন্য পাঞ্জাবি কিনতে। (মাহবুব ভাই সবুজবাগ থানার ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি এবং শহীদ মাসুম ভাইয়ের বড়ভাই)। স্বাভাবিকভাবেই তার সাথে অনেকক্ষণ কথা হলো। মাহবুব ভাই বললেন; 'জানো এবারও সবুজবাগের সব সাথীরা এক ধরনের পাঞ্জাবি কিনেছে। সাবেক এবং বর্তমান মিলে আমরা প্রায় ৫০ জন এক ধরনের পাঞ্জাবি পরে এলাকায় ঘুরবো। এরপরে কোথায় ঈদের নামাজ পড়া হবে, নামাজের পর কাদের বাসায় যাবে, দুপুরে কোথায় খাওয়া হবে, সন্ধ্যা হলে কিভাবে সবাই বিদায় নেবে; সেই গল্প। মাহবুব ভাই আমাদেরও দাওয়াত দিলেন। আরো অনেক গল্পের পরে আমরা বিদায় নিলাম।

২৭ অক্টোবর ২০০৬ ঈদের দ্বিতীয় দিন, ঢাকার আলফালায় ঢাকার সদস্যদের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরু হবে ৩টায়; কিন্তু ৩টার আগেই নতুন পাঞ্জাবি গায়ে সকলেই উপস্থিত। যে যাকে দেখছে বুকে জড়িয়ে ধরছে। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়



icsbook.info

করছে। সদস্যদের ঈদপুনর্মিলনীতে কেন্দ্রীয় সভাপতি সহকার্যকরী পরিষদের অনেক ভাইয়েরাই উপস্থিত ছিলেন। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে ২৮ তারিখের সমাবেশ বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা নেয়া হলো। ২৮ তারিখে আমাদের কিছু জনশক্তি সকাল ১০টায় এবং বাকি সকলে ১২টার মধ্যে উপস্থিত হবার সিদ্ধান্ত হলো।

## দুই বন্ধুর গল্প

ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ থানা সবুজবাগ। তুলনামূলকভাবে এখানে সাংগঠনিক কাজ ভালো। সবুজবাগের মাদারটেক এলাকার (২৭নং ওয়ার্ড) স্থানীয় সাথী-কর্মীরা এবারেও এক সাথে ঈদ করেছে। এক রঙের পাঞ্জাবি পরে দায়িত্বশীলদের সাথে ঘুরে বেরিয়েছে। এলাকার বন্ধু, সাংগঠনিক ভাই, মুরুব্বী, স্থানীয় দোকানদার, রিকশাওয়ালা সবার সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়। এক সাথে সেমাই-ফিরনি খাওয়া, ছবি তোলা, গল্প করা আর আনন্দের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে কেটেছে ঈদের দিনটি। আর এই ঈদের আনন্দ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছে সবার প্রিয় মাসুদ, শিপন দুই বন্ধু। সেই ছোট্ট সময় থেকেই এক সাথে স্কুলে যাওয়া, খেলতে যাওয়া, নামাজ পড়তে যাওয়া থেকে শুরু করে সবকিছু। দুই বন্ধু এভাবে হাত ধরাধরি করেই শহীদি কাফেলার ছায়াতলে এসছিল। তারপরে প্রায় এক সাথেই কর্মী, সাথী হয়েছে। এরপরে আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের সময়ও শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম ওয়ার্ড সেক্রেটারিআর গোলাম কিবরিয়া শিপন একই ওয়ার্ডের বায়তুলমাল সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আন্দোলনের কাজের ব্যাপারে তাদের অনেক পরিকল্পনা, অনেক স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের বিবিধ আয়োজন। তাদের নেতৃত্বে গোটা সবুজবাগেই ইসলামী আন্দোলনের কাজের এক নতুন ধারা তৈরি হয়েছিল।

## ইতিহাসের ভয়াল দিন

চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারের পাঁচ বছর পুর্তির পরে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি ছিল ২৮ অক্টোবর '০৬। সমাবেশের উদ্দেশ্যে ছিল পাঁচ বছর পুর্তি উপলক্ষে জনগণকে ধন্যবাদ জানানো। এ উপলক্ষে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিএনপি নয়াপল্টনস্থ পার্টি অফিসের সামনে আর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বায়তুল মোকাররম উত্তরগেটে সমাশে করার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর আওয়ামী লীগসহ চৌদ্দদলীয় জোট পল্টন ময়দানে সমাবেশ ডাকে। সম্ভাব্য সংঘাত এড়ানোর জন্য চৌদ্দদলীয় জোটকে ঐ দিন পল্টন ময়দানে সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়নি, পূর্ব থেকেই। কারণ চৌদ্দদলীয় জোট ইতিপূর্বে অনেকগুলো জঙ্গি মিছিল করেছে এবং জোটনেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ অক্টোবর সকল কর্মীকে লগি-বৈঠা নিয়ে সমাবেশে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংবিধানের ৩৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনসভা হতে হয় নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ। কিন্তু চৌদ্দদলীয় জোটের জনসভা সংবিধানে বর্ণিত ৩৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুমোদন পাওয়ার যোগ্য ছিলো না। ২৮ অক্টোবর সকাল থেকেই চৌদ্দদলীয় লোকজন পল্টন ময়দানে জোরপূর্বক প্রবেশ করে। পুলিশ তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দেয়। পল্টন ময়দানে ১৪৪ ধারা জারি করার কারণে আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে সমাবেশ করতে না পেরে জিরো পয়েন্ট, মুক্তাঙ্গন এবং পল্টন মোড়ে মিছিল, ভাঙচুর, অগ্নিকাণ্ডের মাধ্যমে সকাল থেকেই উন্মত্ত অবস্থায় অবস্থান করতে থাকে। জামায়াতের সমাবেশ ছিল



icsbook.info

বিকেল ৩টায়। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকরা সকাল ১০টা থেকেই সমাবেশের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করতে থাকে। ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে শিবিরের নেতা-কর্মীরা ঈদের তৃতীয় দিনে বেশ উৎফুল্ল মনে সমাবেশে আসতে শুরু করে। ঢাকার সবুজবাগ থানা উত্তরের ২৭নং দক্ষিণ ওয়ার্ডের সেক্রেটারি সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম ২৮ তারিখ সকাল থেকেই তার এলাকার কর্মীদের বাসায় গিয়ে ডেকে নিয়ে এসে, সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ব্যস্ততার কারণে সকালের নাস্তা করাও হয়ে উঠেনি। আর ওয়ার্ডের বাইতুলমাল সম্পাদক শিপনও সকাল সকাল মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। পল্টনের দিকে আসতে আসতেই মাইকের ঘোষণায় বুঝতে পারে আমাদের সমাবেশে সম্ভবত আক্রমণ করা হয়েছে। তাদের সাথে থাকা স্কুল-কর্মীদের ভিন্ন রিকশা করে এলাকায় পাঠিয়ে দেয়। এই দুরদর্শী দায়িত্বশীলরা। এরপরে তারা এসে হাজির হয় পল্টন মোড়ে।

## পল্টন মোড়ের দৃশ্য

২৮ অক্টোবর ২০০৬ সকাল ১১টার দিকে জামায়াতের সমাবেশ ভণ্ডুল করতে মঞ্চ পুড়িয়ে দিয়ে, জামায়াত-শিবিরের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার জন্য অতর্কিত আক্রমণচালায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা। লগি, বৈঠা, পিস্তল, চুরি, বোমা নিয়ে কয়েক হাজার হায়েনা এগিয়ে আসে পল্টন মোড়ের দিকে। সেই সময় পল্টন মোড়ে আমাদের অনুর্ধ্ব ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব পালন করছিলেন। হঠাৎ হামলায় আমাদের নিরস্ত্র কর্মীরা প্রথম হতবাক হয়ে যায়। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সিসাঢালা মানব প্রাচীর গড়ে তোলে আমাদের ভাইয়েরা। শিবিরের সর্বপর্যায়ের দায়িত্বশীলরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে যান। তখন সাইফুল্লাহ মাসুম, শিপন, মুজাহিদ ভাইয়েরা নির্ভীকভাবে মোকাবেলা করতে থাকে হায়েনাদের। আহত হতে থাকে আমাদের প্রায় সবাই। যে-ই আহত হয় সে আবার চিকিৎসা নিয়ে ফিরে আসে ময়দানে। মাথায় বেন্ডিজ, রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে আবার এসে দাঁড়ায় মিছিলের সম্মুখভাগে। আর আওয়ামী লীগের সশস্ত্র হায়েনারা লঠি-বৈঠা নিয়ে পৈশাচিকভাবে হত্যা করতে থাকে আমাদের নেতা-কর্মীদের। মাসুম এবং শিপন ভাইয়েরা আক্রান্ত হন দুপুর ১২.টা ৩০মিনিটের দিকে। দু'জনেরই মাথায় গুরুতর আঘাতের কারণে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। শিপন ভাইকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে আর মাসুম ভাইকে নিয়ে যায় ইবনে সিনা হাসপাতালে। শিপন ভাইকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেয়ার পরপরই শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। আর মাসুম ভাই ৫দিন অসহনীয় যন্ত্রণার পরে ৩ নভেম্বর সর্বোচ্চ ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শহীদের কাতারে সামিল হন। ২৯ অক্টোবর ২০০৬ ঢাকার পরিবেশ থমথমে আওয়ামী লীগের রক্ত পিপাসা তখনো কমেনি। আমাদের অধিকাংশ দায়িত্বশীল এবং কর্মীরা আহত। এর মাঝেই ২৯ অক্টোবর জামায়তের কেন্দ্রীয় অফিসে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় ৩ শহীদের। (শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপন, শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম এবং শহীদ জসিম উদ্দীন) জানাজায় ইমামতি করেন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। এরপর সবুজবাগে নিয়ে যাওয়া হয় শিপন ভাইয়ের লাশ। সেখানে আবার জানাজা হয় এবং সন্ধ্যার আগেই তাকে দাফন করা হয় মাদারটেকের মায়াকাননের স্থানীয় কবরস্থানে। স্থানীয় জনগণের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার, অশ্রুসিক্ত



icsbook.info

মোনাজাত, শহীদের সাথীদের কান্না আর শহীদ পরিবারের সদস্যদের নির্বাক মুখগুলো গোটা পরিবেশকে ভারি করে তোলে।

এরপর একে একে সারাদেশে থেকে আসে আরো শাহাদাতের খবর। শহীদ জসিম উদ্দীন (লালবাগ) ঢাকা, শহীদ হাবিবুর রহমান (ঢাকা), শহীদ আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল (নারায়ণগঞ্জ), শহীদ রফিকুল ইসলাম (কুড়িগ্রাম), শহীদ জাবেদ আলী (সাতক্ষীরা), শহীদ আব্বাস আলী (মেহেরপুর), শহীদ রুহুল আমিন (গাজীপুর), শহীদ শাহজাহান আলী (নাঙ্গলকোর্ট) কুমিল্লা, শহীদ সাদের হোসেন (নীলফামারী), শহীদ আরাফাত হোসেন সবুজ (মাগুরা), শহীদ জসিম উদ্দীন (২) (শ্যামপুর, ঢাকা)। এভাবে সারা দেশে জামায়াত-শিবির এবং জোটের প্রায় অর্ধশত নেতা-কর্মীকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ। আহত হয় অগণিত। তারা ভাঙচুর এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে রাজধানীসহ সারাদেশের চারদলীয় জোটের নেতাকর্মীদের ঘর-বাড়ি, গাড়ি, দলীয় অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট প্রভৃতি। সেই সাথে তারা নির্লজ্জ লুটতরাজ চালায়।

মাসুম ভাই শহীদ হন ৩ নভেম্বর ২০০৬। ২৮ অক্টোবর ২০০৬ আহত হবার পর দীর্ঘ ৫দিন ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি থাকার পর, সারা দেশের অগণিত মানুষের দোয়া, শহীদের সাথীদের চোখের পানি, বন্ধুদের ভালোবাসা আর মায়ের শক্ত বাঁধনকে ছিঁড়ে মাসুম ভাই চলে গেলেন তার মহান প্রভুর দরবারে। তিনি সামিল হলেন শহীদী মিছিলে। আর সেই চিরশান্তির জান্নাতে তাকে স্বাগত জানালেন শহীদ মালেক, সাব্বির, বিমানসহ শহীদের অগ্রবর্তী সাথীরা। সবাই যদিও সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন মাসুম ভাইকে আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনার কিন্তু আমাদের মহান রবের সিদ্ধান্তটিই চূড়ান্ত।

শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুমের জানাজা হয় বাইতুল মোকাররমের উত্তরগেট সংলগ্ন সড়কে। জানাজায় ইমামতি করেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। জানাজার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রাখেন– কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ, সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুর রহমান, ঢাকা মহানগরী পূর্বের সভাপতি মুহাম্মদ কামাল হোসাইন এবং শহীদের বড়ভাই শামসুল আলম মাহবুব। তারা শহীদের সাথীদের ধৈর্য্যধারণ করার এবং হত্যাকারীদের বিচার দাবি করেন। জানাজায় উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানায়। জানাজার নামাজের তাকবীর শুনে শহীদের সাথীদের বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠে, তাদের প্রিয় সাথীর জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করে চিরবিদায় জানায় তাদের সাথীকে। দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত সবুজবাগ আব্দুল আজিজ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে, সেখানেও স্থানীয় এমপি, মন্ত্রী, কমিশনারসহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে তাদের এলাকার নম্র-ভদ্র, সদা হাস্যোজ্জ্বল প্রিয় মাসুমকে শেষবারের মতো দেখার জন্য। অবশেষে মাগরীবের আযানের পূর্বেই মাসুম ভাইকে চিরনিদ্রায় শায়িত করে দেয়া হয় তার আপন ঠিকানায়।

মাসুম আর শিপন ভাই ২৮ তারিখে এক সাথে বেরিয়েছিলেন, একই সময়ে আহত হয়েছিলেন আর তাদের সাংগঠনিক জীবনের কাজগুলোতেও খুব মিল লক্ষ্য করা যায়।



icsbook.info

নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের কাছে তাদের এই বন্ধনটি খুব পছন্দনীয় ছিল। আর তাই তাদের কবর দু'টিও একেবারে পাশাপাশি। বাগানবাড়ি কবরস্থানের একবারে দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি দু'টি কবরে ঘুমিয়ে আছেন দুই বন্ধু শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম ও শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপন।

মাসুম ভাইকে যখন কবরে নামানো হচ্ছিলো তখন মাগরীবের আর অল্প সময় বাকি আছে। সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুর রহমান ভাই জোরে জোরে দোয়া পড়ছিলেন 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ' আমরা সকলেই তার সাথে দোয়ায় কণ্ঠ মিলিয়ে রাসূলের এক ভক্তকে তার দলে উঠিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। সেই দিন থেকে আজো পর্যন্ত দুই শহীদের পাশাপাশি দু'টি উজ্জ্বল মুখ শায়িত আছে বাগানবাড়ির কবরস্থানে। মাসুম, শিপন ভাইয়েরা জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে জান্নাতের পথে ঠিকানা করে নিয়েছেন। কিন্তু তারা তাদের সাথীদের ওপর দিয়ে গেছেন দ্বীন কায়েমের এক মহান গুরুদায়িত্ব। শহীদদের সংগ্রামী জীবনী ও তাদের অকৃত্রিম ত্যাগ আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে অনন্তকাল এবং তাদের স্বপ্ন পূরণে শহীদের সাথীরা তৎপর রবে প্রতিটি মুহূর্তে; এই সবার কামনা। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে তার দ্বীন কায়েমের পথে আমৃত্যু কবুল করুন। আমীন। ■



icsbook.info

# ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী নির্যাতন

সাজিদ হাসান

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠন করা হয় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে এই দলটি গঠন করা হয়। কিন্তু ১৯৫৫ সালে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে এই দলটি প্রথম মুসলিম জাতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। এরপর সদ্য স্বাধীন দেশ থেকে যখন ভারতীয় বাহিনী আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় সম্পদ লুণ্ঠন শুরু করে তখন তাতে বাধাদেয়ার অপরাধে গ্রেফতার হন মেজর জলিল। সেই গ্রেফতারের মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগ বুঝিয়ে দেয় দেশের স্বার্থ তাদের কাছে অর্থহীন। যে দলের কাছে জাতির স্বার্থ কিংবা দেশের স্বার্থের কোন মূল্য নেই সেই দলটি কতটুকু গণ বিধ্বংসী হতে পারে তা তাদের শাসনকালের অবস্থা থেকে অনুমান করা যায়।

একটি দেশের সরকার সেই দেশের জনগণের জন্য কতটুকু আতঙ্কের কারণ হতে পারে, তা জনগণ সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছে কি পরিমাণ নির্যাতিত হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আওয়ামী লীগের ইতিহাস ঘাটলেই পাওয়া যায়।

## ৭১ থেকে ৭৫

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ছিল আওয়ামী দুঃশাসনের প্রথম অধ্যায়। ক্ষমতায় বসেই শেখ মুজিব তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য রক্ষী বাহিনীর পাশাপাশি দলের কর্মীদের নিয়ে গঠন করলেন লাল বাহিনী, নীল বাহিনী ইত্যাদি। চাঁদাবাজি, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, দখল ছিল এই বাহিনীগুলোর নিত্যদিনের কাজ। তখন রক্ষী বাহিনী, লাল বাহিনী ও নীল বাহিনীর অত্যাচারে জনগণ বৃটিশ আমলের মত আরেকটি দুঃসময় অতিক্রম করছিল। রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে কত নিরীহ মানুষ জীবন হারিয়েছে তার হিসেব কারো জানা নেই। তাদের নির্যাতনের চেয়ে মানুষের জন্য মৃত্যুই অনেক শ্রেয় ছিল। তারা মানুষ হত্যা করত গরম পানিতে চুবিয়ে, হাত-পায়ের নখ তুলে সারা শরীর সিগারেটের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে এবং আরো নানা রোমহর্ষক কায়দায় মানুষ হত্যার উৎসব করত তারা। তাদের নির্যাতনে নিরীহ মানুষরা ডুকরে কেঁদে উঠলেও, চিৎকার করে কাঁদার কোন সাধ্য ছিলনা।



icsbook.info

নির্যাতিত মানুষের আর্ত চিৎকার যেনো চার দেয়ালের বাইরে না যায় তারও ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন শেখ মুজিব সরকার সমর্থিত ৪টি পত্রিকা রেখে বাকি সব পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দেয়।

তারপরও লুটেরা গোষ্ঠীর নির্যাতনের যেটুকু খবর বাইরে বেরিয়েছে তার একটি ছোট্ট চিত্র ১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি 'নিউজ উইক' পত্রিকায় আসে। পত্রিকাটির রিপোর্ট ছিল, 'রক্ষী বাহিনী নামক একটি আধা-সামরিক বাহিনী দেশে পুনরায় হত্যাকান্ড ও নির্যাতনে মেতে উঠেছে'। বিদেশে সাংবাদিকদের কাছে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়, "আজো পাকিস্তানী আমলের মতোই জনগণ কেঁপে উঠে। ... সম্প্রতি মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওকারি একটি মিছিলের উপর রক্ষী বাহিনীর মেশিনগান হামলায় কয়েকশত লোক নিহত হয়। সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সরকার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।"

সে সময়ের নির্মম ঘটনাগুলোর অধিকাংশের নেতৃত্বে ছিলেন মুজিব পুত্র শেখ কামাল। তার নেতৃত্বে চাঁদাবাজি, ব্যাংক লুট থেকে শুরু করে সুন্দরী গৃহবধু ধর্ষণ পর্যন্ত এমন কোন কাজ নেই যা হয়নি। মুজিব তার বিরুদ্ধ শক্তিকে দমনের জন্য জাসদ নেতা সিরাজ সিকদারসহ প্রতিপক্ষের ৪২ হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা করেছেন বলে জানা যায়। এক নেতার এক দেশ নামক রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নে বিভোর শেখ মুজিব বিরোধীদের হত্যা করে সবগুলো দল নিষিদ্ধ করলেন। তারপর ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠন করলেন। গণতন্ত্রের কবর রচনা করে ঘোষিত হলো এ দেশে বহু দল থাকবে না, থাকবে একটি দল 'বাকশাল'। যার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব।

এই নেতা একদিকে ব্যস্ত ছিলেন নিজের ক্ষমতাকে স্থায়ী রূপ দিতে, অন্যদিকে তাকে ঘিরে গড়ে, ওঠা আওয়ামী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী মত্ত ছিল লুণ্ঠনে। সাতকোটি মানুষকে জিম্মি করে আওয়ামী লীগ নেতারা দেশের সকল খাদ্য সম্পদ গুদামজাত করতে লাগল। ফলে দেশে কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি হলো। শুরু হলো '৭৪ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। যারা রক্ত দিয়ে এই দেশ এনেছিল সেই মানুষগুলোই খাদ্য না পেয়ে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে যায়। এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এতই ব্যাপক ছিল যে বিশ্বের অন্য যে কোন দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে ছাড়িয়ে গেছে। আনুমানিক হিসেবে ন্যূনতম ১০ লাখ লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা যায়। ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে না পেরে সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহবধূ কিংবা কুমারি মেয়েকে জড়িত হতে হয় ঘৃণ্য দেহ ব্যবসায়। ক্ষুধার কষ্টে মা তার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে হত্যা কিংবা বিক্রিকরতে বাধ্য হন। সহায়-সম্বল বিক্রিকরেও এক মুঠো ভাত চাইত মানুষ। একটু খাবারের জন্য ডাস্টবিনে কুকুর আর মানুষের লড়াই ছিল স্বাভাবিক দৃশ্য।

সেই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে পত্রিকার কয়েকটি রিপোর্ট ছিল এমন :

* গরীব মানুষ খাদ্য পায়না টাউটরা মজা লুটছে। ও পরবর্তীতে চাল, আটা নিয়ে হরিলুটের কারবার। (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, গণকণ্ঠ)
* চাউল আকাশচুম্বী, আটা উধাও, কেরোসিন ও ওষুধ নাই, শুধু আছে আনাহার আর আত্মহত্যা। (২২ এপ্রিল ১৯৭৩ ইত্তেফাক)
* স্বাধীন বাংলার আরেকরূপ : জামাই বেড়াতে এলে অর্ধ উলঙ্গ শ্বাশুড়ি দরজা বন্ধ করে দেয়। (১৫ জুলাই ১৯৭৩, সোনার বাংলা)



icsbook.info

* জঠর জ্বালায় ঝিনাইদহে ৪৪১ জনের আত্মহত্যা। এর মধ্যে ৩৩৮ জনই মহিলা (৭ অক্টোবরে ১৯৭৩, সোনার বাংলা)

'৭৪ এর দুর্ভিক্ষকে যদি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে খুব একটা বেশি পার্থক্য থাকেনা। '৭৬ এর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বৃটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি নামক একটি ভিনদেশী লুটেরা গোষ্ঠীর অবাধ লুণ্ঠন ও নির্যাতনের ফলে। আর '৭৪ এর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার একক দাবীদার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের দেশে লুণ্ঠন ও নৈরাজ্য চালিয়ে রাতারাতি ধনী হওয়ার যে লোভী থাবা তার ফলে। উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য গুদামজাত করে নিরীহ মানুষকে অসহনীয় ক্ষুধার রাজ্যে ছেড়ে দেয়া হয়। তাহলে বৃটিশ শাসন এবং আওয়ামী দুঃশাসনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ১৭৫৭ সালে স্বাধীনতা হারিয়ে নির্যাতনের যে চাবুক আমরা পিঠে নিয়েছিলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাই অব্যাহত রেখেছিল। পার্থক্য শুধু দেশী এবং বিদেশীর মধ্যে। একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসে। আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল। দীর্ঘ ৫ বছর ক্ষমায় থেকে তারা জনগণের কাছে তাদের কর্ম দিয়ে কতটুকু ঘৃণার পাত্রে পরিনত হয়েছে তা বুঝা যায় ২০০১ সালে তাদের বিরুদ্ধে জনগণের ভোট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। তারা প্রমাণ করে দেয় '৭১ থেকে '৭৫ এ যা ছিল তা থেকে একটুকুও দলটি বদলায়নি।

## ১৯৯৬ থেকে ২০০১

'চট্টগ্রাম আওয়ামী নেতা কর্মীরা কি শাড়ি-চুড়ি পরেন? আর যদি একটি লাশ পড়ে তবে ভবিষ্যতে ১০টি লাশ পড়বে।'

ভাবার কোন কারণ নেই যে, এই বক্তব্যটি কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন বা মস্তিস্ক বিকৃত মানুষের। চট্টগ্রামে আলোচিত এইট মার্ডারের পর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা এমনি আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যটি তিনি যখন দিয়েছেন তখন একইসাথে তিনি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। দেশের অভিভাবক হিসেবে কোটি কোটি মানুষের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব যার, তিনিই তখন লাশের কথা বলেন, কান্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য দিয়ে নেতা-কর্মীদের উস্কে দিয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন, তখন সহজেই বুঝা যায় এই দলটির অন্যদের কি অবস্থা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মানুষ আওয়ামী লীগের হাতে যে নির্যাতন ভোগ করেছিল তার পুনরাবৃত্তি হোক তা কারো কাম্য ছিলনা। কিন্তু ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে সমগ্র দেশে আবার আধিপত্য বিস্তার এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করে দলটি প্রমাণ করল তারা একটুও বদলায়নি।

নিরীহ জনগণের উপর নিস্পেষণের স্টিমরোলার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখেই তারা চালিয়েছে। ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা তাদের চিরাচরিত দুর্বৃত্তপনা ও খুনের নেশায় মেতে ওঠে। আওয়ামী লীগের নেতারা একেকজন পরিণত হয় একেকটি এলাকার রাজা-মহারাজায়। পুরো প্রশাসন চলত তাদের কথায়। এসব রাজা মহারাজারা মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করে রাতারাতি ধনী বনে যায়। নেতাদের লালিত সন্ত্রাসীদের দাপটে তটস্থ ছিল একেকটি এলাকা। তাদের শতশত মাফিয়া ডনদের কয়েকজন হলো ফেনীর জয়নাল হাজারি, লক্ষ্মীপুরের মুজিববাদী তাহের, ছাতকের



icsbook.info

আওয়ামী এমপি বোমা মানিক, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, ঢাকার হাজী সেলিম, হাজী মকবুল, কামাল মজুমদার, ডা. ইকবাল, আলতাফ গোলন্দাজ, হাসনাত আবদুল্লাহ, লিয়াকত হোসেন, হান্নান, চট্টগ্রামের মামুন। এসব সন্ত্রাসী গডফাদারদের হত্যা, সন্ত্রাস, দখল, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন আর লুণ্ঠনে কেঁপে উঠে একেকটি জনপদ। আওয়ামী গডফাদাররা তাদের বিরোধীদের চিরতরে বিদায় করে দিতে জেলায় জেলায় গড়ে তোলে 'কিলিং স্কোয়াড'। এই কিলিং স্কোয়াডে যাকে ইচ্ছা তাকে হত্যা করা হতো, কোন বিচার হতোনা। হাজার হাজার বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীকে এরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। তাদের ক্ষমতা কত বেশি তা তারা প্রকাশ্যেই বলত। ১৩ মার্চ ২০০১ সালে দৈনিক প্রথম আলোতে এক সাক্ষাতকারে বিরোধীতাকারীদের পরিণতি সম্পর্কে তৎকালীন আওয়ামী নেতা ও পৌর চেয়ারম্যান মতিন সরকার বলেছিলো– ''আমার কথা শুনবা না, আবার বিরোধীতা করব না? হ্যাগো ঠ্যাং আমি ভাইঙ্গা ফালামু। আমার টাহা আছে, লাঠিয়াল বাহিনী আছে। কোর্টে যাইব? তার আগেই তো কামশেষ।"

আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা যাদের হত্যা করে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন হলেন– ঢাকার বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট হাবীবুর রহমান মন্ডল, লক্ষীপুর বিএনপির জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম। শিবির নেতা এফ.এম মহসীন, ফেনীর জেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক নাসির উদ্দিন। শুধুমাত্র ফেনীর গডফাদার জয়নাল হাজারীর কিলিং স্কোয়াডের হাতের খুন হয়েছে ৪০ জন বিরোধী কর্মী। আওয়ামী লীগের স্বঘোষিত অঞ্চল রাজাদের অত্যাচারে এলাকা ছাড়তে হয়েছে বিরোধীদের। শিশু বৃদ্ধ থেকে শুরু করে নারী পুরুষ অসহায় অনেক মানুষকে এদের অত্যাচারে ঘর ছেড়ে জঙ্গলে রাত কাটাতে হয়েছে। মানুষ না পেয়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিত। বিরোধী দলের অফিসে হামলা, সভা সমাবেশে বাধাদান ছিল তাদের নিয়মিত কাজ। এভাবে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে বাড়ি ছাড়া হয় বিরোধীরা। স্থবির হয়ে পড়ে জনপদ। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই নাজুক অবস্থায় পৌঁছায় যে পুরো দেশ নৈরাজ্যে ভরে উঠে। সে সময়ে পত্রিকার কয়েকটি রিপোর্ট দেখলে তা সহজে বুঝা যাবে।

* রাজধানীতে ২৪ ঘন্টায় ৬ জন খুন। ১০ ঘন্টায় ৩ জন খুন। (১৪ অক্টোবর ২০০০ জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০০ আজকের কাগজ)
* আওয়ামী লীগ সরকারের ৪ বছরে সারাদেশে ১৫ হাজার মানুষ খুন (১৯ জুলাই ২০০০ আজকের কাগজ)।
* বাংলাদেশ মানবাধিকার লংঘনকারীদের অভায়ারণ্য ঃ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (১৫ জুন ২০০০ ইত্তেফাক)।
* চার বছরে চার মহানগরীতে ১২৬৭টি খুন। সাজা হয়নি কারও (৭ নভেম্বর ২০০০ যুগান্তর)।

– আওয়ামী লীগের অত্যাচার আর নির্যাতনে মানুষ শূন্য হয়ে পড়ে বিভিন্ন জনপদ। এক সময়ের কোলাহলপূর্ণ এলাকায় বেজে উঠে শ্মশানের ঘুর। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা মেত উঠে দখল রাজনীতিতে। নিরীহ মানুষের জায়গা দখল, বাড়ি দখল, এমনকি ব্যাংক ও চেম্বার দখলের ক্ষেত্রেও তারা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ১১ অক্টোবর ১৯৯৯ প্রথম আলো থেকে জানা যায়, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক



icsbook.info

আখতারুজ্জামান বাবু পুলিশ ও দলীয় মাস্তান দিয়ে ইউসিবিএল ব্যাংক দখল করেছে। এবং তার পুত্র সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ দখল করেছে চট্টগ্রাম চেম্বার। তাদের দখল আর নির্যাতনের রাজনীতি থেকে রক্ষা পায়নি সংখ্যালঘুরাও। হিন্দুদের জমি জবর দখল, মহিলাদের ধর্ষণ ও সম্ভ্রমহানি এবং সম্পদ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রেও রেকর্ড গড়েছে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এই সংখ্যা লঘুদের ইস্যু ব্যবহার করেই তারা সব সময় নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে এসেছে। হত্যা, সন্ত্রাস আর নির্যাতনের মাধ্যমে যখন আওয়ামী লীগ বিরোধীদলগুলোকে দমাতে পারছিলনা তখন তারা নির্যাতনের কৌশল আরো শক্তিশালী করে। তৈরি করা হয় জননিরাপত্তা আইন এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন। ভয়ানক এই আইনের অধীনে দেশজুড়ে ২০ হাজারেরও বেশি বিরোধী নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। বিরোধী দলের একেক জন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ৮/১০ টি মামলা করে তাদের হয়রানির মধ্যে রাখা হত।

দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোও এদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। ক্ষমতায় আসার পরপরই ছাত্রলীগ কর্মীরা চর দখলের মত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ দখলে নেয়। বিভিন্ন অভিযোগে নির্যাতন করে তাড়িয়ে দেয় বিরোধী ছাত্রসহ অনেক সাধারণ ছাত্রদের। তাদের হত্যা উৎসবে কলুষিত হয় পবিত্র শিক্ষাঙ্গনও। ২৯ এপ্রিল ২০০১ দৈনিক দিনকালের রিপোর্ট অনুযায়ী ছাত্রলীগের পৈশাচিক হামলায় ছাত্রদলের ২০০ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৩০ জনসহ প্রায় ৪ শতাধিক বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মী খুন হয়। সাধারণ ছাত্রীদের সাথে তাদের আচরণ কেমন ছিল তার একটি প্রমাণ জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটির ছাত্রলীগ সেক্রেটারিজসিম উদ্দিন মানিকের ধর্ষণের সেঞ্চুরি উৎসবের মধ্যে দিয়ে বুঝা যায়। একজন নারী হিসেবে শেখ হাসিনা নারীর সতীত্ব হানির চির অবমাননার এই উৎসব দেখে কি করেছিলেন তা জাতি আজও জানতে পারেনি। ছাত্রলীগের সোনার ছেলেদের কর্মকান্ড এখানেই থেমে ছিলনা। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সাল রাতে ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে তরুণী বাঁধনের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা কারো অজানা নয়। এক ধাপ এগিয়ে ইডেন মহিলা কলেজের হোস্টেলে ঢুকে ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করার মত জঘন্য ঘটনাও ছাত্রলীগ কর্মীরা ঘটায়। আর তা করেছে গডফাদার হাজী সেলিমের নেতৃত্বে।

আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় শত্রু এ দেশের আলেম, ওলামা এবং ইসলামপ্রিয় জনগণ। তাই এদের বিরুদ্ধে তারা নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়েছে নির্মমভাবে। বিশেষকরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই অংশ। ক্ষমতায় এসে তারা তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠে। ইসলাম, মসজিদ, মাদরাসা, আজান, কোরআন, ফতোয়া, হাদীস, নবী-রাসুল প্রভৃতি মুসলিম জনতার আবেগের বিষয়গুলোকে তারা ক্রম-আঘাত করতে থাকে। বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রাযাকার ও জঙ্গিবাদ আখ্যা দিয়ে তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। হত্যা, গ্রেফতার, মামলা, হামলার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের তারা ঘর-ছাড়া করে। ক্ষমতায় থাকাকালীন ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের পদক্ষেপগুলোর কয়েকটি হলো– ফতোয়া নিষিদ্ধ করা। ৩০০ মাদরাসা বন্ধ করা। বায়তুল মোকাররমের তৎকালীন খতীব মাওলানা উবায়দুল হককে অব্যাহতি দেয়া পরে আদালতের রায়ে তিনি নিজ পদে ফিরে আসেন। ইসলামী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা।



icsbook.info

বুটজুতা নিয়ে মসজিদে পুলিশের ঢোকা এবং ৩০ হাজারেরও বেশি আলেমের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ও মামলা দায়ের করা। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশের একটি প্রমাণ হচ্ছে ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় শান্তিপুর্ণ মিছিলে গুলি চালিয়ে ৯ জন হাফেজ ও আলেমকে হত্যা করা। ২৩ জুলাই ২০০০ দৈনিক সংগ্রামের একটি রিপোর্ট ছিল, ছাত্রলীগের গুন্ডারা পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়িয়েছে মানিকগঞ্জের ডাস্টবিনে ফেলে, কোরআন শরীফ পুড়িয়েছে মীরপুর, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী ও কটিয়াদিতে।

৭ মে ২০০১ দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্ট ছিল : 'আওয়ামী লীগের লেলিয়ে দেয়া পুলিশ বাহিনী (হিন্দু, চাকমাসহ) বুটজুতা পায়ে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররম ও চট্টগ্রামের আন্দর কিল্লার শাহী মসজিদের ভেতরে ঢুকে নামাজরত মুসল্লীদের নির্মমভাবে পিটিয়েছে ও গণহারে বন্দী করে নিয়ে গেছে'।

ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনকে যখন কোনভাবেই দমানো যাচ্ছেনা, তখন তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বোম ফাটিয়ে তার দায় ইসলামী দলগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের এইট মার্ডার, উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে বোমা হামলা, রমনার বটমূলে বোমা হামলা অন্যতম। এ সমস্ত ঘটনায় আওয়ামী লীগ ইসলামী দলগুলোকে দোষারোপ করে তাদের গ্রেফতারসহ চরম নির্যাতন চালায়। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান এখনও অব্যাহত রয়েছে। তাই তারা ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে। সত্যিকার অর্থে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ নয় বরং একটি ধর্মবিরোধী দল। যার প্রমাণ ইসলাম প্রিয় জনতার উপর তাদের নির্মম নিষ্পেষণ। সেই দুঃসময়ে দেশের মানুষ যখন আওয়ামী অত্যাচারে জর্জরিত, তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় সাংবাদিকরা। ফলে সাংবাদিকদেও ছাড়েনি আওয়ামী লীগ।

১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করার যে কাজ শুরু করেছিলেন শেখ হাসিনা এসে তা অব্যাহত রেখেছেন। ৫ বছরে আওয়ামী লীগের ক্যাডার বাহিনীর হত্যার শিকার হয়েছেন মোট ৯জন সাংবাদিক। তাদের মধ্যে যশোরের শামছুর রহমান, আবদুল গাফফার, সাইফুল আলম মুকুল, ফারুক হোসেন, ঝিনাইদহের মীর ইলিয়াস খুলনার নহর আলী প্রমুখ। নির্যাতিত হয়েছে প্রায় চার শতাধিক সাংবাদিক। হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয়েছে প্রখ্যাত সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, রুহুল আমীন গাজী, আব্দুল হাই সিকদার প্রমুখের উপর। ক্ষমতায় আসার পরপরই তারা বন্ধ করে দেয় দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, আনন্দ বিচিত্রা। বিরোধী সংবাদপত্রগুলোকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়া হয়। সত্যা প্রকাশের কারণে আওয়ামী হামলার শিকার হয় এর মধ্যে দৈনিক সংগ্রাম, দিনকাল, সাপ্তাহিক এভিডেন্স, জনতার ডাক, জাগো মুজাহিদ, চট্টগ্রামের দৈনিক কর্ণফুলী, পূর্বকোণ, সাতক্ষীরার চিত্র, অনির্বানসহ আরো অনেক পত্রিকা। যদিও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ড. মোজাম্মেল হোসেন কর্মীদের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, সাংবাদিকদের হাত-পা ভেঙ্গে দিন। থানায় কোন মামলা হবেনা। তারই বাস্তব পরিণতি আমরা দেখতে পাই



icsbook.info

ফেনীর টিপু সুলতান, প্রবীর সিকদার, শহীদুল আলম ইমরানসহ বহু সাংবাদিকের মাঝে।

টিপু সুলতানকে এত নির্মমভাবে মারা হয়েছে যে, আজও সে পূর্ণ সুস্থতার স্বাদ পায়নি। অথচ তার হাত-পা ভেঙ্গে দিয়ে জয়নাল হাজারি আওয়ামী লীগের একজন পরীক্ষিত নেতা হিসেবেই নিজেকে প্রমাণ করেছে।

আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা ছিল গুরুতর অপরাধ। তাই শুধু সাংবাদিক নয় যারাই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলেছে তাদের উপরই নেমে এসেছে নির্যাতনের খড়গ। দেশের সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্য এমন কাজ নেই যা তারা করেনি।

সারাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ যখন বিচারের আশ্রয় খুঁজছিল তখন বিচার বিভাগকেও নিয়ন্ত্রণ করতে তারা নানা চেষ্টা চালায়। কোন কোন ক্ষেত্রে হুমকি ধমকি দিয়ে বিচার বিভাগকে থামাতে না পেরে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে রাজপথে অর্ধ ডজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে তারা লাঠি ও কিরিচ মিছিলও বের করে। ১৯ এপ্রিল ২০০০ দৈনিক যুগান্তরের রিপোর্টে দেখা যায়, '১৮ এপ্রিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিমের নেতৃত্বে আদালতের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল বের করা হয়। সেই মিছিল শেষে মোঃ নাসিম হুমকি দিয়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগকে যারা চিনেনা তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। লাঠি কোথায় মারতে হয় আ'লীগ তা দেখিয়ে দেবে।'

সম্মানিত আদালতকে যারা লাঠির ভয় দেখিয়ে হুমকি দিতে পারে, সাধারণ মানুষ তাদের কাছে কতটা অসহায় তা সহজেই অনুমেয়।

আওয়ামী লীগ শুধু মানুষের লাশ নিয়েই ছিনিমিনি খেলেনি, দেশের প্রশাসনকেও তাদের দলীয় কেন্দ্রে পরিণত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিপতিত আওয়ামী লীগের একটি দুর্নীতির প্রমাণ বিসিএস পরীক্ষায় দলীয়করণ। ১১ জুলাই ১৯৯৯ প্রথমআলো রিপোর্ট করে– '২০তম বিসিএস সহ বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে মেধাবী ছাত্রদের নিয়োগ দানের পরিবর্তে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের গণহারে নিয়োগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরি বিসিএস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস)কে আওয়ামী সরকার বঙ্গবন্ধু ক্যাডার সার্ভিসে পরিণত করেছে।'

আওয়ামী লীগ এমন একটি দল যারা ক্ষমতায় আওয়ার জন্য কিংবা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এমন কোন কাজ নেই যা করতে পারেনা। ক্ষমতায় থাকালীন অনেকগুলো দেশবিরোধী বিতর্কিত চুক্তিও তারা করেছিল। যার জন্য তখনই প্রতিবাদ হয়েছিল। আওয়ামী লীগ শুধু ক্ষমতায় থেকেই যে রক্ত নিয়ে খেলেছিল তা কিন্তু নয়, ক্ষমতার বাইরে থেকেও সাধারণ মানুষকে তারা রেহাই দেয়নি।

বিরোধী দলে থেকে হরতাল ধর্মঘট ডেকে দেশ অচল করে গাড়ি ভাংচুর করা, গাড়ি পোড়ানো, পেট্রল দিয়ে মানুষ জ্বালিয়ে মারা ছিল তাদের স্বভাবিক কাজ। ২৮ অক্টোবর তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ■



icsbook.info

# আমার দেখা
# শহীদ শাহজাহান

মু. মাহাবুবুর রহমান

শহীদ শাহজাহান কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার উল্টর যাত্রাপুর গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে শহীদ শাহজাহান ছিলেন সবার প্রিয়। পিতা-মাতার স্বপ্ন ছিল শাহজাহান বড় হয়ে পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল করবেন। পিতা-মাতার স্বপ্ন পূরণ হতে দিলনা ঘাতক আব্দুল গফুর ভূঁইয়া।

## শহীদ শাহজাহান ছিলেন মজবুত ঈমানের অধিকারী

শহীদ শাহজাহান ছিলেন মজবুত ঈমানের অধিকারী। যখনই আন্দোলনের ডাক আসতো আন্দোলনের মাঠে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার কোন শক্তিকে ভয় পেতেন না। লড়াকু সৈনিকের মত ভূমিকা পালন করতেন। জিহাদ ফি সাবিল্লাহের কাজকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সকল বাধা ও প্রতিবাধা হাসিমুখে গ্রহণ করতেন। কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা তাকে ঈমানের পথ থেকে সরাতে পারেনি।

## দাওয়াতে ইলাল্লাহর গুনেগুনান্বিত

শহীদ শাহাজাহান ছিলেন দাওয়াতে ইলাল্লাহর এক মূর্তপ্রতীক। আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করা ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ মিশন। অল্প সময়ে তিনি একজন মানুষের মন জয় করে নিতে পারতেন। তার ছন্দময় কথা ও কাজ ইসলামের প্রতি সবাইকে আকৃষ্ট করতো। পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী মানুষেরা শাহজাহান ভাইয়ের সংস্পর্শে আসলে তাদের মনের মাঝে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসত। তার মাঝে দাওয়াতে ইলাল্লাহর পরিপূর্ণ গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

## প্রচন্ড দায়িত্ব শীলতা

শহীদ শাহাজান ছিলেন একজন আনুগত্য পরায়ন দায়িত্বশীল। শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো সাথী শাখার দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন– চৌদ্দগ্রাম উল্টর সাথী শাখা, পিপুলিয়া সাথী শাখা, চৌয়ারা সাথী শাখা, লাকসাম উল্টর থানা শাখা এবং সর্বশেষ নাঙ্গলকোট উপজেলা দক্ষিণ সাথী শাখার। তাকে সংগঠন যেখানেই কাজ করার সিদ্ধান্ত



icsbook.info

দিয়েছে, তিনি তা হাসি মুখে গ্রহণ করেছেন। কখনো কোন কাজে আপত্তি পেশ করেননি। নিজের সদস্যকে আল্লাহর নিকট তুলে ধরাইছিল তার অভ্যাস। তাকে যে শাখায় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বছর শেষে তিনি সে শাখাকে শক্তিশালী শাখায় রূপান্তরিত করেছেন। দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। কোন প্রকার অলসতা তাকে থামাতে পারেনি। তার চেহারার মধ্যে সবসময় পেরেশানিক ভাব দেখা যেত। সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে ওমর (রা.) এর মত দায়িত্ববান সংগঠক ছিলেন।

## নিজের ওপর অন্যকে গুরুত্বদান

শহীদ শাহাজাহান নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের ওপর অন্যকে গুরুত্ব প্রদান করতেন। এ গুণ সবার মধ্যে অনেক সময় পাওয়া যায়না। নিজের পেটের ক্ষুধা থাকতে নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানো ছিল তার স্বভাব। নিজের প্রয়োজনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অন্যের চাহিদাকে প্রাধান্য দিতেন তিনি। নৈতিকতার উত্তম চূড়ায় তিনি উন্নিত হয়েছিলেন।

## হাস্যোজ্জ্বল মন মানসিকতা

শহীদ শাহাজান ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল। শিক্ষাশিবিরি, সম্মেলন, বিভিন্ন সভা-সমাবেশে অল্প সময়ের মধ্যে সবার প্রিয় মানুষে পরিনত হতেন। ইসলামী সংগীত ও কৌতুক পরিবেশন করাকে তিনি পছন্দ করতেন এবং বিভিন্ন সময় প্রোগ্রামে পরিবেশনও করতেন। কৌতুকপ্রিয় শাহাজাহান ভাই সহপাঠিদেরকে হাসি ও আনন্দের মধ্যে মাতিয়ে রাখতেন। তিনি কুট কথা বলতেন না এবং কাউকে কষ্ট দিতেন না। কাউকে গ্রহণ করাছিল তার নিত্য দিনের কাজ।

## মানুষের সুখে-দুখে অংশগ্রহণ

শহীদ শাহাজাহান মানুষের সুখে ও দুখে অংশিদার হতেন। বিভিন্ন সময় যখন বাড়িতে যেতেন, বাড়িতে গিয়ে কখনোও বসে থাকতে পারতেন না। বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে গরীব-দুখি মানুষের খবর নিতেন। অল্প বয়সে সারা দিন নিজেকে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। নিজের গ্রামে প্রয়োজনীয় মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজের মানুষ তার বাস্তব স্বাক্ষী। তিনি সমাজের মানুষের সাথে মিশে থাকাকে বেশি পছন্দ করতেন।

## নিভে গেল একটি উজ্জ্বল বাতি

শহীদ শাহাজাহানের পিতা মৌলভী সিরাজুল ইসলাম শিক্ষকতা করে সামান্য বেতন দিয়ে কষ্ট করে শহীদ শাহাজাহানকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। শাহাজাহান ছিলেন পিতা-মাতার আদরের সন্তান। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে জানাযা নামাজ পড়াবেন, এটাই ছিল তাদের প্রত্যাশা। কিন্তু সন্ত্রাসী আব্দুল গফুর ভুঁইয়ার বুলেট সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে দিলনা। শহীদ শাহাজাহানের অনেক স্মৃতি আমাদের মনের গভীরে নাড়া দেয়। শহীদ শাহাজাহান আর কোন দিন ফিরে আসবেন না। শাহাজাহানের রক্তে ধূয়ে আসুক মুক্তি, কায়েম হউক আল কুরআনের আলোর সমাজ। হে আল্লাহ! তুমি শহীদ শাহাজাহানকে কবুল কর আমীন।

---

*লেখক : সমাজকল্যাণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# যেমন দেখেছি
# শহীদ ফয়সালকে

মোঃ সাইফুল আলম

সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ। ক্লান্তিহীন চেহারা। শত শাসনেও বিষন্নতার ছাপ নেই। নেই সীমাহীন চাহিদা। ছোটকাল থেকেই ইসলামী অনুশাসনের প্রতি ছিল তার ব্যতিক্রমী অনুরাগ। একজন দায়ী হিসেবে তার ভূমিকা সত্যিই অনুকরণীয়। একদিকে স্নেহ-মায়া-মমতায় জড়িয়ে রাখত এলাকার সকলকে অন্যদিকে সত্যের প্রতি সে ছিল আপোষ-হীন। সেই ছোটকাল থেকে তাকে দেখেছি। এ বয়সের অনেক ছেলেই বহু অঘটনের সাথে জড়িয়ে পড়ে কিন্তু ফয়সাল ব্যতিক্রম।তার বিরুদ্ধে কেউ কোনোদিন বিচার নিয়ে আসেনি। শহীদ ফয়সাল ছিলো এক কর্মঠ যুবক। যখন তার আব্বা ইন্তেকাল করেন, তখন তার সকল ভাই-বোন পড়ালেখায় রত। এ অবস্থায় পরিবারের ব্যয় চালাতে সবাই কিছু একটা করতো। ফয়সাল স্থানীয় হাজী শামসুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রভাতী শাখার একজন শিক্ষক ছিল। কোমলমতি ছোট-ছোট ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে 'ফয়সাল স্যার' খুবই প্রিয় নাম। পড়াশুনার পর চাকরি, চাকরির ফাঁকে টিউশনি- এরপর আবার ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নিয়মিত কর্মীর কাজ। সব মিলিয়ে অধিক ব্যস্ততম মানুষটির নাম 'শহীদ ফয়সাল'। শত ব্যস্ততার মাঝেও তার সতেজ ও সজীব মুখমণ্ডল সবাইকে আকৃষ্ট করতো।

## সেদিন কি ঘটেছিল চিটাগাং রোড মোড়ে

সেদিন ছিল ২৮ অক্টোবর। যেদিন ঘটেছিলো ইতিহাসের জঘন্য ঘটনা। বেলা আনুমানিক ১০টা। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার জামায়াত কার্যালয়ে হামলা করলো আওয়ামী হায়েনারা। আমি তখন ফয়সালের টেলিফোনের দোকানেই ছিলাম। মোবাইলে সংবাদ এলো হামলা হয়েছে জামায়াত কার্যালয়, ভাঙচুর ও লুণ্ঠন করেছে আসবাবপত্র, আহত হয়েছে ৩ জন। তারা তছনছ করেছে আমাদের প্রিয় সম্পদ কোরআন-হাদিসকে। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে কোরআন-হাদিসের পাতা আপনারা আসুন। এ খবরের পর আমি



icsbook.info

রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পরলাম। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল ফয়সাল এবং তার বড় ভাই ফাহাদ। আমি এ সংবাদ দু'চার জনের মাঝে পৌঁছে দিয়ে রওয়ানা হলাম জামায়াত কার্যালয়ের দিকে। পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ফাহাদ এবং ফয়সালকে। তোমরা কোথায় যাচ্ছ? সংক্ষিপ্ত উত্তর- আমরাও যাই। কোরআন-হাদিসের অবমাননা তারা সহ্য করতে পারছিল না। চোখে-মুখে ছিল টানটান উত্তেজনা। জামায়াত কার্যালয়ে কিছুক্ষণ ছিলাম। জোহরের আযানের পর বাসায় আসব চিন্তা করে বের হলাম। গেটেই দেখি ফয়সাল এবং ফাহাদ দাঁড়িয়ে। আমি তাদেরকে দুপুরের খাওয়ার কথা বললে, ফয়সাল বলল, 'রুটি কলা খেয়ে নিব, আবার যদি আসে।' কে জানে এটাই হবে ফয়সালের সাথে আমার শেষ কথা। আসর নামাজ শেষে আমি বাসা থেকে বেড়িয়েছি মাত্র, এলাকার এক ছেলে এসে বলল, 'ফাহাদ-ফয়সাল দু'জনই গুরুতর আহত।' আমি আর স্থীর থাকতে পারছিলাম না। দৌড় দিলাম চিটাগাং রোডের দিকে। ফুয়াদ দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে শহীদের মা-খালারা পাগলিনীর মতো। সবার মুখে একই কথা হায়-হায় সোনার টুকরো ছেলেগুলোকে হায়েনারারা কি করল। ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি 'শহীদ ফয়সাল।' তার মুখমণ্ডল ছিল জান্নাতী আভায় আলোকিত। আর জ্ঞান ফিরেছে শহীদ ফয়সালের ২ দিন ছিলাম হাসপাতালে শহীদের সাথীদের সাথে। অবশেষে শোকের সাগরে ভাসিয়ে জান্নাতে পাড়ি জমাল শহীদ ফয়সাল। কাঁদলাম অনেক্ষণ। ফুপিয়ে-ফুপিয়ে কাঁদছে শহীদের সাথীরা।

কফিন যখন শহীদের বাসার সামনে, তখন হাজার হাজার মানুষের আহাজারি-আর্তনাদ আকাশ-বাতাসকে ভারি করে তুলছিল। বাকরুদ্ধ শহীদের গর্বিত মা। তার একই প্রশ্ন– কী অপরাধ ছিল আমার ফয়সালের। নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক একাকার হয়েছিল শহীদের লাশ দেখতে। সবাই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে কফিনের দিকে। অনেকেই হু হু করে কেঁদে উঠছিল থেকে থেকে। অচেনা অনেক মানুষের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল চোখের পানি।

পুলিশ এএসপিসহ সবাই হতবাক। 'শহীদ ফয়সাল' জীবন্ত ফয়সালের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। চারদিকের স্লোগান প্রমাণ করে, শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না।'

হে আল্লাহ! শহীদ ফয়সালের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও। বাংলাদেশের সবুজ ভূখণ্ডে ইসলামের বিজয় দিয়ে শহীদ ফয়সালের রক্তের বদলা দাও। আমিন। ■



icsbook.info

# জান্নাতের পাখি
# শহীদ আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল

মোঃ আরিফুল ইসলাম

যত মানুষ জন্ম নিয়ে আসে পৃথিবীতে, তার প্রত্যেককে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে যেতে হয়। এ ক্ষণিকের আসা-যাওয়া কেয়ামত অবধি চলবে। পরপারে তাকে একটি জায়গায় স্থান পেতে হয়। হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম। কিন্তু খোদার রাহে যারা জীবন দিয়ে চলে যায় খোদা কি তাদের ফেলে দিবেন? না, খোদা তাদের তাঁর কাছে টেনে নেন।

আল্লাহর এই উদ্যানের সুনদরতম সেরা গোলাপ শহীদ আব্দুল্লাহ আল ফয়সালকে বাঁছাই করলেন তার নিজের জন্য আর ভালোবেসে আপন করে নিয়ে গেলেন শহীদি মর্যাদায় ভূষিত করে।

নশ্বর এ পৃথিবীতে জন্ম মৃত্যু মানুষের
স্রষ্টার এক বিশাল খেলা
ভেঙ্গে যায় সব ক্ষণকাল পর সুখ-দুঃখের ঐ মিলন মেলা

সকলের আকাঙ্খা ছিল পিতাহারা এই পরিবারের কষ্ট লাঘব করবে ফয়সাল। সেবা করবে সকল মানুষের সুখে চলবে আট সদস্যের এই পরিবার। কিন্তু না শহীদ আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল এর ব্যতিক্রম। রক্ত পিচ্ছিল, কন্টকাকীর্ণ দুর্গম পথের এক যাত্রীর হৃদয়ে শাহাদাতের অদম্য তামান্না। মিছিলে তার স্লোগান- আমরা সবাই লড়তে রাজি মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী। ইসলাম যখন হৃদয়ে বিস্তীর্ণ অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে হৃদয় দুনিয়ার জাগতিক যাবতীয় সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে অবস্থান করে মৃত্যুকে তুচ্ছ ভেবে সংগ্রামের অগ্নিঝরা ময়দানে নিজেকে অকাতরে উৎসর্গ করে দিতে পারে। তাইতো পবিত্র কুরআনে সুরা আত-তওবায় মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহর পথে লড়াই করার যোগ্যতা তাদেরই আছে যারা আখেরাতের বিনিময় জীবনকে বিক্রিকরে দিয়েছে। তারা



icsbook.info

আল্লাহর পথে লড়াই করবে। এ পথে নিহত হবে অথবা বিজয়ী হবে। উভয়ই অবস্থাতে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। এপথে যারাই সত্যের বিজয় নিশ্চিত করতে এগিয়ে গিয়েছিল বাতিলের চোখে তারাই আতঙ্ক। তাদেরই দিতে হয়েছে তপ্ত তাজা রক্ত আর এই রক্তের বিনিময়ে তারা সফল হয়েছে।

অনেকেরই শাহাদাতের তামান্না থাকে কিন্তু শহীদি মৃত্যু সবার ভাগ্যে জোটে না। শাহাদাতের মৃত্যু সর্বশ্রেষ্ঠ মৃত্যু। এটা বিরাট সম্মানজনক ও মর্যাদার এবং পরম সার্থতার। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং তার পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এজন্যই রাসুল (সা.) আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও বারবার শাহাদাতের আকাঙ্খা ব্যক্ত করতেন। তিনি বলতেন, আমার বড়ো ইচ্ছে আল্লাহ পথে নিহত হই আবার জীবিত হই আবার শহীদ হই আবার জীবিত হই এবং পুনরায় শহীদ হই। শহীদের দেহ কবরেও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থাকে। কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা তাকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় হাজির করবে এবং তার সেই স্থান হতে নূরের আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ সুবাহান্নাল্লাহ তায়ালা শহীদের মুকুট পরিয়ে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ করবেন। মৃত্যুবরণ করেও চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে শহীদ আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল।



icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর
# আমাদের অনুপ্রেরণা

আবদুস সাত্তার সুমন

তখন দুপুর ১১টা। আমরা ১০/১৫ জন মিলে সমাবেশে যাচ্ছিলাম। নির্বাচন উপলক্ষে আমীরে জামায়াতের দিকনির্দেশানামূলক বক্তব্য আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া ঈদের পর বাড়ি থেকে এসেছি, এ সমাবেশে অনেক পরিচিতদের সাথে সাক্ষাত হবে, কুশল বিনিময় হবে এ ছিল উদ্দেশ্য। রিকশায় হাইকোর্টের সামনে কদম ফোয়ারার ঠিক উত্তর পাশে আমাদের নামতে হলো। কারণ হাইকোর্ট মোড় থেকে পল্টনমুখী রাস্তাটি পুলিশ ও বিডিআর বেরিকেড দিয়ে রেখেছে। পুলিশ বিডিআর এর সদস্যদের সশস্ত্র আক্রমণাত্মক অবস্থায় দেখে আমরা সকলেই বিস্মিত হয়েছি। রিকশা থেকে নামতে গা শিউরে উঠলো। মৎস্য ভবনের দিক থেকে যুবলীগের একটি জঙ্গি মিছিল সকলের হাতে লাঠি, লগি-বৈঠা, মুখে কুৎসিত স্লোগান। মনে হচ্ছে এখনই কিছু একটা করে ফেলবে। মিছিলটির লোকগুলোকে দেখে বেশি অবাক হয়েছি। সামনে কয়েকজন নেতা গোছের লোক। যাদের পরনে শার্ট-প্যান্ট-পাঞ্জাবি। মধ্যখানে এবং শেষভাগে রাস্তার টোকাই, রিকশাওয়ালা যাদের কারো পরনের ময়লা লুঙ্গি, হাতে লাঠি-বৈঠা সারা শরীর খালি। কারো পরনে লুঙ্গি থাকলেও শরীরের ময়লা ছেড়া শার্ট। মোট কথা সন্ত্রাসী গোছের কিছু লোকের একটি মিছিল। এ ভীতিকর পরিস্থিতি দেখে অজানা এক শঙ্কায় বারবার ভাবতে লাগলাম কি হচ্ছে, সমস্যা কোথায়? কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না।

পায়ে হেঁটে একজন দু'জন করে পল্টন মোড়ে পৌছলাম। পল্টন মোড়ে পৌছে দেখলাম মুক্তঙ্গণে একটি ট্রাকে আওয়ামী-যুবলীগের কিছু নেতা-কর্মী উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে এবং কিছুক্ষণ পরপর এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করে স্লোগান দিচ্ছে যা কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পল্ট মোড়ে পূর্ব পাশের রাস্তাটির মাথায় আমাদের কিছু ভাই সংগঠনের পতাকা হাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে যাতে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটের সমাবেশে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। আমরা পায়ে হেঁটে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটের ওভারব্রিজটির সামনে দাঁড়ালাম। সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুর রহমান ভাই



icsbook.info

আমাকে ডেকে কথা বলছিলেন। এক মিনিটও হয়নি, ঠিক এমন সময় প্রেসক্লাবের রাস্তা ধরে যুবলীগের একটি বিরাট মিছিল সশস্ত্র অবস্থায় প্রকাশ্যে লাঠি-লগি-বৈঠা, রামদা, কিরিচ, পিস্তল নিয়ে আমাদের পল্টন মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইদের ওপর আক্রমণ করলো।

যুবলীগের মিছিল পল্টন ময়দানের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে জামায়াতের মঞ্চ দখলের পরিকল্পনা করে অতর্কিত হামলা চালায়। আমাদের সমাবেশ ৩টায়, বেলা ১১টায় কেউ আসার কথা নয়। মাত্র শ'খানেক লোক মঞ্চ তৈরির কাজ ও প্রোগ্রামের শৃঙ্খলার জন্য উপস্থিত ছিল। যুবলীগের হাজার হাজার লোকের মোকাবেলায় আমরা গুটিকয়েক লোক কিবা করার আছে। মুহূর্তের মধ্যে মনে হলো আমাদের অনেক কিছুই করার আছে। আমরা বদর, ওহুদ, খন্দক ভুলিনি। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে স্বাভাবিক আন্দোলনে নেমেছে তাতে আল্লাহর সহযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। আমরা রুখে দাঁড়ালাম। ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতির অবনতি হতে লাগলো। আমি জানিনা সে নারকীয়তার কথা লিখতে পারবো কি না, যে পাশবিকতা হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। স্মরণ হলে মূর্ছা যেতে হয় বারবার। চোখের সামনে যখন দেখলাম ৭০ বছরের বৃদ্ধ এক ভাইয়ের মাথা হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে, সারা শরীর রক্তে ভিজে গেছে। দু'জনে ধরে নিয়ে গেলাম মহাগরী জামায়াত অফিসে। প্রতি মিনিটে ৫-৬ জন আহত হচ্ছে। কারো চোখ বেয়ে, মাথা বেয়ে রক্ত ঝরছে। বৈঠার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মাথার চুলসহ খুলি খসে পড়েছে। এ দৃশ্য কি সহ্য করা যায়? ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায়ে পল্টন মোড়ে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী জসিম ভাইয়ের পাঞ্জাবি ধরে টেনে নিয়ে যায় হায়েনারা। তারপর যা ঘটেছে তা বর্ণনা করা সত্যি কঠিন। সাপ যেভাবে মারে জসিম ভাইকে পেয়ে জানোয়াররা উল্লাসে মত্ত হয়ে লগি-বৈঠার অবিরাম আঘাত করতে লাগলো। কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষের পক্ষে একটি অসহায় মানুষকে এভাবে মারা সম্ভব নয়। সে কি উল্লাস! মারতে মারতে যখন তিনি জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়লেন তখনও তার উপর বেধড়ক লাঠি পেটা হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়! মৃত লাশের ওপর লাফ দিয় উঠে নেচে আনন্দ উল্লাস করা ইতিহাসের কেউই শুনেনি, দেখেওনি। সে বর্বর, পাষণ্ড, পৈশাচিকতা তারা করেছে। কস্তুরী হোটেলের গলিতে গেলাম। সেখানে গিয়ে আরো হতাবাক হলাম। গলি দিয়ে আমাদের অফিসের দিকে ঢুকতে চাইছে ঐ লম্পটরা। কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক রেজাউল করিম ভাই সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাদের অস্ত্রের কাছে আমরা খালি হাতে পেরে উঠছিলাম না। তার উপর আমাদের লোক সংখ্যা কম। রেজাউল ভাই আমাদের কয়েকজনকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে বললেন, আপনারা পিছপা হবে না, আমরা শহীদ হব কিন্তু পিছপা হবো না। হয়তোবা সেই সারির মধ্যেই ছিলেন শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম ভাই। আমরা নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে তাদেরকে ধাওয়া দিয়ে সামনে আগাতেই তারা দৌড়ে মেইন রোডে উঠল। বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারলাম না। কারণ লোকসংখ্যা কম হওয়ায় উল্টো আমাদের ধাওয়া দিলে আমরা পিছু হটি। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটে গেল সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ধাওয়া খেয়ে পেছনে আসতে গলির মধ্যে আটকা পড়েছে শহীদ মুজাহিদ ভাই। তারপর যা ঘটার তাই হলো। আওয়ামী হায়েনার নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার মুজাহিদুল ইসলাম। হিংস্র



icsbook.info

জন্তুর সামনে অসহায় কোনো প্রাণীর যে অবস্থা হয়। তাই হলো। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেভাবে প্রাণীর দেহ বিচ্ছিন্ন হয় ঠিক সেভাবে মুজাহিদ ভাইকে অত্যাচার করে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হলো। আমরা আবার প্রস্তুত হয়ে ধাওয়া দিলাম। তারা পিছু হটলে পড়ে থাকতে দেখি মুজাহিদ ভাইয়ের ক্ষত-বিক্ষত দেহ। উদ্ধার করে যখন দুই হাতে দুই জন দুই পায়ে দুই জন ধরে নিয়ে আসা হয় তখনো জীবিত ছিল। হাসপাতালে স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিয়ে শোকে ভাসিয়ে চলে যান শহীদ মুজাহিদ ভাই। এভাবে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলতে থাকে সংঘর্ষ। অবাক হয়েছি সেদিনের পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায়। এত এত বিডিআর পুলিশ নিরবে দর্শকের ভূমিকায় ছিল। তাদের সম্মুখেই প্রকাশ্যে গুলি করে, বোমা নিক্ষেপ করে শহীদ করা হলো মেধাবী ছাত্র হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন, সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুমকে।

দুপুর ১১টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত টানা সংঘর্ষে তারা বারবার চেয়েছিল মঞ্চ দখল করতে কিন্তু আমাদের ভাইদের ঈমানী দৃঢ়তা, আল্লাহর প্রতি ভরসা ও কঠিন সাহস কিছুতেই তা করতে দেয়নি। জীবন দিয়েছে, রক্ত ঢেলেছে তবুও আমাদের সমাবেশ ভণ্ডুল হতে দেয়নি।

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস এমনই হয়। কণ্টকময় পথে ফুল বিছিয়ে কার্যসিদ্ধ করাই ইসলামী আন্দোলনের ঐতিহ্য। ২৮ অক্টোবর আওয়ামী হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক কবর রচনা করেছে। আর ইসলামী আন্দোলনের জন্য ত্যাগের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রচনা করে এ কাজকে এগিয়ে নেয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। ■



icsbook.info

# স্মৃতিতে অমলিন
# শহীদ মাসুম ও শিপন

শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির

প্রতিদিনের মত আজও পূর্ব দিগন্তের ফর্সা আকাশ ভেদ করে সোনালী সূর্যটা তার রঙের আভায় সারা দুনিয়া রাঙিয়ে দিতে উদিত হলো। তবে সকালের শান্ত স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতা ভেঙে ক্রমে ঢাকার রাজপথে, অলি-গলি পেশাজীবী মানুষের কোলহল কলরব মুখরিত হলো না প্রতিদিনের ন্যায়। আজ ঢাকার অতি পরিচিত দৃশ্য জ্যামের কবলে আটকে থাকতে হলো না। সোনালী রঙিন সূর্যটা রঙের ছটায় ডুবিয়ে দিতে বৃথা চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। এদিন শুধু ঐ সোনালী সূর্যটা নয়, আর ঢাকার অধিবাসী নয়, গোটা সৃষ্টিকুলকে নিথর নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল। পাখিরাও যেন প্রাণ খুলে গাইতে ভুলে গিয়েছিল। কেন প্রকৃতি আজ এমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে। তারা কোনো অশনি সংকেতের পদধ্বনি শুনেত পেয়েছিল, তারা কি বুঝতে পেরেছিল কোনো নির্মম বর্বরতার পূর্বাভাস। হয়তোবা হবে এমনটি। হ্যাঁ, প্রকৃতি হয়তো জানতো যে মানুষরূপী কোনো দানব আজ সৃষ্টি করবে নতুন ইতিহাস। ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নেয়া ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর যেদিন ছিল ইতিহাসের জঘন্য বর্বরতার, অমানবিক পৈশাচিকতার, নিষ্ঠুর নির্মমতার, নব্য জাহেলিয়াতের প্রেতাত্মাদের নির্দয় তাণ্ডবের।

পৃথিবী যতদিন থাকবে আর এদিনটি যতবার আসবে মানুষ একদিকে যেমন শহীদের ত্যাগের দৃষ্টান্তকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে, অন্যদিকে আবু জাহেলের গোষ্ঠীরা পেতে থাকবে ধিক্কার এবং ঘৃণাই হবে তাদের পাওনা। সেই দিনের ঐ প্রেতাত্মাদের নর হত্যার উন্মাদনা কেউকি ভুলতে পারবে? কেউকি শহীদদের হৃদয়ের অবিরল রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পারবে? ঐ দৃশ্য কি কেউ কোনো দিন ভুলতে পারবে। যেদিন লগি-বৈঠার আঘাতে আঘাতে বেয়নেটের মতো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জীবন্ত তরতাজা মুজাহিদ, হাবিবুর রহমান, জসিম উদ্দিনসহ ৬ জনকে মেরে শুধু ক্ষান্ত হল না, তাদের ডাইনি বুবুকে খুশি করতে মৃত লাশের ওপর করল জঙ্গি বর্বর নৃত্য। এ দৃশ্য টিভিতে দেখে গোটা দেশবাসী শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য যারা ঐ নব্য জাহেলিয়াতের প্রেতাত্মাদের তল্পিবাহক তারা বাদে বাংলার মায়েরা সেদিন অশ্রুকে ধরে রাখতে পারেনি। পুরো



icsbook.info

পৃথিবীর মানুষগুলো দেখলো কিভাবে এদেশের প্রগতির ধ্বজাধারীরা শান্তিতে নোবেল পুরস্কারটিকে রক্তাক্ত করলো, বরণ করলো লাশের দ্বারা তা আবার নোবেল বিজয়ের মাসেই।

ঐ দিনের নির্মম বর্বরতার স্বীকার ছিল আমার প্রিয় সাথী প্রিয় বন্ধু সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম ও গোলাম কিবরিয়া শিপন। সবুজবাগ থানার সাবেক সভাপতি শামসুল আলম ভাই-এর ছোট ভাই হওয়ায় মাসুম ভাইয়ের নাম অনেকবার শুনেছি বিভিন্ন প্রোগ্রামে। তবে তার সাথে আমার পরিচয় ২০০৩ সালের কোনো এক সময়। প্রথম সাক্ষাতে তার বিনয় মিশ্রিত আচরণ এবং মুচকি হাসি আমাকে ভিষণভাবে আকৃষ্ট করলো। ক্রমেই সে আমার হৃদয়ে এক উঁচু স্থানে ঠাঁই করে নিল। দেখা হলেই সালামের সাথে মুচকি হাসিটা কি করে ভোলা যায়। এভাবে তার সাথে অনেক ছোট খাট স্মৃতি আছে। তবে যে স্মৃতিগুলো কখনো ভোলা যাবে না সেটা না বললে আমি নিজেকে খুব অপরাধী মনে করবো। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে দুই সবুজবাগের যৌথ উদ্যোগে সীরাত মাহফিলের আয়োজন করে। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববরেণ্য ও নন্দিত মুফাচ্ছিরে কুরআন আল্লামা হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। মাহফিল বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক জনশক্তি সমর্থকেরা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করে যাচ্ছিল। মাহফিল বাস্তবায়নের প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে এসে মাহফিলের আগের দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো। প্রত্যেকের মনে তখন এক নতুন আশঙ্কার জন্ম নিল। প্রত্যেকে তখন আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছিলাম এই ভেবে যে, প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার কাছে কি অবশেষে আমরা পরাজিত হব? পণ্ড হয়ে যাবে আমাদের মাহফিল। ক্রমে সময় ঘনিয়ে আসছে আর আমাদের মনের ধুকপুকানি বাড়ছে। মাহফিলের আগের রাতে আমাদের ২৮ পশ্চিমের সাথীদের এবং সবুজ উত্তর ২৭ দক্ষিণের সাথীরা ছিলাম মাঠ এবং স্টেজ পাহারা দেয়ার কাজে নিয়োজিত। মাসুম ভাইও ছিল আমাদের সাথে। এশার নামাজ পড়ে সবাই এলাম মাঠে। মাঠে এসে বৃষ্টিতে যেখানে পানি জমেছিল তা সরানোর চেষ্টা করলাম সবাই মিলে। আর বালতি ভরে ভরে মাঠের কোণায় রাখা বালু এনে কর্দমাক্ত জায়গায় ভরাট দিতে লাগলাম। তখনো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল মেঘের তর্জন গর্জন আমাদের হৃদয়ের কম্পনকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। মাসুমসহ আমরা আনন্দের সাথে কাজ করছিলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাসুম ও অন্য কয়েকজন রাতের লাইটের আলোতে তাঁবুর নিচে ক্রিকেট খেলে মনকে আরো চাঙ্গা করে নিচ্ছিল। ওদিকে মেঘ তার কাজ যথারীতি করে যাচ্ছিল গোমড়া মুখে। মেঘের গোমড়া মুখ দেখে আমাদের মনও কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় কাঁপছিল। হয়তোবা শেষ পর্যন্ত আমাদের সকল আয়োজন বৃথা হয়ে যাবে। মাঠে বসে সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম কাজ শেষে আমরা কেউ ঘুমাবোনা (পালা করে ঘুমানোর সিডিউল থাকলেও তা বাদ দিলাম) সারা রাত মহান রবের দরবারে রুকু সিজদা করে কাটিয়ে দেব। মাঠের কাজ শেষে প্রত্যেকে যখন ক্লান্ত তখন প্রয়োজন ছিল গভীর ঘুমের কিন্তু রহমানের বান্দারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকলো। মাহফিল শুরুর আগে দুপুরের দিকে কয়েক মিনিট হালকা বৃষ্টি নামলে দায়িত্বশীলদের মুখ ফ্যাকাশে হতে দেখেছিলাম। কিন্তু মাসুম ভাই এবং আমরা পরিপূর্ণ আশ্বস্থ ছিলাম আমরা সুন্দরভাবে সমাপ্ত করতে পারবো। সত্যিই সুন্দর আবহাওয়ায় আমরা মাহফিল সমাপ্ত করলাম। ঐ দিনের ঘটনায় মাসুম



icsbook.info

ভাইয়ের ঈমানের যে জযবা দেখেছি তা আমাকে বারবার অনুপ্রাণিত করবে। শুধু ঐ ঘটনা নয় আরো অনেক সুখ স্মৃতি আছে মাসুম ভাইয়ের সাথে। মাসুম ভাইয়ের সাথে প্রতিদিন সকাল বেলা দেখা হতো বাসাবো মাঠে। একজন দক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। জাতীয় দলের সহঅধিনায়ক দুনিয়া কাঁপানো আশরাফুল ছিল তার খেলার সাথী। বল করতো গিলেস্পির মতো করে। তাই দুষ্টমি করে তাকে ডাকতাম গিলেস্পি মাসুম বলে। শুধু কি মাসুম ভাইয়ের পদচারণা এখানেই শেষ? মিছিল হলেই মাসুম ভাইয়ের অগ্রগামীতা ছিল চোখের পড়ার মতো। পল্টনে যে কোনো মিছিলে মাসুম ভাইকে দেখা যেত মাইকের মাউথ হাতে স্লোগান দিতে। তার বিচিত্র স্লোগান এবং স্লোগানের আওয়াজকে মনে হতো যেন কোনো বজ্রাহত সিংহ শাবক গর্জন করছে। ভারী সুন্দর লাগতো বিপুল উৎসাহ নিয়ে স্লোগান দিতাম। সেই বাসাবো মাঠ আছে, পল্টন আছে, পল্টনে মিছিল হবে কিন্তু কোথাও দেখা পাব না আমার প্রিয় মাসুম ভাইয়ের। আর শুনবোনা কখনো মাসুম ভাইয়ের বিপ্লবী বজ্রকণ্ঠের হুংকার ধ্বনি। আর তো মাসুম ভাই ব্যাট বল নিয়ে বাসাবো মাঠে আসবেনা কখনো। মাসুম ভাইকে আর কখনো দেখা যাবে না ২৮ অক্টোবরের মতো বাতিলের বিরুদ্ধে জান-প্রাণ দিয়ে লড়তে। অকালে ঝরতে হলো একটি প্রস্ফুটিত গোলাপকে আর বাগান থেকে যার সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগটুকু পেলনা। এর জবাবে কে দেবে? আমাদের সান্ত্বনা একটাই আমরা শহীদের গর্বিত সাথী তার উসিলায় আমরাও কাল কেয়ামতে পার পেতে পারি।

আল্লাহর আর এক বীর মুজাহিদ ২৮ অক্টোবরের শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপন। শিপনের সেই মিষ্টি হাসি প্রাণোচ্ছল হাসিমাখা মুখ আমার স্মৃতি থেকে কখনো মুছবেনা। যারা তার সাথে উঠা-বসা, চলাফেরা ও খেলাধুলা করতো তারাও হয়তো কখনো ভুলতে পারবেনা তাদের প্রিয় সাথীকে। যে কোনো আসরে শিপন ভাই ছিল মধ্যমণি। যতক্ষণ থাকতেন আসর মাতিয়ে রাখতেন বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার কথা বলে। কথায় দারুণ পটু ছিলেন। বাকপটু শিপন ভাইয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিতা ছিল অবাক করার মতো। তিনি সব সময় কথায় হারতে ছিলেন নারাজ। তার প্রত্যুৎপন্নমতিতা আমাকে বারবার মুগ্ধ করতো। আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো বলে মনে হয় না।

২০০৫ সালের ঈদুল ফিতর পালন করি ঢাকায়। দিনটাকে আমাদের মিলনের দিন বললেও ভুল হবে না। কর্মী, সাথী এবং সুধীদের বাসায় যাওয়ার কর্মসূচী সবুজবাগ থানার একটি ঐতিহ্য। ঈদের নামাজ পড়ে সবাই একে একে জড়ো হচ্ছে সবুজবাগ উত্তরের তৎকালীন সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের বাসায়। আমি ছিলাম আদর্শ থানা (নটরডেম কলেজ) এর সেক্রেটারি। ঈদের ছুটিতে আমাদের থানার সবাই বাড়ি চলে যায়। তাই সবুজবাগের সাবেক জনশক্তি হিসেবে সবুজবাগের ঐতিহ্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে আমিও সেদিন মিলিত হই আজাদ ভাইয়ের বাসায়। সেখানে উপস্থিত হয়েই দেখতে পেলাম শিপন ভাই এবং কুতুব ভাই দু'জনকে। রুমে ঢোকার সাথে সাথে শিপন ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো। আমার সাথে ছিলেন ২৮ পশ্চিম ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি শফিউদ্দিন সেন্টু ভাই। তার সাথেও একইভাবে ভাব বিনিময় করলেন। এভাবে সবার সাথে ভাব বিনিময় এবং কুশল বিনিময় করতে লাগলেন। যতক্ষণ আমরা আজাদ ভাইয়ের বাসায় ছিলাম আমাদের পুরো



icsbook.info

সময়টাই মাতিয়ে রাখলেন শিপন ভাই। তার চমৎকার উপস্থাপনা এবং মজার মজার ঘটনার কথা শুনে আমরা হাসিতে লুটিপুটি খাচ্ছিলাম। আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে চলছিল আজাদ ভাইয়ের ঈদ আপ্যায়ন। ঐ দিন সবুজবাগ থানার ৩৫ জন ভাই একই রঙের পাঞ্জাবি পরে সুধীদের বাসায় বাসায় ঘুরে বেড়ালাম। অবশ্য শিপন ভাই, আজাদ ভাই এবং আমার পাঞ্জাবিটা ছিলো অন্য রঙের। এর মধ্যে হঠাৎ শিপন ভাই আমার পাঞ্জাবিটা টান মেরে বললেন, আজাদ ভাই ওনার পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলতে বলেন, নাইলে কিন্তু টেনে ছিঁড়ে ফেলবো। আজাদ ভাই তখন আমাকে বললো ভাই আপনার পাঞ্জাবিটা বেশি সুন্দর তো তাই ওনার হিংসে হচ্ছে। এভাবে প্রতিটি প্রোগ্রামেই শিপন ভাই মেতে উঠতেন দুষ্টুমিতে। তার দুষ্টুমিতে আমরা কখনো বিরক্তবোধ করিনি বরং এটা ছিল আমাদের কাছে খুবই উপভোগ্য। আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা এবং শ্রেষ্ঠ উপভোগ্য দিন ছিল সেটি। শিপন ভাই উপস্থিত ছিলেন বলেই দিনটা এতো উপভোগ্য এবং এতো স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার কাছে। আজও কেউ আমার স্মরণীয় দিনের কথা বলতে বললে আমি সেই দিনটার কথাই বলি। শিপন ভাইয়ের সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাত হয় মালিবাগ রেললাইনের উপর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনো একদিন। আমাকে দেখে তিনি বিস্ময়ে বললেন, ভাই আপনি এখানে কি করেন? আমাদের ছেড়ে চলে আসলেন একটু বেড়াতেও যান না। আমি বললাম, আমিতো এই থানার (রমনা থানায়) দায়িত্বে। একথা শুনে বললেন, আপনাকে আর কতো জায়গা ঘুরতে হবে আল্লাহই ভালো জানেন। তারপর সবুজবাগ থানায় খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে সেদিনের মতো চলো গেলো। তার সাথে ছিল সাবেক সাথী সুজন ভাই। তার চলে যাওয়ার দিকে আমি অনেক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম, তার যাওয়া দেখলাম। ঐ দিনের দেখাই যে তার সাথে শেষ দেখা হবে একথা কে জানতো। শিপন ভাইকে আর দেখতে পাবো না, শুনতে পাবো না তার মুখরোচক, চিত্তাকর্ষক আকর্ষণীয় উপস্থাপনার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। ভাবতেই নয়ন অশ্রুতে ভিজে যায় আমার কপোল। ২৮ অক্টোবর নামক কালাজ্বর কেড়ে নিল তার জীবন। যেমনিভাবে বুকে ধারণ করেছিলেন কুরআনের বাণীকে, তেমনিভাবে ২৮ অক্টোবর আওয়ামী নরপিশাচদের নির্মম নির্যাতন শরীরে ধারণ করে দন্ত মুবারক শহীদ করে নিজেও শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন। সিক্ত হলেন নিজের রক্তে। চলে গেলেন আপন ঠিকানায়। কিন্তু শোকের সাগরে ভাসিয়ে গেলেন আমাদেরকে। শিপন ভাইয়ের পিতা প্রতিদিন পথ পানে চেয়ে থাকেন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠেন। আম্মার চোখের পানি কখনো শুকায়না। কেন এমন হল? কোন অপরাধে তাকে অকাল জীবন দিতে হলো। তার অপরাধ ছিল, সে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতো। তার অপরাধ ছিল সে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। আর কখনো হারাতে চাইনা কোনো ফুটন্ত গোলাপকে। পেতে চাই গোলাপের পূর্ণ সুবাস। মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে এই প্রত্যাশাই করি এবং প্রিয় সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম ভাই এবং হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন ভাইয়ের শাহাতাদের কুবলিয়াত কামনা করে আমার টুকরো স্মৃতির ইতি টানছি। আল্লাহ হাফেজ। ■



icsbook.info

# ভাই হারানোর বেদনা ভুলতে পারি না

আব্দুল্লাহ আল ওয়াহিদ

২. ভূমিকা

আল্লাহ মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব করে সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের এই মর্মবাণী তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা আল্লাহর পাকের হুকুম, আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলেন। ইসলামের সত্য, সুন্দর, সহজ-সরল পথ যারা অনুসরণ, অনুকরণ করেছে এবং একনিষ্ঠভাবে মেনেছেন তারাই শ্রেষ্ঠ। তাদের কাজ-কর্মে কষ্ট পায় না কোনো আদম সন্তান। নির্যাতিত হয় না কোনো জীব, চিন্তিত হয় না কোনো মানবতা। এ ধরনের মানুষই শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকে কুরআন বলছে– 'বালহুম আদাল' অর্থাৎ মানুষ তার কর্মের কারণে চতুষ্পদ পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট। রাসুল (সা.) কে অনুসরণ না করে আবু জেহেল, আবু লাহাবকে যারা অনুসরণ, অনুকরণ করেছে তারাই এই আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইসলামই কর্মের কারণে মানুষকে শ্রেষ্ঠ আর নিকৃষ্ট বলেছে। মানুষ সম্পর্কে নেগেটিভ-পজেটিভ আলোচনার রহস্য উদঘাটন করা প্রয়োজন। আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করে মানুষের জন্য কুরআন দিয়েছেন জীবন পরিচালনার জন্য। যারা রাসুল (সা.) কে অনুসরণ করে সৎ আমল করবে তারাই শ্রেষ্ঠ আর যারা কুরআন অনুসরণ করবে না তারাই নিকৃষ্ট। অনুরূপভাবে রাসুল (সা.) হতে আজ পর্যন্ত যে সব নেতা আছেন তারা দু'ভাগে বিভক্ত। যারা কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করে কর্মীদের পরিচালনা করেন তারাই শ্রেষ্ঠ আর যারা কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ না করে পরিচালনা করে তারাই নিকৃষ্ট। বাংলাদেশ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা মৌলিক দু'টি ভাগে বিভক্ত। সুতরাং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বলতে পারি– একদল নেতাকর্মী শ্রেষ্ঠ আর অন্যদল নিকৃষ্ট।

সুপ্রিয় পাঠক, প্রশ্ন হলো ২৮ অক্টোবর '০৬ এর লগি-বৈঠা, গুলি-বোমার হামলাকারীরা কোন দলে?

২. লগি-বৈঠার তাণ্ডবকারীদের পরিচয়

লগি-বৈঠা, গুলি-বোমার তাণ্ডবকারীদের পরিচয় হলো– ওরা 'আওয়ামী লীগ'।

স্বত:সিদ্ধ প্রমাণ : আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনার ঘোষণা- 'লগি-বৈঠা ছাড়া আসবেন না।'



icsbook.info

লগি-বৈঠার তাণ্ডবকারীদের পরিচয় জানার পর এবার তাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরবো। তাদের অতীত ইতিহাস আলোচনা করা হবে এবং ভবিষৎ কাজ-কর্ম তাদের কি হতে পারে তা আপনারা মন্তব্য করবেন।

প্রকৃত পক্ষে তাদের ধর্ম কি তা আজ জানা প্রয়োজন। তারা যে দেশদ্রোহী, মানবতার শত্রু ও ইসলাম বিরোধী তার স্বপক্ষে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরা হলো–

১. জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের সাথে সাক্ষাত করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করা এবং বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতায় জাতিসংঘের সমর্থন আদায়।
২. আমেরিকান কংগ্রেসের বাংলাদেশ ককাস এবং ইন্ডিয়ান ককাসের কাছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াসহ বাংলাদেশ সরকারকে সকল প্রকার সাহায্য বন্ধের অনুরোধ করা এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।
৩. সমস্ত দাতাদেশকে বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে বন্ধ করার জোর প্রচেষ্টা চালনা।
৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন এনজিওকে সাহায্য করে তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রিপোর্ট তৈরি করে দাতাদেশসমূহকে দেয়া।
৫. ভারত সরকারকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নেয়ার জন্য বলা।
৬. আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ ভেঙ্গে পৃথক রাষ্ট্র 'নতুন বাংলা' নামে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৫টি জেলাকে নিয়ে হোমল্যান্ড আন্দোলন শুরু করেছে। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আওয়ামী চক্রান্তের সার্বিক সহযোগিতা করছে ভারত।
৭. দেশদ্রোহীতার আর একটি নমুনা, গত ২৫ অক্টোবর ২০০৫ আওয়ামী লীগের সেমিনারে বক্তারা জোরালো ভাষায় বলে– 'বাংলাদেশের মৌলবাদ উৎখাতে আওয়ামী লীগ বিদেশী যে কোনো শক্তিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।'
৮. ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে ফেলা। এরই অংশ হিসেবে পরিকল্পিতভাবে সারাদেশে গার্মেন্টস এ হামলা, জ্বালাও-পোড়াও, অবরোধ, ভাঙচুর, লুটপাট করা।
৯. মসজিদের আজানকে তারা বেশ্যার খদ্দের ডাকার সাথে তুলনা করেছিল।
১০. কোথাও কোথাও কোরআনকে তারা ডাস্টবিনে, ময়লায় ফেলে অপমান করেছিল।
১১. প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা) অনুষ্ঠানে আল্লাহ আকবার বলে ধ্বনি দেয়া যাবে না বলে নির্দেশ জারি করে।
১২. নির্বাচনের সময় কুকুরের মাথায় টুপি পরিয়ে এলাকায় প্রদর্শন করা হয়।
১৩. টাকার ওপর থেকে মসজিদের ছবি তুলে দিয়ে শেখ মুজিবের ছবি সংযোজন করা হয়।
১৪. পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে শেখ হাসিনা কপালে সিঁদুর পরেছিল।
১৫. কবি নজরুল ইসলাম কলেজের ইসলাম বাদ দিয়ে কবি নজরুল কলেজ করেছিলেন।
১৬. ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে মুসলিম বাদ দিয়ে ফজলুল হক হল করা হয়।
১৭. সংবিধান থেকে তারা বিসমিল্লাহ বাদ দিয়েছিল।
১৮. ঢাকা শহরে ৩৬০টি মূর্তি তৈরি করে মসজিদের শহরকে তারা মূর্তির শহরে পরিণত করেছিল।

সচেতন নাগরিক, আপনারাই আওয়ামী লীগের অতীত ইতিহাস দেখে বলুন, তাদের ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি কি হতে পারে?



icsbook.info

## ৩. আওয়ামী গোষ্ঠীর হামলা :

১৯৯৬ সালে আওয়ামী বাকশালী ধর্মনিরপেক্ষ একটি সরকর ক্ষমতায় বসে। ক্ষমতায় বসেই তারা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ধ্বংসের প্রক্রিয়াশুরু করে। যার ফলে নেমে আসে দাড়ি-টুপিওয়ালাদের ওপর নির্মম অত্যাচার। দেশ ধ্বংসের নীল নকশা হিসেবে তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের জুলাই পর্যন্ত আওয়ামী দুর্বৃত্তরা দেশে ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করে যা ইতিহাসে নিষ্ঠুর এক কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। যার অংশ বিশেষ হলো–

ক) অর্থনীতির বিপর্যয় অবস্থা।

খ) শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলা।

গ) আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি।

ঘ) রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অত্যাচার।

ঙ) নজীরবিহীন আত্মীয়করণ ও দলীয়করণ।

চ) বিভিন্ন চুক্তির নামে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা।

ছ) হত্যা, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাই বেড়ে যায়।

আওয়ামী ব্যর্থতায় ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণ কল্পেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে চারদলীয় জোট গঠনপ্রক্রিয়াশুরু হয়। ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে চারদলীয় জোট গঠন ও যাত্রা শুরু করে। জোট সরকার সফলভাবে দেশ পরিচালনা করে দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করে। আইন-শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ব্যবস্থার চরম উন্নতি ও মজবুত অর্থনীতির ভীত গঠনসহ সকল দিকে উন্নতি, অগ্রগতির ছোঁয়া লাগে।

অত:পর জোট সরকার মেয়াদ শেষ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় আওয়ামী ১৪ দলীয় জোট হিংসার বশবর্তী হয়ে সুস্থ অর্থনীতিকে তারা সহিংস রূপ দিতে উঠে পড়ে লাগল। দেশে যে গণতান্ত্রিক সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় ঈদের ৩ দিন পর জোট সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কেয়ারটেকার সরকারের কাছে। শান্তিপ্রিয় মানুষ যখন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক সে সময়ই এক অজানা আশঙ্কা ভর করে সবার মনে।

রেওয়াজ অনুযায়ী ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্য বিদায়ী ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। ঠিক তারপরই পরিকল্পিতভাবে সারা দেশে সৃষ্টি করা হল এক চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। ঢাকা শহরে এক অদ্ভূত থমথমে নীরবতা, গ্রাম-গঞ্জে আটকেপড়া শহরমুখী মানুষ এক অবর্ণনীয় দুশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে। সরকার বদলের দিন কেন এই নিষ্ঠুরতা। ৫টি বছর আন্দোলনে ব্যর্থ ও জনগণের সমর্থন নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে ব্যর্থ হয়েছে আওয়ামী লীগ। তাদের চিন্তাধারা সফল জোট সরকার সফলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে ও পরবর্তী নির্বাচন হলে তাদের স্থায়ীভাবে কবর রচনা হবে বিধায় তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। তারা নির্বাচন না করে বানচালের পথ বেছে নেয়। শুরু করে হাঙ্গামা। মসনদ না পাওয়ার বেদনায় হায়েনার মতো মানুষ খেকো আওয়ামী গোষ্ঠী রাজপথ রঞ্জিত করার প্রক্রিয়াশুরু করে। ফলে সংগঠিত হয়, ২৮ অক্টোবর '০৬। ■



icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর ২০০৬ স্মরণে

আফরোজা খাতুন হীরা

দিনটি ছিল ২৮ অক্টোবর ২০০৬। দিনটি আমার জীবনে এতো বেশি স্মরণীয় যে মনে হলে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ি। নিজেকে সামলানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ ঐ দৃশ্য আমার জীবনে কখনো দেখিনি। আশা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আর কখনো দেখাবেন না।

সেদিন ছিল প্রতিটি দলের নিজস্ব মিটিং। কোন বা কারও প্রতি বিদ্বেষ বা কারও কোন দোষ ত্রুটি প্রচার করার উদ্দেশ্য নয়। নিজস্ব দলের বিগত বছরের কার্যাবলী ভালো মন্দেও পর্যালোচনা এবং আগামী দিনগুলোর কাজের ধারা, কি করতে হবে, কি করা উচিত, এই লক্ষ্যেই ছিল এই মিটিং।

রমজানের ঈদে বাড়ি গিয়েছিলাম ২/১ দিন পরেই ফিরে এলাম। কারণ জামায়াতের প্রতিটি কর্মীকে মিটিং-এ অংশগ্রহণ করতে হবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। ২৮ অক্টোবর বিকাল ৩টায় সবাইকে যেতে হবে। কিন্তু হঠাৎ সকাল ৯টায় কেন্দ্র থেকে সংবাদ আসলো জামায়াতের সকল রুকন ভাইকে সকাল ১০টায় সমাবেশ স্থলে পৌঁছাতে হবে। আমার স্বামী জামায়াতের রুকন, সংবাদ পাওয়ার পরপরই অন্য রুকন ভাইদের সংবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি গোসল সেরে গন্তব্যস্থলে চলে গেলেন। সারাদিন গেছে, হঠাৎ বিকাল ৫টায় জামায়াত কর্মী বাহাদুর মোবাইল করে জানালো বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট থেকে পল্টন মোড় পর্যন্ত অবস্থা খুব খারাপ। ভিষণভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীরা জামায়াতের মিটিং-এর উপর হামলা করেছে, দোয়া করবেন। ফোন পাওয়ার পর চিন্তা করলাম কেন তারা হামলা করেছে? এ প্রোগ্রাম তো কারও বিরুদ্ধে নয়। এটা যার যার পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় নিজের দলের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনার উপর আলোচনা হবে। বুঝতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ পর নিজেই আবার আমার ছোট ভাই মাহবুবকে (জামায়াতের রুকন) ফোন করলাম। কিরে কি হয়েছে? ও বললো, আপা এখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন। ব্যাপারটা আমার কাছে প্রশ্ন বোধক হয়ে দাঁড়ালো। পরবর্তীতে আবারও জামায়াত কর্মী বাহাদুরের কাছে ফোন



icsbook.info

করলাম। বাহাদুর জানালো অবস্থা খুবই খারাপ চলছে, দোয়া করেন। কাকা অর্থাৎ আমার স্বামীর কথা বল্লো ভালো আছে, আমার কাছেই আছে। এর ভেতরে একজন এসে বল্লো TV তে পল্টন মোড়ের ঘটনা দেখাচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম না, কারণ নিজের ঘরে TV নেই। যার কারণে অতটা গুরুত্ব দিয়ে বুঝে উঠা সম্ভব হলো না। মাগরিবের নামাজ পড়ে আমাদের উপরের ৫ তলায় গেলাম TV তে কি দেখাচ্ছে তা দেখার জন্য। সেখানে খবর পড়ার মাঝে একটুখানি কেবল দেখলাম একটা ছেলেকে লাঠি দিয়ে পেটানো হচ্ছে। দৃশ্যটা তখনও অনুধাবন করতে পারিনি কারা কাকে এভাবে নির্দয়ভ্রাবে পেটাচ্ছে। এরই মধ্যে খবর পেলাম আমার স্বামী ফিরে এসেছেন। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলাম। এসে দেখি উনার হাঁটু এবং আঙ্গুলে ইটের আঘতে ফেটে গেছে। জিজ্ঞাস করলাম কিভাবে কেমন করে লাগলো? উনি আমাকে কিছু ঘটনা বলেন এবং বল্লেন খুব কষ্টে অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা এতটা ভয়াবহ পর্যায়ে গেছে, এতগুলো ছেলে সকালবেলাই এভাবে শহীদ হয়ে গেছে। আর আমার স্বামী নিজেও আহত হয়েছেন, তিনিও অতটা জানতে পারেননি। পরের দিন খবরের কাগজ পেলাম। খবরের কাগজে বিস্তারিত জানতে পারলাম এবং খবরের কাগজের ছবিগুলো দেখলাম। খবরের কাগজ পড়ার পর ছবি দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। নিজেকে বুঝ দিতে পারছিলাম না। বারবার আল্লাহর রব্বুল আলামিনের কাছে এদের জন্য দোয়া করলাম ও বিচার চাইলাম। এর ২/১ দিন পর আমার ছেলে ঐ পল্টনের ঘটনার দৃশ্যের CD নিয়ে এসে কম্পিউটারে দেখার সুযোগ করে দিল। দৃশ্যগুলো কিছুটা দেখার পর ভালোভাবে আর দেখতে পারছিলাম না। কারণ ঐ দৃশ্য আমাকে এতটা ব্যথিত করে তুলেছিল যে, চোখের পানির ধারাকে কিছুতেই রোধ করতে পারছিলাম না। আর দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। শুধু চিন্তা করছিলাম, হে আল্লাহ! যারা পিটাচ্ছে এরা কি মানুষ? মানুষ মানুষকে এভাবে পিটিয়ে হত্যা করতে পারে? এরা কোন মায়ের সন্তান? যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নেই। আর বারবার মনে প্রশ্ন হচ্ছিল, হে আল্লাহ! ওখানে একজন বিবেকবান মানুষও কি ছিল না যে ঐ ধরনের মারের অবস্থাকে বাধা দেবার মতো। যখন দেখলাম ছেলেটা মার খাচ্ছে এবং একবার চিৎ একবার উপর হচ্ছে, তখন বারবার মনে হচ্ছিল, আহা! কি কষ্ট বুকের মধ্যে চেপে আজ সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওর মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে– ঐ দৃশ্য দেখছি আর ওর কষ্ট যেন আমার বুকের মাঝে লাগছে। নিজেকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলাম না।

এরই মধ্যে আমাদের হজ্বে যাওয়ার সময় হয়ে এলো। হজ্বে যাওয়ার আগের রাতে থানা আমীর ভাই-এর কাছে ফোন করলাম সুষ্ঠুভাবে যাতে হজ্ব পালন করে দেশে ফিরে আসতে পারি। থানা আমীর ভাই আমাদের জন্য দোয়া করলেন আর আমাকে বল্লেন দেশের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতে। তিনি আমাকে না বল্লেও আমার মনে তখন থেকে পরিকল্পনা ছিল হজ্বে যেয়ে আল্লাহর ঘরের অর্থাৎ কাবার সামনে বসে আমি দোয়া করবো দেশের জন্য, আমার কলিজার টুকরা শহীদ ছেলেদের জন্য। পরিকল্পনা অনুযায়ী মদীনা ও মক্কাতে আরাফাতের ময়দানে দোয়া করেছি শহীদ ছেলেদের জন্য, অসুস্থ অবস্থায় যারা হাসপাতালে পড়ে আছে তাদের জন্য, নিজের ও নিজের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজনের জন্য। কিন্তু ওদের জন্য দোয়া করেছি অনেক আবেগ অনুভূতি নিয়ে।



icsbook.info

২৮ অক্টোবরের শহীদ ও আহতদের জন্য যখনই হাত তুলেছি ঐ ঘটনার দৃশ্য আমাকে বিচলিত করেছে, অন্তরের অন্তরস্থল থেকে ওদের জন্য দোয়া করেছি, কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছি। একটাই দোয়া ছিল, হে আল্লাহ তাদেরকে তুমি শহীদ হিসাবে কবুল করে নাও আর জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করো। তাদের এই রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশে তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করে দাও। আর ঐ সন্তানের মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রীদের ধৈর্য্য ধরার তৌফিক দাও।

যখন পথে পথে ওদের ছবিসহ পোস্টারগুলো দেখি তখন আমার সন্তানের কথা মনে হয় যে, আমার ছেলেটা যদি এভাবে কষ্ট পেত আমি কি ধৈর্য্য ধরতে পারতাম? ঐ সব মায়ের কথা যখন মনে পড়ে তখন যেন মনে হয় ওরা ওদের সন্তান নয় ওরা যেন আমার সন্তান। কারণ নিজেকেই সংযত করতে পারছি না আমি আর যাদের কলিজার টুকরা ছেলে চলে গেলো তারা কিভাবে ধৈর্য্য ধরছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাদেরকে শহীদের পিতা মাতার মর্যাদা দান করেন ঐ দোয়া করি। পরিশেষে একটি হাদিস লিখে শেষ করতে চাই যেটা আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

'রাসূল (সা.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তিকে কোনো ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে মারে, গালি দেয় বা মিথ্যা অপবাদ ছড়ায় তবে দুনিয়াতে ঐ ব্যক্তির ঐ অবস্থা না হওয়া ছাড়া মৃত্যু হবে না' –(বোখারী)।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার দ্বীনকে বোঝার আমল করার এবং আল্লাহর জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার কাজে প্রচেষ্টা করার তৌফিক দিন, আমীন। আর ঐ দিনের লোকগুলোকে হেদায়াত করুন, যারা ছেলেদেরকে শহীদ করেছে। আর হেদায়াত যদি ওদের কপালে না থাকে তবে দুনিয়াতে আল্লাহ তাদের পরিণতি দেখার সুযোগ করে দিন। আমীন। ■



icsbook.info

# সংবাদপত্রে ২৮ অক্টোবর

রফিক রুমান

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতার ভয়াবহতম দিন ২৮ অক্টোবর ২০০৬। একজন নেত্রীর একটি ঘোষণা এবং তা বাস্তবায়নে অনুগত-উৎসাহী কর্মীদের ভূমিকা পালন-এর মধ্যদিয়ে ইতিহাসের যে কালো অধ্যায় সেদিন রচিত হলো তা বাংলাদেশকেই শুধু নয়; পুরো বিশ্ববিবেককে দংশন করেছে। ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া মানুষকে সরাসরি দেখিয়েছে পল্টনের সেই বিভৎসতা। মানুষ শিউরে উঠেছে, অনেকেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি। মানুষকে পিটিয়ে মারছে আর একজন মানুষ। নিস্তেজ হয়ে যাওয়া লাশের উপর উঠে উল্লাস প্রকাশ করছে। পিটিয়ে মারার পর মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য হাতের নাড়ি দেখছে। সেদিনের পল্টনের এই দৃশ্যপট সিনেমার দৃশ্যকেও হার মানালো।

বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়া এই ঘটনা এদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র এবং সাংবাদিককে নাড়া দিতে পারেনি। আমরা জানি প্রত্যেকটি সংবাদপত্রেরই একটি নিজস্ব নীতি (Policy) থাকে এবং তাতে কর্মরত সাংবাদিকদের ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সেই নীতিমালা মেনে চলতে হয়। কিন্তু সেখানে দলের চেয়ে দেশ বড় হয়ে উঠে, পক্ষ-বিপক্ষের প্রশ্নের চেয়ে সত্যবোধ বড় হয়ে দেখা দেয়, পত্রিকার নীতির চেয়েও মনুষ্যত্ববোধ আর মানবিকতার দাবি সামনে চলে আসে, তখন পেশার চেয়ে নৈতিকতাকেই বেশি মূল্য দেয়া উচিত। আমাদের দেশে এটি কখনোই দেখা যায় না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে এখানে চলে স্বেচ্ছাচারিতা। তথ্য সন্ত্রাসের অবাধ বিচরণক্ষেত্র আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ। ২৮ অক্টোবরের ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রগুলো তাদের স্বাধীনতাকে আরো একবার প্রমাণ করলো– 'ঘটনা যাই হোক এবং যেভাবেই ঘটুক জামায়াত-শিবিরের বিরোধীতা করতেই হবে'। পল্টনের ঘটনায় জামায়াত-শিবিরের পাঁচজন নিহত হলো। অথচ বলা হলো– জামায়াতের মিছিল থেকে বৃষ্টির মতো গুলি করা হয়। আওয়ামী লীগ তথা ১৪ দলের লাঠি-বৈঠার আঘাতে যদি জামায়াত-শিবিরের পাঁচজন নিহত হয় তাহলে জামায়াত-শিবিরের বৃষ্টির মতো গুলি



icsbook.info

বর্ষণে তো তাদের পাঁচ শতাধিক নিহত হওয়ার কথা ছিল। বৃষ্টির মতো গুলি কোথায় গিয়ে আঘাত হানলো?

সাংবাদিকদের মতো এদেশে আরো দু'টি শ্রেণী আছে, যারা একই সুরে কথা বলেন। তারা হলেন বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং মানবাধিকার সংস্থা। বুদ্ধির দৌড়ে যারা সব সময়ই নিজেদেরকে একধাপ এগিয়ে রাখেন, সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা পান থেকে চুন খসলেই বুদ্ধির যাবতীয় কলা-কৌশল নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পত্রিকায় বিবৃতি, উপ-সম্পাদকীয় লিখে ঝড় তোলার চেষ্টা করেন। ২৮ অক্টোবরের ঘটনায় তাদের কাউকেই সরব হতে দেখা যায়নি। একই রকম রহস্যজনক নিরবতা পালন করেছে এদেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলো। রাস্তার ক্রসফায়ারে কোনো চিহ্নিত সন্ত্রাসী মারা গেলেও এরা কলম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিবৃতি, মানববন্ধন আরো কত কি? সেই বিবৃতি আর মানববন্ধনের ছবি তথাকথিত প্রগতিশীল পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় স্থান পায়। ক্রসফায়ারে কোনো সন্ত্রাসীকে মারা মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে লাঠি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মীকে মারা মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? অথচ একটি মানবাধিকার সংস্থাও ২৮ অক্টোবরের ঘটনায় কোনো বিবৃতি প্রদান করেনি। এটি দু:খজনক।

২৮ অক্টোবরের ঘটনা দৈনিক পত্রিকাগুলো যেভাবে উপস্থাপন করেছে–

* পল্টন রণক্ষেত্র জামায়াত শিবিরের সশস্ত্র তাণ্ডব– (দৈনিক আমাদের সময়, ২৮ অক্টোবর ২০০৬)
* অবরোধের জনতার অভ্যুত্থান (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ অক্টোবর ২০০৬) খবরে বলা হয়– চৌদ্দ দলের অবরোধ কর্মসূচি সারাদেশে গণঅভ্যুত্থান রূপ নিয়েছে। এমন রক্তাক্ত সংঘাতমুখর সহিংস পরিস্থিতি বাংলাদেশ অনেকদিন দেখেনি।'
* লাঠি-বৈঠা-লগি দিয়ে হাসানকে প্রতিহত করলো ১৪ দল। প্রাথমিক বিজয়ে মুক্তির স্বাদ। (জনকণ্ঠ, ২৯ অক্টোবর ২০০৬)
* দৈনিক ইনকিলাব এর একটি শিরোনাম- রাজপথে জামায়াত-কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন; গুলি (২৯ অক্টোবর ২০০৬)। খবরে বলা হয়, ... প্রকাশ্যে জামায়াতের কর্মীরা অস্ত্র উঁচিয়ে কয়েকশ' রাউন্ড গুলি চালায়...।
* প্রথম আলোর একটি রিপোর্টে বলা হয়– 'স্বাধীনতার পর গতকালই প্রথম খোদ রাজধানীতে প্রকাশ্য রাজপথে অস্ত্র উঁচিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে ডানপন্থী ইসলামী দল জামায়াত ও এর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির।' (২৯ অক্টোবর ২০০৬)।
* ঘটনার পরের দিন ২৯ অক্টোবর দৈনিক ভোরের কাগজে মুনতাসীর মামুনের একটি মন্তব্য প্রতিবেদন ছাপা হয়। শিরোনাম 'আন্দোলন মাত্র শুরু, সাফল্য অনেক দূর।' মুনতাসীর মানুন কি লাঠি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ মারাকে আন্দোলনের শুরু হিসেবে দেখেছেন? তাহলে কি আওয়ামী লীগের আন্দোলন মানেই মানুষ খুন?
* ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আওয়ামী ঘরানার দু'টি পত্রিকার স্ববিরোধীতা চোখে পড়ার মতো। জনকণ্ঠের প্রথম পাতায় একটি রিপোর্টে বলা হয়– 'সম্পূর্ণ বদলে



icsbook.info

গেছে পুলিশ, চারদলীয় জোটের ক্ষমতা ত্যাগের মুহূর্তে তাদের বদলে যাওয়ার চরিত্রটি সর্বমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, বিরোধী দলের উপর তারা মারমুখী অবস্থানে নেই।.... শনিবার রাজপথে নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে সংঘর্ষ সংঘাতের এই চিত্র দেখেছে পুলিশ।' অন্যদিকে একই ঘটনার বর্ণনায় প্রথম আলোর রিপোর্টে বলা হয়– .... এ সময় পুলিশও আওয়ামী লীগের কর্মীদের লক্ষ্য করে বেপরোয়া গুলি ছোড়ে। এতে আওয়ামী লীগের শতাধিক কর্মী আহত হন। আহত হন কয়েকজন সাংবাদিক ও সাধারণ পথচারি।'

* এই হলুদ সাংবাদিকতা এখানেই থেমে থাকেনি। ২৮ অক্টোবর ঘটনার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ১১ নভেম্বর ২০০৬ দৈনিক জনকণ্ঠে আর একটি রিপোর্ট ছাপা হয়। শিরোনাম 'বিচ্ছৃঙ্খলা নৈরাজ্য সৃষ্টির গোপন নীলনকশা ফাঁস।' রিপোর্টে বলা হয়, গত ২৮ অক্টোবর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের ভেতরে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের জড়ো করা হয়। বিরোধী দলের অবরোধ কর্মসূচির ওপর হামলা করায় তারা। বিশেষ সংস্থার নেতৃত্বে জঙ্গি, সন্ত্রাসী শিবির ক্যাডারদের দিয়ে বিরোধী দলের ওপর হামলা চালায়। আরো বলা হয়– জামায়াত নিজেরাই লোক দিয়ে তাদের কর্মীকে পিটিয়ে মেরেছে।' এটি শুধু হাস্যকরই নয়; চরম অরুচিকরও বটে।

এই রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে সাংবাদিকতার মতো এই মহৎ পেশাটির নেতিবাচক এবং উদ্দেশ্যপ্রোণিদত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোথাও বলা হলো– পল্টনে জামায়াত শিবিরের সশস্ত্র তাণ্ডব। অথচ অসংখ্য অগণিত মানুষ দেখেছে এই তাণ্ডব কারা চালিয়েছে। বলা হয় জনতার অভ্যুত্থান। আওয়ামী লীগ মানেই কি জনতা? তারা তো এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নয়। মানুষকে পিটিয়ে মেরে যারা তথাকথিত 'গণঅভ্যুত্থান' ঘটায় সেখানে কোনো অবস্থাতেই জনতার অংশগ্রহণ থাকতে পারে না। বলা হলো- এটি প্রাথমিক বিজয়। মানুষকে রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে যারা বিজয় উৎসব করে, তাদের সাথে এদেশের মাটি ও মানুষের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। বলা হয়– জামায়াতের মিছিল থেকে কয়েকশ' রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়। কিন্তু এই কয়েকশ' রাউন্ড গুলি কোথায় গিয়ে আঘাত হানলো সে হিসেব পত্রিকাগুলো দিতে পারেনি।

২৮ তারিখের ঘটনা নিয়ে যে কয়েকটি পত্রিকা হলুদ সাংবাদিকতা করতে চেয়েছে, তারা চিহ্নিত। এ সমস্ত পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট হলো জামায়াত শিবিরের বিরোধীতা করা। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে মনগড়া রিপোর্ট তৈরি করে এরা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। অথচ শিবিরের হাজারো ভালো কাজ এদের চোখে পড়ে না। কোনো কোনো পত্রিকা মাদক এবং এইডস সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধির জন্য নানা কর্মসূচি হাতে নেয়। মাদক বিরোধী কনসার্টের আয়োজন করে। আর সেই কনসার্টে যারা গান গায়, তাদের অধিকাংশই হয় মাদকাসক্ত। ছাত্রশিবিরের কাছ থেকে ঐ পত্রিকার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কোনো কনসার্টের প্রয়োজন হয় না। ছাত্রশিবির তার লাখ-লাখ কর্মীকেরকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে, যেখানে একজনকর্মীকে মাদকাসক্ত হিসেবে পাওয়া যাবে না। শিবির কর্মীদের সুশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং তাদের অসংখ্য ইতিবাচক কর্মসূচি এসব পত্রিকায় স্থান পায় না।



icsbook.info

কিছু পত্রিকা পল্টনের ঘটনার নিরপেক্ষ বর্ণনা দিয়েছে :

'১৪ দলের কর্মীরা মুজাহিদকে তুলে পল্টন মোড়ে এনে বৈঠা ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এবং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। এক পর্যায়ে ১৪ দলের শত শত নেতাকর্মী নিহত মুজাহিদের লাশকে ঘিরে উল্লাস করে এবং বৈঠা ও লাঠি উঁচিয়ে 'হই হই রই রই জামায়াত শিবির গেলি কই' বলে স্লোগান দেয়। (দৈনিক আমার দেশ ২৯ অক্টোবর ২০০৬)।

'দুপুর সোয়া ১২টার দিকে আওয়ামী কর্মীরা মুক্তাঙ্গনের দিকে এসে জামায়াতের অবস্থানের দিকে গুলিবর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হতে থাকলে গুলিবিদ্ধ হয়ে জামায়াতের দু'জন নিহত হয়।' (নয়া দিগন্ত ২৯ অক্টোবর ২০০৬)।

'বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে জামায়াতের সমাবেশস্থল পর্যন্ত আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। তারা তিনজন শিবির কর্মীকে প্রহার ও কুপিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে রাস্তায় ফেলে রাখে।' (দৈনিক ইত্তেফাক ২৯ অক্টোবর ২০০৬)

২৯ অক্টোবর দৈনিক দিনকালের একটি রিপোর্টের শিরোনাম 'হাসিনার লাঠি বৈঠার উপহার ১৭ লাশ।'

৩০ অক্টোবর দিনকালের আর একটি রিপোর্টের শিরোনাম 'এর জবাব দেবে কে?' রিপোর্টে বলা হয়- 'কী বীভৎস দৃশ্য! কী নৃশংসতা। একটি মানুষকে রাস্তায় ফেলে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে মেরে ফেললো আর কতগুলো মানুষ(?) লাঠি-বৈঠা হাতে যারা রাস্তায় পড়ে যাওয়া লোকটাকে পেটাচ্ছিল, অনেকেই প্রশ্ন করেছেন ওরা আসলে মানুষ কিনা। একজন মানুষকে এভাবে পিটিয়ে হত্যার দৃশ্য দেখে বিবেকবান মানুষ শিউরে উঠেছেন। সবার মনেই প্রশ্ন জেগেছে, কেন এই বর্বরতা, কেন এই পাশবিক আচরণ? কেন এই লাশ উপহার? কে বহন করবে এই লাশের বোঝা?'

পল্টনের নৃশংসতা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। ন্যূনতম মনুষ্যত্ববোধ যাদের আছে, তারা সবাই কেঁদেছে নব্য রক্ষীবাহিনীর এই বর্বরতা দেখে। শহীদ মুজাহিদের ছোট্ট বোন মালিহার শুধু নয়, প্রত্যেকটি বিবেকবান ব্যক্তিরই জিজ্ঞাসা– মানুষ মারার এ কোন রাজনীতি?

১২ নভেম্বর ২০০৬ দৈনিক সংগ্রামের একটি রিপোর্টের শিরোনাম– 'আরও এক কোমলমতি ছাত্রের প্রতিক্রিয়া, এভাবে লোক মেরে কি ভোট নেয়া যায়।' রিপোর্টটি এখানে তুলে ধরা হলো–

পল্টনে শিবির নেতা মুজাহিদ হত্যাকাণ্ড টিভিতে দেখে গতকাল শনিবার 'আরও এক কোমলমতি স্কুল ছাত্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তার নাম ফাহিম। ঢাকার একটি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ছোট্ট মানুষটি অনভ্যস্ত হাতে অনেক ব্যথা নিয়ে লেখা অভিব্যক্তি পত্রে গত ২৮ অক্টোবর রাজধানীতে আওয়ামী লগি-বৈঠা বাহিনীর খুনের নেশায় উন্মত্ততাকে ঘৃণা জানিয়েছে। ইতোপূর্বে খুলনার দু'স্কুল ছাত্রী অনুরূপ প্রতিক্রিয়া করে যা সর্ব মহলে নাড়া দেয়। কচিপ্রাণ ফাহিমের দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক বরাবরে পাঠানো ফ্যাক্স বার্তাটি এমন, 'গত ২৮ অক্টোবর আমার আব্বু-আম্মুর সাথে সন্ধ্যায় যখন



icsbook.info

টেলিভিশন দেখি তখন খবরে দেখলাম রাস্তায় এক লোককে বৈঠাপেটা করা হচ্ছে। তাকে মারছে কেন? আব্বু বলল, যাকে মারছে সে ইসলামী দল করে, আর যারা মারছে তারা আওয়ামী লীগ (লীগ) দল করে। আব্বুকে বললাম, তাতে কি হয়েছে? আব্বু কোনো উত্তর দিল না। খালি বললেন, ভোটের জন্য মারছে। সামনে ভোট তো তাই। আব্বুকে বললাম, এভাবে মানুষ মারলে তো লোকে ভোট দেবে না।'

সাত কি আট বছরের শিশু ছেলেটি বার্তাটিতে আরো উল্লেখ করেছে, তার আম্মু আওয়ামী লীগের সমর্থক হলেও ঐ বর্বর লাঠিপেটার দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে টিভি বন্ধ করে দেন এবং পরপরই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সুস্থ করে তোলার পর আম্মু কাঁদতে কাঁদতে আর কোনো দিন আওয়ামী লীগে ভোট দেবে না প্রতিজ্ঞা করে।

সে সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে বলেছে, 'আমি সেদিন (২৮ অক্টোবর) অনেক মোন (মন) খারাপ করেছিলাম। আমার অনুরোদ (অনুরোধ) আমার মতো যারা ঐদিন টেলিভিশনের ঐ ছবি দেখেছে তারা জেন (যেন) কোনদিন ঐ দলে (আওয়ামী লীগে) যোগ না দেয় এবং ভোট না দেয়।' ■



icsbook.info

# সন্ত্রাস মানবতার শত্রু

সৈয়দ আবুল হোসেন

সভ্যতার আদি যুগে মানুষ নাকি গুহায় আর জঙ্গলে বসবাস করতো। কারণ তখনও শিক্ষা ও সভ্যতার ছোঁয়া নাকি মানুষকে স্পর্শ করেনি। বর্বরতা ও ইতরামি তাই নাকি ছিল সে সময়ের মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। জঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত ছিল জংলিতন্ত্র। যুক্তি, আইন, চরিত্র ও মূল্যবোধের পরিবর্তে শক্তি প্রদর্শন ও পৈশাচিকতাই ছিল শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। কিন্তু সেসময় এখন এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির বদৌলতে মানুষের মন মানসিকতার আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের মূল্যবোধ, মানুষের মনুষ্যত্ব আজ অনেক বেশি বিকশিত। সমাজ, রাষ্ট্র, আইন, আদালত, গণতন্ত্র, মানবতাবাদ, স্বাধীনতা আজকের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, সভ্যতার অনিবার্য অনুষঙ্গ। কোন শিক্ষিত, বিবেকবান, মার্জিত রুচির মানুষই এতসব অর্জনকে বিসর্জন দিয়ে আবার জংলি যুগের জংলিতন্ত্রে ফিরে যেতে চাইবেন না, বরং আমরা সে বর্বর যুগ, জংলি যুগকে এখন আর স্বীকার করতে চাই না, তাকে অস্বীকার করতে চাই, ইতিহাসের পাতা থেকে ধুয়ে-মুছে তাকে তুলে দিতে চাই। অবশ্য চাইলেও আমরা তা কখনো অস্বীকার করতে পারবো না, কারণ আমাদের মধ্যেই মানুষ নামের কিছু নরপশু ঠিকই জানান দিয়ে যাবে আমাদের জংলি ইতহাসের সেই অস্তিত্বের কথা। এদের নিয়ে সভ্য সমাজ খুব বেশি চিন্তিত নয়, কারণ সভ্য মানুষের সমাজে মানুষরূপী ইতরের সংখ্যা সব সময়ই থাকে একটি সহনীয় পর্যায়ে, সেখানে তারা কখনো মাথা উচুঁ করতে পারে না। কিন্তু কোন সমাজে এ ধরনের ইতর, বর্বর ও পাষন্ড লোকদের প্রভাব ও আধিপত্যই যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সে সমাজের পরিচয় নিয়ে সত্যি সত্যিই প্রশ্ন ওঠে।

মিডিয়ার কল্যাণে আওয়ামী বর্বরতার যে নজির সারা বিশ্বের মানুষ প্রত্যক্ষ করল, তার ফলে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, আমরা কি সত্যিই কোন সভ্য জগতে বাস করছি, নাকি কোন জঙ্গলে বাস করছি। অবশ্য, সেদিনকার ঘৃণ্য তান্ডব প্রত্যক্ষ করে বাংলাদেশসহ সভ্য জগতের সকল মানুষ হতভম্ব হলেও– প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষকে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে তার উপর পৈশাচিক নৃত্য করার ইতিহাস আওয়ামী লীগের নতুন নয়। এ দলটি সব সময়ই তার প্রতিপক্ষকে পেশী শক্তির মাধ্যমে মোকাবেলা করার চেষ্টা



icsbook.info

করেছে। জামায়াত-শিবিরের সাথে তাদের বিরোধ তো বহুদিনের পুরনো। কারণ, আওয়ামী লীগের পর জামায়াতই সবচেয়ে পুরনো দল। সেই ষাটের দশক থেকেই জামায়াত বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়,আর তখন থেকেই জামায়াতের সাথে যুক্তি, আদর্শ ও চরিত্রের লড়াইয়ে টিকতে না পেরে তাদেরকে পেশী শক্তির মাধ্যমে দমন করার চেষ্টা করেছে আওয়ামী লীগ। ১৯৭০ সালে মাওলানা মওদূদীর উপস্থিতিতে জামায়াত যখন প্রথম প্রকাশ্যে জনসভা করার চেষ্টা করে, তখন সে সভায় হামলা করে এমনিভাবে পিটিয়ে মানুষ মেরেছিল আওয়ামী লীগ। অথচ জামায়াতসহ গণতান্ত্রিক দলগুলোর আন্দোলনের কারণেই বন্দি দশা থেকে মুক্তির মুখ দেখতে পায় শেখ মুজিব। ১৯৬৯ সালে শিক্ষানীতি প্রশ্নে এক বিতর্ক সভায় তৎকালীন ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেকের ইসলামী শিক্ষার স্বপক্ষে ক্ষুরধার বক্তৃতা ও অকাট্য যুক্তির সামনে টিকতে না পেরে বিতর্ক সভা থেকে ফেরার সময় তৎকালীন ছাত্রলীগ ক্যাডার তোফায়েল আহমদ ও তার বাহিনী নির্দয়ভাবে তাকে পিটিয়ে মেরেছিল। এরপর স্বাধীনতার পরে জামায়াত-শিবিরকে তো রক্ত-পিচ্ছিল পথ বেয়েই অগ্রসর হতে হয়েছে। এ পর্যন্ত জামায়াত-শিবিরের প্রায় দুই'শ নেতা-কর্মীকে আওয়ামী-বাকশালীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে। একানব্বইয়ের নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসার জন্য আওয়ামী লীগ জামায়াতকে মন্ত্রীত্বসহ ক্ষমতার শরীক হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিএনপিকে নি:শর্ত সমর্থন দিয়েছিল জামায়াত। এরপর জামায়াতের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে তথাকথিত ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গঠন এবং অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে জংলি কায়দায় গণ আদালত ও আন্দোলন গড়ে তোলে। সে সময় জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে নির্মূল মার্কা জংলি রাজনীতির জন্ম দিয়ে চরম ফ্যাসিবাদের পরিচয় দিয়েছিল আওয়ামী লীগসহ বামপন্থি দলগুলো। "একটা-দুইটা শিবির ধর, সকাল-বিকাল নাস্তা কর; ধর রাজাকার, মার রাজাকার" এই ছিল তাদের রাজনীতির ভাষা। সে সময়ও বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেটে জামায়াতের জনসভা থেকে ফেরার পথে মতিঝিলের প্রকাশ্য রাজপথে শিবিরকর্মী মাদরাসাছাত্র সাইজুদ্দিন এবং আতিকুল ইসলাম দুলালকে একা পেয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিল আওয়ামী পাষন্ডরা। শুধু তাই নয়, মাদরাসাছাত্র সাইজুদ্দিনের বুকের উপর পা দিয়ে নির্দয়ভাবে লাথি দিয়ে দিয়ে তার গলা থেকে জিহ্বা বের করে ফেলেছিল মানুষ নামের এসব অমানুষগুলো। সে ছেলেটিরও বয়স ছিল খুবই কম। সে ছিল মাদরাসার নিরীহছাত্র। যারা তাকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছে, তাদের সাথে তার কোন শত্রুতা ছিল না। তার অপরাধ তার পড়নে ছিল পাজামা-পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি, তার চেহারা ছিল নিস্পাপ সরলতায় মাখা। কাজেই সে নিশ্চয়ই শিবির... এটিই যেন তার হত্যার শিকার হওয়ার জন্য ছিল যথেষ্ট। কেননা, কোন মারামারিও সেদিন হয়নি। জামায়াতের এটি জনসভা থেকে ফেরার পথে একা পেয়েই মানুষ নামের হায়েনারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে পিটিয়ে তাকে হত্যা করে। কিন্তু সে সময় কোন বেসরকারি টিভি চ্যানেল ছিল না, তেমনি জামায়াতের জনসভায় কোন টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাম্যানরাও সে সময় যেতো না। যার কারণে ঐ বর্বরতার কথা ঘটনাস্থলের গুটিকয় মানুষ ছাড়া আর জামায়াত-শিবিরের লোকেরা ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। এমনিভাবে আওয়ামী বর্বরতার আরো অসংখ্য পৈশাচিক হত্যাকান্ড ও বর্বরতার ইতিহাস গণমানুষের অগোচরে রয়েগেছে। তাছাড়া মিডিয়াগুলোর বেশিরভাগই



icsbook.info

জামায়াতবিরোধী হওয়ায় তারা জামায়েতের প্রতি কখনও সুবিচার করতে পারেনি। তা নাহলে দেশবাসী আরো অনেক আগেই আওয়ামী লীগের আসল চেহারাটা দেখতে পেতো। এই আওয়ামী লীগই সকল ভিন্নমত ও বহুদলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করে গণতন্ত্রের কবর রচনা করেছিল। এই আওয়ামী লীগই হত্যা করেছিল সিরাজ শিকদারসহ জাসদের ত্রিশ হাজার নেতা-কর্মীকে।

জঙ্গিবাদ নিয়ে মাঠ গরম করার চেষ্টা করেছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, জঙ্গিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে যে দলটির, তার নাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। জঙ্গিবাদিরা যেমন গণমতের কোন তোয়াক্কা না করে গায়ের জোরে তাদের মতামত জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তেমনি গায়ের জোরে তাদের নেত্রীর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষকে বাস্তবায়ন করতে চায়। এ ক্ষেত্রে গণমত, মানবাধিকার কোন কিছুরই তোয়াক্কা করে না তারা। বরং বর্বরতা ও ইতরতার যদি মাত্রা পরিমাপ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে জঙ্গি-বর্বরতা ও ইতরতার চেয়ে আওয়ামী বর্বরতা ও ইতরতা আরো বেশি ভয়াবহ, আরো বেশি জঘন্য।

জঙ্গি-বর্বরতার এটি সরলতা ও সততা রয়েছে । কারণ, ধর্ম-বিশ্বাসের সরলতার কারণে তারা যা কিছু ভাল মনে করে তা বাস্তবায়নের জন্য সততা ও আত্ম-ত্যাগের মনোভাব নিয়েই এগিয়ে আসে। যদিও তাদের ধারণা ও প্রবণতার মধ্যে গলদ রয়েছে; কারণ জঙ্গিবাদের উৎস হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষার অভাব, বিকৃতি, অস্পষ্টতা ও কুপমন্ডুকতা; কিন্তু যথার্থ শিক্ষা ও সচেনতার মাধ্যমে জঙ্গিবাদের অভিশাপ সহজেই নির্মূলযোগ্য। কিন্তু আওয়ামী বর্বরতার অভিশাপ সহজেই নিরাময়যোগ্য নয়। কারণ বর্বরতার উৎস হচ্ছে স্বর্থপরতা ও অসততা। তারা জেনে-শুনে ঠাণ্ডা মাথায় রাজনৈতিক দস্যুবৃত্তি করে যাচ্ছে। এ কারণে তাদের নিরাময় সহজ-সাধ্য নয়। They are basically bad.কারণ যারা জেগে ঘুমায় তাদের জাগানোর সাধ্য কারো নেই। তারা জ্ঞানপাপী। আওয়ামী লীগ গায়ের জোরে রাজনৈতিক দস্যুবৃত্তি করতে চায়। চর দখলের মত লাঠির জোরে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। লাঠির জোরেই তারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিদেরকে হটাতে চায়। গত ২৮ অক্টোবর বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে জামাতের জনসভা পন্ড করতে গিয়ে তারা যে পৈশাচিকতার মহড়া দিয়েছে তা তাদের চিরাচরিত জংলি রাজনীতিরই ধারাবাহিকতা মাত্র।

মূলত আওয়ামী লীগ হচ্ছে জঙ্গিবাদের চেয়েও ভয়াবহ এটি ফ্যাসিবাদী দল। আধুনিক ভাষায় ফ্যাসিবাদি বললেও এদেরকে কম বলা হয়, বরং বলা উচিত জংলি দল। কারণ চেহারা-সুরতে আধুনিক মনে হলেও এ দলের নেতা-নেত্রীরা পুরোপুরি জংলি মানসিকতায় আচ্ছন্ন। জঙ্গলে যেমন শিক্ষা, সভ্যতা ও মূল্যবোধের কোন অস্তিত্ব নেই, বরং শক্তি প্রদর্শন ও পৈশাচিকতাই জঙ্গলের সরদারদের কাছে আধিপত্য বিস্তারের প্রধান উপায় হিসেবে পরিগণিত হয়, তেমনি আওয়ামী নেতারাও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নিয়মতান্ত্রিকতা ও অপরের বাকস্বাধীনতার প্রতি কোন ধরনের ভ্রুক্ষেপ না করে লাঠির জোরে প্রতিপক্ষকে হটিয়ে দিতে চায়, নির্বাচন এবং জনমতের তোয়াক্কা না করে নিজেদের স্বেচ্ছাচার জাতির উপর চাপিয়ে দিতে চায়, কথায় কথায় হরতাল, অবরোধের নামে জ্বলাও পোড়াও, ভাংচুর, জোর পূর্বক সড়ক অবরোধ এবং দেশ ও জনগণের সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে জাতিকে জিম্মি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চায়। সন্ত্রাস ও বর্বরতাই হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক ভাষা, ইতরতাই তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য।



icsbook.info

জোট সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের পর মুহূর্তে লাঠি-বৈঠার ভয় দেখিয়ে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল আওয়ামী লীগ। সারা দেশে লাঠি বৈঠার নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এক জঘন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তারা। তাদের এই ইতরতার কাছে জিম্মি হয়েই দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন কে.এম হাসান। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টকে শক্ত হাতে হাল ধরতে হয়। তিনি যদি এই সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হতেন, তাহলে দেশ নিশ্চিত এক গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতো। চারদলীয় জোট ইতোমধ্যেই বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমর্যাদা গড়ে তুলেছিলেন। পবিত্র রমজান মাসের পর শান্তি, সৌহার্দ্য, সংযম ও ভ্রাতৃত্বের সওগাত নিয়ে এসেছিল যে পবিত্র ঈদুল ফিতর, তার মাত্র তিন দিন পর জামায়াতের জনসভায় হামলা চলিয়ে স্মরণকালের ভয়াবহ বর্বরতা প্রদর্শন করে সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মুখে একেবারে চুনকালি মেখে দিয়েছে শেখ হাসিনা আর আব্দুল জলিলের আওয়ামী লীগ।

এখন আবার তারা লাঠি-বৈঠা স্থাপন করেছে কেয়ারটেকার সরকারের মাথায়। একেরপর এক ডিকটেশন দিয়ে এবং শর্ত আরোপ করে তারা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত ও প্রভাবিত করতে চায়। এভাবে কোন দলের ডিকটেশনে চলার জন্য তো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তারা যদি স্বাধীনভাবে, শংকামুক্তভাবে, কারোদ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কাজ করতে না পারেন, তাহলে এ ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা যে অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লাঠির নিচে বসে তো কোন ভদ্রলোক কাজ করতে পারেন না। আব্দুল জলিল মুখ বাঁকা করে আর শেখ হাসিনা আঙ্গুল উঁচিয়ে উঁচিয়ে যেভাবে তাদেরকে ধমকি-ধামকি দিয়েছেন, এ অবস্থায়ও বিব্রত না হয়ে যথেষ্ট ধৈর্য ধরে কাজ করেছেন কেয়ারটেকার সরকার। এটাই জাতির প্রতি তাদের বিরাট মেহেরবানী। কারণ যাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তারা তো কোন ইতর শ্রেণীর মানুষ নন। তারা সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত সদস্য। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব, সততা ও নিষ্ঠার কারণেই তারা জাতির আস্থাভাজন ব্যক্তি। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও তাদের লাঠিয়াল বুদ্ধিজীবীরা তাদের সাথে যে ইতরের মত ব্যবহার করছে– এরফলে ভবিষ্যতে আর কোন ভদ্রলোক এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই কেয়ারটেকার সরকারকে ধৈর্য ধরে তাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। কারণ আওয়ামী বর্বরতা ও ইতরতার কাছে আত্মসমার্পন করার মানে হচ্ছে লগি-বৈঠা রাজনীতির কাছে আত্মসমার্পন আর লাঠি-বৈঠার অপ-রাজনীতির কাছে সংবিধান, সততা, ন্যায়পরায়নতা ও দক্ষতার পরাজয় মানে হচ্ছে জংলিবাদের কাছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সভ্যতার পরাজয়। আর জনগণকেও মনে রাখতে হবে– তারা যদি কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চান, নিজেদের শান্তিপূর্ণ ভোটাধিকারকে অব্যাহত রাখতে চান, তাহলে ইতরতা ও বর্বরতার অশুভ রাজনীতিকে অবশ্যই পরাভূত করতে হবে। উৎসাহিত করতে হবে নিয়মতান্ত্রিক ও আদর্শিক রাজনীতিকে। মনে রাখতে হবে– আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও দুরদর্শিতার অভাবে যদি জংলি রাজনীতির জয় হয় আর পরাজয় হয় নিয়মতান্ত্রিক ও গঠনমুখী রাজনীতির, তাহলে সে পরাজয় হবে মূলত আমাদের নিজেদের পরাজয়; সভ্যগজতের পরাজয়। আর তখন জংলি সমাজের আর আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকবে না। ■



icsbook.info

# শহীদ পরিবারের সদস্যদের লেখা

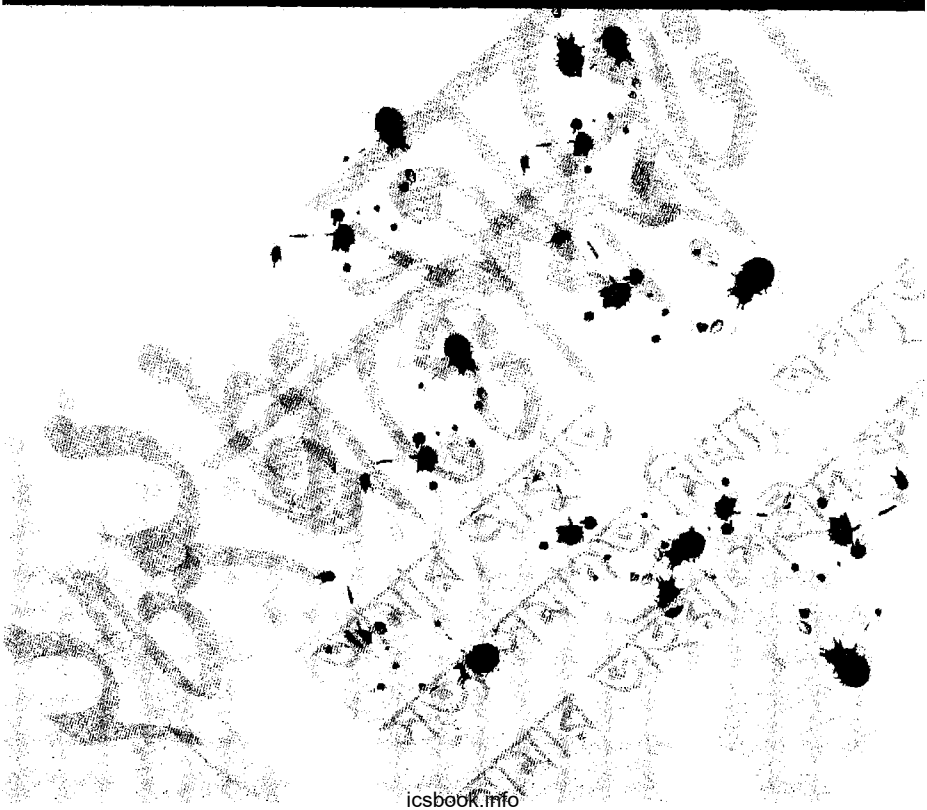

icsbook.info

icsbook.info

# আমার আকুতি

মাহমুদা মানসুরী মুন্নী

"আমেনুবিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী ওয়ান্নুরিল্লাজী আনযালনা" (সুরা তাগাবুন-৮)
"ঈমান আনো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং যে নূর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি"

আমি আমার আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেখে, সন্তান শহীদ মুজাহিদ সম্পর্কে কিছু কথা লেখার চেষ্টা করছি মাত্র। গত কয়েকদিন যাবৎ চিন্তা-ভাবনা করে কুল পাচ্ছিলাম না কোথা থেকে শুরু করি। মুজাহিদ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় সব সময়ই আল্লাহ-তায়ালার দরবারে প্রার্থনা করতাম, আল্লাহ তুমি যা দান করবে তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তবে তুমি যাকে দান করবে, সে যেন হয় সুস্থ, সবল এক পূর্ণাঙ্গ শিশু। সেই সাথে তোমার কাছে মিনতি আমার, সেই শিশু হয় যেন মুমিন, মুত্তাকি, চক্ষুশীতলকারী, তোমার সন্তুষ্টি হাসিলকারী, দ্বীনের খেদমতকারী, সাহাবীদের মতো চরিত্রের অধিকারী এবং সদকায়ে জারিয়াহ এর গুণাবলী সম্পন্ন এক মানব শিশু।

১২ রবিউল আউয়ালের সুবেহ-সাদেকের মুহূর্তে দুনিয়া আলোকিত করে, আমার কোল জুড়ে প্রশান্তির ছোঁয়া দিয়ে সে এলো দুনিয়ায়। আমার বাবার বাসায় জন্ম হয় মুজাহিদের। আমি ৪টি সন্তানের মা হয়েছি। প্রসব বেদনার কষ্ট, অনেক কষ্টের। আল্লাহর অশেষ রহমতের ফলে সবচেয়ে কম সময়ের ব্যবধানে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। প্রিয় সময়ে, প্রিয় তারিখে দুনিয়ায় এসেছিল বলে ওর নানা বলে, নাতির নাম হবে মুজাহিদুল ইসলাম (মুজাহিদ) ইসলামের সৈনিক। আল্লাহ ও রাসূলের পথের সঠিক অনুসারী। আমার চোখের মণি মুজাহিদ শিশু বয়স থেকে খুবই শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। কথা বলতে শিখার পর বলতো– আম্মু আমার ক্ষুধা লেগেছে। কাজের তাগিদে যদি আধা ঘন্টা পরেও খাবার দিতাম তাতেই সই। কোনো কান্না-কাটি, চিৎকার চেঁচামেচি, পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করা, বায়না করা স্বভাব ওর শিশুবেলা থেকে এই পর্যন্ত আমি পাইনি। বিরক্ত কাকে বলে, বাবা-মাকে কষ্ট দেয়া কাকে বলে, হে আল্লাহ! তুমি তো সাক্ষী এ ছেলের কাছে তা কোনদিনই পাইনি। এজন্য আল্লাহ তোমার দরবারে অনেক শুকরিয়া যে, তুমি এমন



icsbook.info

শান্ত, নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, মার্জিত, সৎ ও নিষ্ঠাবান ছেলের মা হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছিলে। এজন্য নিজকে অনেক ভাগ্যবতী মনে করি। মনে মনে ভাবি, আর বলি প্রতিটি ঘরের, প্রতিটি মায়ের, প্রতিটি সন্তান যদি এমনই চক্ষু শীতলকারী সন্তান হতো, তাহলে মায়েদের মনে কোন দুঃখ-কষ্ট থাকতো না। ওর আগে মেয়ে হারা মা আমি। মুজাহিদ ছিল আমার দ্বিতীয় সন্তান, বড় মেয়ে জান্নাত ৩৮ দিনের মাথায় অসুস্থতার কারণে জান্নাতবাসী হয়ে যায়। মেয়ে হারা মা ছিলাম বলে ওকে বুকে পেয়ে যক্ষের ধনের মত আগলে ছিলাম। কখনো ওকে চোখের আড়ালে রাখিনি আমি। ও বকা খাওয়ার মত ছেলে ছিল না বলে ওকে কখনো বকা-ঝকা করিনি, মারিনি। কেউ দুষ্টামি করে ওকে মারলে ওর চোখে জল দেখলে ব্যথায় বুকটা মুচড়ে উঠতো। ও কাঁদলে সাথে সাথে আমি কাঁদতাম।

ওর বাবা ছিল খুবই হিসেবী মানুষ। বেহিসেবী চলা-ফেরা পছন্দ করতেন না। একদিনের একটি কথা আজ মনের আকাশে উঁকি দিলো, মুজাহিদের প্রিয় ছাত্র সংগঠন থেকে একদিন পিকনিকে যাবে রাঙামাটি। ও বলল মা সুন্দর জায়গা দেখতে খুব মন চায় এমন জায়গায় মন চাইলেইতো যেতে পারিনা, সুযোগ পেয়েছি যখন তখন তুমি নিষেধ করোনা মা। ওর মধ্যে সৎ আদর্শ চরিত্রের পাশা-পাশি ছিল বাবা মাকে প্রচন্ড রকমের ইজ্জত ও সম্মান করার গুণ। এ রকম অতি উত্তম ছেলে কিছু চাইলে দিতে না পারলে, বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যেতো আমার। আমি কি যে করি ওকে দিবার মত অত টাকা আমার হাতে তখন ছিলনা, অনেক কষ্টে সেই টাকা সংগ্রহ করি ওর জন্য। বিশ্বাস কেউ করবে কিনা জানিনা, পিকনিকের চাঁদার টাকার বাইরে একটি পয়সাও বেশি দিতে পারি-নি সেই সময়। সৌন্দর্যের লীলাভূমি রাঙামাটি দেখে ফেরার পথে ওর সকল ভাইয়ারাসহ নাকি যায় ওখানকার মার্কেটে। ওর হাতে বাড়তি টাকা ছিল না, কিন্তু নামটা মনে নেই কার থেকে যেন ৫০০ টাকা ধার করে রাফির জন্য একটি ফতুয়া, মালিহার জন্য চাকমা মেয়েদের মত পোশাক আর আমার জন্য লাল রং এর খুব সুন্দর একটি তাঁতের ওড়না আনে। দোকানী বলে, মা, ভাই ও বোনের জন্য তো নিলেন? আপনার জন্য কিছু নিয়ে যান। তখন নাকি ওঁ উত্তর দিয়েছিলো– 'আমার জন্য আমার মা আছে, তিনি আমার জন্য সমস্ত কিছু কিনে দেন। তাই আমার জন্য কিছু লাগবেনা। আমার মা-ই আমার জন্য যথেষ্ট।' ওর সদাই করা জিনিসগুলো ৫০০ টাকার বেশি দাম ছিল। কিন্তু দোকানী নাকি বলে– 'এমন ছেলেতো দেখিনি যে, নিজের চিন্তা না করে মা, ভাই, বোন এর চিন্তা করে।' দোকানী ওর কথায় খুশি হয়ে বলে, দাও তোমার ৫০০ টাকাই দাও। দোকান ছিল ফিক্সড প্রাইজের, ওর কথায় মুগ্ধ হয়ে আর বেশি টাকা নেয়নি। মুজাহিদের সফরের বর্ণনার পাশাপাশি ওর কাপড় ক্রয়ের বর্ণনায় এত খুশি হয়েছিলাম তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। শুনে মনে চিন্তা করলাম, উঠতি বয়েসের ছেলেরা হাতে টাকা পেলে সবার আগে নিজের পছন্দের জিনিস কিনে বা কেনার কথা ভাবে। ক'টা ছেলে আছে যে নিজের পছন্দের জিনিস না কিনে, না ভেবে বলতে পারে যে, আমার জন্য আমার মা-ই যথেষ্ট। আমি তার এ উত্তর শুনে কি যে খুশি হয়েছি তা আল্লাহই ভালো জানেন। আমার মনে হয়, আমার খুশির সাথে সাথে আল্লাহ তার উপর খুশি হয়ে গিয়েছিল। আর আল্লাহর দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করি এমন নেয়ামতময় সন্তান দান করেছেন বলে। আমি প্রতিটি নামাজে একটাই প্রার্থনা করতাম– আল্লাহ তুমি যে তিনটি রত্ন দান করেছো তাতে আমার কোন কেরামতী নাই। সবই তোমার কুদরতের দান। তুমি তোমার এ



icsbook.info

দানদের তোমার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করো, তোমার দ্বীনের জন্য কবুল করো। তোমার জান্নাতের জন্য কবুল করো আল্লাহ। আল্লাহ আমার কথা কবুল করেছেন দেখে আমি শুকরিয়াই আদায় করতে থাকি তার দরবারে।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্মরণীয় দিন, সবচেয়ে বেদনার দিন এবং সবচেয়ে বড় শুকরিয়া আদায়ের দিন। এই দিনে আমার পরম প্রিয় নাড়ি ছেঁড়া ধন, রক্তের বাঁধন ছিন্ন করে শাহাদাত বরণ করলো। সে হলো শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম। সে ছিল আমার অতি প্রিয় সন্তান। যাকে যাবেনা কোন দিন ভোলা। সে যে অন্তরে থাকবে অতি যতনে। সেছিল আমার চোখের মণি, কলিজার টুকরা, সাধনার ধন, আত্মারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার বিহনে আমি যে কিভাবে বেঁচে আছি তা শুধু আমি ও আমার সৃষ্টিকর্তা জানেন। সে শুধু আমার সন্তানই ছিলনা, ছিল পরম প্রিয় বন্ধু। আমার জীবনের যত কষ্ট, যন্ত্রণা, বোবাকান্না তা শুধু তার সাথে শেয়ার করেছি, অন্য কারো সাথে নয়। নয় স্বামী, নয় বাবা-মা, নয় কোন আত্মীয়-স্বজন। সে ছিল আমার পরামর্শদাতা। আজ সে নেই তাই আমার অব্যক্ত বুকফাটা আর্তনাদ। তার মত ভালো আমলের ভালো ছেলে পরকালে আমি পাবোতো? এই জীবনে তাকে আমি কিছু দিতে পারি নাই। তাই আল্লাহকে বলি, হে আল্লাহ এই জীবনে যতটুকু পূন্য করেছি এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্তে পর্যন্ত যা পূন্য অর্জন করবো, তার সবটুকু ছওয়াবই আল্লাহ যেন তার আমলনামায় যোগ করে দেয়। আমার জন্য আমার পাপগুলো থাক জমা। আমার আল্লাহ যা ভালো মনে করবেন– তাই করবেন। আমিতো 'মা' জীবনের প্রয়োজনে, হাজারো-লক্ষ ব্যস্ততার মাঝে, কথার মাঝে, আপনজনদের মাঝে তাকে খুঁজে বেড়াবো নিরন্তর। এ যে ভোলার নয়, এই হলো মায়েরই অন্তর। মানুষ দৃষ্টির আড়াল হয়, মনের আড়াল হয়না কখনো। হবেনা কোনদিন, কোনক্ষণে। যদি সে হয় অতি প্রিয়জন। আমি আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করে ভাবি, আজকের সমাজের মায়েরা হুতাস করে, ভালো চরিত্রবান, আদর্শের মানদন্ডে সৎ নিষ্ঠাবান সন্তানের জন্য। সেই অর্থে সত্যিই আমার জন্ম সার্থক যে, উত্তম আর্দশের উত্তম গুণাবলীর এক সার্থক বাস্তবরূপ বা রূপকার ছিল মুজাহিদুল ইসলাম। সাত বছর বয়স থেকে সে রোজা রাখা শুরু করেছিল। প্রথমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী ছিলনা। নবম ও দশম শ্রেণীতে উঠার সাথে আস্তে আস্তে পাঞ্জেগানা নামাযী হয়ে যায়। প্রতিদিন ফজরের পর কোরআন তেলাওয়াত করতো। আমার ও ওর চাচীদের দেরী হলে ও সবাইকে নামাজের জন্য ডেকে তুলে তবেই মসজিদে যেতো। এলাকার সকল ছেলের মাঝে আল্লাহর অশেষ রহমতের দান হিসাবে ও ছিল অনন্য অসাধারণ এক ব্যতিক্রমী ছেলে। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করে বলছি–

হে আল্লাহ! আমি মা হিসাবে তোমার দরবারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুজাহিদ সন্তান হিসেবে ছিল অতি ভদ্র, নম্র, বিনয়ী যে কখনো বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কারো সাথে কখনো বেয়াদবী করেনি, তর্ক ও মনো-মালিন্য হয়নি কারো সাথে আমার জানা মতে। উচ্চস্বরে, চোখরাঙ্গানী দিয়ে কখনো কথা বলেনি, শব্দ করে হাসতোনা। কখনো কারো দ্বারা দু:খ পেলে বিনিময়ে তাকে দু:খ না দিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতো। কাউকে কখনো বুঝতে দেয়নি তার ব্যথা। আমি, ওর বাবা, চাচা-চাচী, নানা-নানি, মামা-মামী, খালাসহ অনান্য আত্মীয়-স্বজন বা এলাকার লোক কোন কাজ করতে বললে বা কোন সাহায্য চাইলে কাউকে 'না' বলতে পারতো না। 'না' শব্দটি ওর ক্ষুদ্র জীবনের



icsbook.info

অভিধানে ছিলনা। এটা পারবোনা, ওটা করবোনা, কোথায় যেতে বললে না যেতে পারবো না- যত কষ্টই হোক যথাসাধ্য চেষ্টা করতো সার্বিকভাবে সকলকে সাহায্য করতে। মুজাহিদের আব্বু ছিল মুজাহিদের প্রিয় ইসলামী সংগঠনের পরিপন্থিদের কট্টর বা গোঁড়া সমর্থক। সে মোটেও জানতো না তার ছেলে সংগঠনের সাথী বা সদস্য হয়েছে। জীবনের তাগিদে সকালে বের হতো আর রাত্রে বাসায় ফিরতো। বাবা ছেলের মুখামুখি হতোনা তেমন একটা। তাতে কি হয়েছে, তবে ছেলের আচরণে বুঝতো যে, ছেলে সংগঠনের সমর্থন করে। আর এতেই সে আগুনের মত ক্ষেপে যেত। আমাকে আগুনের ফুলকি ঝরা বাক্যবানে বিদ্ধ করতো। সে বলতো– কাউকে সাপোর্ট করার প্রয়োজন নেই। পড়াশুনা কর, আর পাশাপাশি আমার সাথে দোকানদারি কর। মুজাহিদ মাঝে মাঝে সাহায্য করার জন্য ওর আব্বুর সাথে দোকানেও যেত। তার বাবার কথার কারণে ও ভার্সিটির পড়াশুনা কম করার কারণে আমি ওর সাথে অনেক রাগারাগি করতাম, খারাপ ব্যবহার করতাম। আমি রাগ করলে একটি তর্কও না করে পাশের রুমে যেয়ে কানের উপর বালিশ চাপা দিয়ে শুয়ে থাকবে। ১০মিনিট পরে উঠতো আর মিষ্টি হাসি দিয়ে বলতো– "মাগো মা! তুমি আমার উপর রাগ করোনা, সবাই রাগ করলে, বকা দিলে আমার কোন কষ্ট লাগে না। তুমি রাগ করলে মা, আল্লাহ আমায় মাফ করবে না। মাগো আমায় মাফ করে দাওনা 'মা'।" তখন কি কেউ রাগ করে থাকতে পারে। স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ৫ম সেমিস্টার ফাইনাল দিচ্ছিল, ২টা পরীক্ষা রোজার ঈদের আগে হয়েছিল, ঈদের বন্ধের পর বাকী ২/৩টা পরীক্ষা ছিল। এই পরীক্ষা শেষ হলেই ও ৬ষ্ঠ সেমিস্টারে উঠতো। ৫ম সেমিস্টারের পাস করার আগে আল্লাহ তাকে পাস করিয়ে উঠিয়ে নিলেন তার দরবারে। এর আগের ৪টি সেমিস্টারের মধ্যে ২টিতে স্কলারশিপ পায় ৫ হাজার করে ১০ হাজার টাকা। দুবারই টাকা পেয়ে মাকে সালাম করে মার হাতে দিয়ে দিত টাকা। বলতো মা তুমি খুশি হয়েছো? ছেলের সাফল্যে কোন্ মা-না খুশি হয়। তবে আমার খুশির মাত্রা ছিল অতিমাত্রায় বেশি। কারণ আমি পড়া-শুনা করতে তেমন একটা পারিনি, এজন্য মনের মাঝে বিশাল একটা ফাঁকা জায়গা ছিল। ছেলের ভালো ফলাফল মায়ের সেই শূন্যতাকে একটু একটু করে পুরা করছিলো। রাব্বুল আলামিন তাকে এই দুনিয়ার উত্তম ফলাফলের চাইতে আখেরাতের উত্তম ফল প্রদানের জন্য শাহাদাত এর নজরানা দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন।

ওর পাওয়া টাকার আনন্দ ও সবার মাঝে শেয়ার করেছিল। বাবা-মা, নানা-নানি, মামারা-মামীরা, ভাই-বোন ও চাচীসহ সকলের জন্য জামা-কাপড় ও বোরখা কিনে দেয়। এবং সংগঠনের জন্যও কিছু ব্যয় করেছিল। ভাবতে ভালো লাগে যার নিজের আনন্দের চাইতে সকলের আনন্দ বড় ছিল জীবনে। দোয়া করি বাংলাদেশের প্রতিটি মায়ের কোলে এরকম চক্ষু শীতলকারী সন্তানের জন্ম হউক। আর যারা মুজাহিদের মত বড় তারা হও সৎ গুণের আদর্শ সন্তান।

মুজাহিদ বলত, মাগো বেশি বেশি কোরআন পড়ো, তাফসীর সহকারে, আমল করার লক্ষ্যে কোরআনকে হৃদয়ে ধারণ করো। কোরআনের বর্ণনামতে, কি অনুকরণীয়, কি পালনীয়, কি বর্জনীয় সেই মোতাবেক না চললে পরকালে পার পাবে না। যথাসাধ্য চেষ্টা করবে আল্লাহর আনুগত্য পরিপূর্ণরূপে করতে। সে রেগুলার ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতো বা পড়তো। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তো, মাঝে মাঝে নফল রোজাও



icsbook.info

রাখতো। রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের নামায খুব সুন্দর ও ধীর-স্থির গতিতে পড়তো। সব সময় প্রার্থনা থাকতো একটাই- আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে শহীদি তামান্না হাসিল করা। বলতো মা, রাসূল (সা.) আরবী ১৪০০ শত হিজরীর পর দুনিয়াতে কি কি পরিবর্তন ঘটবে তা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি। মা, আমরা জাহেলিয়াতের যুগে বাস করছি, যে যুগ সম্পর্কে আল্লাহর নবী ধারণা করতে পারেননি।

আমরা সেই যুগে বর্তমানে আছি আর ১৪০০ হিজরীর বেশ কয়েক বছর পার করেছি অলরেডি। মা, এ যুগে ঈমান ঠিক রেখে চলা খুবই কঠিন ব্যাপার তার চাইতে জ্বলন্ত কয়লা কুন্ড মুখে পুড়ে রাখা অনেক সোজা। মাগো আমরাতো অত বড় শক্ত ঈমানদার হতে পারিনি। কোরআনের নির্দেশ মানতে হলে কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করতে হলে, ইসলামের প্রকৃত সেবা করতে হলে বাতিলের কাছে মাথা নিচু না করে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার চাইতে উত্তম আর কি আছে জীবনে? কুকুর মরে, বিড়াল মরে রোড এ্যাক্সিডেন্টে মানুষ মরে, অসুখে মরে যেভাবেই হোক মানুষ দুনিয়াতে আসে নির্দিষ্ট একটা সময় পার হবার পর তাকে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে ফেরত যেতেই হয়। কারো সাধ্যি নাই তাকে ধরে রাখতে পারে। মা শুন, আসলে যখন যেতেই হবে তখন কুকুর বিড়ালের মত না মরে সিংহের ন্যায় মৃত্যুইতো শ্রেয় 'মা'। মাগো দোয়া করো, শহীদের মৃত্যু হলে সরাসরি জান্নাত অবধারিত।

মাগো, শহীদ হতে চাইলেই কি শহীদ হওয়া যায়? যায় না মা। শহীদ হতে হলে অনেক বড় ভাগ্য লাগে, সত্যিকার অর্থে আমার কি সেই ভাগ্য আছে মা, মাগো শহীদ হলে কর্মফলের কোন হিসেব দিতে হয়না, কোন শাস্তি হয়না কবরে, জাহান্নামে যেতে হয়না। শাহাদাত হলে সরাসরি জান্নাতে যাওয়া যায়। মানুষ চাইলেই কি শাহাদাতবরণ করতে পারে? পারেনা মা পারেনা। এর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়। দ্বীন-ইসলামের জন্য জান, মাল ও সময় ব্যয় করতে হয়। নতুবা তোমার কোন কার্য সাধন হবেনা মা। সকলের উর্ধ্বে, বাবা-মা ভাই-বোন, দুনিয়াবী আরাম আয়েশের উপর আল্লাহর কথার দাম দিতে হবে। তাই বলি আল্লাহ শুন তুমি, মুজাহিদ ছিল খুবই সুন্দর মনের একটা ছেলে।

আল্লাহ তুমি নিজে সুন্দর, তাই সুন্দরকেই তুমি অধিক ভালবাস। তোমার ভালবাসা নিখুঁত। তোমার নির্বাচনে কোন ভুল নেই। শুকরিয়া, শুকরিয়া, শুকরিয়া আল্লাহ তোমার কাছে। ওর নানা-নানু হজ্ব থেকে আসবে সেদিন কিন্তু ও এয়ারপোর্টে যায়নি। নানা-নানুকে দেখা করার কথা ভাবেনি, বাবা-মায়ের, ভাই-বোনের থেকে প্রোগ্রামের ডাক তার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহ অন্তর্যামী। তিনি সকলের অন্তরকে জানেন, মুজাহিদ সবার চাইতে অধিক আল্লাহকে ভালবেসেছিলো। আল্লাহ এজন্য তাঁর সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন। পছন্দের জিনিসকে পছন্দের মর্যাদা দিয়ে কবুল করেছেন। আল্লাহ তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলছি, তুমি মা-ছেলের প্রার্থনাকে ব্যর্থতায় রূপ দাওনি দেখে শুকরিয়া তোমার দরবারে। আল্লাহর দ্বীনের জন্য যারা নিবেদিতপ্রাণ কর্মী তাদের চলা-ফেরা, উঠা-বসা, আচার-আচরণ হয় অন্য সবার থেকে আলাদা। তারা হয় ভদ্র ও বিনয়ী।



icsbook.info

মুজাহিদ মাঝে মাঝে এত সুন্দর করে কথা বলতো যে, শুনলে হৃদয় জুড়িয়ে যেতো। বলতো- "মা, ইসলামকে আমরা লেবাস আর বুলির মাধ্যমে আটকে রেখেছি। আসলে জানো মা, ইসলামী লেবাস গায়ে জড়িয়ে বড় বড় কথার ফুলঝুড়ি নিয়ে বসে থাকলে তো হবেনা। আসলে কর্মের মাধ্যমে সঠিকরূপে পরিণত করাই হবে আসল কাজ। আমাদের দেশের সবাই বংশানুক্রমেমুসলমান। কেউ রাসূলের যুগের মত কুফরের আমলে নেই আমরা। মুসলমান হয়ে অন্য মুসলমানের মাঝেই দাওয়াতী কাজ করি। কেন করি জানেন? দেশ চালাতে যেমন সংবিধান লাগে তেমনি মুসলমান হয়ে চলতে গেলে সংবিধান লাগে, মুসলমানদের সংবিধান বলো বা জীবন বিধান বলো তা হলো আল্লাহর কোরআন। কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তা জীবন চলার পথে বাস্তবায়ন করাই হলো প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। সকলে কি সেই কর্তব্য পালন করি? যে দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ লোক মুসলিম সেই দেশের ৯৫ ভাগ লোক কি কোরআন হাদীস পড়ে সেই নির্দেশিত পথে চলছে? আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা রাসুল (সা.) কে নিজ জীবনে অনুসরণ করে তা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করো। রাসুল (সা.) এর জীবনকে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করতেই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েমকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে এবং অন্য সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় তৎপর থাকতে হবে। তবেই না হবে মুসলমান হিসেবে সঠিক কাজ করা, দোয়া করো 'মা' জীবন দিয়ে হলেও যেন আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী রূপ দিতে পারি।" আল্লাহ অন্তর্যামী তিনি তার মনের একান্ত চাওয়াটাকে কবুল করতে মোটেও দেরী করেননি।

মুজাহিদ ছিল পুরামাত্রায় পিতা-মাতার আনুগত্যকারী। সংগঠনের আনুগত্যকারী এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল সে। ইসলামী সংগঠনের জন্য কাজ করতে পারার আনন্দে বিভোর থাকতো। সে বলত আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখতে নেই। কালকে যে বাঁচবো তার তো কোন গ্যারান্টি নেই। সে যে, এত ভালো ছিলো, নামাজে, কোরআন-হাদীস-সাহিত্য অধ্যায়নে, নম্রতা, ভদ্রতা, সম্মানকারী, উঠতে-বসতে সে সালাম দিত, সে সকলের উপকারে আসতে চাইতো। সে ছোট-বড়, ভালো-মন্দ সকলের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে আপ্রাণ চেষ্টা করতো। সে সকলের হিতাকাঙ্খী ছিল। এ রকম ভালো ধরণের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে আমি মা হিসাবে আমার ভূমিকা ছিল যৎ সামান্য। এজন্য আল্লাহর রহমত ও তার প্রিয় সংগঠনের সাহচার্য, পরামর্শ, বন্ধুসুলভ আচরণ, তাকে ধীরে ধীরে একজন সৎ আদর্শবান যুবকে পরিণত করেছে। এই জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ মহান রাব্বুল-আলামিনের কাছে ও তার প্রিয় দ্বীনি সাথী ভাইদের কাছে। মুজাহিদ পড়াশুনায় ভালো করার পেছনে তার সঙ্গী-সাথী ভাইদের উৎসাহ-উদ্দীপনার কোন ঘাটতি ছিলনা। এজন্য তাদের অবদান আমি কখনো ভুলবোনা।

মুজাহিদের প্রিয় ইসলামী ছাত্র সংগঠনকে আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবি, এই সংগঠন হলো একটি সুশোভিত, আলোকিত, ফুলের শক্ত ও মজবুত ঝাড়। যে ঝাড় কখনো ভাঙ্গবেনা, দুমড়ে, মুচড়ে, পিষে ফেলা যাবেনা। মোট কথা, যাকে কোনদিন নিশ্চিহ্ন করা যাবেনা। এই ঝাড়ে অজস্র ফুলকে সঠিকভাবে রাখা হলে, এর শোভা বৃদ্ধি পাবে শতগুণ এবং তা হবে চিরস্থায়ী। এর সুঘ্রাণে মোহিত হবে চারিপাশ ও মনোমুদ্ধকর



icsbook.info

হবে পরিবেশ। এই ঝাড়ে ফুলকে ঠিকভাবে রাখতে জানলে, এ ফুল কখনো পচবেনা, দুর্গন্ধ ছড়াবেনা এবং কাঁটাও থাকবেনা।

আর এই ঝাড়ের যে অপরূপ আলো তার আলোয় সকল আঁধার কেটে যে দ্যুতির বিচ্ছুরণ ছড়াবে, তা পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোকেও হার মানিয়ে যাবে। তাতে সকলেই বিমোহিত হবে, সে আলোর এমনই গুণ যে নিজকে আলোকিত করে, পরিবারকে আলোকিত করে, সমাজকে আলোকিত করে ও বিশ্বকে সকল আঁধারমুক্ত করে আলোয় উদ্ভাসিত করে। সেই ফুলের ঝাড়ের অজস্র অসংখ্য ফুলের মাঝখানে আমার সন্তান মুজাহিদ হলো তরতাজা ফুটন্ত এক রক্ত গোলাপ, যার সৌন্দর্য ও সুঘ্রাণ ইতিহাস হয়ে থাকবে চিরদিন চির অম্লান।

তোমরা বেসেছিলে আল্লাহকে ভালো,
আল্লাহ বেসেছিলো তোমাদের ভালো
তাই শাহাদাতের নজরানা দিয়ে
করে নিলেন বরণ।

আমি মুজাহিদের আম্মু হিসেবে নয়, একজন মা হিসেবে সকল মুসলিম সন্তানের উদ্দেশ্যে বলছি, আমরা আল্লাহর সৃষ্টি দুনিয়াতে এসেছি এটা যেমন সত্য, তেমনি আবার একটা নির্দিষ্ট সময়ে চলেও যাবো। কেউ ধরে রাখতে চাইলেও কোন কিছুর বিনিময়ে তাঁকে আর ধরে রাখা যায়না। আমরা দুনিয়াতে আসি চলে যাবার জন্য। তাই এখন একটা কথা বলি, মনে কষ্ট নিওনা তোমরা। আমরাতো সকলে মুসলিম এটা তো স্বীকার করো, তাহলে আমাদের সংবিধান বা জীবন বিধান সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চলতে হবে, জানতে হবে আমদের গন্তব্যের ঠিকনা। কি আমল নিয়ে যাচ্ছি আমরা অন্ধকার কবরে? তাই বলি সকলকে– এসো আলোর পথে, থেকোনা অন্ধকারে। আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার হাত থেকে যেন আল্লাহ সকলকে রক্ষা করে, সেই যোগ্য আমল প্রত্যেকে গড়ে তুলি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে উপকারী জ্ঞান দান করুন এবং কবুলযোগ্য আমল করার তাওফিক দিন এবং পবিত্র হালাল জীবিকা দান করুন। আপনার নির্দেশিত পথে চলার তাওফিক দিন। মুজাহিদ, শিপন, মাসুম, ফয়সাল, জসিম, হাবীবসহ প্রত্যেককেই উত্তম শহীদ হিসেবে কবুল করুন। ২৮ অক্টোবরের হামলায় মুজাহিদের সকল আহত সাথী ভাইদের আল্লাহ পরিপূর্ণ সুস্থ করে দিন। তাদের দীর্ঘায়ু দান করুন, হেফাজত করুন এবং রোগমুক্ত জীবন দান করুন। আল্লাহ! আমরা যেন আপনার সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারি সেই সাথে সবরকারীর অন্তর্ভূক্ত হতে পারি সেই তাওফিক দিন।

মুজাহিদের অসমাপ্ত কাজগুলো যেন পূর্ণতায় রূপ দিতে পারি সেই সুস্থতা, যোগ্যতা ও আমল দান করুন। আল্লাহ আপনার পছন্দনীয় পথে আমদের সকলকে কবুল করুন। আমিন।

---

*লেখক: শহীদ মুজাহিদের প্রিয় মা*



icsbook.info

# আমার প্রিয় ফয়সাল ভাইয়া

উম্মে হাবিবা (শাম্মী)

প্রিয় ফয়সল ভাইয়াকে এভাবে হারিয়ে ফেলব কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। ভাইদের মধ্যে ফয়সল ভাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আমি ফয়সল ভাইয়া থেকে ছোট হলেও সে ছিল আমার বন্ধুর মত। যে কোন কাজ করার আগে সে আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিত এবং আমিও নিতাম। ওকে আমার ভালো লাগার মূল কারণ ছিল ওর মন ছিলো সহজ, সরল। সে সবসময় হাসিখুশি থাকত, যে কোন কাজ দক্ষতার সাথে করত এবং বুদ্ধির সাথে পরামর্শ দিত। লেখাপড়ার ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা আমাকে করত। ছোট বেলা থেকেই বই খাতা থেকে শুরু করে ভার্সিটিতে ভর্তি পর্যন্ত আমাকে করে দেয়। ফয়সল ভাইয়ার সাথে একসাথে ভার্সিটিতে যেতাম আসতাম। সেই ভাইয়া আজ নেই। আমাকে একাই যাওয়া আসা করতে হয়। ক্যাম্পাসে গেটে যখনই প্রবেশ করি তখনই বারবার ফয়সল ভাইয়ার কথা মনে পড়ে। ভাইয়ার বন্ধুদের ক্যাম্পাসে দেখা যায় কিন্তু, আমার ভাইয়াকে দেখা যায় না। ভাইয়া যে আমাদের মাঝে নেই একথা কল্পনাও করতে পারি না। যখনই ভাইয়ার কথা মনে হয় দেখি পাশে নেই অস্থির হয়ে যাই। তখনই কোরআনের সেই আয়াতটি মনে করি– "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত" কিন্তু, তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। ফয়সল ভাইয়া ছোট বেলা থেকেই শান্ত প্রকৃতির ছিল। তার সব গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো তার ধৈর্য্য। কোন ব্যাপারে সে হতাশ হত না। আল্লাহর উপর ভরসা করত। আমার আব্বা যখন ২০০৬ সালের ১৮ জুন হঠাৎ মারা যায় তখনও সে হতাশ হয়নি। সবাইকে ধৈর্য্য ধারণ করতে বলেছে এবং সান্তনা দিয়েছে। এত অল্প বয়সে সে যে দায়িত্ব পালন করেছে যা অকল্পনীয়। এত পরিশ্রম করেও তার মুখে হাসি লেগেই থাকত। তাই আমি তাকে সুখী মানুষ বলতাম। রাতে যখন বাসায় ফিরত বিভিন্ন ধরনের ইসলামী সংগীত গাইতে গাইতে আসত। দরজায় কড়া নাড়ানোর আগেই আমি দরজা খুলে দিতাম। তাই মাঝে মাঝে ওকে শিল্পী ভাই বলেও ডাকতাম। ভাইয়া ইন্টার পাস করার পর হঠাৎ মোটা হয়ে যায় এবং দাড়ি রাখার কারণে আরো অনেক বড় লাগত।



icsbook.info

তাই আমি ওকে বলতাম ভাইয়া তুমি দাড়ি ছেটে ফেল এই বয়সে কেউ দাড়ি রাখে? ভাইয়া আমাকে বলত দাড়ি হচ্ছে নবীর সুন্নত দাড়ি রাখলে শয়তানের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকা যায় শুনে আমার এত ভালো লাগল যে এ ব্যাপারে আর কোনদিন তাকে বাধা দেইনি। ফয়সল ভাইয়ার আচরণ ছিলো অত্যন্ত সুন্দর এবং সবার সাথে মিষ্টি মুখে কথা বলত। ছোটদের আদর করত বিশেষ করে আমার ছোট ভাই সাকিবকে অত্যন্তআদর করত। বাসায় যখন অবসর থাকত বিভিন্ন ধরনের ইসলামী সংগীত ও ইসলামী বই পড়ত। বই পড়ার প্রতি তার ছিল অত্যন্ত ঝোঁক। অল্প সময়েই অনেক বই পড়ে ফেলতে পারত। বিভিন্ন ধরনের ইসলামী সংগীত এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

"আমাকে শহীদ করে সেই শিবিরে
সামিল করে নিও.....
মরণ তো একদিন আসবেই জানি....
সেই সংগ্রামী মানুষের সারিতে
আমাকেও রাখিও রহমান.....

ভাইয়ার সেই গানের সুর এখনও জেগে ওঠে আমাদের মনে। ভাইয়া ছোট বেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিল। বিভিন্ন গান ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় বহু পুরস্কার পেয়েছে। ভাইয়া মেহমানদারী খুবই পছন্দ করত। তাই ২০০৬ সালে ২০ অক্টোবর ভাইয়ার বন্ধুদের দাওয়াত দিয়েছিল। সেদিন তাদের খাওয়ানোর জন্য আমার সাথে অনেক কাজ করে। তাদেরকে খাওয়াতে পেরে সে অনেক খুশি হয়। শত কাজের ফাঁকেও সে সংগঠনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকত। বাসায় এসে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন বন্ধুদের গল্প করত। শিবিরের ভাইয়াদের খুবই প্রশংসা করত। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমার প্রিয় ভাইয়াকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন এবং যে সন্ত্রাসীরা আমার নিরঅপরাধ ভাইয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার সঠিক বিচার করেন।

---

*লেখক : শহীদ ফয়সালের বোন*



icsbook.info

# শহীদ মাসুম

ডা. আবু সাঈদ

আলহামদুলিল্লাহ। সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম আমার বড় মেয়ের ছোট ছেলে এবং প্রিয় নাতি ছিল। শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুমের শিশুকালের ৩ বছর নানা-নানু, মামা-খালামনিদের স্নেহের পরশে কেটেছে। ছোট বেলায় শহীদ মাসুম ফুটফুটে চাঁদের মত সুন্দর ছিল। ওকে দেখলে যে কেউ আদর না করে পারতো না। ওকে লোকেরা দেখে বলতো ইংরেজের বাচ্চা। চুলগুলো ছিল লালচে রং এর, দেখতে খুব সুন্দর লাগতো। সাধারণত দেখা যায় ২/৩ বছরের বাচ্চারা চঞ্চল থাকে। এটা ধরে ওটা ধরে, জিনিসপত্র নষ্ট করে কিন্তু শহীদ মাসুমের বেলায় এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মাসুম শান্ত ভদ্র পরিচ্ছন্ন ছিল। যেখানে বসিয়ে রাখা হত সেখানে শান্তভাবে বসে থাকতো। আমি প্রতিদিন অফিস থেকে বাসায় আসার পর দুপুরে নাতিকে ছাড়া ভাত খেতাম না যদিও নানু খালারা ঠিক সময়ে খাবার খাওয়াতো। শিশুকালে আমাদের বাসায় মাসুমের উপস্থিতিতে আমাদের ঘরখানা আলোকিত হয়ে থাকতো। নানু-নানা খালা মামা চাচা-চাচীদের আদরের টুকরা ছিল মাসুম।

শহীদ মাসুমের বয়স তখন ২/৩ বছর এর বেশি ছিল না ঐ সময় আমাদের এলাকায় আল্লামা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী এসেছিলেন। উনার সাথে আরো জামায়াতি ভাইরাও ছিলেন সবাই আমার বাসায় আসলেন ও বসলেন। শহীদ মাসুম মেহমানদের সামনে এগিয়ে গেল নাশতা হাতে নিয়ে।

মাওলানা সাঈদী সাহেব মাসুমের পরিচয় জানলেন ও ছোট্ট সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুমকে কোলে নিয়ে আদর করলেন ও দোয়া করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আরামিন হয়তো সেই সময়ে আলেমের দোয়া কবুল করে নিলেন। শহীদ মাসুম সাঈদী সাহেবের ভক্ত ছিল। উনার ওয়াজ খুব পছন্দ করতো ভিসিডি এনে কম্পিউটারের সামনে বোনদের নিয়ে ওয়াজ শুনতো। তাফসীর শুনার জন্য সব সময় ছুটে যেত মাহফিলে। ওর ছোট বোনদের সামনে সাঈদী সাহেব সেজে ওয়াজ করার অভিনয় করতো। বড়ই সৌভাগ্য আমার নাতির। যার দোয়া পেয়েছে শিশু বয়সে, সেই আলেমই আমার নাতির জানাজার নামাজ



icsbook.info

পড়ায়েছেন। শহীদ মাসুম নিজের ঈদের জুতা কেনার টাকাটা ইফতার মাহফিলে দিয়ে দিয়েছিল। সে সবাইকে বিলিয়ে খুব আনন্দ পেত। তার খুব আত্মসম্মানবোধ ছিল। কারো কাছে কোন কিছু চাওয়ার চেয়ে বিলিয়ে দেয়াতে আনন্দ পেত।

শহীদ মাসুম আমাদের খুব ভক্ত ছিল। বিএএফ শাহীন কলেজে পড়ার কালে বাগান বাড়ির বাসায় ফেরার আগে নানা নানু ছোট খালা কুমকুমের সাথে দেখা না করে বাসায় ফিরতো না। ২০০৬ এর রোজার ঈদের পরের দিন লাল রং-এর ফতুয়া পরে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল। নানুর হাতের ডিম আর এক গ্লাস দুধ ছিল শহীদ মাসুমের নানুর বাড়ির শেষ খাবার। সেই দিনই তার সাথে আমার শেষ দেখা হল।

আমার ৪র্থ মেয়ে সাবিকুন্নাহার মুন্নী ও জামাতা মতিউর রহমান আকন্দ ওদের গ্রামের বাড়ি থেকে ঈদ করে মায়াকাননে আমাদের সাথে ঈদের সালাতের জন্য এসেছিল। তখন শহীদ মাসুম খালা খালুকে দেখে কুশল বিনিময় করে খালুর সাথে শেষ কোলাকুলি করল। ওর গায়ে ছিল লাল ফতুয়া। মুন্নী বলল মাসুমকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার উজ্জ্বল চেহারা দেখে মুন্নী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখনো মুন্নী জানতো না মাসুম ২ দিন পরে শহীদ হয়ে যাবে। শহীদি পবিত্রতায় তার চেহারা জ্বলজ্বল করছিল। মুন্নী বাসায় গিয়ে জামাতা মিয়ার কাছে এ কথা বর্ণনা করেছিল। এখন শহীদ হওয়ার পর এই কথাগুলো আলোচিত হয়। আল্লাহপাক ওকে শহীদ করবেন বলে এত সুন্দর করে বানিয়েছেন।

আমরা গোটা পরিবার ইসলামী আন্দোলন করছি। নানার বাড়িই হল ওর হাতে খড়ি ওর রক্তের শিরায় শিরায় ইসলামের বীজ ঢুকে গিয়েছিল। পুরোপুরি ইসলামিক পরিবেশেই বড় হয়েছে। আমার নাতি খুবই ইসলাম পাগল ছিল মাসুম ইসলামের পথে প্রাণ দিয়েছে, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছুতে হতে পারে না। আমার বাবা ছিলেন পেশ ইমাম। বোম্বে হান্ডিওয়ালা মসজিদের। বৃটিশ আমলে। আমাদের ভিতরে ইসলামের টান সংগঠনে ঢুকার পূর্ব থেকেই ছিল। প্রথমে জামায়াতের দাওয়াত পেয়েছি ঢাকার গোড়ান এলাকার রোকন কাসেম ভাই থেকে। ইনি এখন বেঁচে নেই আল্লাহ উনাকে বেহেস্ত দান করুন। কোরআন পড়েছি আয়াত শরীফ মুখস্ত করেছি, নোট করেছি। হাকিকত সিরিজ পড়লাম তার পর থেকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গোটা পরিবার নেমে গেলাম। আমার বাসায় সাপ্তাহিক বৈঠকগুলো হতো। তখনকার সময়ে আমার বাসা ছিল এই এলাকার জামায়াতের ঘাঁটি। আমি আমার স্ত্রী, মেয়ে ছেলেদেরকে এই পথে এগিয়ে দিলাম। আমরা প্রথমে স্বামী স্ত্রী দু'জন রুকনিয়াত গ্রহণ করলাম আল্লাহর ইচ্ছায়। তারপর শুরু হল দু'জনের কাজের তৎপরতা।

আমি আমার অফিস টাইমের পরে বিকেলে ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদে দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়মিত রোগি দেখতাম ও রোগিদের কোরআন হাদীসের দাওয়াত দিতাম ও জামাতের দাওয়াত দিতাম। এই দাওয়াত দানের কারণে মানুষের ভিতর জামায়াত সম্পর্কে সুধারণা ও সমর্থন বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ কারণে আশেপাশের ইসলামের শত্রুরা ইর্ষান্বিত হয়ে উঠল। সন্ত্রাসী দিয়ে আমাকে মেরে ফেলার ফন্দি এঁটেছিল। খুব সম্ভব ১৯৯২ সালের কথা : সন্ত্রাসী আমার দুই হাতের বাহুতে গজারের লাঠি দিয়ে সজোড়ে



icsbook.info

আঘাত করার ফলে আমার হাত ফেটে রক্ত ঝরে সাদা লম্বা কোর্তা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। সন্ত্রাসীরা আমার বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। এদের মধ্যে একজন বাঁধা দিচ্ছিল। সেই সন্ত্রাসী ধাক্কা দিয়ে ছুরি সরিয়ে দিল এভাবে আমি বেঁচে গেলাম, সবই আল্লাহর ইচ্ছা তা না হলে আমি এখন আল্লাহর কাছে শহীদ হিসাবে থাকতাম। আমার সেই সৌভাগ্য হল না। আমি শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে পারলাম না। এভাবে আমাকে জামায়াতের কাজের জন্য মার খেতে হল।

আমার নাতি শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম বড়ই ভাগ্যবান। সে আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে। আল্লাহর দেয়া জীবন আল্লাহর পথেই খরচ করেছে। ওর হিসাব সহজ। সন্ত্রাসীরা আমাকে মেরে রক্তাক্ত করেছে কিন্তু আমি ব্যথা পাইনি। আমি উপলব্ধি করতে পারছি কিছুটা হলেও যে, শহীদরা ব্যথা পায় না। আমার নাতি মাসুম কষ্ট পায় নাই। আমিও যেন মৃত্যুর সময় আমার নাতির মত মৃত্যু কষ্ট ছাড়া মরতে পারি এই দোয়াই করি।

নাতিটা আমার সময় পেলেই শহীদের গানগুলো শুনতো।

"মরতেই হবে যখন
শহীদি মরণ দিও আমাকে
রোগে শোকে মরণ দিও না আমার..."

ওর আশা আল্লাহ পূরণ করেছেন। ওর ব্যক্তিগত ডাইরিতে নিজ হাতে লিখেছিল "শাহাদাতই দেবে মুক্তি"।

যদিও ইসলামের শত্রুতাই আমার নাতিকে হত্যা করেছে দুনিয়ায় দৃষ্টিতে মনে হয়। আসলে আমার নাতি অনেক সহজে আল্লাহ পাকের কাছে চলে গিয়েছে। আমি জানি কেমন করে আল্লাহর কাছে যাব সেই চিন্তাই করি। আল্লাহ যেন আমাকে ও আমার আদরের নাতির মত সহজভাবে কবুল করে নিন সেই দোয়া করছি। শত শহীদ নাতিদের রক্তের বিনিময়ে যেন এদেশে ইসলাম কায়েম হয়। দেশের মানুষ শান্তিতে ঈমান নিয়ে যেন বেঁচে থাকতে পারে–আমীন।

---

*লেখক : শহীদ মাসুমের নানা*



icsbook.info

# আমার ভাইয়া শহীদ ফয়সাল

ফাহমিদ আল ফারিদ

আমার ইলেকট্রনিক্স ব্যবহারিক পরীক্ষা; আমি খুব ব্যস্ত। হঠাৎ মনটা খারাপ লাগছে। মনে হলো এলাকার সংগঠনের লোকজনদের খোঁজ খবর নেই। ফোন করলাম আমাদের ফতুল্লা থানার সভাপতি তারেক ভাইকে। তারেক ভাই আমার খোঁজ-খবর নেয়ার পর বললেন, ফাহমিদ ভাই সব শহীদদের এক সাথে একটি পান্ডুলিপি বের হচ্ছে, আপনি কি জানেন? আমার আসলে জানা ছিল না। তিনি আমাকে পান্ডুলিপিতে ছাপানোর জন্য একটি লেখা পাঠাতে বললেন। আমি বললাম – পরে ছাত্র সংবাদে লেখা পাঠাবো, এখন ব্যস্ততার মাঝে লেখা সম্ভব হবে না। তারেক ভাই বললেন, এত সুন্দর একটা পান্ডুলিপি হবে আর আপনি লিখা দিবেন না! বেশি সময় লাগবে না লিখে ফেলেন একটু।

আসলে ছোট থেকে যে ভাইয়ার সাথে বড় হয়েছি, তার কথা কি সামান্য পরিসরে প্রকাশ করা সম্ভব? ভাইয়ার যে ভাল গুণগুলো ছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। ভাইয়া আমার কিছু বড় হলেও ভাইয়া যে আমাদের মাঝে নেই তা কখনো কল্পনাও করতে পারি না। নীরবে যখন একা ভাবি তখন কান্নায় বুক ভেসে যায়। তখন নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দেই। আল্লাহ্ যদি ভাইয়াকে শহীদের মর্যাদা দিয়েই থাকেন তাহলে আফসোসের তো কিছু নেই। ইসলাম তো আমাদের শিক্ষা দেয় প্রত্যেকের সর্বোচ্চ ভালোটাই কামনা করার। দুনিয়া ও আখিরাতে শাহাদাতের চেয়ে কি আর বড় কোন মর্যাদা আছে? যদি নাই থাকে তবে আমরা আফসোস করবো কেন। তাই প্রত্যেকেরই উচিৎ নিজের জন্য শাহাদাত কামনার পাশাপাশি অন্যের জন্যও শাহাদাত কামনা করা। তাই আমি নিজেও দোয়া করি এবং সবার কাছে দোয়া চাই আল্লাহ্ যেন ভাইয়াকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। আর আমার জন্য সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি, আমিও যেন ভাইয়ার মত শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করতে পারি। আগে ভাইয়ার শাহাদাত সম্পর্কে কিছু বলি।

আপনারা হয়তো জানেন পড়াশুনার পাশাপাশি ভাইয়ার আরো অনেক ব্যস্ততা ছিল। ব্যস্ততার মাঝেও তিনি দ্বীন-ইসলাম নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা ও সময়ের কোরবানি করতেন। বইপড়া ছিল তাঁর প্রিয় শখ। তাই ভাইয়ার জ্ঞানের পরিধিও ছিল অনেক বিস্তৃত। যাই হোক, গত ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর কয়েকদিন আগে থেকেই দেশের সার্বিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। ২৮ অক্টোবরের আগেও সন্ত্রাসী-চক্রআমাদের



icsbook.info

কয়েকজন ভাইকে শহীদ করেছিল। গাজীপুরের জামাতের একজনকে শহীদ করার কথা ভাইয়াই প্রথমে বাসায় দিয়েছিল। ভাইয়া ওনাকে নিয়ে অনেক দু:খ করেছিল। ভাইয়া বলেছিল, ইসলামের এই দুর্দিনে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। ২৮ অক্টোবরের দুইদিন আগেই তো ছিল রমজানের ঈদ। রমজানের শেষের দিকে বেশ কিছুদিন আমি বাড়িতে ছিলাম। রমজানে অনেক সময়ই কাটতো ভাইয়ার সাথে ইসলামী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করে। ভাইয়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিচিত মুখ ছিল। ভাইয়ার বিনম্র ব্যবহার ও চারিত্রিক মাধুর্য মানুষকে আকৃষ্ট করতো। ভাইয়া সবসময় মানুষকে খুব আপন করে নিতো। দেখা হলেই সবার সাথে সালাম বিনিময় করতেন। ভাইয়া জ.বি. এর কোন বড় দায়িত্বশীল ছিল না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি নিজামুল হক নাঈম ভাই থেকে শুরু করে সকল দায়িত্বশীল এর সাথে ছিল অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক। তারা সবাই ভাইয়াকে ভালোবাসতো এবং সম্মান করতো। ভাইয়া বলতো– "আমি যখন সংগঠনের ভাইদের হোস্টেলে যেতাম তখন তারা আমাকে ভাত না খাইয়ে ছাড়তো না। এবং বলতো ফয়সল ভাই ম্যাসে চলে আসেন। ভাইয়া তখন বলতো পারিবারিক সেই কঠিন ব্যস্ততার কথা।" যাই হোক যে জন্য জগন্নাথের ভাইদের কথা বলা। এই রমজানে জগন্নাথের ভাইরা বললো– "ফয়সল ভাই আমরা আপনার বাসায় যাবো"। ভাইয়ার সাথে মধুর সম্পর্ক থাকার কারণেই তো তারা এভাবে বলেছিল। ভাইয়া বলেছিল আপনারা যখন সময় পান ফোন করে চলে আসবেন।" জগন্নাথের ভাইরা সম্ভবত ২৫ রমজানের দিকে বাসায় এসেছিলেন। নাঈম ভাইয়াসহ সবার সাথে আমার অনেক আলোচনা হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছিল। আমার মেজ ভাইয়া ফাহাদ বিন আহছানও তখন ছিল। ভাইয়াও জ.বি. এর ছাত্র ছিল। ফলে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বড় ভাইকে পেয়ে তারাও জ.বি-এর বর্তমান পরিস্থিতি সমন্ধে ফাহাদ ভাইয়ার সাথে আলোচনা করলো। এবার একটু ফাহাদ ভাইয়া সম্পর্কে বলি।

ছোট থেকেই ফাহাদ ভাইয়া খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। একাডেমিক রেজাল্ট সবসময় ভাল ছিল। ফাহাদ ভাইয়ার সাথে ফয়সল ভাইয়ার বয়সের পার্থক্য ছিল খুব কম। তাই ভাইয়াদের মধ্যে ছিল ভাল সম্পর্ক। আব্বা মারা যাওয়ার পর থেকে ফাহাদ এবং ফয়সল ভাইয়া পরামর্শ করে সকল পারিবারিক কাজ করতো। তারা দু'জনে মিলেই আমাদের ব্যবসা পরিচালনা করতো। ভাইয়াদের মধ্যে এত বোঝাপড়া দেখে মানুষ হিংসা করতো। ফাহাদ ভাইয়া ফয়সল ভাইয়াকে ছাড়া কোন কাজ করার কথা কল্পনাও করতো না। এই ফাহাদ ভাইয়া ও ফয়সল ভাইয়া দু'জনেই এক সাথে গত ২৮ অক্টোবর গুরুতর আহত হয়েছিল। এই ঘটনা পরে আলোচনা করছি। যাই হোক, জগন্নাথের ভাইদের নিয়ে আমরা সবাই ইফতার করলাম। ইফতারের পর খাবারের ব্যবস্থা হলো। এলাকার দায়িত্বশীলদের মধ্যে আরো ছিল আমার স্কুলবন্ধু সংগঠনের সদস্য মোরশেদ, তৎকালীন থানা সভাপতি আ: রহীম ভাই ও শহর শাখার দায়িত্বশীল মাসুদ ভাই ও আরো কয়েকজন। ফয়সাল ভাইয়া সবাইকেই খুব আদর আপ্যায়ন করলেন। শেষ বিদায়টা জগন্নাথের ভাইরা যেন ঠিক এভাবেই নিল। রমজান শেষে ঈদ হল। ভাইয়াকে সাথে নিয়ে ঈদের নামায পড়লাম। ভাইয়া এবার ঈদে কেন জানি কারো বাসায় গেল না। ঘরে ঘুমিয়েই কাটালো। ঈদের পর দিন থেকেই দেশের সার্বিক অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছিল। চ.বি.তেও তখন আতঙ্কজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। সংগঠনের ভাইরা ২৭ অক্টোবরের মধ্যে ক্যাম্পাসে পৌছানোর কথা বলে দিয়েছিল। আমাকে নিয়ে ভাইয়াদের ও আম্মার



icsbook.info

ছিল যত দুশ্চিন্তা। সাংগঠনিক পরিবার হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ভাইয়ারা ও আম্মা ক্যাম্পাসে আসার অনুমতি দিল। ২৭ অক্টোবর বিকাল চারটায় আমাকে বাসে উঠিয়ে দেয়ার জন্য ফয়সাল ভাইয়া রওনা হলো। পথে ভাইয়া আমার ব্যাগটা নিজ কাঁধে নিলো। আমাকে ধরতেও দিলো না। বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালাম সাড়ে চারটার দিকে। তখনও ভাবিনি এটা ছিল ভাইয়ার সাথে আমার শেষ দেখা। আমার বাস যখন ছেড়ে দিল ভাইয়া তখন ফোন করলো জ.বি. সভাপতি নাঈম ভাই এর কাছে। জ.বি. পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়ে বলল, যে কোন পরিস্থিতিতে ভাইয়াকে যেন ডাকা হয়। ২৭ অক্টোবর বিকাল থেকেই আওয়ামী সন্ত্রাসীরা রাস্তা-ঘাটে ব্যারিকেড দেয়া শুরু করেছিল। ফয়সাল ভাইয়া আমাকে একটু পরে পরে ফোন করে খোঁজ নিচ্ছিল। কোন সমস্যা হচ্ছে কি না। সেদিন থেকেই আম্মার মন খুব খারাপ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানো পর্যন্ত ভাইয়া এভাবে ফোন করে খোঁজ নিচ্ছিল এবং আম্মার দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য আম্মাকে অবগত করছিল। হলে যখন পৌঁছালাম তখন আবার ভাইয়া ফোন দিল এবং আম্মার সাথে কথা বলিয়ে দিল। ২৮ অক্টোবর সকাল বেলা ফজর পড়ে ভাইয়া শেষবারের মত ফোন করলো। আম্মার সাথেও কথা বললাম। তারপর বিকাল পর্যন্ত কোন যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ মনে হলো একটু বাসায় ফোন করা দরকার। এমন সময় বড় ভাইয়া ফোন করলো "ফাহমিদরে!... কারা জানি... আমাদের দুই ভাইকে মাথা ফাটিয়ে চিটাগাং রোডে ফেলে রেখেছে"। ভাইয়া বলছে আর বাসার দিকে দৌড়াচ্ছে। বাসায় এসে মোবাইলটা ঢিল মেরে ফেলে প্যান্টটা পরে দৌড়ালো চিটাগাং রোডের দিকে। ঘরের সবার আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছে কিন্তু কেউ কথা বলছে না। হঠাৎ মোবাইলের লাইন কেটে গেল"। সেই দিন সকালে রীতিমতই ভাইয়ারা সকল কাজকর্ম করছিল এবং দোকানে বসে আমার খালুজানের সাথে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করছিল। এমন সময় দুপুর বারোটার দিকে খবর আসলো আওয়ামী সন্ত্রাসীরা জামায়াত-শিবিরের থানা অফিসে হামলা করেছে অনেক ভাংচুর করেছে এবং অনেকে আহত হয়েছে। ভাইয়ারা দোকান-পাট বন্ধ করে বাসায় আসলো। কোন কিছু না খেয়ে ভাইয়ারা আম্মার অনুমতি নিয়ে খালুজানদের সাথে থানা অফিসে চলে গেল। আম্মাও নির্দ্বিধায় অনুমতি দিলেন। আম্মা চিন্তা করলেন "ইসলামের এই দুর্দিনে সব মায়েরা যদি তার সন্তানদেরকে ঘরে বসিয়ে রাখে তাহলে কারা এগিয়ে আসবে। যারা দুর্দিনে অগ্রসর ভূমিকা পালন করছেন তারাও তো কোন মায়ের সন্তান"। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে খালুজানরা, বড় ভাইয়া, খালাতো ভাই সবাই দুপুরের খাওয়ার জন্য বাসায় আসলো কিন্তু ফাহাদ ভাইয়া ও ফয়সাল ভাইয়া বললো "আমরা বাসায় যাবো না এখানে থাকতে হবে। প্রয়োজনে রুটি কলা খেয়ে নেবো।" ভাইয়াদের বাসায় আর আসা হলো না। ভাইয়ারাসহ আরো ৬০-৭০ জন থানা অফিসে ছিল। সেখানে সবাই আসর পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। এমন সময় থানা আমীরকে জোটের এমপি গিয়াসউদ্দিন (দুর্নীতির দায়ে বর্তমানে তিনি জেলে) ফোন করলো চিটাগাং রোড চৌরাস্তায় বিএনপি এর সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য। এদিকে আওয়ামী ৭০০-৮০০ জন সন্ত্রাসী লগি-বৈঠা নিয়ে মিছিল করতে করতে চৌরাস্তার দিকে আসছে। অবস্থা বুঝতে পেরে দুর্নীতিবাজ গিয়াসউদ্দিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা চৌরাস্তা ত্যাগ করে। এমনকি তাদের চলে যাওয়ার বিষয়টি থানা আমীরকে জানায়নি। থানা আমীর তার সাথে মাত্র ৬০-৭০ জন নিয়ে চৌরাস্তার দিকে রওয়ানা হন। তিনি সেদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। সে সময় তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপই ছিল ভুল। তিনি সুযোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন। নেতৃত্বের অযোগ্যতাই সেদিন দুর্ঘটনার মূল কারণ। তথ্য নেয়ার জন্য যে দুজনকে পাঠানো



icsbook.info

হয়েছিল তারা ছিল বয়সে ছোট এবং তাদের কাছে কোন মোবাইল ফোন ছিল না। সমাবেশে যোগ দেয়ার আগে শিবিরের শহর সভাপতি ও জেলা সভাপতির সাথেও আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব তো দিতে হয় বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার সাথে। আমরা তো সেই মুসলিম জাতি যারা ৩১৩ জন বিজয় লাভ করেছিল ১০০০ জনের সাথে। এক ওসমানের হত্যার বদলা নেয়ার জন্য ১৪শ সাহাবী রাসূলের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুঃখ হয় সেদিন ৭-৮ জন মর্দে মুজাহিদ চিটাগাং রোডে সন্ত্রাসীদের মোকাবিলায় খালিস নিয়তে অগ্রসর হয়। আর বাকী সবাই পিছু হটে। এক্ষেত্রেও দোষটা দিতে হয় নেতৃত্বের উপর। কারণ তিনি সন্ত্রাসীদের মুখামুখি হওয়ার আগে যতটুকু সময় পান তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত দিলেও সবাই নিরাপদে সরে যেতে পারতো। তাছাড়া আমীর সাহেব সবাইকে নিয়ে বের হওয়ার সময় এমন কোন উজ্জীবিত করার মত বক্তব্যও প্রদান করেন নি যে "শহীদ হতে হলে আমরা এক সাথে শহীদ হবো অথবা স্থান সবাই একসাথে ত্যাগ করবো। যাইহোক সন্ত্রাসীরা যেই ৭-৮ জনকে লাঠি-বৈঠা দিয়ে প্রচুর মারলো। প্রথমে গুরুতর আহত করেছিল একজন জামায়াত কর্মীকে। তারপর ফাহাদ ভাইয়াকে ধরে চারিদিকে বেরিকেড দিয়ে পেটাতে শুরু করে। ফয়সাল ভাইয়া একটু পাশের দিকে ছিল। ফয়সাল ভাইয়া দৌড়ে আসলো ফাহাদ ভাইয়াকে যেখানে মারছিল সেখানে। ফয়সাল ভাইয়া কোন কথা বলার আগেই লগি-বৈঠা দিয়ে ভাইয়ার মাথা থেতলে দিল। ভাইয়া সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সন্ত্রাসীরা ফাহাদ ভাইয়া এবং ফয়সাল ভাইয়া দু' জনেরই মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে মনে করে চলে গেল। ফাহাদ ভাইয়ার জ্ঞান একটু ছিল। ফাহাদ ভাইয়া বললো– "ফয়সালকে যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখলাম তখন আমার মনে হলো ফয়সাল আর বুঝি নাই। তবে আমার মনে হচ্ছে সন্ত্রাসীরা আমাকে যখন মারছিল আমার কোন ব্যথা লাগেনি শুধু শব্দ শুনতে পেয়েছি। আমার মনে হয় ফয়সালেরও কোন কষ্ট হয়নি।"

আমি উপরের আলোচনাটি শুধু করেছি মূলঘটনা জানানোর জন্য। এটা নিয়ে আফসোসের কিছু নেই। যা ঘটে আল্লাহর হুকুমেই ঘটে। তাকদীরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে, এ ঘটনা থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এবং ভবিষ্যতে যে কোন ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। আগের ঘটনায় ফিরে আসি। বড় ভাইয়া ইতোমধ্যে চিটাগাং রোড পৌঁছে গেছে। আম্মা বাহিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আম্মা অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল। যে কোন বিপদকেই আম্মা সবসময় ধৈর্য্যের সাথে মোকাবিলা করেন। আম্মা তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। আম্মার এসএসসি পরীক্ষা যখন সামনে তখন নানা মারা যান। বোনদের মধ্যে সবার বড় হওয়ায় তখন থেকেই আম্মার অনেক দায়িত্ব পালন করতে হতো। আমার নানু (জামায়াতের রুকন) বলেছেন– যে ছয়জন নিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা প্রতিষ্ঠা হয় আম্মা তাদের মধ্যে একজন। আব্বা একজন মাওলানা এবং অত্যন্ত সৎ মানুষ হওয়ায় সংসারে সারা জীবনই আম্মাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু আম্মা কখনো ধৈর্য্যহারা হননি। ২০০৩ সালে আব্বা হঠাৎ ব্রেন স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করায় আমাদের পুরো পরিবার পড়ে যাই এক মহাবিপদে। সবাই পড়ালেখা করছি কিন্তু আয়ের পথ বন্ধ। এরপর ভাইয়াদের পড়াশুনার পাশাপাশি করতে হয় আয়-উপার্জনের সংগ্রাম। আম্মা ধৈর্য্যসহকারে ভাইয়াদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে আল্লাহর রহমতে আমাদের মধ্যে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আমাদের পারিবারিক জীবনে নেমে আসে আঁধার।



icsbook.info

আম্মা তারপরও এখনও ধৈর্য্য হারা হননি। আম্মা এসবের প্রতিদান শুধু আল্লাহর কাছেই পেতে চান। আপনাদের সবার কাছে আম্মার জন্য দোয়া প্রার্থী। আম্মাকে যেন আল্লাহ আরও ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করেন এবং হায়াতে তায়্যিবা দান করেন। যাই হোক আম্মা বোরখা পরে চিটাগাং রোডের উদ্দেশ্যে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। বাইরে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি। কোন মহিলা মানুষ নেই, সব পুরুষ। আম্মা দ্রুত হাঁটছেন। প্রথমে থানা অফিসের কাছে গেলেন। দেখলেন গেট বন্ধ। তারপর শুভেচ্ছা ক্লিনিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কোন হদিস মিললো না। আম্মা ধীরে ধীরে চৌরাস্তার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সামনে দেখছেন অনেক মানুষ এবং পুলিশ জড়ো হয়ে আছে। আম্মা অগ্রসর হচ্ছেন– হঠাৎ একটা মাইক্রোর মধ্যে ফুয়াদ ভাইয়ার গেঞ্জি দেখতে পেলেন। আম্মার অজান্তে মুখে চিৎকার চলে আসলো "ফুয়াদরে"। এলাকার একটা ছেলে আম্মাকে চিনতে পেরে বললো এটাতো ফয়সালের আম্মা। আম্মাকে দেখে সবাই সরে দাঁড়ালো এবং মাইক্রোবাসের দিকে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো। আম্মা উঠলেন। ফুয়াদ ভাইয়া ফয়সাল ভাইয়ার কাছে থাকলো এবং আম্মাকে ফাহাদ ভাইয়ার কাছে থাকতে দিল। মাইক্রোবাস ইসলামী ব্যাংক হসপিটালে চলে আসলো। দু'জনকেই সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংক হসপিটালের সম্ভবত ৮ম তলায় নিয়ে গেল। ফয়সাল ভাইয়াকে আবার নামিয়ে এম্বুলেন্সে করে ইবনে সিনাতে নিয়ে যাওয়া হল। ফাহাদ ভাইয়ার সাথে আম্মা থাকলো এবং ফয়সাল ভাইয়ার সাথে ফুয়াদ ভাইয়া ইবনে সিনাতে গেল। ফয়সাল ভাইয়াকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হলো।

এদিকে আমার বড় মামা ও মেজ মামা (উভয়েই জামায়াতের রুকন) এবং বড় মামার ছেলে রিফাত ও রিয়াদ পল্টনে ছিল। রিফাত আহত হয়। মামারা ভাইয়াদের খবর শুনে সবাই হসপিটালে চলে আসে। এদিকে আমি প্রত্যেকটি অবস্থা ফোনের মাধ্যমে জেনে নিচ্ছি। বাসায় ফোন করে ছোট ভাই-বোন ও বড় আপুকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এবং হসপিটালে খোঁজ নিচ্ছি। আমি তখনি রওনা দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু সবাই আমাকে নিষেধ করেছে। রাত এগারোটা পর্যন্ত এভাবেই কাটলো। রাত ঠিক এগারোটার দিকে ফুয়াদ ভাইয়া ফোন করে আমাকে বলছে– "ফাহমিদ যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকো। মানসিকভাবে শক্ত হও। তখনি আমি ভেবেছিলাম ভাইয়া আর হয়তো বাঁচবে না। সারারাত নির্ঘুম কাটলো। মনকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিলাম আর ফোন করে খোঁজ নিচ্ছিলাম। সতর্কতামূলকভাবে শাহ্ আমানত হলে কিছু সাথীভাই সারারাত হল পাহারায় ছিল। নাস্তা হিসেবে বিস্কুট ছিল তাদের কাছে। বিস্কুট খেয়ে রোজা রাখলাম। আমি বেহেশতী জিওর বের করে শাহাদাত অধ্যায় পড়ছিলাম। আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলাম এই কঠিন বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দেয়ার জন্য। সকাল বেলা ছোট ভাই নাকিবকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আর পারলাম না গলা ধরে এলো....।

নাকিব বলছে, "আমার ফয়সাল ভাইয়া নাই... ভাইয়া। আমি কেঁদে ফেললাম...।" তার একটু পরে মেজ মামা ফোন করলো, "ফাহমিদ তুমি ঢাকা চলে এসো"। আমি বলছি, ভাইয়ার কি অবস্থা আমাকে বলেন। মামা ফোনের লাইনটা কেটে দিল। আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না। আমি কাঁদছি আর রওনা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমার রুমমেট হাসান ভাইকে বললাম, সভাপতিকে খবর দেবার জন্য। সেক্রেটারিমাহবুব ভাই আসলেন এবং আমাদের এক সাথীভাই ফরহাদ ভাইকে আমার সাথে দিয়ে দিলেন। সকাল ৮টার সময় রওনা করলাম। ট্রেন, টেম্পু, রিক্সা, মাইক্রো, বেবিতে পর্যায়ক্রমে চড়ে সারা পথ ফরহাদ ভাইকে নিয়ে চললাম। রাত ১টার দিকে বাসায় পৌঁছলাম।



icsbook.info

এদিকে ভাইয়া যে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শাহাদাত বরণ করেছেন তা আমি তখনও নিশ্চিত ছিলাম না। বাসায় অল্প ভাত ছিল ফরহাদ ভাই ও আমাকে খেতে দিলেন মেজ খালামনি। খালামনি মহিলা জামায়াতের থানা নাজেম। খালামনি আমাদেরকে উনাদের বাসায় নিয়ে গেলেন। ফরহাদ ভাই ও আমি নামায শেষ করলাম। খালামনি আমাকে তাফহীমূল কুরআন ১ম খন্ড দিয়ে বললেন, "ফাহমিদ ১৫৪ নাম্বার আয়াতটি একটু পড়"। "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত বল না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা বুঝতে পারো না..."।

তখন আমি ভাইয়ার শাহাদাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম। আম্মা ও বড় ভাইয়াকেও ভাইয়ার শাহাদাতের কথা না জানিয়ে হসপিটাল থেকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ জন্য তারাও পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। খালামনি আমাকেই প্রথম জানালেন এবং বললেন, "ফাহমিদ তুমি তো বুঝ; ধৈর্য্য ধারণ করো"। ফরহাদ ভাই ঘুমালেন। সকালে ফজর পড়লাম বাসায়। আম্মাও জানলো। আম্মাকে আমি সান্ত্বনা দিচ্ছি, আম্মাও আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বাসায় মানুষের ঢল পড়ে গেছে। এলাকার হাজারো মানুষ ছোট থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত ফয়সাল ভাইয়ার ছাত্র-ছাত্রীরা কাঁদছে। তারা আমাদের কি সান্ত্বনা দিবে, তারা নিজেরাই কেঁদে অস্থির। সেদিন জনসাধারণের মুখে সান্ত্বনার ভাষা ছিল না। আমাদেরতো একটা সান্ত্বনা ছিল, আল্লাহ্ ভাইয়াকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের তো কোন বুঝ ছিল না। তারা শুধু আফসোস করছিল "হায় কি হলো", "কেন ওরা ওখানে গেল?", "কারা ওদের এমন করল", "এমন অমায়িক, বিনম্র, ছেলেগুলোকে কিভাবে নরপিশাচরা মারলো" ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে আমিই তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। এলাকায় তখনও আতঙ্ক বিরাজ করছে। "শহীদের লাশ অতি শীঘ্রই নিয়ে আসা হবে" এমনটি বলা হচ্ছে। কিন্তু কখন আনা হবে নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে না। কারণ আওয়ামী নরপশুরা তখনও ওঁৎপেতে ছিল। যে কোন সময় আবারো হামলা করতে পারে, এ জন্যই ছিল সতর্কতা। হাজারো জনতা অপেক্ষা করছে শহীদের লাশের জন্য। অবশেষে আসরের দিকে শহীদের লাশ এসে পৌঁছলো। বাসার গেটের সামনে কফিন রাখা হলো। হাজারো মানুষ পর্যায়ক্রমেআসছিল শহীদের লাশটুকু একপলক দেখার জন্য। কিন্তু সবার দেখার সৌভাগ্য হল না। সদাহাস্য সেই আগের ফয়সালের মতই যেন শহীদের ঠোঁটে অকৃত্রিম হাসি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। লাশ দেখে একটুও বুঝা যাচ্ছিল না যে এত নির্মম আঘাত তার উপর করা হয়েছে। বাদ আছর জানাযার নামাজের সময় ঠিক করা হল। জানাযার নামাজে এত মানুষ হয়েছিল যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখা যাচ্ছিল না। সিদ্ধিরগঞ্জের মানুষ জীবনেও এত বড় জানাযার নামায দেখেনি। জানাযার নামাজের আগে আমার মেজ খালুজান (জামায়াতের বর্তমান থানা সেক্রেটারি)কিন্তু স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য প্রদান করলেন। ভাইয়া যে স্কুলে চাকরি করতো খালুজান সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আদর্শ একজন শিক্ষক হিসেবে ভাইয়ার যে ভূমিকা ছিল খালুজান সেগুলো তুলে ধরলেন। ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের তৎকালীন সভাপতি হাফেজ আবু তাহের ভাই শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে মাইক দেয়া হলো আমার ছোট চাচা মাওলানা মো: আমিনুল হককে। তিনি সংগঠনের ভাইদের আন্তরিকতা ও পরিশ্রম দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কখনো জামায়াত-শিবিরের সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু তিনি সেদিন মাইকে ঘোষণা দিলেন– "এখন থেকে আমি জামায়াত-শিবিরের জন্য যে কোন ধরনের সহযোগিতা করে যাবো"। জানাজার নামাজে ঈমামের দায়িত্ব পালন করলেন আমার বড়



icsbook.info

মামা সৈয়দ হাসান মাসউদ। নামায শেষে শহীদের লাশ সিদ্ধিরগঞ্জপুল কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেই দাফন করা হলো। এই কবরস্থানে আমার আব্বাকেও দাফন করা হয়েছিল। দাফন কার্যক্রম শেষ করে আমরা সবাই বাসায় চলে আসলাম। আমাদের সংগ্রাম তখনই শেষ হয়ে যায়নি। ফাহাদ ভাইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি। ফাহাদ ভাইয়ার কাছে তখনও বেশ কয়েকজন ছিল। সেজ ছেলেকে সমাধিস্থ করে আম্মা চলে গেলেন মেজ ছেলের সেবা শশ্রুষা করার জন্য। কয়েকদিনের মধ্যে ভাইয়ার শরীরের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। সমগ্র শরীরে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটানোর কারণে ভাইয়ার শরীর ফুলে গিয়েছিল।

ফয়সাল ভাইয়ার কথা মনে হলেই ফাহাদ ভাইয়ার চোখ দিয়ে শুধু পানি টপ টপ করে পড়তে থাকতো, আর ভাইয়া কোন কথা বলতো না। ভাইয়া আলেম মানুষ হওয়ায় কুরআন-হাদীসের দলীল পেশ করে আম্মাকে সান্ত্বনা দিত। মাসিক পৃথিবী নভেম্বর-২০০৬ সংখ্যায় বুখারী শরীফের একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছিল। আম্মাকে সেটা পড়ে শুনালাম– "মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সারা জীবন পরীক্ষা করে থাকেন। পরীক্ষা দিতে দিতে এমন একটা সময় আসে যখন মুমিন ব্যক্তির আর কোন গুনাহ্ থাকে না। তখন সে মৃত্যু বরণ করে।"

হাসপাতালে ভাইয়া দীর্ঘ ১৭ দিন ভর্তি ছিল। ঢা.বি.র দায়িত্বশীল এপ্লাইড কেমিস্ট্রির ফারুক ভাই এবং মারুফ ভাই হসপিটালে দেখা শুনার দায়িত্বে ছিলেন। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সংগঠনের সকল ভাইদের মধ্যে আমরাই সর্বশেষ ভাইয়াকে হসপিটাল থেকে বাসায় নিয়ে আসি। ভাইয়াকে একমাস বিশ্রামে থাকার জন্য ডাক্তার নির্দেশ দেন।

কিছু লোক ফয়সাল ভাইয়ার শাহাদাত সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিল। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন "কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য তার কোন ভাই এর সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং দুশমনের মোকাবেলায় মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তার মৃত্যুকে আপনি কি বলবেন?" অথবা "কোন ঈমানদার ও সহীহ্ আকীদা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি যদি কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে সেই মৃত্যুকে কি আপনি কোন সাধারণ মৃত্যু হিসাবে বিবেচনা করবেন?" সেদিন ফয়সাল ভাইয়াতো শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খালেছ নিয়তে স্রেফ একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ঘর ছেড়ে বের হয়েছিলেন। যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই আপনারা বিশ্লেষণ করেন না কেন, ভাইয়ার শাহাদাতকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আর কবুলের দায়িত্ব তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। এ ব্যাপারে তো কারো কথা বলার অধিকার নেই।

ফয়সাল ভাইয়া একজন ভাল আমলদার ব্যক্তি ছিলেন। আব্বা মারা যাওয়ার আগেই ভাইয়া দাড়ি রেখেছিলেন। আব্বাও খুব খুশি হয়েছিলেন। ছোট বেলা থেকেই মৃদুভাষী ছিলেন। কারো সাথে অহেতুক কোন তর্কে জড়াতেন না। দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে ভাইয়া কোরআনের সেই আয়াত অনুসরণ করতো– "তোমরা মানুষের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায় এবং সবরের নীতি অবলম্বন কর।" কোন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে ভাইয়া সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। ইসলামী আন্দোলন নিয়ে ভাইয়ার অনেক স্বপ্ন ছিল। আব্বাস আলী খান, সাতক্ষীরার মাওলানা নেয়ামত আলী খানের কথা খুব বেশি বলতেন। আফসোস করতো "আমরা ইসলামী আন্দোলনের সেই ধারা হারিয়ে ফেলতে



icsbook.info

বসেছি। আমরা বিলাসীতায় বুক ভাসিয়ে দিচ্ছি। আমাদের আমলের মধ্যে কমতি দেখা দিচ্ছে। ব্যবহারে আন্তরিকতার চেয়ে কৃত্রিমতাই বেশি দেখা যাচ্ছে।" আমরা যদি ইসলামী আন্দোলন পরিপূর্ণ খুলুসিয়াত নিয়ে না করি তাহলে এই ইসলামী আন্দোলন দিয়ে আমরা কোন ফায়দা হাসিল করতে পারবো না। আমরা ইসলামী আন্দোলনের দাবি কিছুটা আদায় করবো আর কিছুটা আদায় করবো না এমন করা যাবে না। আল্লাহ তো পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– "তোমরা পরিপূর্ণরূপে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।" আমরা মুখে মুখে ইসলামী আন্দোলনের কথা বলবো আর কাজে করবো আরেকটা এমনটা কখনোই মেনে নেয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমরা নিজেরা যা করি না তা অন্যকে উপদেশ দিয়ে থাকি। উর্ধ্বতন ভাইরা অধঃস্তন ভাইদের ক্ষেত্রে এমনটা করে থাকি। আমরা যতদিন পর্যন্ত নিজেদের আমলের পরিবর্তন না করবো, রাসূলের সুন্নাতকে পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে না ধরবো; ততোদিন পর্যন্ত আমরা যত কৌশলই অবলম্বন করি না কেন; আমাদের দাওয়াতি কাজ ফলদায়ক হবে না। আল্লাহ্ তায়াআলা তো পবিত্র কোরআনে বলেছেন– "তোমরা এমন কথা বল কেন যা নিজে কর না।"

রাসূলের সুন্নাতের ব্যাপারে আমাদের যত্নশীল হতে হবে। আল্লাহর রাসূল তো বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন– "আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটি হলো পবিত্র কুরআন ও আরেকটি হলো আমার সুন্নাত। যতদিন তোমরা এ দুটো আঁকড়ে থাকবে (ততদিন) পথভ্রষ্ট হবেনা।" সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ দুটোকেই আমাদের আঁকড়ে ধরতে হবে। বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণ অনুশীলন করতে হবে। আমাদের একটা কথা চিন্তা করা উচিৎ– "আমরা দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করতে চাচ্ছি; তাই আমাদের আমলে পরিপূর্ণতা আসা দরকার। আমাদের মধ্যে আমলের সামান্য খুঁত থাকলেও সেটা আমাদের দাওয়াতী কাজের ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আজকে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা নির্যাতিত নিপিড়িত। আফগানিস্তান, ইরাক, কাশ্মীর, সোমালিয়া ইত্যাদি দেশে আমাদের শত শত ভাই প্রতিদিন শাহাদাত বরণ করছে, আমাদের মা-বোনেরা লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে। এসবের জন্য আমাদের মন-প্রাণ কি তাদের জন্য একটুও কাঁদে না। ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের সেই ভ্রাতৃত্ববোধ কোথায়! আমরা ঈমানের কোন পর্যায়ে আছি? জিহাদ করা এই প্রেক্ষাপটে ফরজে আইন। আমরা এসব ব্যাপারে কতটুকু চিন্তা-ভাবনা করছি এবং পদক্ষেপ নিচ্ছি? সমগ্র বিশ্বের সকল অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ আমাদের করতে হবে। লাখো-লাখো শহীদ ভাইদের রক্তের বদলা আমাদের নিতে হবে। সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের হক আদায় করতে হবে। তাই আমাদেরকে "সমগ্র বিশ্বব্যাপী, কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী, ইকামাতে দ্বীনের জন্য, জিহাদের সর্বোচ্চ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, খিলাফতে আলা-মিন-হাজিয়্যিন নব্যুয়াৎ কায়েমের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে।"

পরিশেষে সবার কাছে আমার পরিবারের জন্য দোয়া চাচ্ছি। আমার লেখায় যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। "আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ইসলামের সঠিক বুঝ দান করুন এবং হক এর উপর আমৃত্যু টিকে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।" ■



icsbook.info

# আল্লাহভরসা

## শহীদ মুজাহিদের বড় চাচী

"অকালেই ঝরে গেল একটি তরতাজা ফুটন্ত গোলাপ। যে গোলাপটি ছিল আমাদের কে ছেড়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া সে শহীদ মুজাহিদ।"

মুজাহিদ ছিল আমাদের সবার অতি আদরের সন্তান, বাবা-মায়ের চোখের মণি বুকের মানিক, ভরা পূর্ণিমার রাতে পূর্বাকাশে উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র। কাজে, কর্মে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, সততা আর উদ্দীপনায় সে যেভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিল সত্যিই সে উজ্জ্বল নক্ষত্রই ছিল। সে ছিল এই সংসারের জ্বলন্ত এক প্রদীপ। এই প্রদীপের তৈল যে এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে সেটা কখনও ভাবিনি। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমি বলবো বাবা মুজাহিদ যে কত ভাল নিষ্পাপ চরিত্রের একটি সন্তান, তার চারিত্রিক গুণাবলির কথা লিখে শেষ করা যাবেনা। সে সৎ, ভদ্র ও আদর্শ চরিত্রের একটি সন্তান ছিল। তার সাথে যতবার দেখা হত ততো বার সে সালাম দিত। তার সব কিছুতে নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে নখ কাটতো, আমার থেকে কাটারটা নিয়ে। এখন সপ্তাহ ফিরে আসলে তার কথা খুব মনে পড়ে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। কখন কোন কারণে বাদ পড়লে সেটা সঙ্গে সঙ্গে বাসায় এসে পড়ে নিত। সে ছোট বেলা থেকে খুব ভাল স্বভাবের একটি সন্তান ছিল। তার সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো আমার খুবই ভাল লাগত। তাই আমি ওকে খুব পছন্দ করতাম। ছোট বড় সবার সাথে তার বন্ধুর মত সম্পর্ক, ছোট ভাই বোনদের খুব আদর করত, ভালোবাসতো। কখনও উচ্চস্বরে কথা বলা, রাগ করা, হিংসা, লোভ, ঘৃণা করা ওর মধ্যে কখনও এগুলো ছিলনা। বরং নিজের ক্ষতি করে হলেও অন্যের উপকার করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকত। একটি ছোট্ট ঘটনার কথা লিখলাম, একদিন সকালে মুজাহিদ ভার্সিটিতে যাবে কিন্তু ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরী হয়ে গেল তারপরও সে তাড়াহুড়ো করে রেডি হয়ে কাঁধে ব্যাগ হাতে বেল্ট নিয়ে ভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওনা হল। ওর যাওয়ার পথে ওর কাকার দোকান পড়ে। তখন আমি বললাম, মুজাহিদ বাবা তোমার কাকাকে নাস্তাটা দিয়ে দিও। সে নাস্তা নিয়ে চলে গেল। ওই খানে যাওয়ার পর ওর কাকা ওকে একটা পাউরুটি দিয়ে বলল, এটি বাসায় দিয়ে এসো। সে রুটি নিয়ে আবার বাসায় আসল। আমি ওকে দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তার হাতে কিন্তু বেল্টটা তখনও ছিল। আমি ওকে বললাম তুমি রুটি নিয়ে আসছো কেন? তোমার না



icsbook.info

দেরি হয়ে যাচ্ছে তুমি কাকাকে বলতা, মুজাহিদ আমাকে উত্তর দিল চাচী অসুবিধা নেই। সে দিনের ঘটনার কথা মনে পড়লে কান্নায় বুক ভেসে যায়। তার মধুর কণ্ঠে চাচী ডাকটা প্রতি মুহূর্তে কানে ভাসে। তার রেখে যাওয়া স্মৃতিগুলো সব সময় মনে দোলা দিয়ে যায়। সে যে কত ভদ্র নম্র একটি সন্তান একটা হিরের টুকরো ছেলে তার সাথে কাউকে তুলনা করা যাবে না। এই সমাজ ব্যবস্থা যে কত খারাপ তার মধ্যে এমন ধরণের ছেলে পাওয়াই দুস্কর। এই বয়সের ছেলেরা বড়দের সাথে কত বেয়াদবি করে কিন্তু সে কখনও বাবা-মা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কারো সাথে কখনো বেয়াদবি/ মনে কোন কষ্ট পাবে এমন কোন আচরণ করে নাই। নিজে কোন কষ্ট পেলেও সে অন্যকে বুঝতে দিত না। তাই মুজাহিদকে সবাই খুব ভালবাসতো। আমরা এত ভালবেসেও শহীদ মুজাহিদকে আমাদের মাঝে রাখতে পারিনি আমাদের থেকে আল্লাহ তায়ালা আরও অনেক বেশি ভালবেসেছিলেন। তাই তিনি যে ভাবে নিস্পাপ করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন সে ভাবে আবার আমাদের মাঝখান থেকে নিস্পাপ করে তুলে নিয়ে গেলেন। মুজাহিদের সব সময় কামনা ছিল সে যেন শহীদি মর্যাদা পায়। আল্লাহ তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন, আল্লাহ যেন তাকে শহীদ এর মর্যাদা দিয়ে কবুল করেন। সব সময় এই প্রার্থনা করি। আমাদের খারাপ লাগে এমন সন্তানকে হারিয়েছি যার অভাব কোন দিন পূরণ হবে না, তাকে কোন দিন ভুলা যাবে না। তবে আমার মতে এমন সন্তান পৃথিবীতে বেঁচে থাকারও প্রয়োজন আছে। তা না হলে এই পৃথিবী দিন দিন ধ্বংসের রসাতলে ধাবিত হবে। তবে একটাই দুঃখ যে সন্তানকে বাবা মা কোন দিন একটা টোকা দেয়নি সে সন্তানটিকে হায়েনারা কিভাবে পিটিয়ে শহীদ করলো? তাদের মনের ভিতর এতটুকু দয়া হল না। এই স্মৃতিগুলো মনে পড়লে চোখের পানি কোন অবস্থায় আটকাতে পারিনা। বুকের ভিতরটা হাহাকার করে, তবুও যদি এই শহীদদের রক্তের বিনিময়ে এই নরপশুদের কে আল্লাহ হেদায়েত নসীব করেন এই প্রার্থনা করি। আমরা আজ শহীদ মুজাহিদকে হারিয়ে বেদনায় বিধুর তবুও বলবো যে, শহীদ মুজাহিদ যে মর্যাদা সম্মান নিয়ে এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছে তার বাবা ও মা সত্যিই ভাগ্যবান/ভাগ্যবতী। কারণ এই দুনিয়ার মায়াতো একদিন আমাদের সবাইকে ত্যাগ করতে হবে। সবার ভাগ্যেতো এত সম্মান আর মর্যাদা জুটেনা। আজ এই শহীদ মুজাহিদের রক্তের বিনিময়ে সারা বিশ্বের মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলুক, ২৮ অক্টোবরের এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের স্মৃতি মানুষের মনকে জাগ্রত করুক, ভাল মন্দ বুঝার তৌফিক দান করুক এই কামনাই করি। আর বাংলার ঘরে ঘরে যেন শহীদ মুজাহিদের মত সন্তান জন্ম নেয়। তাহলে আর কোন মায়ের বুক খালি হবে না। দেশটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

শহীদ মুজাহিদের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। দুচোখের পানি দিয়ে লিখাগুলো লিখলাম, ওর কথা ভাবতে পারিনা, ভাবলে বুক ফেটে কান্না আসে। একটা কথা কি জানেন? আমি কাঁদলে শহীদ মুজাহিদের মা/ আমার বড়জা উনি আমাকে বলে কাঁদিস না আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবে। মুজাহিদতো ভাল আছে, সুখে আছে। এইটুকু আমার সান্ত্বনা। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আপনারাও দোয়া করবেন আল্লাহ যেন শহীদ মুজাহিদের বাবা মাকে ধৈর্য্য এবং সবর করার তৌফিক দান করেন। পরিশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমার দোয়া শহীদ মুজাহিদসহ সেই দিনের সকলের শাহাদাত কবুল করার পাশাপাশি আমরাও সবাই যেন তাদের পথধরে জান্নাত বাসী হতে পারি। আমীন। ■



icsbook.info

# সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত

শামসুন্নাহার রুবি

আমি স্কুল জীবনে ও কলেজে শেখ মুজিব পাগল একজন দেশ প্রেমিক ছিলাম। মনে পড়ে সেই দিনের কথা, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকার বাসাবো মাঠে এলাকার জনসাধারণের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। সেই দিন পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিলাম প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য। যেই নেতাকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে দিয়েছিলাম আমারই মনের অজান্তে। সেই সময় অর্থসহ কোরআন পড়তাম না কোরআন খতম দেয়াটাকেই বেশি প্রাধান্য দিতাম। সাধারণ পর্দা নামাজ অবশ্য সব সময় কায়েম ছিল। 'ওয়া তাছিমু বিহ-াবিল্লাহি জামিয়াও অলা তাফাররাকু' অর্থাৎ তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। এই আয়াতের অর্থ ও জানতাম না যার জন্য এই আওয়ামী লীগ ঘেঁষা হয়ে গিয়েছিলাম। আর জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। শুধু শেখ মুজিবকে নিয়েই ছিল চর্চা। গান গাইতাম 'আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব' যখন ৭ম শ্রেণীতে পড়ি তখন থেকেই আমার ব্যক্তিগত এলবামে শেখ মুজিব ও তার পরিবারের সবার ছবি সযত্নে রেখেছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের যত গান শেখ মুজিবকে নিয়ে রচিত হয়েছিল প্রত্যেকটি গান আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সেই গান গুন গুন করে গাইতাম। বিশেষ করে শেখ মুজিবকে ও শেখ হাসিনাকে বেশি ভালোবাসতাম। তাদের ছবিগুলো দেখে আনন্দ পেতাম। আসলে এই ভালোবাসা ছিল অন্ধ ভালোবাসা। এখন বুঝতে পারছি এবং আল্লাহর নিকট তাওবা করছি, শুকরিয়া আদায় করছি তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি ৮ম শ্রেণীতে পড়তাম। খুব ছোট ছিলাম না। সবই বুঝতাম দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঢাকার বাসা ছেড়ে আমাদেরকে চলে যেতে হয়েছিল দেশের বাড়ি কুমিল্লা। সেখানে নিরাপদে থাকতে না পেরে পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারের ভয়ে ইন্ডিয়া চলে যেতে হয়েছিল। কারণ এমন একটা জায়গায় আমাদের বাড়িটা ছিল দুই বাহিনীর অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্ডার এর নিকটে। গোলাগুলির সময় বড় বড় শেলগুলো আমাদের ঘরে বাড়িতে এসে পড়তো। আমাদের ঘর ধ্বংস হয়ে



icsbook.info

গেল। আমরা প্রাণে বাঁচার জন্য সেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম যার পাশেই ছিল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। আমার দাদী জন দরদী ও সমাজ সেবিকা ছিলেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য দীর্ঘ নয় মাস রোজা রেখেছিলেন। এখানে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, একজন নাগরিক কতটুকু দেশ প্রেমিক হলে নয় মাস রোজা রাখতে পারেন? মানুষের এক মাস রোজা রাখতে যেখানে কষ্ট হয়। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের বৈষয়িক সম্পদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। দেশ স্বাধীন হল অনেক রক্তের বিনিময়ে। দেশের মুক্তি পাগল জনগণ রাজ পথে নেমে এসেছিল তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিল দেশের মুক্তির জন্য। নিজের চোখে দেখেছি কিভাবে মুক্তিবাহিনী নিজেদের জীবনকে দেশের স্বাধীনতার জন্য কুরবান করেছেন। ক্যাম্পে খাওয়া-দাওয়া ভালো ছিল না পেটের অসুখে মুক্তিবাহিনী কত ভুগেছেন। আমার দেখা একটা ক্যাম্পের কথা সব সময় স্মরণ হয়। কি কষ্টইনা মুক্তিবাহিনীরা করেছেন। দেশ স্বাধীন হলো শেখ মুজিব দেশে আসলেন। প্রিয় নেতাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিলেন দেশবাসী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যিই কি আমরা মুক্তি পেলাম? এ প্রশ্নের উত্তর সবার কাছে রইল। স্বাধীনতা লাভের পর শুরু হলো গণতন্ত্রের নামে শোষণ নির্যাতন। গণতন্ত্রের বুলি ছেড়ে প্রিয় নেতাজী এক নায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার পরিশেষে বাকশাল কায়েম করে দেশ শাসন করা শুরু করলো। নেতাজী শেখ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ধনেরা, ভাগ্নেরা যেই সুকীর্তি (!) করল– দেশবাসী এখন পর্যন্ত ছিঃ ছিঃ করছে। ব্যাংক লুট, যেনা, ব্যাভিচার, লুণ্ঠন, দিন দুপুরে হত্যা, অস্ত্রের ঝনঝনানিতে শহরের জনগণ সদা সর্বদা ভীত বিহ্বল চিত্তে দিনতিপাত করতো। মানুষ ভয়ে দিন দুপুরে রাস্তায় বের হতে পারতো না। রাতে ডাকাতের ভয়ে ঘুমাতে পারতো না। এই হল আদর্শ বিবর্জিত একটি দলের উত্থানের ফল। তারা তাদের দলের নাম আওয়ামী মুসলিমলীগ থেকে মুসলিম কথাটা বাদ দিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ক্ষমতায় আসার পর দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলিম কথাটি বাদ দিয়ে দিল। তার প্রমাণ কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, সার্টিফিকেটের ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক' আয়াত, এসব ইসলাম মুসলিম কুরআনের আয়াত তারা মুছে ফেলতে দ্বিধা করলো না। সংবিধান থেকে আওয়ামী লীগ বিসমিল্লাহ মুছে ফেলল। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে গণতন্ত্রের কবর রচনা করলো। কথায় কথায় মানুষ খুন জ্বালাও-পোড়াও দেশের সাধারণ জনগণকে হত্যা তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। নির্মম পরিণতি ভোগ করাও হল। শেখ মুজিবকে যখন মারা হল তখন আমি এইচএসসি প্রথম বর্ষে পড়তাম। তার খুনের খবর শোনার পর আমার চোখের পানিতে গাল ভেসে গেল। শেখ মুজিবের আসল চেহারা দেখার পরও তার প্রতি অন্ধ ভালোবাসা আমার অন্তর থেকে যায়নি। পরিবারের সবার কাছে আমি সেই কান্নার জন্যে হাস্যকর বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগতি হলাম। আস্তে আস্তে আমার অন্ধ ভালোবাসার অবসান ঘটলো। অবশেষে আমি জামায়াতের কর্মী থেকে রোকন হলাম।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের কথা সবার জানা সত্ত্বেও আবারো স্মরণ করিয়ে তুলনা দেওয়ার জন্য। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে মানুষ না খেয়ে মরেছে। একবেলাও মানুষ রিজিকে ভাত জুটতো না, মানুষ আটা দিয়ে জাউ খেয়ে কোনো মতে জীবন রক্ষা করেছে। সেই দুর্ভিক্ষের সময় প্রিয় নেতাজী তার সুপুত্র শেখ কামাল যার কুকীর্তি সবার জানা আছে



icsbook.info

বলে উল্লেখ করলাম না। সেই কামাল পুত্র বধূকে মাথায় সোনার মুকুট দিয়ে বিয়ে দিয়েছে। শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা দিয়েছিল শত্রুদেরকে (অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদেরকে) আমরা ওদেরকে পানিতে মারবো, ভাতে মারবো ইত্যাদি। একজন নেতা সুন্দরভাবে সমঝোতায় না এসে মারামারির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আর তারই প্রেতাত্মা সদকায়ে জারিয়া কু'সন্তান রেখে গেছেন শেখ হাসিনাকে। শেখ হাসিনা যেন বাবার উত্তরসূরী হিসেবে ২৮ অক্টোবর লাঠি লগি বৈঠা দিয়ে ছাত্র জনতা পিটিয়ে মেরে প্রমাণ করলো সে যে কতবড় খুনি। তদের আদর্শ হলো দলের স্বার্থে নিজের দলের লোককেও হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। বাংলার বন্ধুর কন্যার এত দরদ দেশের আর্ত মানবতার জন্য যে, তার আদেশে গরীব সিএনজি চালককে অবরোধে গাড়ি চালানোর অপরাধে পুড়িয়ে মারল। দেশের সম্পদ আগুন লাগিয়ে পুড়ে ছাই করে সত্যিকারের দেশ প্রেমিকের পরিচয় ভালো করে দিল।

আলহামুদলিল্লাহ একটা সংগঠন বা দলের সন্ধান আল্লাহ পাক আমাকে দিলেন। সেই দলের নাম হল ইসলামী ছাত্রশিবির। সেই শিবিরকে খবর দিলাম আমার বাসায় সংগঠনের কর্মীদের চরিত্র এত সুন্দর যে আমি তাদের চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী নম্র, ভদ্র, শান্ত ওরা। এরা লেখাপড়ার পাশাপাশি দুষ্টমি করে সময় না কাটিয়ে তারা ঐ সময়টুকু দাওয়তের পথে কাটায়। ওরা আমার মণিকোঠায় স্থান করে নিল। আমার দুই সন্তানকে সে দলে দিয়ে দিলাম। ছেলের শিশুকাল থেকে কলেজ ভার্সিটির জীবন পর্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে কাটিয়েছি। মানসিক প্রশান্তির সাথে আমি দ্বীন কায়েমের কাজ করতে পেরেছি। জীবনে ছেলেদের নিয়ে পড়ায় কোনো নালিশ আসেনি আল্লাহর রহমতে। শিবিরে সম্পৃক্ত হয়ে আমার ছেলেরা নিষ্কলুশ চরিত্রের অধিকারী হতে পেরেছে আল্লাহর রহমতে। যারা বেঁচে আছে তাদেরকে যেন আল্লাহপাক বাকী জীবন আল্লাহর পথে থেকে ভালো কাজ করতে করতে শাহাদাত নসীব করুন সদা সর্বদা এই আশা পোষণ করছি। ইসলামী ছাত্রশিবির একজন ছাত্রকে একাধারে নামাজী, সমাজসেবক পিতা-মাতার বাধ্য, মেধাবী ছাত্র হিসাবে গড়ে তোলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। শহীদ সাইফুল্লাহ মাসুম শহীদ হওয়ার পর একজন পাড়ার মুরুব্বী যিনি এই শিবির সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে পছন্দ করতেন না। তিনি মন্তব্য করেন যে যদিও মাসুম শিবির করতো কিন্তু এর মতো একটা ভালো ছেলে এই এলাকার মধ্যে কোথাও পাওয়া যাবে না। মসজিদে তালিম পড়া আরেক মুরুব্বী বলেছেন, মাহতাবের দুই ছেলের মতো এইন ভালো ছেলে এই পাড়ায় আর নেই– এই মন্তব্যগুলো তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে আমার কানে এসেছে তাই বলে আমি আনন্দিত হয়ে যাইনি। বরং শুকরিয়া জানিয়েছি আল্লাহর কাছে এবং দোয়া করছি দশের সাক্ষি আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন। তাদের এই প্রশংসা কুড়ানোর জন্য নিজের কোনো বাহাদুরিত্ব নেই। এটা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভাইদের নিরলস শ্রমের ফল। শিবিরের দায়িত্বশীল ভাইদের যত্ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতে সম্ভব হয়েছে।

২০০৬-২০০৭ সালে জাতির জন্য একটি চির স্মরণীয় সাল। দেশের মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। মানুষ বুঝতে চেষ্টা করুক যে, সৎ চরিত্রবান নেক্কার লোকের বিকল্প নেই। একমাত্র ছাত্র শিবির ও জামায়াতে ইসলামীই পারে সৎ খোদাভীরু যোগ্য লোক তৈরি করতে কোরআন, হাদিস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। কোরআন, হাদিসের জ্ঞান ছাড়া মানুষ কোনো দিন ভালো হতে পারে না। দেশের বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে এই কোরআনের জ্ঞান না থাকার কারণেতারা তাদের প্রিয়



icsbook.info

মাতৃভূমিতে সৎ, যোগ্য লোক উপহার দিতে পারে নাই। যেহেতু কোরআনের অপর নাম ফোরকান অর্থ হলো হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য ধরিয়ে দেয়া। আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ, আল্লাহর দেখানো পথ ইসলাম তথা আল কোরআনকে যখন আঁকড়ে ধরবেনা, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। যার ফলস্বরূপ আদর্শ বিবর্জিত দলের পতন। তাদের দলের যিনি নেত্রী তিনি নানা অপকর্মে জড়িত। তারা এখন ধরা পড়ে গেছে। কোনো কোনো দল আবার ডাহা মিথ্যা কথা বলেন, তার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রিয় দেশের জনগণ। তারপর নিজেরা খুনি, চাঁদাবাজ, প্রতারক। শুধু তারা একা নয়, তাদের স্ত্রী, সন্তানও এসব অপকর্মে জড়িত। যেহেতু কোরআন, হাদিসের চর্চা তাদের মাঝে নেই সেই কারণে ইবলিশ তাদের ভালোভাবে পাকড়াও করে অপমানিত করেই ছাড়লো। তাদের দলের প্রত্যেকেই লোভী। ক্ষমতা পেয়ে ইচ্ছে মতো দেশের জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। এখন কোরআন, হাদিসের আদর্শ বিবর্জিত দলগুলোর নেতা-কর্মীদের উপর চলছে ধরপাকড়। কেউ শান্তিতে ঘুমাতে পারছেনা। তদের কাছে দুনিয়াই হয়ে গেছে জাহান্নাম। পরকালের কথাতো বাদ। তবে পরকালকে তো কিছুইতে বাদ দেয়া যাবে না। ক্ষমতায় গিয়ে যেসব মানুষের হক নষ্ট করে বিগত সময়গুলোতে আরাম করেছে তার বিনিময়ে আল্লাহর আইন অনুযায়ী অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে। দোয়া করি আল্লাহ তাদের হেদায়েত করুন।

এই ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে আমার মত শত শত মায়ের বুক এরা খালি করেছে। যে সব মায়েরা প্রিয়তম সন্তানকে হারিয়েছে তারা দিন রাত কিভাবে আহাজারি করেছে তাদের খবর কি তারা রাখে। এই মায়েদের কলিজার টুকরা আদরের ধন, যাদেরকে লালন-পালন করা হয়েছে অত্যন্ত যত্নের সাথে, যেই সন্তানরা একটু চোখের আড়ালে যাওয়াটাও মায়েদের সহ্য হতো না। এত প্রিয় সন্তান ছিল এরা, শুধু মায়েদের কাছেই এরা প্রিয় ছিলো না গোটা এলাকাবাসীর কাছে এরা ছিলো প্রিয় মানুষ। যাদের জন্য এখনো এলাকাবাসীরা চোখের পানি ফেলেন আর বলেন যে, আমাদের ছেলেদেরকে কে নামাজের জন্য বাসা থেকে এসে ডেকে নিয়ে যাবে? কে তাদেরকে কোরআন, হাদিসের দাওয়াত দিবে? সেই মায়েরা এখন চিন্তিত তাদের সন্তানদের নিয়ে। ছেলেহারা মায়েদের চোখের পানিতে গাল ভেসে যাচ্ছে। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে তাদের চোখ নষ্ট হবার অবস্থা হয়েছে। এলাকার সব মানুষ ঘুমায়, কিন্তু ছেলেহারা মায়ের রাতের গভীরে ঘুম ভেঙ্গে যায় ছেলে হারানোর ব্যথায়। ছেলে হারানোর ব্যথা যে কত কঠিন যারা ছেলে হারিয়েছেন তারাই বলতে পারবেন। প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে জীবনের গতি হারিয়ে ফেলেছি। সব ঠিক আছে কিন্তু মাসুম নেই। যেই মাসুমকে না দেখলে অস্থির হয়ে যেতাম, সেই মাসুমকে ছেড়ে আজ কিভাবে এক বছর গত হতে চললো। মাসুমের মা ডাক আর কোনো দিন শুনবো না। মাসুম আর মায়ের কাছে টাকা চাইতে আসবে না, এয়ানত ও ইফতার মাহফিলের জন্য। জামা, জুতা, কলেজ ব্যাগ কেনার টাকা, গাড়ি ভাড়া, কোচিং ফি আর চাইবে না কোনো দিন। তার সুন্দর হাসিমাখা চেহারাটা আর দেখতে পাচ্ছি না। দ্বীনের কাজ সেরে ঘরে ফিরে মায়ের খোঁজে রান্না ঘরে গিয়ে আর কোনদিন বলবেনা আসসালামু আলাইকুম। মাসুম নামে যে কি মধু ছিল। মাসুম বলতে পাগল ছিলাম। মায়ের স্নেহের টানে ক্রিকেট খেলার মাঠেও শান্তিতে একটু খেলতে পারতো না। সেখানেও আমি হাজির হয়ে যেতাম। শেখ হাসিনার হুকুমে জসিম, শিপন, মাসুম, মুজাহিদ, ফয়সাল, রফিকরা শহীদ হয়েছে। মাসুম শিপনরা এখন দূরে চলে গিয়েছে। তাদের কাছে দৌড়ে যাওয়াও সম্ভব না। দুনিয়ায় কোথাও ওদের খুঁজে পাওয়া



icsbook.info

যাবে না। যখন ওদের কথা মনে উঠে তখন বুকের ভেতর কত কষ্ট হয়- যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই কষ্টের ভেতর ভাবতে থাকি কষ্ট যত বেশি, আল্লাহর ভালোবাসাও মনে হয় তত বেশি হবে। মনে পড়ে হাদিসের কথা কোনো ব্যক্তির সন্তানের রুহ কবজ করে আনার পর আল্লাহ পাক আজরাইল (আ.) কে প্রশ্ন করবেন যে তুমি যখন তার সন্তানের রুহ কবজ করে এনেছো তখন আমার বান্দা কি বলেছে? উত্তরে আজরাইল বললেন, আপনার বান্দা বলেছে আলহামদুলিল্লাহ। তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে হুকুম করবেন যাও বেহেশতে তার একটা বাড়ি তৈরি কর এবং তার নাম দাও বাইতুল হামদ অর্থাৎ প্রশংসা গৃহ। এ হাদিসের কথা মনে করেই দুনিয়ার বেঁচে আছি। এই দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে থকোবা ক্ষত-বিক্ষত অন্তঃকরণ নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। কারণ সন্তানদের কথা মা কখনো ভুলতে পারে না। এক সন্তানের বিকল্প আরেক সন্তান হতে পারে না। কারণ শিশুকাল থেকেই শহীদ মাসুম শান্ত, ভদ্র পরিচ্ছন্ন ছিল। সে এত অবিডিয়েন্ট ছিল যে, যেখানে তাকে বসে থাকতে বলা হতো সেখানেই বসে থাকতো, কখনো দুষ্টমি করতো না। শিশুকাল থেকে এইচএসসি ক্লাস পর্যন্ত জীবনে যতটুকু সময় পেয়েছে জীবনে কোনো অন্যায় কাজ করে নাই। কারো মনে কষ্ট দেয়নি। লেখাপড়া, ক্রিকেট লেখাও সংগঠনের কাজ এই ছিল তার জীবনের গণ্ডি। ৭ বছর বয়স থেকে ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সাথে পড়তো। দুই ভাই এক সাথে মসজিদে যেতো। ৫/৬ বছর বয়স থেকে রোজা রাখা শুরু করেছিল ১/২টা, ৫টা করে। বাড়ির চাচাতো ভাই বোনদের সাথে পাল্লা দিয়ে রোজা রাখতো কার চেয়ে কে কত বেশি রোজা রাখতে পারবে– এই ছিল তাদের প্রতিযোগিতার বিষয়। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই সে ৩০ রোজা রাখতো। কখনো ভাঙতো না। এমনকি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসলেও কোনো দিন ফরজ রোজা ভাঙ্গেনি। সে খুবই মিশুক ছিল। সমাজের সব ধরনের ছেলেদের সাথে ও মিশতো এবং আল্লাহর পথে আনার জন্য তাদের সাথে সময় দিয়ে খেলাধুলা করতো। ওর দায়িত্বশীল বলেছেন, কোনো ধরনের শিবিরের প্রোগ্রাম হলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ডেলিগেট মাসুম ভাই নিতে পারতো। লোভ, হিংসা মাসুমকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। সে ছিল উদার প্রকৃতির। শিশুদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল মধুর। ও শিশুদের সাথে খুব দ্রুত মিশে যেতো। তাদের নিয়ে খেলা করে তাদের আনন্দ দিত। তাদের কোলে, কাঁধে নিয়ে আদর করতো। শিশুরাও তাকে পেলে খুশি হয়ে যেতো। ছেলেদেরকে আল্লাহর পথে আনার জন্য নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি বিলিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতো না। এক গরীব ছাত্রকে মাদরাসায় ভর্তির টাকা পয়সা মেনেজ করে নিজের পছন্দের জামাটা পড়িয়ে তাকে মাদরাসায় ভর্তি করে দিয়েছিল শহীদ মাসুম। গাছের ফল পেড়ে সেগুলো প্রাথমিক সদস্য কর্মীদের খাওয়াতো। মানুষের অসুস্থতার খবর শুনে হাসপাতালে ছুটে যেতো। এমনকি হাসপাতালে রাত কাটাতে দেখেছি শহীদ মাসুমকে। মুমূর্ষু রোগিকে সে রক্ত দান করেছে। তার এসব তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সংগঠন। মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করে সে আনন্দ পেত। সংগঠনের জন্য তার ছিল নিবিড় টান। যত কাজ করেছে তা আন্তরিকতার সাথে করেছে। আমি তাকে উৎসাহ দিতাম আল্লাহর পথে চলার জন্য। পড়া নষ্ট করে, টিচারের এর পড়া বাদ দিয়ে হলেও টিসি, টিএস-এ পাঠাতাম। মনে করতাম আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান যদি অর্জন করতে না পারে তার দ্বারা সে যত বড় শিক্ষিত হোক নাক না সত্যিকারে সোনার মানুষ হতে পারবে না। আল্লাহ পাক আল কোরআনে বলেছেন, তোমারা এমন সন্তান দুনিয়াতে রেখে যাবে যে সন্তান বলবে 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি ছাগিরা'।



icsbook.info

জীবনের কত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দেখেছি যাদের ভেতর ইসলামের জ্ঞান না থাকার কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদের পিতা-মাতা লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারছে না। মনে পড়ে একটা ঘটনা– মাসুমের টিচার বুয়েটের ছাত্র মাসুমকে পড়াতো এইচএসসিতে থাকা অবস্থায়। ওর টেবিলে কোরআন হাদিসের বই দেখে কিছু উল্টা পাল্টা কথা বলেছিলেন সেই চিটার। সেই টিচার মোল্লাদের সম্পর্কে কটুক্তি করেছিলেন। শহীদ মাসুম টিচার-এর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। আমাকে বলে এই টিচারের কাছে আমি আর পড়বো না। পরদিন শিক্ষক আসলো পড়াতে কিন্তু মাসুম তখন মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিল। মাসুমের চাচাতো ভাইকে মসজিদে ডেকে পাঠালাম নামাজ শেষে তাড়াতাড়ি বাসায় আসার জন্য। কিন্তু মাসুম সেই শিক্ষকের কাছে আর পড়েনি। পরে জানতে পারলাম সেই শিক্ষক কমিউনিস্টপন্থি। আরো একটা ঘটনা মনে পড়ে কিশোর বয়সের আমি ওদের দুই ভাইকে সবসময় টুপি পরাতাম। টুপি পড়ে থাকলে আমার কাছে ভালো লাগতো। আমি মা হিসেবে একটু কড়া ছিলাম। নামাজ রোজা সংগঠনের বেলা খুবই সতর্ক ছিলাম। ক্রিকেট খেলার জন্যও আমি ওকে মার দিয়েছি। এখন ওর শূন্যতায় সেই কথাগুলো মনে ওঠে আর কান্না সামলাতে পারি না। আল্লাহ নারাজ হবেন বলে কান্নাকে সামলাতে চেষ্টা করি। যা হোক, মাথার টুপির কথায় চলে আসি। কিশোর বয়সে ওকে ওর বড় বোনকে কোচিং সেন্টারে ভর্তি করি। রীতিমতো কোচিং-এ যাচ্ছে মাথায় টুপি দিয়ে। একদিন কোচিং-এর কোনো এক শিক্ষক টুপি সম্পর্কে ওকে ইনসাল্ট করেছে বলে শহীদ মাসুমকে সেই কোচিং সেন্টারে আর পাঠাতে পারলাম না। ইসলামের ব্যাপারে সে ছিল সাংঘাতিক রকমের। অন্যায় সহ্য করতে পারতো না। সাহসিকতার দিক থেকে শহীদ মাসুম ছিল নির্ভীক। রাতের অন্ধকারে পোস্টারিং এর কাজ, দেয়াল লিখনের কাজ সে করেছে আন্তরিকতার সাথে। নিজের হাতে আটা এনে চুলায় গাম করে সে পোস্টারিং এর কাজ করেছে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। এক রাতে তার সাথী ক'জন নিয়ে রাত ১২টার পর পোস্টারিং অথবা দেয়াল লিখনের কাজে বেরিয়েছিল। একদিকে গভীর রাত পুলিশের গাড়ি এদেরকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। আমি জানিনা। আমি জানি আল্লাহর কাজে বের হয়েছে বড় ভাই মাহবুবের মতো ফজর পড়ে ঘরে ফিরবে তারপর ঘুমাবে। দেখতে দেখতে রাত ফুরিয়ে ফজরের ওয়াক্ত হল। ফজর পড়ে ঘরে ফেরার কথা কিন্তু দেখা গেলো ফিরলো না। আমার চিন্তায় দমবন্ধ হওয়ার উপক্রমহল। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে ফজরের নামাজ পড়লাম। দোয়া করলাম। এর মধ্যে পূর্ব আকাশে সূর্য উঠে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল। চিন্তায় কষ্ট পেতে লাগলাম এবং ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি। বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লাম মাসুমের খোঁজে। পথিমধ্যে দেখি মাহবুব (শহীদ মাসুমের বড় ভাই) আসছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম মাসুমের ব্যাপারে তখন শহীদের বড় ভাই থেকে জানলাম মাসুম নানুর বাসায় ঘুমাচ্ছে। রাতে পুলিশ ওদের থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার পর শহীদ মাসুম মায়া কানন নানার কাছে ফোন করে জানালে ওর নানা, মেজ খালু ও শহীদের বড়ভাই মাহবুব গিয়ে ওদেরকে থানা থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসে। গভীর রাতে বহুদিনই এই পোস্টারিং এর কাজ করতো তখন শুধু আল্লাহর কাছে আমানত দিয়ে রাখতাম এগুলো করার উৎসাহ পেয়েছে বড়ভাই মাহবুবের কাছ থেকে।

লেখাপড়া, আন্দোলনের কাজে, ব্যক্তিগত কাজে রুটিন মেনে চলতো মাসুম। দাওয়াতের কাজে ছিল সে বড় পেরেশান। শাহীন কলেজের ছাত্রদেরকে সে শিবির সম্পর্কে সুন্দর ধারণা দিয়ে গিয়েছে। অন্তত ওদের ব্যাচের ছেলেরা শিবিরের দাওয়াত



icsbook.info

ভালোভাবে পেয়েছে মাসুমের মাধ্যমে। শহীদ মাসুম তার কম্পিউটারের ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রচার শুরু করেছিল। যাতে করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতি সুধারণার জন্ম হয়। এই সংগঠনকে মাসুম মনেপ্রাণে ভালোবাসতো। আমি মা তাকে হাত ধরে এগিয়ে দিয়েছিলাম ছাত্রশিবিরের কাতারে। এই পথে যেত বলে আমি খুব তৃপ্তি পেতাম। আমি সব সময় আনুগত্যের হাদিস বেশি করে আলোচনা করতাম যাতে করে মাসুম ও অন্যান্য সন্তানেরা দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করতে শিখে। তার কাছে শিবিরের মনোগ্রাম খুবই প্রিয় ছিল। বই খাতার যেখানে সেখানে শিবিরের মনোগ্রাম আঁকতো। অব্যবহৃত একটা ফোনের মধ্যে শিবিরে মনোগ্রামন ও মুষ্টিবদ্ধ হাত এঁকেছিল কিশোর বয়সে। তার ধ্যান-ধারণা ছিল সংগঠন। পড়ালেখার ফাঁকে সংগঠনের কাজের ফাঁকে সে শিবিরের ও শহীদের গান শুনতো। ভাত খেতে খেতে অংক করতে করতে শুনতো। সত্যি শহীদ হওয়ার পর আমি বুঝতে পারছি। তার নিজ হাতে আঁকা মুষ্টিবদ্ধ হাত ও মনোগ্রামের ভেতের লেখা 'আল্লাহু আকবার' এই তাকবীর ধ্বনি কত গুরুত্বপূর্ণ। শহীদ মাসুম বেঁচে থাকা অবস্থায় যেন কল্পনা করতো এ নিয়ে। জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন শত্রুরা আবু লাহাব ও আবু জেহেল হিন্দার উত্তরসূরীরা শিবির জামায়াতকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসছিল সেই সময়ে মাসুম বলেছিল আমরা বেঁচে থাকতে নেতারা আহত হবে? এটা হতে পারে না। একথা বলতে বলতে সে সামনে এগিয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত ময়দানে সবার আগে গিয়ে প্রতিবাদ করতে করতে জীবন দিয়ে দিল। দ্বীনে মহব্বতে মাসুম শত্রুর মোকাবেলায় চলে গিয়েছিল। কাপুরুষের মতো পালিয়ে মায়ের আঁচলে ফিরে আসেনি। তার ডাইরিতে নিজ হাতে লেখা সেই গানের সেই লাইনগুলোই–

দাও খোদা দাও আমায় আবার ওমর দারাজ দিল,
দাও আলীর মতো বীর সেনানী জাগাতে নিখিল
হামজাকে দাও ঘরে ঘরে জীবন দিতে অকাতরে
আবার কাবা ভাঙতে এলে পাঠাও আবাবিল।

সত্যি সেদিন মাসুম অকাতরে জীবন দিয়ে আমীর হামজার ভূমিকা পালন করলো। সেদিন ২৮ অক্টোবর কি ঘটনা ঘটেছিলো? সেদিন ছিল জামায়াতের সমাবেশ। শহীদ মাসুমেরা সমাবেশে গিয়েছিল নেতার আদেশে নেতাদের বসার জন্য মঞ্চ তৈরির কাজ চলতেছিল। তারা গিয়েছিলো ভলান্টিয়ারের কাজ করার জন্য। শহীদের বড় ভাই দুই দিন আগেই এসব কাজে ব্যস্ত ছিল ওখানে। শহীদ মাসুম, শিপন তাদের আরো সহকর্মীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়ার ডাক এলো। শহীদ মাসুম সব সময় সমাবেশে যাওয়া পছন্দ করতো। দেখা যেতো পরীক্ষা চলছে তাকে নিষেধ করলেও শুনতো না। সমাবেশে যাবেই, সেদিন ফজরের নামাজ পড়ে ছোট বোন নাদিয়াকে বললো ৭টার সময় আমাকে ডেকে দিও। আমি একটু ঘুমাই। আমি প্রতিদিনের অভ্যাস মতো মেয়ে তিনজনকে নিয়ে ভেতরের কক্ষে বসে ফজর বাদ কোরআন পড়ছি। আমি খেয়াল রাখছিলাম কখন ৭টা বাজবে। পড়তে পড়তে ৭টা বেজে গেল। ওর ছোট বোন নাদিয়াকে বললাম ওকে ডেকে দিতে। আমি ভেবেছিলাম হয়তো বা কোনো বৈঠক আছে। নাদিয়া ডাকার সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠে গেল। তারপর বের হয়ে গেল সবার বাসায় বাসায়। সবাইকে খবর দিল এবং এক পর্যায়ে ঘরে এসে নাদিয়াকে বলল, দরজা খোলা রাখ সবাই আসলে বসতে দিও। তারপর চলে গেল শিপনদের বাসায়। সেখানে গিয়ে শিপনকে ঘুম থেকে ডেকে উঠাল এবং বের হয়ে আসতে বললো। তারপর কুতুবদের বাসায় গেল (ওয়ার্ড সভাপতি ২৭ নং)। কুতুবকে ডেকে বাসায় আসলো। আমি প্রতিদিনের মতো ভারী নাস্তা খাওয়ার



icsbook.info

আগে হাল্কা খাবার হিসেবে দুটো ডিম সিদ্ধ করে দিলাম। ভেবেছিলাম দাওয়াতী কাজ করে বাসায় আসলে ভারী নাস্তা খাবে। আমি তখনও জানতাম না শহীদ মাসুম পল্টনে যাবে। সকাল বেলা আমি আমার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। মাসুম কর্মী সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। ঘরে একবার ঢুকে আবার বাহিরে যায়। আমি আমার কাজে ব্যস্ত কিন্তু মনটা কেন জানি খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু কাউকে বলছি না। ওর বাবা চলে গেলেন অফিসে। মাহবুব তো ঈদের পর দিন থেকেই পল্টন অফিস পাহারায়। আমার মনটা খুব খারাপ লাগার কারণে শুধু দোয়া ইউনুস পড়ছি। তখনো মাসুম ঘরে আসে আবার যায়। এক পর্যায়ে মাসুম তার কক্ষে ঢুকে ২টা ডিমের মধ্যে ১টি ডিম খেল আর একটা ডিম ওর পড়ার টেবিলে প্লেটে রাখা ছিল। শিপন এসে কড়া নাড়লো তারপর তাকে ভেতরে বসতে বলল। সামনের কক্ষে শিপন বসলো। শিপন বলল আমি কিন্তু নাস্তা খাইনি একথা শুনার পর মাসুমের অবশিষ্ট ডিমটা ও পানির বোতল শিপনকে দিল। শিপন সেই ডিম ও পানি খেয়ে নিল। তাদের এত ব্যস্ততা যে তারা একটু ভারী নাস্তা খাবে এতটুকু সময়ও দিল না আমাকে। তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে পড়ল। আর আমি আমার সংসারের কাজ সেরে গোসল নামাজ সেড়ে নিলাম। কম্পিউটারে মাসুমের লোড করা সেই ফেরাউন লুত, আদ, সামুদ জাতির ধ্বংসের ইতিহাস সম্বলিত ছবিগুলো দেখছিলাম। আমার মনের মধ্যে সেই সময় পেরেশানি ছিল না। দুপুরের দিকে ও আহত হয়েছে সে খবরও জানি না। বাসায় আমরা স্বাভাবিকভাবেই ছিলাম। প্রথমে আড়াইটার দিকে ফোন আসল খুরশিদা খালামণির। তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন আওয়ামী হায়েনারা আমার কয়েকজন শিবিরকে মেরে ফেলেছে। মা তোর ছেলেরা কোথায়? উত্তরে বললাম, মা তারাও সেই উত্তরগেটে গেছে। তিনি বললেন, দোয়া করতে থাক। বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে থানা সভাপতি সাইফুল্লাহ ফোন করলো বাসায়। আমি ফোন রিসিভ করলাম। থানা সভাপতি সাইফুল্লাহ বলল, খালা আম্মা আসসালামু আলাইকুম। মাসুম একটু ব্যথা পেয়েছেন ইসলামী ব্যাংকহাসপাতালে আছে। দোয়া করবেন, আবার কিছুক্ষণ পর ফোন বেজে উঠল, খালাম্মা আপনি আসতে পারবেন কি? আমি বললাম আচ্ছা। আমি বোরখা পরে বাইরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এমন সময় ফোন আবার বেজে উঠল। রিসিভ করলাম শিবির সদস্য শিবলি বললেন, খালাম্মা মাসুমের মাথা ফেটে গেছে মাহবুব ভাই আহত হয়েছে এখন ভালো। তবে মাসুমের চিকিৎসা চলছে। আমি বললাম যে, হাসপাতালে আসছি। তখন শিবলি বলল, আপনি আসতে পারবেন না। কারণ আওয়ামী লীগ কর্মীরা এখনো রাস্তায় গোলাগুলি করছে। আপনি ঘরে বসে দোয়া করেন। তারপর মাহবুবের কাছে ফোন করে জানলাম ওকে ব্রেনের অপারেশনের পর ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাহবুব বলল আপনি পরে ইবনে সিনা হাসপাতালে আসেন। সন্ধ্যার পরে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। কারণ তখনো রাস্তায় রাস্তায় গণ্ডগোল করছিল। একদিন পরে আমি আমার প্রিয় সন্তান মাসুমকে দেখতে যাই। হাসপাতালে ওর চেহারা দেখে আমি শান্তি পেলাম। কারণ চোহরার মধ্যে কোনো কষ্টের ছাপ ছিল না। মনে হচ্ছিল মাসুম ঘুমাচ্ছিল। মনে আশা পোষণ করেছিলাম আস্তে আস্তে ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। হাসপাতালে থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু শিবিরের নেতারা আমাকে থাকতে দেয়নি। কারণ মাসুম তো আইসিইউতে। ওর কাছে কাউকে থাকতে দেয় না। সবার কথা শুনে বাসায় ফিরে এলাম। এসে ৪ দিন যাবত সবাই জায়নামাজে নফল নামাজ ও দোয়া করতে থাকলাম। আল্লাহ যেন ওকে বাঁচিয়ে দেয়। হায়াত ভিক্ষা চাইলাম আল্লাহর কাছে। আর আশায় আশায় থাকতাম কখন জানি জ্ঞান ফিরবে। পূর্বে যারা বিভিন্ন



icsbook.info

এক্সিডেন্টে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে তাদের অপারেশনের পর কত দিন পর জ্ঞান ফিরেছে এগুলো জিজ্ঞাস করতাম বিভিন্ন মানুষের নিকট, কেউ বলে ৪৮ঘণ্টা পর, কারো আবার ১১দিন পর জ্ঞান ফিরেছে। সেই আশায় ছিলাম আমার মাসুমের হয়তো এভাবে জ্ঞান ফিরবে। এই আশায় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকলাম। ৫দিন যাবত আমাদের চোখে কোনো ঘুম ছিলো না। জায়নামাজের কাছে টেলিফোন নিয়ে অপেক্ষমান ছিলাম ও দোয়া করছিলাম। এ আশায় থাকতাম কখন যেন খবর আসে ওর জ্ঞান ফিরেছে। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার রাত। আমাদের বাসাটা ছিল টিন সেড। রাতের গভীরে মাসুমের শহীদ হওয়ার কিছু সময় আগে আমি কানে শুনতে পাচ্ছি টিনের চালায় টপটপ করে পানির ফোঁটা পড়ছে আর আমি আমার মেয়েকে বলছি, তখন মাসুমের জন্য মনে হচ্ছে প্রকৃতিক কান্না করছে। তার কিছুক্ষণ পর মাসুমের বড় ভাই মাহবুবের ফোন আসল মাসুম শাহাদাত বরণ করেছে। ৩.৪৫ মিনিটে সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম আমাদেরকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেল আল্লাহর আরশের ছায়ায়। জীবিত অবস্থায় ওর পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে যত্নের সাথে রেখেছিলাম শহীদদের ছবি সম্বলিত এ্যালবাম। এই এ্যালবাম খুলে শহীদ ছোট বোনদের সাথে গল্প করতো আর বলতো শহীদ হওয়া সবার ভাগ্যে জুটে না। বেঁচে থাকা অবস্থায় শহীদি গান ও শিবিরের গান বেশি বেশি শুনতো। ও সুন্দর কবিতা লিখতে পারতো। ওর লেখা কতগুলো কবিতা ছিল এর মধ্যে জন্মভূমি, সিগারেট খাওয়া কবিতা নিয়ে আমরা অনেক হাসাহাসি করেছিলাম। সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে গেলে ছোট বোন নাদিয়া, সাদিয়াকে নিয়ে ইসলামী গান হামদ গাইতো প্রাণ ভরে। শহীদ মাসুম ভালো ক্রিকেটার ছিল। বর্তমান অধিনায়ক আশরাফুলের চেয়েও শহীদ মাসুম ভালো ক্রিকেট খেলতে পারতো। আশরাফুল এক সময় বলেছিল মাসুমকে যদি গাইড দেয়া হতো তাহলে সে আমার চেয়েও একজন ভালো ক্রিকেটারহতে পারতো। কিন্তু সব সময় দোয়া করতাম হে আল্লাহ আমার ছেলেকে দ্বীনের খাঁটি মুজাহিদ বানাও। আসলে মাসুম খেলোয়াড়দের ইসলামের দিকে ভিড়ানোর জন্যই ক্রিকেট খেলতো। আল্লাহ পাক ওর এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। কিছু কর্মীকে ফজর নামাজ পড়ানোর জন্য সকালে বল খেলার লোভ দেখিয়ে ফজর নামাজ পড়াতো। ও এক দেড় ঘন্টা বল খেলতো। এভাবে শহীদ বিভিন্ন টেকনিক খাঁটিয়ে আল্লাহর পথে লোক তৈরির চেষ্টা করতো। শহীদ মাসুমের কিছু স্মৃতি কথা এ ক্ষুদ্র পরিসরে লেখার প্রয়াস শুধু এই কারণে যে, এরকম ছেলেই ছিল বাকী শহীদরাও। এই রকম সোনার টুকরা ছেলেদেরকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ভেবেছিল পল্টনে জামায়াত-শিবিরের কবর রচনা করবে। কিন্তু আল্লাহ পাক তা কখনো হতে দিবেন না। তার প্রমাণ কোরআনের ইতিহাস আছে। সূরা ফজরের ৬-১৪নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছে, 'তুমি কি দেখনি তোমার রব সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী আদে ইবামের সাথে কি আচরণ করেছেন, যাদের মতো কোনো জাতি দুনিয়ায় কোনো দেশে সৃষ্টি করা হয়নি? আর সামুদের সাথে যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গুহা নির্মাণ করেছিল আর কীলধারী ফেরাউনের সাথে? এরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বড়াই সীমা লঙ্ঘন করেছিল এবং সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে তোমার রব তাদের ওপর আযাবের কষাঘাত করলেন। আসলে তোমার রব ওঁৎ পেতে আছেন।'

এক মাসুমকে হত্যা করে কখনো ইসলামের অগ্রগতি স্তব্ধ করা যাবে না। শেখ হাসিনারা ভেবেছিল যে, জামায়াতে ইসলামের কিছু লোককে ধরে মেরে ফেললে কেউ জামায়াত-শিবিরে অগ্রসর হবে না। কিন্তু এর ফল বিপরীত দিকে মোড় নিল। তারই



icsbook.info

প্রমাণ স্বরূপ মাসুমকে আওয়ামী হায়েনারা আহত করার পর এই খবর মাসুমের এলাকার পরিচিত জনৈক ব্যক্তির কানে পৌঁছল। সে লোক আওয়ামী লীগ করতো। মাসুমের আহত হওয়ার খবর শুনার পর সে ব্যক্তি বলল– এমন ছেলেদেরকে যারা হত্যা করে এই আওয়ামী লীগ আমি আর কখনো করবো না। নাম মনে করতে পারছিনা, আরেকজন শহীদের চাচা আওয়ামী লীগ করতো তার ভাতিজা শহীদ হওয়ার পর সে বলেছিল– আমি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কোনো দলই করবো না। আজ থেকে আমি জামায়াতে যোগ দিলাম। হাসিনার আদেশে ২৮ অক্টোবর হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের নাম নিতে মানুষ ঘৃণা বোধ করে। এতোগুলো মানুষ শেখ হাসিনার হুকুমে খুন হলো এর সমস্ত দায়ভার দুনিয়া ও আখেরাতে তার উপর বর্তাবে। শেখ হাসিনার হুকুমে দেশে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ হত্যা মহাপাপ। শেখ হাসিনা একজন মা হয়ে কিভাবে অন্য মায়েদের সন্তান হত্যার আদেশ দিল? যারা দুনিয়ায় ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করে, সীমা লংঘন করে তাদেরকে ফেরাউনের মতো, নমরুদের মতো, শাদ্দাদের মতো আযাবের কষাঘাতে জর্জরিত করবেন আল্লাহ পাক। এটা কোরআনের ওয়াদা। আল্লাহ পাক লাঞ্ছিত করবেন অপমাণিত করবেন। দুনিয়া এবং পরকালে কঠিন আযাবে পাকড়াও করবেন। সুরা বাকারায় আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন।

এই শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনাকে কোনো এক সময় ভালোবাসতাম আর তারই হুকুমে লগি-বৈঠার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আমাদের মাসুমরা আল্লাহর কাছে চলে যাবে একথা কখনো ভুলেও কল্পনা করিনি। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন 'হুওয়াল্লাজী আরছালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দ্বীনিল হাক্ব লি ইউজহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লি।' অর্থাৎ তিনিই সেই সত্তা যিনি তার রাসুলকে সত্য দ্বীন সহকারে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। অন্যান্য সমস্ত দ্বীনের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করতে। আল কোরআনের আলোকে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল রাসূলের অনুসরণ।

রাসূলকে আল্লাহপাক দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি অন্যান্য মনগড়া মতবাদের উৎখাত করে হক্বকে অর্থাৎ ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর এই উদ্দেশ্যেই জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে।

মাসুমদের কোনো অপরাধ ছিল না। তাদের একটাই অপরাধ ছিল যে, তারা আল্লাহর জমীন থেকে অন্যায় জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন শোষণের অবসান ঘটিয়ে দেশবাসীর নিকট সুন্দর শান্তির একটি সমাজ উপহার দিতে চেয়েছে। এই তাদের অপরাধ।

ওদেরকে মেরে চিরসত্য ইসলামকে বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলার যতো পরিকল্পনাই করুক না কেন তাদের এই অবৈধ প্রচেষ্টাকে আল্লাহ পাক কখনো ফলপ্রসূ হতে দিবেন না। আল্লাহ পাক শত শত শিপন, মাসুম, মুজাহিদ, রফিক, জসিমের জন্ম এদেশে একদিন ইসলামের পতাকা উত্থিত করবে। তাইতো বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণ সৎ যোগ্য নেতার তালাশে পেরেশান। ইচ্ছা হোক আর অনিচ্ছায় হোক মানুষকে সত্যের কাছে মাথা নত করতেই হবে। আল্লাহ পাক তার কোরআনে ওয়াদা করেছেন সত্য সমাগত ও মিথ্যা অপসৃত। এই আশায় বুক বেঁধে আছে শত শহীদ মাসুমের মায়েরা।

---

*লেখক : শহীদ মাসুমের প্রিয় আম্মা*



icsbook.info

# ওতো শহীদ, ওতো আমাদের মাঝে আছে এবং চিরকাল থাকবে

## শহীদ মুজাহিদের মেঝ মামী

মুজাহিদ সম্পর্কে তো লিখে শেষ করা যাবে না। কারণ মুজাহিদ তো মুজাহিদই। মহান আল্লাহ তাকে এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ইসলামের বাহক হয়ে কাজ করতে যার প্রতিফলন ঘটেছে তার শাহাদাত বরণের মাধ্যমে। ইসলামে শহীদের মর্যাদা পাওয়ার জন্য যা যা গুণের প্রয়োজন সেগুলোর কোনটিই আমার মুজাহিদের মধ্যে কোন অংশে কম ছিল না। আমি একদিকে মুজাহিদের মামী অন্য দিকে মুজাহিদের শিক্ষিকা। মুজাহিদ কেমন ছাত্র ছিল সেটা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। সেটা আমরা তার ফলাফলের মাধ্যমেই বুঝতে পেরেছি, যেমনটি বুঝতে পেরেছি মুজাহিদ আল্লাহর প্রিয় বান্দা যা কিনা আল্লাহ পাক শহীদের মর্যাদা দিয়ে সেটি আমদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার শ্বশুর বাড়ি এবং আমার বাবার বাড়ি কাছাকাছি তাই সকাল, বিকাল, দুপুর এবং রাত যখনই আমার যাওয়া আসার প্রয়োজন হত আমার সাথে ছিল মুজাহিদ। যাওয়া আসার রাস্তায় সব সময় ওর সাথে আমার কোরআন, হাদিস, নামায অর্থাৎ ইসলাম প্রসঙ্গে কথা হত। আর তার সাথে ছিল তার সংগঠনের আলাপ। সংগঠনে সে কিভাবে কাজ করে এই সংগঠন তাকে কি শিখিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মুজাহিদের রূপের গুণের কোনটাই আল্লাহ পাক তাকে কোন অংশে কম দেননি। ওর আরেকটি মহৎ গুণ ছিল, সেটি হল ও কখনই রাগ করত না, কোন কাজ করতে বললে না করত না। ও যখন আমার কাছে পড়ত আমি তখন ওকে অনেক শাসন করতাম। রাগ করতাম। মুজাহিদ শুধু মাথা নিচু করে বলত– জ্বী মামী আর হবে না। মুজাহিদকে আমি প্রায় আড়াই বছর পড়িয়েছি, ওকে পড়াতে পেরে নিজেকে এখন খুব গর্বিত মনে হয়। মুজাহিদকে কখনই ভুলার নয়, কারণ ও আমার অনেক কাজের সমাধান করে দিত। যখন যা কিছুর প্রয়োজন হত সব কিছুই ওর মাধ্যমে পেয়ে যেতাম এবং অনেক সমস্যার সমাধান মুজাহিদের মাধ্যমে হত। মুজাহিদ সকলের সাথেই ভাল সম্পর্ক বজায় রেখে সকলকে ইসলামের দাওয়াত দিত। মুজাহিদের প্রতিটি স্মৃতি মনে রাখার মত। ও আমাদের মাঝে নেই সেটা লিখে বুঝাবার মত নয় এবং প্রকাশ করার মত নয়। মুজাহিদ আমাদের মধ্যে নেই এটা বললে ভুল হবে কারণ ওতো শহীদ, ওতো আমার ও আমাদের সকলের মাঝে আছে এবং চিরকাল থাকবে। আমি আর লিখতে পারছি না খুব কান্না পাচ্ছে, যেহেতু আমি তোমার মামী এবং শিক্ষিকা ছিলাম কোন কারণে বা কোন কথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে মাফ করে দিও। ■



icsbook.info

# খোদা মোর দোয়া টুকু রেখো

মোঃ রফিকুল ইসলাম রাফি

আমার ভাইয়ার নাম মুজাহিদুল ইসলাম, আমার ভাইয়া যে এত আদর করত তা বলে বুঝাতে পারব না। ২৮ অক্টোবর যাদের তান্ডবে আমার ভাই শাহাদাত বরণ করলো তাদের কাছে একটাই প্রশ্ন– তোমাদের ভাই কি এভাবে জীবন দিয়েছে? ভাই হারা বেদনা যে কত কষ্টের তা লিখে বুঝাতে পারবনা। যে কষ্ট আর কোনদিন পূরণ হবার নয়। আমার ভাইয়া খুব সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে নামাজ পড়তো। কখনো তাড়াহুড়া করতো না। আমি হলাম তার উল্টোটা। নামাজের ব্যাপারে ছিলাম আলসে। ভাইয়া আমাকে সব সময় নামাজের জন্য তাড়া দিত। কখনো কখনো ঘরে নামাজ পড়লে ও খুব ব্যথা পেত। বলত, ঘরের পাশে মসজিদ থাকতে ঘরে পড়া ঠিক না। আমাকে নামাজ, কোরআন, আল্লাহর কথা বুঝাতো।

আমরা তিনভাই বোন হলে কি হবে, আম্মুর আদর সব সময় ওর জন্য বেশি থাকতো, তাই বলতাম ভাইয়া তুই আম্মুর পেটের ছেলে আর আমি আম্মুর পিঠের ছেলে। ভাইয়া বলে আম্মু সবাইকে সমান আদর করে। তুই আম্মার কথা শুনিস তাহলে তোকে আম্মু বেশি আদর করবে। ভাইয়ার প্রিয় খাবার ছিল ডিম ভাজি, বেগুন ভাজী ও আলু ভর্তা। ভাইয়া বড় বলে আম্মু ভাইয়াকে বেশি ভাজী ও ভর্তা দিত। এই নিয়ে আমি ঝগড়া শুরু করে দিতাম সবাইকে সমান দিতে হবে। ভাইয়ার ভাগেরটা আমাকে দিয়ে দিত। বলত ওর খাওয়া হলেই আমার খাওয়া হবে। এরকম ভাই পৃথিবীতে বিরল। আম্মুর সাথে বেয়াদবী করলে, প্রোগ্রামে না গেলে, মসজিদে না গেলে চোখের রাঙ্গানী দিত ও বুঝাত। যারা আমাকে ভাইহারা করলো তাদের উদ্দেশ্যে বলবো– তোমরা কেউ ভাই হারা হয়োনা। আমরা সবাই মুসলিম, সবাই ভাই ভাই। আমি তোমাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহকে বলি তুমি আমার ভাইকে উত্তম শহীদ হিসাবে কবুল করো। কারণ সে ছিল তোমার জন্য পাগল। আমার দোয়াটুকু রেখো খোদা। আমীন।

*লেখক : শহীদ মুজাহীদের ছোট ভাই*



icsbook.info

# আমার ছোট ভাই ও বন্ধু ফয়সাল

ফুয়াদ আব্দুল্লাহ

ফয়সাল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ফয়সালের শিশুকাল থেকে শুরু করে শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত বহু ঘটনা মনে পড়ে, যা কাগজের পাতায় লিখে শেষ করা যাবে না। বাবা সরকারি চাকরি করার সুবাদে আমাদের পরিবারকে বাবার সাথে বিভিন্ন স্থানে থাকতে হয়েছে। কখনো ঢাকা, কখনো চট্টগ্রাম, কখনো টাঙ্গাইলের পাহাড় কাঞ্চনপুর। আবার কখনো ঢাকার কুর্মিটোলা বালুর ঘাটে তিন বছর করে থাকি। এরপর নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসাবাস শুরু করি। ফয়সালের শিক্ষা জীবন শুরু হয় চট্টগ্রাম হালি শহর আবুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বয়সে ছোট হলে কি হবে সে এক সময়ে ছিল বন্ধু বৎসল। ক্লাসের অনেক বড় ছেলেরা তার বন্ধু ছিল। তারা জোট বেঁধে বাসায় এসে তাকে স্কুলে নিয়ে যেত। এরপর টাঙ্গাইলে নলুয়া বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সেখানেও একই রকম অবস্থা। বন্ধু বান্ধবের নিকট সে ছিল অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আব্বার বদলিজনিত কারণে আমাদেরকে ঢাকায় আসতে হয়। সেখানে ফয়সাল হাইস্কুল জীবন শুরু করে। ছোট বেলা থেকেই ফয়সাল ছিল সাহিত্যানুরাগী। গল্প প্রবন্ধ কবিতা পড়তে ভালোবাসত। তার স্মরণ শক্তি খুব ভালো ছিল। তাই দাদীমা তাকে কুরআনে হাফেজ বানাবার জন্য আব্বাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু আব্বা এক জায়গায় স্থায়ী না হবার কারণে এটা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে আমরা তিন ভাই ফুয়াদ, ফাহাদ, ফয়সাল পিঠাপিঠি। ছোট বেলা থেকেই এক সাথে রয়েছি, খেলেছি, ঝগড়া করেছি। আবার বন্ধুর মতো আচরণ করেছি। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে বড় ভাই বা ছোট ভাই হিসাবে আলাদা করা যেতে না। তবে গঠনমূলক কোন কাজে ফয়সাল আমার ভুল শুধরে দিত। তখন আমি মেনে নিতাম। আবার আমিও তার ভুল শুধরে দিলে সেও মেনে নিত। অর্থাৎ আমরা ছিলাম বন্ধুর মতো। বই পড়ার প্রতি তার ছিল দারুন আগ্রহ। ইসলামী সাহিত্য গল্প কবিতা ইসলামী সঙ্গীত খুবই পছন্দ করত সে এবং খুব অল্প সময়ে অনেক, মোটা বই পড়ে ফেলত। সাইমুম সিরিজের, সেবা প্রকাশনীর গোয়েন্দা কাহিনী, নসীম হিজাজির বই, মাওলানা মওদূদীর বই, আব্বাস আলী খান, অধ্যাপক গোলাম আজম-এর মতো উঁচু মানের লেখকের বই পড়ত। বই পড়তে যেয়ে একাডেমিক পড়ার ক্ষতি হয়ে যেত। ছাত্র জীবনে বিজ্ঞান বিভাগ



icsbook.info

নিয়ে এসএসসি ও এইচএসসিতে পড়শুনা করেছে। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক কারণে ও অন্যান্য কারণে মানবিক বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ফয়সালের সাধারণ জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে পরপর দুইবার আইকিউ পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় হয়, যদিও অন্যান্য পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়নি। ফলে সেখানে তার চান্স হয়নি। ফয়সাল ছিল নি:স্বার্থ পরোপকারী আচার আচরণ ছিল অত্যন্ত সুন্দর ভদ্র ও বিনয়ী স্বভাবের। সম্ভবত এই স্বভাবের কারণে তার বন্ধুর সংখ্যা এতো বেশি ছিল। ফয়সাল আমাদের সাথে সমগ্র বিশ্বের মুসলামানদের অবস্থা ইসলামের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতো। বিশেষ করে ইরাক-আফগানিস্তান-ফিলিস্তিনী, ইরান এর দুর্দশা সম্পর্কে প্রায়ই আলোচনায় বসতাম। আজ ফয়সাল পাশে নেই সে কথা ভাবতেই খুব কষ্ট হয়। যে কিনা একই বেডে আমার পাশে ঘুমাতো। ২৮ অক্টোবর সে কথা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। সেদিন সকাল এর পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল। আমার ভাই বাসার কাউকে না বলেই সাকলে শিবির ও জামায়াতের থানা অফিসে পাহাড়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। বেলা ১১টার দিকে বাসায় আসে এবং সামান্য খাবার খেয়েই আমাদের বাড়ির পাশে আমাদের দোকানে এসে বসে। তখন আমার সাথে তার বলা কথাই ছিল তার সাথে শেষ কথা। এরপর বাসায় এসে বাজার করতে যায় ও বাজার থেকে কচি শশা নিয়ে আসে। মা বললেন, বাসায় গোস্ত নেই অথচ তুই শশা নিয়ে এলি। উত্তরে ফয়সাল বলল, শশা খেয়েই জিহাদ করতে হবে। কিন্তু ফয়সালের আর শশা খাওয়া হলো না। হঠাৎ করে ফাহাদ এসে ফয়সালকে বলল, শিবিরের থানা অফিসে যেতে হবে। ফয়সাল তৎক্ষণাৎ চলে গেল। যাবার সময় খালাম্মা বলেছিল, ফয়সাল একটু সাবধানে থাকিস। তখন ফয়সাল আল্লাহর নাম করে বলল, কপালে যদি মাইর লেখা থাকে তাহলে কেউ ফিরাতে পারবে না। আমি তিনটার দিকে থানা অফিসে যাই এবং সেখানে আমি ফয়সালকে অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকতে দেখি। ফয়সালের সাথে আমার কেনো কথা হয়নি। এটাই ছিল আমার শেষ দেখা। একটু পরে আমার মেজ ভাই ফাহাদ এসে বলল, ভাইয়া তুমি বাসায় চলে যাও, তুমি বাসা এবং দোকান সামলাও আমরা এখানেই আছি। আমি তাই করলাম, বাসায় এসে ভাত খেয়ে এত অচেতনভাবে আমি কখনো ঘুমাইনি। ঘুম থেকে উঠে মসজিদে নামাজ আদায় করে আমাদের ফোন ফ্যাক্সের দোকানে যেয়ে বসি। হঠাৎ আমাদের এলাকার বন্ধু মাহাবুব এসে বলল, তোমার ভাই চিটাগাং রোডে আহত হয়েছে। তাকে সুগন্ধা ক্লিনিকে নেয়া হয়েছে, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। আমি বাসায় এসে কোনো মতে প্যান্ট পড়ে দৌড়ে চলে যাই। ক্লিনিকে গিয়ে দেখি, সে এতটাই যখম হয়েছে যা আমি ভাবতেই পারিনি। একটা বেডে ফয়সাল অপর রুমে ফাহাদকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমি প্রথমে ফয়সালকে দেখতে যাই। ফয়সালের অবস্থা অতি শোচনীয়। হায়েনারা এমনিভাবে তাকে আহত করেছে যে, ফয়সালের সুন্দর মাথাটা চেপ্টা করে দিয়েছে। ঠিক গাড়ির চাকা মানুষের মাথার উপর দিয়ে গেলে যেমনটি হয়। ফয়সালের মুখ দিয়ে লালা বের হচ্ছে। আমি তখনই বুঝে ফেলি তাকে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফয়সাল বেডে পড়ে আছে আর ঘন ঘন নি:শ্বাস ছাড়ছে। আমি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ি। দৌড়ে ফাহাদের কাছে যাই। ফাহাদের শরীর ও মাথা রক্তাক্ত অবস্থায় আছে। ফাহাদও সঙ্গাহীন। তখন নিজের স্বজন ও সংগঠনের কাউকে দেখছিনা। এদেরকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যেতে হবে। কে বা কারা ট্রলি ধরাধরি করে বিশ্বরোডে নিয়ে এল।



icsbook.info

কিন্তু সমস্যা হলো এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নের সম্মুখিন হচ্ছিল বার বার। ফাহাদ ও ফয়সাল সম্পর্কে বিভিন্ন কিছু জিজ্ঞাসা করছে। এমন সময় আম্মাকে দেখতে পেলাম, আম্মা কোথা থেকে যেন এলো। চারদিকে নিস্তব্ধ একটি রিকশা পর্যন্ত নেই। একটি সংবাদপত্রের মাইক্রোগাড়িটিতে আমাদের নিতে চাইলো না। এক পুলিশের এএসপি এবং কিছু দয়াবান মানুষের অনুরোধে আমাদের নিতে রাজি হল। পকেটে আমার একটি পয়সাও ছিল না। তাড়াহুড়ার কারণে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এমন সময় আমাদের সাবেক ভাড়াটিয়া রফিক ভাইকে দেখি। সে অফিস হতে বাসায় ফেরার পথে আমাদের গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ধরাধরি করে আমাদের উঠিয়ে দিচ্ছে। তার কাছ থেকে শ'তিনেক টাকা ধার নেই। তখন জামায়াতের কালাম ভাই কোত্থেকে যেন উপস্থিত হলেন এবং শিবিরের কয়েকজন ভাই এলেন। আমরা ঢাকা মেডিকেল এর উদ্দেশ্যে রওনা হই। কিন্তু যাত্রা বাড়ির কাছে এলে মনে হলো ঢাকা মেডিকেলে হয়তো আরো অনেক আহতের ভিড় হবে। তৎক্ষণাৎ ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল শাহাজাহানপুরের কথা মনেহলো। দ্রুত সেখানে নিয়ে যাই, সেখানে গিয়ে আমার মামাদের দেখতে পাই। তারাও পল্টনের সমাবেশে এসেছিল। সেখান হতে ফাহাদ ও ফয়সালকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দ্রুত ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, তবে তার অবস্থা শোচনীয় দেখে ইবনে সিনায় পাঠানো হয়। সাথে আমি এবং আমার মামা ও কালাম ভাই এবং তরুণ বয়সের ডাক্তার ছিলেন। তিনি সিলেট মেডিকেল কলেজ শিবিরের সাবেক সভাপতি ছিলেন। অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে ফয়সালকে সিটি স্ক্যান আর এমও করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানালেন। পরে জামায়াতের ঊর্ধ্বতন নেতা ও ইবনে সিনার পরিচালক আবু নাসের সাহেবের সহযোগীতায় ফয়সালকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রেখে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করলে আমি এবং আমার মামা ও চাচা এসে হসপিটাল মসজিদের নামাজের স্থানে বসে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমার ভাইটিকে সুস্থ করে দেন। রাত প্রায় এগারোটায় সেখানকার বড় ডাক্তার আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আপনার ভাইয়ের মস্তিস্কের পেছনে অংশ অর্থাৎ লঘু মস্তিষ্কের মগজ থেতলে গেছে। তার আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। সেজন্য আমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে বললেন। এর পরদিন বারটা পর্যন্ত আমি আর আসিনি। সকালের দিকে ইবনে সিনায় গিয়েছিলাম সেখান হতে আম্মা এবং আমি বাসায় চলে আসি। আসার সময় ফয়সালকে আমি এবং আম্মা দেখে আসি। ফয়সালকে দেখে মনে হচ্ছিল যে, কোনো মানব শিশু ঘুমিয়ে আছে। পরে জানতে পারি ২৯ অক্টোবর রাত ৮টায় আমার প্রাণপ্রিয় ভাইটি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আমাদের ছেড়ে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে গিয়েছে চির দিনের জন্য। যে নিজের জীবনের বিনিময়ে একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে তার ভাই ফাহাদকে রক্ষা করলো আল্লাহ যেন তাকে শহীদের মর্যাদা দিয়ে বেহেশত নসীব করেন। আমিন, সুম্মা আমিন।

---

*লেখক: শহীদের বড় ভাই*



icsbook.info

# আমার প্রাণ প্রিয় আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল

সাইয়্যেদা বেগম হাসনা বানু

আল্লাহর কাছে লাখো কোটি শোকরিয়া জানাই ফয়সালকে আল্লাহ পবিত্র ও নেক লোকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকার ও দোয়া পাবার তাওফিক দিয়েছেন। ফয়সালের কিছু কিছু স্বভাব আমাকে অবাক করে তুলত। বই পড়তে আরম্ভ করলে খাওয়া দাওয়া ও ঘুমানোর কথা ভুলেই যেত। পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য পড়ার দিকে ঝোঁক ছিল তার বেশি। খবরের কাগজ পড়তে আরম্ভ করলে, পুরোটাই পড়ে ফেলত একটুও বাদ দিত না। এবং যা কিছু পড়ত পরে কথার ফাঁকে আমাদের কাছে তা বর্ণনা করত। মাঝে মাঝেই খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের অনাড়ম্বর জীবন কাহিনী এবং ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এর জীবনের অনেক ঘটনা আমাদের শুনাত। ফয়সালের জন্ম ১৯৮২ সালের মে মাসের ২৬ তারিখে। সেদিন ছিল ১১জ্যৈষ্ঠ। কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে তার জন্ম। বই পড়ার এতটা আগ্রহ এবং কথায় কথায় কবিতা তৈরি করে ফেলত। ক্লাসের পড়ার দিকে কম গুরুত্ব দেয়ার জন্য মাঝে মাঝে তার বই লুকিয়ে রাখতাম। এবং রাগ করতাম, বলতাম– তুই কি কবি নজরুলের মত স্মরণীয় হতে পারবি? আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন আমার ফয়সালকে সালেহীন ও শাহেদীনের কাতারে শামিল করেন।

সৌদি বাদশাহ, শহীদ বাদশাহ ফয়সালের নামানুসারে ফয়সালের নাম রেখেছিলাম। আমি ধারণাও করতে পারিনি আমার প্রাণাধিক প্রিয় ফয়সাল হতভাগিনী মাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে এভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহর কাছে চলে যাবে। ছোট বেলা থেকেই শান্ত স্বভাবের এই ছেলেটা আমাকে কোনদিন বিরক্ত করেনি। সবছেলে মেয়েরাই মায়ের কাছে প্রিয় থাকে। কিন্তু ফয়সাল ছিল আমার সর্বাধিক প্রিয়। সে মায়ের কষ্টের দিকে কড়া নজর রাখত। ফয়সালের প্রাথমিক জীবন এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময় কাটে মিরপুরের ক্যান্টনমেন্টের সরকারি বাসায়। খুব ভোরে তার আব্বা



icsbook.info

নামাজ শেষ করে কোরআন পড়তেন। ফয়সাল যখন ২/৩ বছর বয়সের তখনি ফয়সাল তার আব্বার কোরআন পড়ার শব্দ পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠত এবং পড়ার চেষ্টা করত। যখন তার বয়স তিন বা সাড়ে তিন বছর তখন ফয়সাল তার বড় ভাই ফুয়াদ ও ফাহাদের সাথে আরবী পড়তে যেত। ইমাম সাহেব ফয়সলের আব্বাকে ডেকে বললেন, ওর দিকে আপনি বিশেষ নজর রাখবেন।

ওর স্মরণ শক্তি খুবই ভাল, অতি অল্প সময়েই অনেক কিছু মুখস্থ করে ফেলত। এই জন্য তার আব্বার তাকে কোরআনে হাফেজ বানানোর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট হাফেজী মাদরাসা না থাকায় সম্ভব হয়নি। ফয়সালের ১১ বছর বয়স কাটে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট সরকারি বাসায়। ছোট বেলা থেকেই খুবই মিশুক প্রকৃতির ছিল। বড় ছোট সবার সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। কেউ ঝগড়া করলে তাদের মিমাংসা করাটাই ছিল তার স্বভাব। চুরানব্বই সালে আমরা সিদ্ধিরগঞ্জ নিজেদের বাসায় চলে আসি। এবং সিদ্ধিরগঞ্জ রেবতী মোহন স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে। এর আগে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৩ সালের শেষ পর্যন্ত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম তখন থেকেই আমার ছেলে ফুয়াদ, ফাহাদ, ফয়সল সংগঠন ভুক্ত হয়। শিবিরের ছেলেরা ফয়সালের আব্বার কাছ থেকে সুধী হিসাবে এয়ানত নিত। তখন শিবিরের ছেলেরা এসে তাদেরকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে নিয়ে যেত। এতে ফয়সল খুবই উৎসাহী হয়ে গেল। '৯৪ সালে যখন সিদ্ধিরগঞ্জ আসি তখনও ফয়সাল শিবিরের বিভিন্ন প্রোগ্রামে, মিটিং মিছিলে যাওয়া শুরু করল এবং সাংগঠনিক দিক থেকে খুবই অগ্রসর হতে লাগল। এদিকে ফয়সালের আব্বা ট্রান্সফার হয়ে চিটাগাং চলে গেছে। আমি ফয়সালকে সংগঠনে এত বেশি ঝোঁকার জন্য রাগ করলাম। এতে ফয়সাল অনেকটাই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় তার বাবা ব্রেন স্ট্রোক করে মারা যান। তখন থেকেই ফয়সালের শুরু হয় সংগ্রামী জীবন। সাতটা ছেলে মেয়ে রেখে তার বাবা মারা যাওয়াতে খুবই ভেঙ্গে পড়লাম। মাথায় চিন্তা ঢুকল কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষতা এবং টিউশনী ছাড়া উপায় নেই। বড় ছেলেটা তখন বি.এ পড়ত কবি নজরুল কলেজে। ফাহাদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স প্রথম বর্ষ এবং ফয়সাল ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। বড় মেয়ে শাম্মী এইচএসসি ১ম বর্ষ, চতুর্থ ছেলে ফাহমিদ এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। এমনি অবস্থায় ওর আব্বা মারা যাওয়াতে আমি ভাবলাম টাকা উপার্জন করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। বড় ছেলে হতাশ হয়ে গেল কি করে এত বড় পরিবারের ব্যয়ভার বহন করবে। কিন্তু আমার ফয়সাল হতাশ হল না। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল– আপনার কষ্ট করতে হবে না। আমরাই কষ্ট করব। ওদের তিন ভাইয়ের পড়াশোনার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। বড় ছেলেটা একটি চাকুরি নিল। ফাহাদ ও ফয়সাল একটি দোকান দিল। এবং সিরিয়াসভাবে টিউশনি শুরু করল। ওদের ব্যস্ততা দেখে এলাকার মুরুব্বিরা বলাবলি করত হাই সাহেব ভাল লোক ছিলেন, সন্তানদেরকে ভাল শিক্ষা দিয়ে গেছেন। নিজের লেখাপড়ার ক্ষতি হলেও ছোট ভাই-বোনদের যাতে কোন কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল করত। দোকান, টিউশনি, শিক্ষতা ও লেখাপড়া সবমিলে ফয়সালের উপরই বেশি চাপ হয়ে গেল। বাবা মারা যাওয়ার পর এই তিন বছরে প্রতিদিন ঠিকমত তিন বেলা খাওয়ার সময়টুকুও পেত না। কিন্তু এত পরিশ্রমের পরও আমার এই



icsbook.info

শান্তশিষ্ট ছেলেটার মুখটা মলিন হতো না। ঘরে ফেরার সময় ইসলামী গান গাইতে গাইতে আসত। জিহাদী গান তার খুব প্রিয় ছিল। ফয়সাল দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি লম্বা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিল। তার আচার ব্যবহার, লেনদেন সবকিছুই খুবই প্রশংসনীয় ছিল। ও যে স্কুলে শিক্ষকতা করত সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা ও অভিভাবকরা তাকে খুবই ভালবাসতো। ছাত্র-ছাত্রীরা মাঝে মাঝেই তাকে ডায়েরী, কলম উপহার দিত।

২৫ অক্টোবর ঈদের দিনে ফোনের দোকান খোলা রেখেছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা স্যারের জন্য কেউ চিপসের প্যাকেট, কেউ চানাচুর, চকোলেটের প্যাকেট দিয়ে টেবিল ভরে ফেলেছে। মেঝ ছেলে ফাহাদ দেখে অবাক। ২৮ অক্টোবর তার হৃদয়বিদারক মৃত্যুর কথা শুনে এমন কোন ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক চোখের পানি ফেলেনি, এমন কোন নজির পাওয়া যায়নি। অমুসলিম অভিভাবকরাও তার জন্য কেঁদেছেন। ধনী, গরীব, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার মুখে একই কথা– এরকম ছেলে লাখে একজনও হয় না। আমাদের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী খাঁটি আওয়ামী লীগের লোক। সেও লোকদের সামনে বলেছে, 'এই সিদ্ধিরগঞ্জে এমন কোন লোক আছে, যে বলতে পারবে এই ছেলের কোন ত্রুটি আছে'। এটা আমার গর্বের কিছু নয়। এটা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। এবং আমাদের বাবা মায়ের সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, অহংকার, কিছুই তার মধ্যে ছিল না। এ জন্য সকলের কাছে সে ভাল ছিল। স্কুলের সহপাঠী থেকে ভার্সিটি পর্যন্ত সহপাঠিরা সকলে ভাল জানত। ভার্সিটিতে যেয়ে সে আবার সংগঠনের কাজ করত। আর্থিক সমস্যার কারণে সংগঠনের জন্য বেশি সময় দিতে পারত না। কিন্তু সংগঠনে অগ্রসর হওয়ার জন্যে তার মনটা ব্যাকুল হয়ে থাকত। সংগঠনের সকল দায়িত্বশীলকে সে খুব ভালবাসত। বাসায় এলে না খাইয়ে যেতে দিত না। এক পর্যায়ে ছাত্রী পড়ানোর কারণে সংগঠনে এগুতে পারছিল না। মা হিসেবে আমি ভাবছিলাম ওর বাবার পেনশনের টাকাটা পেলে ওকে আর এত টিউশনি করতে দেব না। কিন্তু আমার ফয়সালের ভাগ্যে আর হল না বাবার পেনশনের টাকা দেখে যাওয়া এবং দুনিয়াতে একটু স্বস্তি পাওয়া। এত পরিশ্রমের পরও ফয়সালের মন সংগঠনের দিকেই পড়ে থাকত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সংগঠনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে চলে যেত। এমনি একদিন শুনতে পেল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-শিবিরের ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। তখন থেকেই সে অস্থির হয়ে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। দাড়ি রাখায় শিবিরের নেতাদের মত দেখা যেত। আমি একদিন বললাম দাড়ি রেখে চিহ্নিত হওয়ার দরকার কি? দাড়ি না রেখেও তো সংগঠন করা যায়। ফয়সাল আমাকে বলল– 'আম্মা দাড়ি থাকলে শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচা যায়।' আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেয়ে গেলাম। ফয়সালের আব্বা এবং আমি দুজনই সংগঠনভুক্ত ছিলাম। কোন কোন জায়গায় ইউনিটের দায়িত্ব পালন করেছি। সংগঠনের লোকদের বিশেষ করে শিবিরের ছেলেদেরকে খুবই ভালবাসতাম এবং স্নেহ করতাম। ফয়সালের আব্বা যেখানে ট্রান্সফার হয়ে যেত সেখানেই জামায়াত-শিবিরের লোকদের সাথে ভাল সম্পর্ক হয়ে যেত। ২০০৫ সালে রমজানে ফয়সাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরের সভাপতিসহ কয়েকজনকে ইফতারের জন্য দাওয়াত দিল, আমি ইফতার ও রাতে ওদেরকে ডাল-ভাত



icsbook.info

খাওয়ালাম। ২০০৬ সালের অক্টোবরের ২০ তারিখ ২৫ রমজান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরের ছেলেদের দাওয়াত দিয়ে বাসায় নিয়ে আসে। সেদিন সারাদিন সে আমাকে সহযোগিতা করেছে। ওরা আসার পর ফয়সাল ওদেরকে ইফতার এবং খাবার খাওয়াল তারপর ওদেরকে এগিয়ে দিয়ে এসে সে কত খুশি! এবং আমাকে বলল, এখন থেকে প্রতি বছর রমজানে শিবিরের ভাইদেরকে দাওয়াত দিব। ওনারা এ সময় ব্যস্ত একটু কম থাকেন। আমি বললাম, ঠিক আছে রমজান মাসে খাওয়ালে বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। সে মেহমানদারীতে ছিল পটু। কিন্তু ভাবতেই অন্তরটা ফেটে যায়। অক্টোবরের ২০ তারিখ ফয়সালের শেষ মেহমানদারী ছিল, যা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। মনে মনে ভাবি জগন্নাথের ছেলেরা কি আসবে খালাম্মার ঘরে ইফতার করতে? মনে হলে কান্নায় বুকটা ফেটে যায়। কান্না সংবরণ করতে কোরআনের সুরা বাকারা ও আলে ইমরান এর সেই দুটো আয়াতকে স্মরণ করি– "তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত। আল্লাহর কাছ থেকে রিজিক প্রাপ্ত"। একটু শান্তি পাই– আল্লাহ যেন আমার ফয়সাল ও অন্যান্য শহীদদেরকে জান্নাতের খাবার দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। খাওয়া দাওয়ার প্রতি তার কোন লোভ ছিল না। ভাল খাবার হলে বলত– আমি পরে খাব। আমার, তার ছোট ভাই নাকিব এবং বাসার অন্য সকলে খেয়েছে কি না খোঁজ নিয়ে তারপর খেত। এ জন্য আমার বড় ছেলে মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলত ওর খেতে হবে না। ওর পরে খাওয়ার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে হবে। ভাল খাবার না খেয়েও তার স্বাস্থ্য ছিল ভাল। ওর খাবার নিয়ে আমিও মাঝে মাঝে দু:খ পেতাম। প্রায়ই বলত, মা-আমার খাবার নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। সেদিন ২৮ অক্টোবর ২০০৬ আমার ফয়সাল জীবনের শেষ খাবার ১১টায় খেয়ে বাজারে চলে গেল। শুধু লাল শাক ও ডাল দিয়ে খেয়েই জীবনের শেষ খাবার খেল। নিষ্ঠুর মায়ের মত একটা ডিমও ভেঁজে দিতে পারলাম না। বড় ছেলে ফুয়াদ, মেঝ ছেলে ফাহাদ খেতে বসলে দৌড়ে গিয়ে ডিম ভেঁজে নিয়ে আসি। কিন্তু আমার মাটির মত নরম ছেলেটির জন্য কোন ব্যস্ত হতে হয় নাই। সে কথাগুলো মনে পড়লে কষ্ট আর সহ্য হয় না। বেশি উদার প্রকৃতির হওয়ার কারণে সে সব দিক থেকেই বঞ্চিত ছিল। দুটি শার্ট, দুটি গেঞ্জি, একটি ফুলপ্যান্ট ও একজোড়া ছেঁড়া সেন্ডেল ছাড়া তার কোন পোশাকই ছিল না। মৃত্যুর পর ফয়সালের পরনের একমাত্র প্যান্টটি ছাত্রশিবিরের শহীদ মিউজিয়ামে দিয়ে দেই। দুনিয়াতে তার কোন চাওয়া পাওয়া ছিল না। কিন্তু ঈমানের বলে বলিয়ান ছিল। আমি কোন কোন ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেলে ফয়সাল আমাকে আল্লাহর উপর ভরসা এবং ধৈর্য্য ধারনের উপদেশ দিত। কিন্তু কোথায় সেই ফয়সাল? বিধবা মা'কে সান্ত না দেয়ার জন্য এখন আর ঘরে ফেরে না। আম্মাকে খোঁজ করে না। ও ঘরে ঢুকেই আম্মার ঘরে ঢুকে যেত। আম্মাকে না দেখলে বোধ হয় অস্থির লাগত। এ কথা মনে হলে মনের অজান্তেই চিৎকার এসে যায়। তখনই আবার মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই কোরআন এবং হাদীসের দিকে। সান্ত্বনা পাই কোরআন ও হাদীসে শহীদদেরকে কত বড় মর্যাদা দিয়েছে তা স্মরণ করে।

সেদিন ২৮ অক্টোবর আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। স্মরণ করতেই বুক শিউরে উঠে। আমার ফাহাদ, ফয়সাল বেরিয়ে পড়ল প্রতিবাদ মিছিলে আমার কলিজাটা



icsbook.info

ছটফট করছিল কিন্তু বিবেকের বাধায় কুলাতে পারলাম না। ইসলামের এ দুর্দিনে আমার ছেলেদেরকে আটকিয়ে রাখলে কে যাবে এই কঠিন পথে? আল্লাহর উপর সোপর্দ করে ছেড়ে দিলাম। আল্লাহ আমার এতিম ছেলেদেরকে কবুল করে ফেললেন। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা আমার ফাহাদ ও ফয়সালকে পিটিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে চলে গেল। অন্যান্যরাও কিছু কিছু আহত হয়েছে। আমি শুনা মাত্র বোরখা পড়ে সেখানে চলে গেলাম। আমার ফয়সাল আর তাকাইলো না। একটু একটু শ্বাস নিচ্ছে আর ফাহাদ তাকিয়ে আছে গায়ে রক্তের বন্যা দেখে কান্না আর সংবরণ করতে পারলাম না। কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! দুজনকেই হাসপাতালে নেয়া হল। আমার ফয়সালকে আর বাঁচানো গেল না। ফয়সাল চলে গেল মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে। ঘটনা ঘটেছে বিকাল পাঁচটায়। সারারাত হাসপাতালে বসে কান্নাকাটি করলাম মহান আল্লাহর কাছে। হে আল্লাহ আমার ফয়সালের হায়াত দাও। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা শত কষ্ট হলেও মানতে হবে। আমিও সহ্য করলাম। আল্লাহ যেন আমার ধৈর্য্যকে কবুল করেন। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন ফয়সালের রক্তে রঞ্জিত সিদ্ধিরগঞ্জকে ইসলামের মজবুত ঘাঁটি হিসেবে কবুল করেন। এবং সমস্ত শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের বুকে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্বশেষ আমার শিবিরের প্রাণপ্রিয় পবিত্র সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি তারা যেন ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে মৃত্যুকে পরোয়া না করে আল্লাহর দেয়া মহান দায়িত্ব পালন করতে পারে। আল্লাহ যেন ফয়সাল, মুজাহিদ, শিপন, মাছুম, রফিকুল ও অন্যান্য সবার শাহাদাত কবুল করেন।

---

*লেখক : শহীদ ফয়সালের মা*



icsbook.info

icsbook.info

icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ

শেখ মো: রোকন রেজা

২৮ অক্টোবর সকাল ৬টায় এগারসিন্দুর এক্সপ্রেসে ঢাকার উদ্দেশে আসার পথে গাড়ি যখনই টঙ্গী থামলো সাথে সাথে লগি-বৈঠাধারি ৩০-৪০ জন যুবক ট্রেনের গ্লাসে এলোপাতাঁড়ি ভাঙচুর শুরু করল। সবাই চিৎকার শুরু করে এদিক সেদিক কেউবা জীবন বাঁচানোর জন্য জানালা দিয়ে বের হওয়া শুরু করল। মহিলা ও শিশুরা বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার শুরু করল। আমি তখনও কিছু বুঝতে না পেরে এক পর্যায়ে দেখলাম ট্রেনের বগিতে কেউই নেই। সন্ত্রাসীরা গ্লাস ভাঙতে ভাঙতে আমার বগির দিকে যখন এলো তখনও চুপ করে বসেছিলাম। ভাবলাম যা হওয়ার হবে আল্লাহ ভরসা। একটু পরই জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দিয়ে ওরা পুলিশের টেয়ার শেল খেয়ে চলে গেল। বৈঠাধারি যুবকদের দেখে বুঝতে পারলাম না ওরা কারা। তবে এদের চেহারা দেখে মনে হলো এরা 'টোকাই লীগ'। একটু পরে পুলিশ ও বিডিআরের সহায়তায় ট্রেন যথারীতি কমলাপুর এসে পৌছল।

কমলাপুর থেকে রিকসাযোগে অফিসে ঢোকা মাত্রই দেখলাম একের পর এক আহত অবস্থায় লোকজন অফিসের দিকে আসছে। অফিসে তখন দেখলাম সেক্রেটারিয়েটভাইয়েরা বসছেন। কথা না বলে চুপ করে বৈঠকে বসে গেলাম। কেন্দ্রীয় সভাপতি তৎক্ষণাৎ বললেন, আর বসে থাকা যায় না, আসুন সবাই বের হয়ে পল্টনের দিকে যাই। অফিস থেকে বের হয়ে আমরা এক সাথে যাচ্ছি। রেজাউল করিম ভাই বললেন, রোকন ভাই আপনি কেন্দ্রীয় সভাপতির সাথে সার্বক্ষণিক থাকবেন, আমরা যাচ্ছি পল্টন মসজিদের দিকে। কেন্দ্রীয় সভাপতির সাথে চলে গেলাম পল্টন ময়দানে। কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! নিজেকে আর সামলিয়ে নিতে পারলাম না। হাজার হাজার লগি-বৈঠাধারি লোক। মনে ভরসা ও বিশ্বাস ছিল যে ওরা যাই করুক না কেন, এক পর্যায়ে তারা পালাবেই। হঠাৎ দেখলাম আমাদের নিকট থেকে ৮-১০ হাত দূরে যেখানে তানভীর নামে ১২-১৪ বছরের একটি ছেলে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। তার রক্তাক্ত মুখে হাত দিয়ে বললাম, কাঁদছো কেন? তখন সে মায়াজ-মোয়াজের মত চিৎকার



icsbook.info

করে বলল, 'আমাকে আহত অবস্থা যুদ্ধের ময়দান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? আমি তো আহত হয়ে যাওয়ার জন্য আসিনি। আমাকে ছেড়ে দিন আমি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হবো। তার এ অনুভূতি দেখে তখনই আমার মনে হচ্ছে আজ আমাদেরই বিজয় হবে। কেন্দ্রীয় সভাপতির সাথে থেকে কোন ময়দানে বাতিলের মোকাবেলা এটাই আমার প্রথম সৌভাগ্য মুহূর্ত। সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সরাসরি ময়দানে মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সভাপতির যোগ্যতা, বিচক্ষণতা আর সাহসিকতা দেখে আমার নতুন করে অনেক কিছু শেখা হল। একবার আমীরে জামায়াতের বক্তৃতার ঠিক আগ মুহূর্তে পাশের ছাদের ওপর দিকে একটি ইটের টুকরা কেন্দ্রীয় সভাপতির দিকে ছুটে আসছে। আমি বললাম মাসুদ ভাই একটু মাথাটা সরে দাঁড়ান, তিনি তখন চিৎকার করে বললেন, না। তৎক্ষণাৎ টুকরাটি তার ডান হাতে এসে পড়ল। পরক্ষণেই শুরু হল বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ। তখন কেন্দ্রীয় সভাপতি সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন, কেউই এখান থেকে যাবেন না। একটু পরই গুলি থেমে যাবে, ওরা টিকতে পারবে না, বাতিলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যেই কথা সেই কাজ। মুহূর্তে তাদের পক্ষ থেকে আর গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তিনিই ময়দান মোকাবেলায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে তার সাথে থাকতে পেরে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি। এভাবে তার বিচক্ষণ নেতৃত্বে সন্ধ্যা পর্যন্ত পল্টনে আমাদের চোখের সামনে হয়ে গেল শহীদ, আহত হল হাজার হাজার দীনি মুজাহিদ। সন্ধ্যার পর যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল তখন এডভোকেট মশিউর রহমান ভাইয়ের নেতৃত্বে শুরু হল মামলার কার্যক্রম।এডভোকেট কামাল ভাই এবং রাজ্জাক ভাই, এডভোকেট ফরিদ ভাই, এডভোকেট শিশির মনিরসহ আরো অনেকের সহযোগিতায় পল্টন থানায় মোট ৩টি ও শাহবাগ থানায় ১টি মামলা রুজু করা হয়।

মামলার কাজ শেষ করে আমরা চলে যাই জামায়াতে ইসলামীর আরেক নির্ভীক দায়িত্বশীলের সাথে তিনটি হাসপাতালে থাকা রোগিদের দেখতে ও খোঁজখবর নিতে। সেই ভাইয়ের সাথে হাসপাতালে যাওয়ার পথে আমি বললাম, আপনার ছেলে পল্টনে ছিল– সেই সময়ে তার খোঁজ নিয়েছিলেন কি না। তখন উত্তরে তিনি বললেন, না আমি তার খোঁজ নেয়ার সুযোগ পাইনি। ছেলের মা আমাকে খোঁজ নিতে বলল, কিন্তু আমি চিন্তা করলাম– আমি যদি শুধু আমার ছেলের খোঁজ নেই তাহলে তার প্রতি আমার পিতা হিসেবে ভালবাসার সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের হযরত ইসমাইল (আ.) এর প্রতি হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর কথা। তৎক্ষণাৎ সেই দায়িত্বশীল ভাই ছোট ছেলেদের ন্যায় কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বলেন, আহত অন্যসব ভাইদের খোঁজ নেয়ার দায়িত্বও আমার। তার পর তিনটি হাসপাতালে গিয়ে একজন একজন করে খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করলাম। সে দায়িত্বশীল ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী ও কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বললেন, হাসপাতালের সকল আহত ভাইদের চিকিৎসার ব্যাপারে যা করণীয় সকল কিছু সংগঠনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আমার। যে কোন সমস্যার ব্যাপারে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।

পরের দিন শহীদ পরিবারের সাথে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন। শহীদদের মা-বাবার অনুভূতি দেখে মনে হলো তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা-বাবা। ঘটনার তিন দিন পর সাবেক



icsbook.info

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে ২৮ অক্টোবর শহীদ পরিবারের সাক্ষাৎ। আমার হাতে থাকা সকল শহীদ পরিবারের নাম ও বিস্তারিত ঠিকানাসহ ফাইলটি কেন্দ্রীয় সভাপতির কাছে দিলাম। জনাব কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে সকল সম্মানিত গর্বিত শহীদ পরিবারকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি সবচেয়ে অবাক হয়ে গেলাম পরদিন কয়েকটি জাতীয় দৈনিক– যেগুলোর নাম লিখে আমি এই স্মরণিকাটিকে অপবিত্র করতে চাই না। দৈনিকগুলোতে বলা হলো সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সাথে ২৮ অক্টোবর নিহত বোরকা পরে মিথ্যা আত্মীয়-স্বজন সেজে দেখা করেছে। আমি সেই জঘন্য পত্রিকার সম্পাদক ও হলুদ একচোখা সাংবাদিকদের বলতে চাই, ২৮ অক্টোবরের শহীদের ঘটনা সারা বিশ্ববাসী জানলেও আপনারা যারা মিথ্যা বলছেন, ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আসুন আমাদের খরচে সকল শহীদের বাড়িতে আপনাদের নিয়ে যাবো। এই প্রস্তাবে কি আপনাদের সাড়া পাওয়া যাবে? এই প্রস্তাবে আপনারা আসবেন না। পরিশেষে বলতে চাই শহীদি এই কাফেলাকে সম্মানিত করা ও সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিজের। ২৮ অক্টোবরের ইতিহাস সত্যাশ্রয়ীদের রক্তক্ষরণের এক অধ্যায় হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

*লেখক : কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাকান্ডের নির্মম দৃশ্য

নিজাম উদ্দিন মাহমুদ

স্মরণকালের কিছু ঘটনা হৃদয়ে সর্বদা যাতনা দেয়। যেমন গুজরাটে পুড়িয়ে মানুষ হত্যার সেই করুণ দৃশ্য দেখে কার চোখে পানি না আসে , আমেরিকাতে কয়েক বছর পূর্বে হ্যারিকেন বিটা'র আঘাতে যখন মানুষগুলো জীবন বাঁচানোর জন্য প্রাণপনে ছুটছে ঠিক সেই সময় সভ্যসমাজের দাবীদার প্রতিবেশীরা কি জঘন্যভাবে নারীদের উপর হিংস্র জানোয়ারের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন অর্থকড়ি ধনসম্পদ কিভাবে লুট করেছে তা বোধকরি সকলের মনে আছে, আর আবু গারাইব কারাঘারের নির্যাতনের সেই কাহিনীতো এখনো ইরাক আফগানে চলছেই। কয়েক বছরের শেষে সালতামামিতে বিভিন্ন বড় বড় ঘটনাগুলো পত্রিকায় আসে। ২০০৬ সালের শেষে যখন মনে করার চেষ্টা করেছি কোন ঘটনাটি ২০০৬ এর সবছে মর্মান্তিক। পুরো পৃথিবীর অনেকগুলো ঘটনাকে মনে করে এবং অনেক হিসাব করে দেখলাম ২০০৬ সালের পুরো পৃথিবীর সবছে জঘন্যতম নির্মম দৃশ্য হলো ২৮ অক্টোবর'০৬ বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া লগি-বৈঠার তান্ডবের সেই অমানবিক দৃশ্যটি। কারণ একটি মানুষকে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করার পর তার উপর লাপিয়ে লাফিয়ে উল্লাস করার ঘটনা হালাকু খান যেমনি করেনি তেমনি কারবালার ময়দানে সীমারও করেনি আর চেঙ্গীসখানের বর্বরতাও এতটুকু পৈশাচিক ছিলনা। কেউ কেউ হিংস্র হতেই পারে কিন্তু অন্যরা তাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেদিন দেখলাম সবাই মিলে উল্লাস করে, প্রতিযোগীরমত মানুষগুলোকে নির্বিচারে পিটাচ্ছে, এমনকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নৃত্য করার মত চরম অমানবিক কাজটিও করছে অবলীলায়। কয়েকজনকে দেখাগেল প্রকাশ্যে গুলি ছুঁড়ছে। এতে কয়েকজনের মাথা বুক হাত পা ঝাঁজরা হয়ে গেছে। লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মাথা কয়েক খন্ড করা হয়েছে, সমস্ত শরীরে মারাত্মক যখম এবং হাত পায়ের হাঁড় ভেঙ্গে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। কারও কারও মাথা পেটে মগজ পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। নির্মম আঘাতে অনেকের চেহারাও বিকৃত হয়ে গেছে। বাঁচাও বাঁচাও



icsbook.info

চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে গেলেও হায়েনাদের হৃদয় একটুও গলেনি। একজন মানুষকে মেরে ফেলার পর লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলা কোন মানুষ নামের জীবের পক্ষেও কি সম্ভব? আমি জানিনা আফ্রিকার জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার কোন শিকার ফেলে এভাবে উল্লাস করে কিনা। অবশ্যই করেনা। তাহলে যারা মাত্র ২দিনে ২৬জন জীবন্ত মানুষকে এমন নির্মমভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করলো তারা কি মানুষ নাকি পশু, আর যারা এহেন কাজের নির্দেশ দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে পক্ষ নিয়েছিল তারা কি? ওরা আসলে মানুষের চেহারায় হিংস্র জানোয়ার, ওরা খুনি, ওরা হায়েনা, ওরা রক্তপিপাসু।

তবে সেদিন বাংলাদেশের ডান বাম সকল বড় বড় সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ আইনজীবীরা ঐ ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছিলেন এবং বিচারও দাবী করেন। শুধু বাংলাদেশ নয় পুরো পৃথিবীতে সেদিনের ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিল। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ নিন্দা জানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের জননেত্রী কর্মসূচি সফল করায় কর্মীবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কি জঘন্য আমাদের মানসিকতা। বিভিন্ন চ্যানেলে সেই দৃশ্য দেখানোর পর অনেক শিশু ভয়ে কাঁদতে থাকেলে অভিভাবকরা টিভি বন্ধ করে দেয় শিশুরা যেন এই বর্বর দৃশ্য দেখতে না পারে। আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির রয়টার ভবনের উপরে নির্মিত বৃহৎ টিভি স্ক্রীনে যখন ঐ পাশবিক দৃশ্য বারবার দেখানো হচ্ছিল তখন কয়েকদিন আগে শান্তিতে নোবেল পাওয়া ব্যক্তির দেশের এই জঘন্য, বর্বর, নৃশংস, ভয়াবহ, নির্মম, পাশবিক, অমানবিক ও বিবৎস দৃশ্য দেখে বিশ্ববাসী লজ্জায় মুখ ঢাকলো। সেদিনের টিভি ফুটেজ দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় সেদিনের সেই গুলি বর্ষণ ও লগি-বৈঠার তান্ডবের নেতৃত্বে ছিলেন ডা. ইকবাল ও হাজী সেলিম। আসলে আওয়ামীদের চরিত্রই এমন। তারা ক্ষমতায় থাকলেও হত্যা সন্ত্রাস করে আর না থাকলেও সন্ত্রাসই তাদের চরিত্র। ২০০১ সালে ডা. ইকবালের উপস্থিতি ও নির্দেশে ৪ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করার সেই ঘটনা আজও দেশবাসীর মনে আছে। এছাড়া তাদের '৭১-৭৪ আমলে ৪০হাজার নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে, লুট করা হয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ, জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে হাজার হাজার বাড়ি-ঘর। সেই বাকশালী চরিত্র যখন মানুষ ভুলতে বসেছে তখনই ৯৬-২০০১ আমলে প্রায় ২০হাজার মানুষকে হত্যাসহ ধর্ষণ চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে চরম কষ্ট দিয়েছিল। ২৮ অক্টোবর দেশব্যাপী যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় তা আওয়ামী লীগের চরিত্রেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। সেই অমানবিক ঘটনার পর একটি পত্রিকায় লগি-বৈঠাধারীদেরকে নিরীহ জনতা বলে উল্লেখ করায় বুঝলাম মানুষের চেহারায় কিছু অমানুষ পৃথিবীতে সব সময়ই থাকে।

আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সেদিন ঢাকাসহ সারাদেশে লগি-বৈঠা দিয়ে যে চরম তান্ডব চালিয়েছে তা বাংলাদেশের মানুষের মনথেকে মুছে যেতে অনেকদিন লাগবে। কিন্তু আগামী প্রজন্মেকে অবশ্যই আওয়ামী লীগের এই জঘন্য চরিত্রের বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে। যেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদেরকে ধিক্কার জানায়। তা না হলে আগামী প্রজন্ম আওয়ামীদের হটকারী চরিত্র বুঝতে পারবে না। ২৮ অক্টোবরের জঘন্য ঘটনার প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সরকারের পক্ষথেকেও তা বলা হয়েছে।



icsbook.info

২৮ অক্টেবরের শহীদদের রক্ত সাগরের ঢেউ বাংলাদেশের ৩৬ বছরের হত্যা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ অপকর্মের কালিমাকে কিছুটা ধুয়ে দিয়ে দেশ আজ রাহুর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। সুতরাং ২৮ অক্টোবরকে 'লগি-বৈঠার তান্ডব দিবস' হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে আগামী প্রজন্মকে সতর্ক করে দিতে হবে। শহীদ পরিবারের সাথে সরকারের গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাত ও মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা ঘটনার নির্দেশ দিয়েছে, নেতৃত্ব দিয়েছে, তান্ডব চালিয়েছে তাদের সবাইকে দ্রুত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং কাউন্টার মামলা প্রত্যাহার করে শহীদদের আত্মীয় ও দায়িত্বশীলদেরকে হয়রানি বন্ধ করতে হবে। পুরো পৃথিবীর মানুষের সামনে এতগুলো মানব সন্তানকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করার বিচার যদি না হয় তাহলে কোন ঘটনার বিচার হবে। কার বিচার হবে। তাহলে বিচার বিভাগইবা কি জন্য। রাজনৈতিক ঘটনা বলে এই মামলাকে দুর্বল করা হলে তা হবে পৃথিবীবাসীর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তেমন কিছু হলে খুনি সন্ত্রাসীরা তাদের অপকর্ম চালিয়ে যাবে যা কারও জন্য সুখকর হবেনা। এমন যেন না হয় তা দেশবাসীর কামনা। সরকার যদি ব্যবস্থা না করে তবে এদেশের শান্তিপ্রিয় লক্ষ জনতা প্রতিবছর ২৮ অক্টোবরকে লগি-বৈঠার তান্ডব দিবস হিসাবে পালন করবে। এবং খুনি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করবে। অবশেষে শহীদ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে শেষ করছি। মহান আল্লাহ শহীদদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমিন।

---

*লেখক ঃ মানবাধিকার কর্মী।*



icsbook.info

# শহীদ রফিকের শাহাদাত
# আমাদের জন্য একটি প্রেরণা

মুহা. রফিকুল ইসলাম

ঈদের আমেজ তখনো কাটেনি আমি আমার গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। ২৬ অক্টোবর সকালে জেলা সভাপতির ফোন পেলাম। ২৮ অক্টোবর জোট সরকারের ৫বছর পুর্তি উপলক্ষে মিছিল হবে। জেলা সভাপতি শাহজালাল সবুজ ভাই ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে নির্বাচনী এলাকা রৌমারী রাজিবপুর সফরে যাবেন। তাই মিছিলের দায়িত্ব আমাকে নিতে হল। বাড়ি থেকে মেসে এসে দেখলাম ২/৩ জন ছাড়া কেউ তখন মেসে আসেনি। দায়িত্বশীল ভাইদের ফোন করে মেসে নিয়ে আসলাম। সবার সাথে পরামর্শ করে ২৮ অক্টোবরের মিছিলকে সফল করার জন্য দাওয়াতি কাজে বের হলাম। ২৭ তারিখ বিকেল বেলা জোট সরকারের পাঁচ বছর পুর্তি ও আমাদের কিছু আদর্শিক স্লোগান সম্বলিত প্লাকার্ড তৈরি করলাম। ২৮ অক্টোবর সকাল ৮ টার মধ্যে প্লাকার্ডগুলো জামায়াত অফিসে পৌছানোর ব্যবস্থা করে আমি দায়িত্বশীল ভাইদের নিয়ে জামায়াত অফিস, চামড়ার গোলায় গেলাম। সকাল ৯টা থেকে কর্মী ভাইয়োরা আসতে শুরু করেন। রফিক ভাইও যথাসময়ে এসে হাজির ছিলেন তার সাথীদের নিয়ে সকাল ১১টার মধ্যে মোটামুটি প্রায় ২ শত কর্মী জামায়াত অফিসে আসে। দায়িত্বশীল ভাইদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত বৈঠক শেষে জামায়াত জেলা সেক্রেটারি দেওয়ান আমিনুল ইসলামের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের পর তার নেতৃত্বেই মিছিল শুরু হয়। দাদা মোড়ে বিএনপি অফিসের সামনে মিছিলটি থামলো না কারণ ওখানে বিএনপির নেতা কর্মীরা আমাদের জন্য অপেক্ষ করছিল । সেখানে জোট নেতাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর জামায়াতের নেতৃত্বে মিছিল শান্তি পূর্ণভাবে শাপলা চত্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু শাপলা চত্বরে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা লগি-বৈঠা হকিস্টিক ইট পাটকেল ও লাটিসোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা আমাদের মিছিল আসতে দেখে লগি-বৈঠা উঁচু করে বিভিন্ন ধরনের উস্কানিমূলক স্লোগান দেয়।



icsbook.info

আমাদের মিছিলের একটি লোকও তখন পর্যন্ত উত্তেজিত হয়নি। আমাদের মিছিলটি যখন ঘোষপাড়াস্থ ট্রাফিক আইল্যান্ডের কাছে আসলো তখন বাধা দেয় এবং ট্রাফিক আইল্যান্ডের ডান দিক (পৌরসভার) পুলিশ দিয়ে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন পুলিশের অনুরোধে জামায়াত নেতৃবৃন্দ যখন নিজউদ্যোগে মিছিলটি পৌরসভার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা আমাদের উপর পেছন থেকে হামলা করে এবং তখন বিএনপির নেতা কর্মীরা আমাদের না জানিয়ে পিছটান দেয় এতে জামায়াত-শিবির একাই প্রতিরোধ গড়ে তুলে আমাদের প্রতিরোধের মুখে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পিছু হটতে থাকে এ সময় পুলিশ নিরপেক্ষতার পরিচয় না দিয়ে জামায়াত-শিবির কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে ফলে আমাদের কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই সুযোগে আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী মঞ্জু ও দুলাল এর নেতৃত্বে পুলিশের সহযোগিতায় আমাদের উপর হামলা চালায় এতে জামায়াত নেতা আঃ ওহাব মাস্টার মাওলানা কাওছার আলী, প্রভাষক নয়ন নূর মুহাম্মদ ও শিবির নেতা আবুল কালাম সরকারসহ বেশকিছু নেতা-কর্মী গুরুতর আহত হয়। এর মধ্যে আঃ ওহাব মাস্টার এর অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। এত সংঘর্ষের মধ্যেও জামায়াত নেতারা আমাদের কর্মীদের ফিরিয়ে আনার জন্য তৎপর ছিলেন। কিন্তু রফিক ভাইসহ বেশ কয়েকজন পিছনে ছিলেন। রফিক ভাইয়ের মাথায় একটি টুপি ছিল। দৌড়াদৌড়ির সময় তার টুপিটি পড়ে যায়। তিনি সেই টুপি তুলে নেয়ার সময় পুলিশ তার পায়ে সজোরে আঘাত করলে তিনি হাঁটার ক্ষমতা অনেকটা হারিয়ে ফেলেন। এই ফাঁকে আওয়ামী লীগের কয়েকজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী রফিক ভাইকে ধরে এবং টেনে হিঁচড়ে পৌরসভার বাঁয়ে পাঠাগারের সামনে এনে তার মাথার পিছনে দিকে সজোরে আঘাত করায় রফিক ভাই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে উপর হয়ে পড়ে যায়। এরপরে শুরু হয় তার উপর লাগি-বৈঠা ও লাঠি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত। ১৩/১৪ জন নর পিশাচ তার উপর অবিরাম আঘাত করতে থাকে যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল। তিনি 'মা' বলে চিৎকার করেছিলেন। কিন্তু সেই অমানুষদের হৃদয়ে মায়া লাগেনি। তারা তাকে মৃত ভেবে উল্লাস করতে করতে চলে গেলে পাঁচগাছী উপশাখার জামায়াতের সেক্রেটারি নূর মোহাম্মদ ভাই তাকে রিক্সায় তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা এতই মুমূর্ষু ছিল যে মাথায় পিছন দিকটা থেঁতলে গিয়েছিল। ফলে নাক মুখ দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। কর্তব্যরত ডাক্তার তার অবস্থা আশংকাজনক ভেবে তাকে ঢাকায় নিতে বলে। কিন্তু অবরোধ থাকার ফলে তাকে ঢাকায় নেয়া সম্ভব হয়নি। তাই তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে রংপুর মেডিকেল হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ৩০ মিনিট পরে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন (ইন্নানিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এভাবে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের লগি-বৈঠার আঘাতে শহীদ রফিকের কচি প্রাণ নিঃশেষে হারিয়ে গেল।

চলে গেলেন প্রিয় ভাইটি মহান রবের কাছে। ময়না তদন্ত শেষে রাত ১টায় রংপুর শহর সেক্রেটারি তারিকুজ্জামান ভাইসহ কয়েকজন লাশ নিয়ে আসে জামায়াত অফিসে। শহীদের সাথীরা রাত জেগে অপেক্ষা করছিল শহীদের লাশ গ্রহণ করার জন্য। শহীদের



icsbook.info

গোসল ও কাফন পরানো হল। পরদিন সকালে ফজর নামাজের পর চামড়াগোলা ও এর আশপাশের এলাকা হতে শত শত পুরুষ মাহিলারা ভিড় জমায় শহীদে নিস্পাপ মুখটি দেখার জন্য। শহীদ রফিক ভাইকে দেখে সাধারণ মানুষ খুনিদের ধিক্কার দিয়েছিল। কি অপরাধ ছিল এই ছোট্ট ছেলেটির ? যার জন্য তাকে প্রাণ দিতে হলো সে দিন সাধারণ মহিলারা শহীদের হাসিমাখা মুখটি দেখে বলেছিল। যারা তাকে হত্যা করেছে তাদের কি কোন সন্তান নেই? সকাল ৯টা ৩০মিনিট পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য শহীদের লাশ দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। জেলা আমীর শহীদ রফিক ভাইকে এক নজর দেখার জন্য এলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। তিনি রফিক ভাইয়ের কপালে চুমো দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পরলেন। তখন শহীদের সাথীদের কান্নায় সেখানকার পরিবেশ ভারী হয়ে গিয়েছিল। এরপর জেলা আমীর। শহীদের সাথীদের নিয়ে তার জন্য দোয়া করলেন। এরপর শহীদের সাথীরা শহীদের কফিন বহন করে নিয়ে গেলেন এম.এ সাত্তার স্কুল মাঠে জানাযা পূর্ব সমাবেশে চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রেখেছিলেন। জেলা আমীরের বক্তব্য দেওয়ার সময় জনতা তাদের চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। জানাযা নামাজের ইমামতি করেন প্রবীণ জননেতা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর আ.ন.ম সোলায়মান। এরপর শহীদের কফিন নিয়ে শুরু হল শোক র‍্যালী। হাজার হাজার মানুষ এ শোক র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করেছিল। কুড়িগ্রামের বুকে এই প্রথম কফিন নিয়ে শোক র‍্যালী দেখে রাস্তার সাধারণ মানুষ দোকান পাট থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং এই হত্যাকান্ডকে কুড়িগ্রামের জন্য ন্যক্কার জনক ঘটনা বলে অবিহিত করেছিল। র‍্যালীর সময় শহীদের কফিন থেকে ফোঁটায় ফোটায় রক্ত রাস্তায় পড়ছিল সেদিন কোরআনের সেই আয়াতকে মনে পরছিল যে, আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলনা, শহীদের কফিন থেকে তাজা রক্ত দেখে সেই সাধারণ মানুষ আশ্চার্য হয়েছিল। র‍্যালী শেষে ট্রাকে করে কফিন নিয়ে যাওয়া হয় তার খালার বাড়ি চান্দের খামারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ট্রাক থামানো হয় সেখান থেকে শহীদের খালার বাড়ি পর্যন্ত মানুষের ভিড় ছিল। শহীদকে শেষ বারের মত দেখার জন্য উন্মুক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ট্রাক থেকে কফিন নামিয়ে শহীদের সাথীরা তার খালার বাড়িতে নিয়ে যায়। খালার কাছে শহীদ রফিক এক বছর বয়সে এসেছিল তখন থেকে খালা তাকে মানুষ করেছিল। খালাকে রফিক ভাই মায়ের মত ভালবেসে ছিল ঈদের দুই দিন পর খালাসহ রফিক ভাই বাবার বাড়ি যাত্রা-পুর গিয়েছিল। মিছিলের দাওয়াত পেয়ে রফিক ভাই যাত্রাপুর থেকে আসার সময় খালাকে নিজ হাতে সেমাই খাইয়ে দিয়েছিল শহীদের লাশ খালার বাড়িতে নিয়ে আসা হলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। শহীদের বাবা শহীদ রফিকের কপালে চুমো খেয়ে বলেছিল, বাবা আমার বুকটা শূন্য করে চলে গেলি। শহীদের খালা ও মা সেদিন কাঁদতে পারেনি। তাঁর সংবাদ শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার ছোট দুটি বোন ছিল। তারা ভাই ভাই বলে ডুকরে কাঁদছিল তার ছোটভাই ওহাব কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলেছিল, ভাই চলে গেল আমাদের কি হবে? তখন তাদের কথার সান্ত্বনা দেয়ার মত ভাষা আমাদের ছিলনা। শহীদের কফিন দেখে গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষ চোখের পানি ধরে



icsbook.info

রাখতে পারেনি। শহীদের বাড়ির কান্নার আওয়াজে সেখানকার আকাশ বাতাস ভারী হয়েছিল। গ্রামবাসীর কাছে শুনেছি, শহীদ রফিক ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির। সে খুব কম কথা বলতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে আদায় করতো। তার নানা বলেছিলেন রফিক নামাজ ক্বাজা করত না এবং কি যেন সব সময় লিখত দ্বিতীয় জানাযায় পূর্বে শহীদের খালা কফিনের কাছে এসে শহীদের মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে দোয়া করেন। এরপর কফিন নিয়ে যাওয়া হয় তিনি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করতেন সেই চান্দের খামার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। সেখানে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিল। জানাযা পূর্ব সমাবেশে জেলা আমীর, শিবিরের জেলা সভাপতিসহ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলে এই নারকীয় হত্যা কান্ডের জন্য আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বিচার দাবি করেন। সমাবেশ শেষে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে তার খালার বাড়িতে দাফন করা হয়। শহীদের লাশ যখন কবরে রাখা হচ্ছিল তখন তার খালা মা বাবা সবাই পাগলের মত শহীদের কফিনের দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু রফিক ভাই তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে চলে গেলেন মহান প্রভুর সান্নিধ্যে। আজও শহীদের খালা পাগল প্রায়। তিনি ছেলে হারা শোকে অসুস্থ, চিকিৎসার উপর তার দিন কাটছে। তার বাবা-মা এখন আমরা গেলে আমাদের দিকে চেয়ে থেকে কাঁদতে চায় কিন্তু পারেনা। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। শহীদ রফিক আজ নেই কিন্তু সে থাকবে তার সাথীদের প্রেরণা হয়ে । ■



icsbook.info

# একজন শহীদের আহ্বান

মোঃ দেলোয়ার হোসাইন

এসো, অনেক দেরি হয়ে গেছে, এসো দেরি করোনা আর, দেরি কিন্তু অনেক হয়ে গেছে, আরো দেরি হলে কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমি কিন্তু তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিনি। জানি দেরি হয়ে যাবে। তোমরা আসবে জানলে আমি প্রতিক্ষায় পথ পানে চেয়ে থাকতাম। আমি এদেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম, স্বপ্ন দেখতাম এদেশের মানুষদের নিয়ে। হে আল্লাহ তুমি একটা জীবন দান করেছিলে আমার এবং আমাদের আনন্দের ফুলঝুরি জ্বালিয়ে অনেক রাত বুনোহাঁসের ডানায় কখন হয়েছে ভোর জানি না, তুষের আগুন জ্বালিয়ে তার চেয়ে বেশি বেদনায় রাত কাটাতে চাইনি, যেন এক একটি হাসির ঋণ শোধ দিতে হলে সহস্র কান্নার সুদে।

এখনও পল্টনের গলি থেকে রক্তের গন্ধ আসে। শত শত মানুষের কান্নার আহাজারিতে যেদিন আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠে ছিল। যেদিন হিংস্র জানোয়ারের কালো থাবায় রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল পল্টন, যেদিন কেঁদেছিল হাজার হাজার মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন এবং ইসলাম প্রিয় মুসলমান, যেদিনের গোলা-গুলি আর বোমার আঘাতে, লাঠি, লগি, বৈঠার সেই ভয়ংকার শব্দ কি তোমরা শুনতে পাওনা? হে পৃথিবীর তরুণেরা তোমাদের চোখের সামনে কি সে দিন ভেসে আসে না? কিন্তু আমি আজও পল্টনের সেই বোমা, গুলি আর লাঠির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আমি যেন অস্থির হয়ে গেছি। অথচ তোমরা কি শুনতে পাও না সেই শব্দ? সেই কান্না, সেই নির্মম হত্যার আর্তনাদ? তোমরা কি এতই আত্মভোলা? তোমরা কি এতই নিষ্ঠুর? আমি আজও শুনতে পাই আমার বোনের ভাই হারানো কান্না, আমার পিতা-মাতার সন্তান হারানো বেদনার্ত হৃদয়ের হাহাকার, দেখতে পাই তাদের হৃদয়ের কান্নায় সদ্য বয়ে যাওয়া পরিস্রবণ।

মাত্র কয়েক দিন হল অথচ তোমরা আমাকে সবাই ভুলে গেছ! আমি আজও তোমাদের জন্য কাঁদি। তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে চাও না কেন? অথচ আমি আল্লাহকে বলি, তুমি আমায় হাজার বার জীবন দান কর, আর আমি আমার সেই জীবন যেন পল্টনের মত বাতিলের হাতে সঁপে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করতে পারি।



icsbook.info

তোমরা তোমাদের জীবন নিয়ে শুধু শুধুই ভবিষ্যতের সুখ পানে ছুটতে চাও– তাই না? তোমরা কি চাও না আমার মত সুন্দর জীবন? থাকতে কি চাওনা জান্নাতুল ফেরদৌসের মাঝে? যেখানে কেবল আনন্দ আর আনন্দ। আমি যদি জানতাম তোমরা কেউ আমার সাথে আসবে তাহলে আমি আরও বেশি অপেক্ষা করতাম। তোমাদের নিয়ে শামিল হতাম শহীদের মিছিলে। যে মিছিলের নেতা হবেন 'নবী মোহাম্মদ (সা.)'।

কিন্তু নিষ্ঠুর পৃথিবী আর কত ফোটন্ত তরুণ গোলাপের রক্তে ভেজা লাশ দেখবে, তাকে নিয়ে আনন্দ ফূর্তি করবে, আর কত রক্ত চাই পৃথিবী?

তোমাদের আমার মত জীবন বিলিয়ে দেয়া লাগবে না। বরং তোমাদের জন্য খোলা আছে মাত্র একটা পথ। আমার শরীর তেকে যে রক্ত ঝরেছে, সবুজ-শ্যামল বাংলায় তাজা-তাজা রক্তে যে নদী বয়ে যায়, সেই নদীর হাজার ফোঁটা রক্তকে, হাজার হাজার তরুণের কাছে নিয়ে যাও। আমি যে পথে চলতে যেয়ে, যে নবীর আদর্শকে প্রচার করার জন্য, সমাজের ঘুনে ধরা তরুণ প্রজন্মের জন্য যে মুক্তির আন্দোলন করতে চেয়েছিলাম, যে কাফেলার তলে সবাইকে দেখতে চেয়েছিলাম। সবাইকে দেখতে চেয়েছিলাম ইসলামের ছায়াতলে, কোন গাছের ছায়া তলে দেখতে চাইনি অশ্লীলতার মধ্যে নিমগ্ন থাকতে। কি তোমরা পারবে না আমার অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দান করতে? সাবধান পৃথিবীর পথ কিন্তু খুবই পিচ্ছিল। একবার পা পিছলে পড়লে কিন্তু অনেক পিছিয়ে পড়বে তোমরা। তোমাদের হাঁটতে হবে নখ পুঁতে পুঁতে। ওমর ফারুকের দেয়া তাকওয়ার সংজ্ঞার মত সতর্কতার সাথে। তোমরা যদি ইসলামী আন্দোলনে পূর্ণতা আনতে পারো, তোমরা যদি বাংলার সব তরুণ প্রজন্মের কাছে ইসলামকে পৌঁছে দিতে পারো, তোমরা যদি আমার রক্ত থেকে শোক নয় শিক্ষা নিতে পারো। তোমরা যদি সোনার ছেলেদের দিয়ে ভরে দিতে পারো এই দেশ, অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতায় যে দেশের আকাশ-বাতাস বেদনায় ছটফট করছিল, তোমরা যদি এই পৃথিবীর অশান্ত আকাশ বাতাসকে ইসলামী সংস্কৃতি এবং ইসলামী জাগরণ দিয়ে শান্ত করতে পারো, তোমরা যদি কোরআনের পতাকা সবুজ বাংলার মাঝে ঊর্মিল আকাশে মেলে দিত পার, আর ঐ অশান্ত বাতাস যেদিন শান্তির বাণী নিয়ে কোরআনের পতাকাকে পত পত করে উড়াতে পারবে, সেদিন পতাকার মত আমিও উঠবো হেসে। সেদিন কেবল শোধ দিতে পারবে আমার পিতা-মাতা, ভাই, বোনের বেদনার্ত কান্নার ঋণ, আরও শোধ দিতে পারবে আমার তাজা তাজা রক্তের ঋণের। তোমাদের কাছে এটাই আমার প্রত্যাশা। ■



icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর ২০০৬

অধ্যাপক মেহেরুন নেসা

২৮ অক্টোবর-২০০৬ ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি রক্ত ঝরা দিন এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ধারায় একটি ভয়ংকর কলংকিত দিন হিসেবে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এদিন আওয়ামী লীগ ও বাম হায়েনাদের পৈশাচিক তাণ্ডবলীলায় আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত প্রাণ ইসলামী আন্দোলনের বেশ কিছু নেতা কর্মী দুনিয়ার সমস্ত মায়া মমতার পাট চুকিয়ে মহান আল্লাহপাকের সান্নিধ্যে মিলিত হয়েছেন। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। শহীদের রক্তমাখা এ দিনটি সম্পর্কে সেদিন থেকেই কিছু লিখব বলে ভেবেছিলাম কিন্তু ব্যস্ততার মাত্রা এত বেশি ছিল যে পেরে উঠছিলাম না। কিন্তু মনকে তো প্রবোধ দিতে পারছিলাম না। বিবেক বলে উঠছে, 'তুমি কি ঐ হিংস্র হায়েনাদের এতটুকু ধিক্কারও জানাবে না। আর শহীদ পরিবারদের এতটুকু সান্ত্বনার বাণীও শোনাবে না!– তাই দেরিতে হলেও বিবেকের তাড়নায় আনার এ কলম ধরা।

জোট সরকারের ৫বছর মেয়াদ পুর্তি উপলক্ষ্যে সেদিন বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেদিনই আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল সরকারের নির্দেশিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সম্পূর্ণ হিংস্র কায়দায় পল্টন ময়দান দখল করে জনসভার আয়োজন করে। একটা চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে টিভি চ্যানেলে সার্বক্ষণিক চোখ রেখে চলেছিলাম যে কি হচ্ছে আর কি হবে দেশের। দেখি লগি-বৈঠা ধারীদের হিংস্র আক্রমণে দোকান-পাট, অফিস-আদালত ও ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান ভাংচুর, লুটপাট ও গাড়ি পোড়ানোর দৃশ্য। এরই মাঝে চোখে পড়ল জামায়াতে ইসলামীর সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ জনসভায় ১৪ দলীয় গুন্ডারা ককটেল, পিস্তল, লগি, বৈঠা ও ইট-পাটকেলের সাহায্যে আঘাতের পর আঘাত হেনে চলছে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে। আহত ও গুলিবিদ্ধ কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে জামায়াত কর্মীরা। কিন্তু যে দৃশ্য দেখবো বলে ভাবিনি কখনো, কল্পনাতেও উঁকি ঝুঁকি দেয়নি, সে দৃশ্য দেখে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে গেলাম। কি নির্মম, কি নিষ্ঠুর, কি পৈশাচিক বিভৎসতা– যা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানায়। আমি যেন আবারো নতুন করে বদর ও ওহুদের



icsbook.info

প্রান্তর দেখলাম। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায়ে চোখে পড়ল মুজাহিদুল ইসলামকে। দৌড়ে চলে যেতে চাচ্ছিল ছেলেটি, কিন্তু দু'ধারে হায়েনার লাঠির নির্মম আঘাতে রাজপথে লুটিয়ে পড়ল দেহটি। এরপর যা দেখলাম তা আরো বর্বর আরো অমানবিক। দু'ধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা হায়েনারা লগি-বৈঠার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করল লুটিয়ে পড়া দেহটিকে। কম করে হলেও একশত বা তারও বেশি আঘাত পড়েছে দেহটির উপর। একটি একটি করে আঘাত পড়ছে আর ও যেন আমারই কলিজায় কাষাঘাত হানছে। হৃদয়ের তারগুলো যেন একটি একটি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে–আহ্! আহ্হারে! ওরে, হতভাগারা! ওরে, তোরা একি করছিস? আহ্! আর দেখতে পারছি না...। নিজের অজান্তেই কথাগুলো বের হয়ে আসছিল মুখ থেকে। এরপর আরো ঘৃণ্য, আরো কুৎসিত অথচ হৃদয় কাঁপানো যে দৃশ্যটি চোখে পড়ল– কি বলে যে ঘৃণা প্রকাশ করবো ভাষা খুঁজে পাই না– আঘাতে আঘাতে ততোক্ষণে করতো ক্ষত বিক্ষত দেহটি হতে হয়তো মুজাহিদের প্রাণপাখি আল্লাহ্র সান্নিধ্যে মিলিত হয়ে গেছে, উচ্ছল তারুণ্যের যৌবনোদ্বীপিত দেহটি নিরব-নিথর হয়ে গেছে, হাড়গোরগুলো ভেঙ্গে চুর-চুর হয়ে গেছে, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি মজ্জা থেঁতলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে– সেই সে দেহটির উপর জুতা পায়ে চড়ে কি পৈশাচিক বিজয় উল্লাস! চরম ঘৃণা ও ধিক্কার ধ্বনি বের হয়ে আসল মুখ থেকে, ওহ! ওরে পাষাণ! ওরে কোন পাষণ্ড, তুইরে! মানবতার এ চরম অবমাননায় অবশ্যি আল্লাহ্র আরশ কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

এ ঘটনায় অন্যদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়লাম। দেখি সকলেরই একই অবস্থা। অনেকে আর্তনাদ করে উঠেছে, শিশুরা বলেছে, 'মা, আর টিভি দেখতে পারবো না, বন্ধ করে দাও।'

"মুজাহিদ! মুজাহিদ! তুমি এভাবেই চলে গেলে বাছাধন! কিন্তু কাঁদিয়ে গেলে গোটা বিশ্ব ভুবনকে! আহা! যাও বাছা যাও, তোমাকে আর ডাকবো না কখনো! কিন্তু যে স্মৃতি চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলে বিশ্বের কোটি জনতার মনের মুকুরে, তা ইতিহাসের খাতায় সোনার হরফে লিখা হয়ে থাকবে। তোমার বিদায়ে আজ শুধু তোমার মা ও পরিবারেরই চোখের পানি ঝরেনি, ঝরেছে অসংখ্য মা, বোন ও পরিবারের চোখের পানি। হে, আমার বাছা মুজাহিদ! তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি! যখনই মনে হয় তোমার কথা, স্থির থাকতে পারি না। মাবুদের কাছে দোয়া করি, আয় আল্লাহ্! মুজাহিদকে যখন পছন্দ করে বেছে নিয়েছ, তখন জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা তাকে দান করো।"

এমনিভাবে দুনিয়ার মোহকে পদাঘাত করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে চলে গেল আরো কয়েকটি তরতাজা প্রাণ। শহীদ আব্দুল্লাহ্ আল-ফয়সাল, শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন, শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম, শহীদ রফিকুল ইসলাম এবং শহীদ মোহাম্মদ শাহজাহান আলী। বয়স্কদের মধ্যে শহীদ রুহুল আমীন, শহীদ হাবিবুর রহমানসহ আরো অনেকে। "হে শহীদেরা! দুনিয়ার কোন স্বাদ-আহলাদ, কোন আশা-আকাঙ্খা তোমাদের পূরণ হয়েছে কি না জানি না, তবে তোমাদের পরোয়ারদিগার তোমাদের শ্রেষ্ঠতম আশাটিই পূরণ করেছেন। শাহাদাতের অমূল্য নিয়ামাত দান করেছেন– যা ঈমানদারদের চরম এবং পরম পাওয়া। পৃথিবীর সমস্ত মায়াজাল ছিন্নকারি দ্বীন কায়েমের স্বপ্নে বিভোর। হে শহীদেরা! শাহাদাতের রক্তে ভিজিয়ে বাংলার এ জমিনে দ্বীন



icsbook.info

প্রতিষ্ঠায় যে অসীম উর্বরতা দিয়ে গেলে এর সজীবতা এর শ্যামলতা দেখার প্রত্যাশায় আজ কোটি জনতা অপেক্ষার প্রহর গুণছে। শাহাদাত পিয়াসী অগণিত পথিকের হে অগ্রপথিক! জান্নাতের ঐ খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখো, তোমাদের রেখে যাওয়া কাফেলা কি দুর্বার গতিবেগে এগিয়ে যাচ্ছে– এ গতিধারা রোধ করবে সাধ্য কার! ওগো জান্নাতের পাখি! পরম প্রিয়তমের সাথে মিলিত হবার আশায় উড়াল দিয়ে চলে গেলে, কিন্তু যে গান গেয়ে গেলে, দেখো, আজ সে গানের মিছিল কত বিশাল! বাংলার অসংখ্য দামাল ছেলেরা সে গানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে, আর বলছে, 'আল কুরআনের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো।' ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর আমীরে জামায়াতের নির্দেশ ছিল যে ইসলামী আন্দোলনের জন্য পাঁচ বছরে আমরা যেন পঁচিশ বছরের কাজ করতে পারি। মনে হয় আমীরে জামায়াতের এ নির্দেশ আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারিনি। আল্লাহ্পাক হয়তো ২৮ অক্টোবর '০৬ শহীদদের রক্ত দিয়েই সে ঘাটতি পূরণ করলেন। শহীদের রক্ত বৃথা যায় না, যেতে দেয়া হয় না। ■



icsbook.info

# যে হাসি মিলবেনাকো কোন দিন

শরীফ আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ

দিনটি ছিল ২৯ অক্টোবর '০৬। আমি এবং তৎকালীন থানা সভাপতি আঃ রহিম ভাই ফজরের পরপরই চলে গেলাম ইবনেসিনার আইসিইউ'তে আব্দুল্লাহ আল-ফয়সালের শয্যা পাশে। অক্সিজেন লাগানো অবস্থায় মাথাটা একদিকে হেলানো ছিল। মনে হচ্ছিল আমাদের দিকে তাকিয়ে তার চিরাচরিত সেই মিষ্টি হাসি হাসছে আর যেন বলছে "ওরা ভেবেছে আমাকে শহীদ করলে তোমাদের মধ্য থেকে একজন কমে যাবে, আসলে সব মিথ্যে, সামনে এগিয়ে যাও, বিজয় আমাদেরই।" আইসিইউ থেকে বেরিয়ে আর স্থির থাকতে পারলাম না। অঝোরে কান্না আসছিল আর বার বার চোখের সামনে ভেসে আসতে লাগলো তার সব সময়ের সেই মিষ্টি মাখানো হাসি।

২০০৩ সালে ফয়সালের আব্বা ইন্তেকাল করার পর ফয়সাল ও তার ভাইদের উপর পারিবারিক চাপ এসে পড়ে। একটি কেজি স্কুলে খন্ডকালীন শিক্ষকতা, টিউশনী আর নিজদের একটি ছোট দোকানে সময় দেয়ার পাশাপাশি লেখাপড়া ও সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যেত। তাই অতিরিক্ত কাজের চাপে শেষ পর্যন্ত তার অনার্সের ইয়ার লস করে পদার্থ বিজ্ঞান পরিবর্তন করে ইসলামের ইতিহাস নেয়। এত কিছুর পরেও যখনই তার সাথে দেখা হত ঈষৎ এক মুচকি মিষ্টি হাসি তার মুখে লেগেই থাকত। বিভিন্ন টি.সি কিংবা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ও সবসময় শহীদি গান গেতে পছন্দ করতো। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল– 'আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নিও....., মরতেই হবে যখন শহীদি মরণ আমায় দিও....., মাগো তোমায় দিলাম কথা মুছো আঁখি ভুলো ব্যথা....., আমার লাশের খবর বন্ধু শুনবে একদিন জানি.....।'

কে জানত তার এসব গানের বাস্তব প্রতিফলন একদিন ঘটবে, হায়েনারা তাকে শহীদ করে ফেলবে! তবে ওর চরম স্বপ্ন ছিল শহীদ হওয়ার। তার বাস্তব প্রমাণ হলো– ঈদের পর দিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর '০৬ আমাদের বাসায় একটি পুনর্মিলনীর আয়োজন করি এলাকায় অবস্থানরত স্থানীয় কিছু প্রাক্তন ও বর্তমান সাথী সদস্যদের নিয়ে। ফয়সালও এখানে আমন্ত্রিত ছিল কিন্তু সাথী না হওয়ার কারণে আসতে দ্বিধা বোধ করেছিল। আমি ফোনে একটু রাগ করেই ওকে বলেছিলাম "তুমি আর সাথী হবে কবে আর কবেই বা আমাদের সাথে এরকম অনুষ্ঠানে বসবে?" প্রতি উত্তরে ফয়সাল যে জবাব



icsbook.info

দেয় তা যেন আজো প্রতি মুহূর্তে আমার কানে বেজে উঠে। সে তখন বলে : "মাসুদ, সাথীতো হবোই এবং আরো বড় কিছু হওয়ারও আকাঙ্খা আছে, আমার জন্য একটু খাস করে দোয়া কর।"

আমি ভাবছিলাম বড় কিছু হওয়া মানে সদস্য হওয়া কিন্তু সে যে তার চেয়েও বড় কিছু হয়ে অর্থাৎ শহীদ হয়ে শহীদ আ: মালেক আর সাব্বির ভাইদের সাথী হয়ে সবার আগে জান্নাতের পাখি হয়ে উড়বে তা আর কে জানতো!

ঘটনার সূত্রপাত হলো ২৮ অক্টোবর '০৬, সারাদেশের মতো সিদ্ধিরগঞ্জ থানা জামায়াত-শিবির অফিসে সকাল ১১টার দিকে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় লগি-বৈঠা আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, অফিসে, অবস্থানরত প্রাক্তন শিবির নেতা রিপন ও জামায়াত নেতা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল হাইকে পিটিয়ে রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত করে, তছনছ করে অফিসের আলমারি, শোকেসসহ অন্যান্য আসবাবপত্র, লুটপাট করে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ, বইপত্র, চেয়ার, বাইসাইকেল ও ২টি মোটর সাইকেল এবং শেষ পর্যন্ত জ্বালিয়ে ফেলে মটর সাইকেল ২টিও। মটরসাইকেলটি কেনা হয়েছিল ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আর শুভাকাংখীদের অনুদানে তিলে তিলে কষ্টার্জিত সংগৃহীত টাকা দ্বারা। অনেক দিনমজুর ও স্বল্প বেতনের চাকরিজীবী শ্রমিকরা তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে উপার্জিত টাকার কিছু অংশ এই মটরসাইকেল কিনতে সহযোগিতা করেছিল, যেন ইসলামী আন্দোলনের ভাইয়েরা আরো সহজে, দ্রুততম সময়ে, অধিক দ্বীনি কাজ করে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলে।

অফিসে এ হামলার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিক থেকে আমাদের ভাইয়েরা অফিসে জড়ো হতে থাকে। ফয়সালও এ খবর শুনে আর বসে থাকতে পারেনি। বাসার নিয়মিত বাজার করে বাসায় প্রবেশ করে শহীদি গান গেতে গেতেই। প্রথমে মা ও পরে খালারাসহ পরিবারের সবার কাছে থেকে দোয়া চেয়ে বিদায় নেয় শিবির অফিসের উদ্দেশ্যে এক প্রতিবাদী ও দৃঢ়চেতা মত নিয়ে। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত হলো একটি প্রতিবাদ মিছিল করার। কেইবা জানতো যে আওয়ামী রক্তপিপাসু হায়েনারা এত কিছু করার পরও রক্তের নেশায় বাসস্ট্যান্ডের চৌরাস্তায় ওঁৎপেতে বসে আছে তাদের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য!

অফিস থেকে বেরিয়ে আমিই প্রথমে স্লোগান ধরি কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারিনি গলার সমস্যার কারণে। ওই দিন অন্যান্য স্লোগানিস্টরাও ছিল না। ভাবছিলাম আর কে স্লোগান দিবে, কিন্তু আমার স্লোগান থামতে দিল না ফয়সাল। বজ্রকণ্ঠে সে নিজেই স্লোগান ধরলো– নারায়ে তাকবীর- আল্লাহ আকবর, শিবির অফিসে হামলা কেন- শেখ হাসিনা জবাব চাই, আমার ভাই আহত কেন- সন্ত্রাসীরা জবাব চাই।

তার এ স্লোগানের আওয়াজ এতই প্রকট ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন আকাশ বাতাসে প্রকম্পিত হচ্ছে আর সমগ্র ফেরেশতাকূলও এ স্লোগানের জবাব দিচ্ছে। কিন্তু মিছিলটি চিটাগাং রোড চৌরাস্তা পর্যন্ত পৌছতে না পৌছতেই আওয়ামী রক্তপিপাসু হিংস্র হায়েনারা ইয়াছিন হাজী আর মজিবুর এর নেতৃত্বে তাদের লগি-বৈঠা আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের শান্তি প্রিয় নিরীহ মিছিলকারীদের উপর। পাশেই দাঁড়ানো ছিল সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার মোহাম্মদ আলী ও এএসআই মুহিতুলসহ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। আমি ও থানা আমীর ওনাদের অনুরোধ করলাম "আপনারা আমাদের একটু সহযোগিতা করেন, আমরা সংঘর্ষে না গিয়ে মিছিল ঘুরিয়ে নিয়ে যাব।" তাদের



icsbook.info

পায়ে ধরা শুধু বাকি ছিল। অথচ তারা ছিল একদম নির্বিকার, মাটির তৈরি পুতুলের মতো নির্বিকার দাঁড়িয়ে পৈশাচিক বর্বরতার দৃশ্যগুলো যেন তারা 'লাইভ কনসার্ট'এর মতই উপভোগ করছিল। মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু যেন ওলোটপালট হয়ে গেল। আমরা ছিলাম শ' খানেকেরও কম আর ওরা ছিল কয়েক হাজার। সারা নারায়ণগঞ্জ হতে বস্তি, টোকাই আর বাসস্ট্যান্ডের শ্রমিকদের জড়ো করে হাতে লগি-বৈঠা তুলে দেয়। চারদিক থেকে তাদের আক্রমণেরবিভৎস দৃশ্য দেখলে যে কেউ শিউরে উঠবে। এ যেন ছিল মধ্যযুগীয় এক হিংস্র বর্বরতার দৃশ্য। অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। কেউ রক্তাক্ত অবস্থায় ক্লিনিকের দিকে দৌড়াচ্ছিল আর কেউবা আঘাতের পর আঘাত খেয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছিল। পিচঢালা রাজপথ রক্তে ভেসে গিয়ে মনে হচ্ছিল, এ যেন এক কসাইখানা। একজনের পর একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকাতে মনে হচ্ছিল এ এক মৃত্যুকূপ। এদেরই মধ্যে একজন ছিলেন শহীদ ফয়সালের বড় ভাই ফাহাদ। যেভাবে তার মাথা থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটছিল তা দেখে ফয়সাল আর স্থির থাকতে পারেনি। সহোদর বড় ভাইকে বৈঠার আঘাত থেকে বাঁচাতে নিজের দেহকে এগিয়ে দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈঠার আঘাতের পর আঘাত খেয়ে নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, থেঁতলে যায় তার সম্পূর্ণ মাথা। ওদের প্রতিটি আঘাতের নিশানা ছিল আমাদের মাথা। যেন সবাই নি:শেষ হয়ে গিয়ে আর কালেমার বাণী প্রচার কিংবা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলতে না পারি। দু' সহোদরের অচেতন নিস্তেজ দেহ দু'টিকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে। সেখানেও মানুষ নামের এ নরপিশাচরা আবার হামলা চালানোর চেষ্টা করে। সাংবাদিক আর সাধারণ লোকদের অনুরোধে যদিও শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়। পরে ঢামেক হাসপাতালে এবং সেখানেও কোন সুবিধা না পেয়ে ইবনে সিনা'য় নেয়া হয়। ইবনে সিনা'র আইসিইউ'তে ফয়সালকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়। সারা রাত এবং পরদিন ২৯ অক্টোবর '০৬ দুপুর পর্যন্ত আমরা অপেক্ষমান ছিলাম যে, হয়তো সে বেঁচে উঠবে, হয়তো আমরা আবার তার ফুটফুটে চেহারার মিষ্টি হাসি দেখতে পাব। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস মুখে তার মিষ্টি হাসি লেগে আছে ঠিকই কিন্তু সে আর কখনো আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলবে না কিংবা আর তাকে প্রিয় শহীদি গানগুলো গেতে হবে না। সে চলে গেছে ওপারে...সুন্দর ভুবনে।

শহীদ ফয়সালের খুনিদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে ছাত্র গণজমায়েতের দিন চারদিক হতে স্লোগানে স্লোগানে সর্বস্তরের ছাত্র জনতার যে ঢল নেমেছিল, মনে হচ্ছিল এ যেন জনতার মহাবিস্ফোরণ। সকলের একটিই জিজ্ঞাসা কিংবা বিস্ময় ছিল– কোন অপরাধে ফয়সালকে জীবন দিতে হলো? যারা এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা কি মানুষ না অন্য কিছু? প্রশাসন কি আদৌ তাদের বিচার করবে? কেন্দ্রীয় সভাপতির আবেগময়ী ও জ্বালাময়ী বক্তব্যে হাজারো জনতা ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল। জনতার এ কান্নার রোলে মনে হচ্ছিল আকাশের নিচে আর জমিনের উপরে অবস্থিত সবকিছুই কাঁদছে। আর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ফয়সাল তার হাসিমাখা মুখটি নিয়ে হাজারো জনতার ভিড়ে উঁকি দিয়ে বলছে– "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বল না বরং তারা জীবিত", "তোমরা হতাশ হয়ো না, নিরাশ হয়ো না, বিজয় তোমাদের অবশ্যম্ভাবী।" সত্যিই শহীদ ফয়সাল প্রেরণার উৎস হয়ে জীবিত থাকবে আমাদের প্রতিটি প্রাণে, প্রাণের শিহরণে। আর তার সেই মায়াবী মিষ্টি মাখা হাসি মিলবেনাকো কোনদিন বরং বেঁচে রবে অমলিন। ■



icsbook.info

# একটি আলোকিত জীবন

মো. গোলাম সারোয়ার সাঈদ

জন্মই যার শ্রেষ্ঠ হবার, পৃথিবীর তামাম সফলতা তার পদচুম্বন করবে– এটাইতো স্বাভাবিক। অদম্য বাসনা যার নিজকে বড় করার, তাকে রুখে সাধ্য কার। জীবনকে সফল করার সকল বৈশিষ্ট্যই যার চরিত্রে বিদ্যমান, সফলতার মুকুটতো তারই প্রাপ্য। তেমনি একটি আলোকিত জীবন, সত্য প্রতিষ্ঠায় নির্ভীক মানুষ, সফলতা প্রত্যাশীদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব– শহীদ আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল।

জন্ম ২৬ মে ১৯৮২। ছোটবেলা থেকেই মিষ্টভাষী, সদালাপী, বিনয়ী ছেলেটি সবার মনে ঠাঁই করে নেয়। জ্ঞানের প্রতি ছিল তার মরুতৃষ্ণা। যখনই ভাল বই পেতেন শেষ না করা পর্যন্ত উঠতেন না। তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির কারণে বই এর আলোচ্য বিষয় এবং শিক্ষা পড়ার পরক্ষণেই হুবহু বলতে পারতেন। জ্ঞানতৃষ্ণাই তাকে সত্যের পথে নিয়ে আসে। তিনি ছিলেন প্রকৃত মুজাহিদ– যিনি একাধারে পিতৃহীন পরিবারের অভিভাবক, সংগঠনের কর্মী, মায়ের একজন আদর্শ সন্তান, মেধাবী ছাত্র, মিথ্যার বিরুদ্ধে আপোষহীন।

পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবসা, শিক্ষকতা, টিউশনি শেষে নিজের লেখাপড়া করে সংগঠনে ব্যয় করার মত খুব কম সময়ই পেতেন। তাই সাথী প্রার্থী হওয়ার পর আর অগ্রসর হতে পারেননি। এতে তার অন্তরে ব্যথা কম ছিল না। মানোন্নয়নের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তার উত্তর ছিল– দোয়া করবেন আমি এর চাইতেও বড় কিছু হব।

২৮ অক্টোবর ২০০৬। দিনটি শুরু হয় একটি সুন্দর সকাল দিয়ে। সূর্যের সোনালী আলোর হাতছানিতে পৃথিবী জেগে উঠলেও মানুষের মাঝে বিরাজ করছিল আতঙ্ক। ক্ষুধার্ত হায়েনার চিৎকারে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ক্ষুধার্ত হিংস্র পশু যেমন নিজের বাচ্চা এবং অন্য শিকারের মধ্যে পার্থক্য ভুলে যায়, তেমনি মানুষের মনুষত্ব হারিয়ে গেলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সে ভুলে যায়। মিথ্যার ঝান্ডাবাহি আওয়ামী লীগের মনুষত্বহীন মানুষরূপী হিংস্র কর্মীরা তান্ডব চালায় মানবতার মুক্তি আন্দোলন জামায়াত-শিবির অফিসে। আহত করে ৫জন ভাইকে। তাদের হিংস্রতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তারা মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে আনন্দ উল্লাস করে।



icsbook.info

আল কোরআনের এই অবমাননা খোদার প্রিয় বান্দারা সহ্য করতে পারেনি। ব্যথায় কেঁদে ওঠে সত্য সৈনিকদের হৃদয়। তাদের মাঝে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। প্রতিবাদের অগ্রভাগে ছিলেন আল্লাহর অকুতভয় সৈনিক আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল। যার প্রতিটি রক্ত কণিকায় সত্য প্রতিষ্ঠার অদম্য নেশা, বাতিলের রক্ত চক্ষু কি তাকে থামাতে পারে। তাইতো হিংস্র হায়েনার অস্ত্রের সামনেই... আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন। বাতিলের অস্ত্রের নির্মম আঘাতও যখন সত্য প্রকাশে তার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি তখন রক্তপিপাসু আওয়ামী হায়েনারা সমস্ত শক্তি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। হায়েনার নির্মম আঘাতে লুটিয়ে পড়ে ফয়সাল। পিচঢালা কালোপথ রঞ্জিত হয় ফয়সালের রক্তে। নিথর দেহটি পড়ে থাকে রাস্তায়। ফয়সালের কণ্ঠ থামিয়ে দেয়ার আনন্দে উল্লাসিত হয় খুনির দল। এক ফয়সালের কণ্ঠকে সেদিন তারা থামাতে পেরেছিল কিন্তু রাজপথ রঞ্জিত করা ফয়সালের প্রতিটি রক্ত কণিকা থেকে জন্ম নেয়া হাজারো ফয়সালের বজ্রকঠিন স্লোগান সিদ্ধিরগঞ্জবাসী ২২ ডিসেম্বর '০৬। ফয়সালের রেখে যাওয়া কাজ সফল করতে তারা নিজেদের জীবনকে কুরবানী করতেও প্রস্তুত।

রাস্তায় সমবেত লোকজন চারটি সারিতে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। দেখতে দেখতে কয়েক হাজার যুবক-বৃদ্ধ এসে সারিতে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সামনে তিনটি কফিন এনে রাখা হয়েছে। দৃষ্টি সবার কফিনের দিকে। সবাই নির্বাক। কারো মুখে কোন কথা নেই। আপনজন হারানোর ব্যথায় কাতর সবাই। কিন্তু কে আপন জন, কার আপন জন। যাদেরকে কখনো দেখেনি, কেউ কেউ নামটিও ঠিকমত জানে না। শুধু জানে, তারা একই কাফেলার যাত্রী। তাদের জন্য এত কষ্ট কেন। এক জনের চোখের দিকে তাকালে মনে হয় জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি হারিয়েছে তারা। স্বজন হারানোর ব্যথায় ঝড় বইছে সবার মনে। চোখে অশ্রুর বান ডেকেছে। কফিনের সামনে দাঁড়ানো কাফেলার নেতা যখন কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তখন কেউ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। বুকের ভেতরে আটকে থাকা কষ্ট অশ্রু ধারায় বইতে শুরু করল। একই দৃশ্যর অবতারণা ঘটেছিল আব্দুল্লাহ আল ফয়সালের জানাজায়।

যে ব্যক্তির মৃত্যুতে লাখো-কোটি মানুষ ব্যথায় কাতর, যার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে, অজস্র কোটি মানুষের সামনে দাঁড় করিয়ে স্বয়ং স্রষ্টা যাকে পরিচয় করিয়ে দিবেন সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, সে মৃত্যু হাজারো জীবনের চাইতেও উত্তম। সে মৃত্যুইতো জীবনের সফলতা। শহীদ ফয়সাল একটি আলোক বর্তিকা। যা আঁধার রাতে মুক্তিপাগল মানুষকে সত্যের পথ দেখায়। আল্লাহ যদি আমার দীর্ঘ জীবনের পরিবর্তে এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তির সৌভাগ্য দান করতেন...। ■



icsbook.info

# আবু উবাইদা (রা.) যার প্রিয় সাহবী

মো. রফিকুল ইসলাম

মুজাহিদ একজন ব্যতিক্রমীমানুষ। আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর ভালোবাসা, শাহাদাতের অদম্য স্পৃহা এবং দায়িত্বশীলের আনুগত্যের সমন্বয়ে ধীরে ধীরে তৈরি করেছিলেন নিজেকে একজন আল্লাহর প্রিয় মানুষ হিসেবে। মুজাহিদের প্রিয় সাহাবী ছিলেন হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)।

ড. আবদুল মা'বুদ এ সাহাবী সম্পর্কে লিখেছেন, "তিনি ছিলেন উজ্জ্বল মুখমন্ডল, গৌরকান্তি, হালকা পাতলা গড়ন ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তাঁকে দেখলে যে কোন ব্যক্তির চোখ জুড়িয়ে যেত, সাক্ষাতে অন্তরে ভক্তি ও ভালোবাসার উদয় হত এবং হৃদয়ে একটি নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হত। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী, অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির। তবে যে কোন সংকট মুহূর্তে সিংহের ন্যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত। তাঁর চারিত্রিক দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা ছিল তরবারীর ধারের ন্যায়। রাসূলের (সা.) ভাষায় তিনি ছিলেন উম্মাতে মুহাম্মাদীর 'আমীন'- বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। (আসহাবে রাসূলের জীবন কথা। পৃঃ ৯০)। মুজাহিদও ছিল তার প্রিয় সাহাবী হযরত আবু উবাইদার প্রতিরূপ। তার মতই ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অটল থেকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হন শহীদ মুজাহিদ।

কোরআনের ভাষায় শহীদেরা বেঁচে আছেন, মরেনি তারা। তবে আমাদের মাঝে আর কখনো আসবেন না। শহীদ মুজাহিদ আজ আল্লাহর রিজিক প্রাপ্ত মেহমান। বাতিলের কাছে মাথা নত না করে শাহাদাতের তীব্র তৃষ্ণা যিনি মিটিয়েছেন লাঠি, লগি, বৈঠার নির্মম আঘাত সহ্য করে। ১০নং ওয়ার্ডের অলিগলিতে আর শোনা যাবে না মুজাহিদের পদধ্বনি, ডেকে ডেকে আর কাউকে বলবে না দ্বীন কায়েমের পথে আসার কথা, ছোট বন্ধুরা আর পাবে না মুজাহিদের ভালোবাসার কোমল পরশ। আর কোন দিন কেউ ফোন রিসিভ করে বিনয়ী কণ্ঠে শুনবে না, "আসসালামু আলাইকুম। ভাই, মুজাহিদ বলছি।" "রফিক ভাই, কথা আছে" বলে আর কোন দিন পরামর্শ চাইবে না মুজাহিদ। 'সাত তারিখের বৈঠকে আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে' বলে আর বায়না ধরবে না মুজাহিদ। পরিকল্পনার ছক আঁকতে মুজাহিদের কলম আর সচল হবে না, স্বপ্নের জাল বুনবে না ইসলামী আন্দোলনকে নিয়ে। ২৯ অক্টোবর'০৬ মাগরিবের নামাজ শেষে আমাদের এই প্রিয় ভাইটিকে চিরনিদ্রায় শুইয়ে রেখে আসলাম কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে অন্ধকার মাটির ঘরে। রাত্রি শেষে সূর্য ফিরে আসবে আলো নিয়ে, মানুষের কোলাহলে মুখরিত হবে জনপদ, ডালে ডালে পাখিদের কিচির মিচির ডাক শোনা যাবে, ফুলে ফুলে লাল হয়ে উঠবে কৃষ্ণচূড়া গাছটি। চাঁদের হাসি, বয়ে চলা নদীর পানি সবকিছু ফিরে আসবে আগের মতই, শুধু ফিরবে না মুজাহিদ। তবে শহীদের এ জনপদে মুজাহিদের স্মৃতিকে বুকে ধারণ করে মুজাহিদের প্রতি ফোঁটা রক্তে জন্ম নেবে লক্ষ কোটি মুজাহিদ। বাতিলের বিরুদ্ধে গড়ে তুলবে শক্ত প্রতিরোধ। আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সমস্বরে গেয়ে যাবে আল্লাহর জয়গান। ■



icsbook.info

# শহীদ তোমরা অমর হয়ে থাকবে

মারজান হোসেন ঊর্মি

মুজাহিদ ভাইয়া আমার চাচাতো ভাই ছিল, কিন্তু কখনো মনে হয়নি মুজাহিদ ভাইয়া আমাদের চাচাতো ভাই, মনে হতো ও যে আমার নিজেরই ভাই। ভাইয়া আমাদের সকলকে নামাজ পড়তে তাগাদা দিত সব সময়, ফজর নামাজের সময় ঘুম ভাঙ্গেনি দেখে দরজা ধাক্কা দিয়ে আমাদের সবাইকে উঠাতো। যেমন ছিল নামাযের তাগিদ, তেমনি ছিল কোরআন শরীফ পড়ার তাগিদ। আর আমাকে বলতো, ছাত্রীসংস্থার প্রোগ্রামে যেতে। ইসলামী সাহিত্য পাঠ করতে বলতো। মাঝে মাঝে অনেক বই এনে পড়েছি ভাইয়ার কাছ থেকে। আমাকে বলতো নিজে পড়বি, মালিহা, শর্মি, পিয়ালকে পড়ে শুনাবি। আমি ছিলাম টিভি দেখার পোকা। ঘরে ঢুকে যদি দেখতো টিভি দেখছি তবে আস্তে টিভি বন্ধ করে দিতো আর বলতো– সারাদিন রাত কিসের এত টিভি দেখা, পড়া-শুনা নাই তোদের। টিভি দেখে ভালো কিছু শিখেছিস আজ পর্যন্ত? দেখছিস যত বস্তাপচা নাটক, সিনেমা, সিরিয়াল আর গান। এগুলো না দেখে ভালো কিছু দেখ, ভালোকিছু শিখ। আর এখন পড়ার সময় ঘরে যাইয়া পড়তে বয়, যা ঘরে যা। আমরা ছোট ভাইবোনরা রাগারাগি করলে আমাদের ঝগড়া থামিয়ে দিত। কখনো ঝগড়া করতে দিতো না আর বুঝাতো ঝগড়া না করার জন্য। মুজাহিদ ভাইয়াকে কখনো উচ্চ স্বরে কথা বলতে শুনিনি, রাগ করতে দেখিনি, বেয়াদবি করতে দেখিনি। আমাদের হুজুর স্যারকে তাগাদা দিত হুজুর স্যার যেন আমাদের নামাজের হিসাব নেয় প্রতিদিন। ভাইয়া বলতো সব সময় বাবা মার কথা মত চলতে, আর বাবা মার মনে দু:খ না দিতে। বড় হয়ে বাবা মার সকল দু:খ দূর করতে হবে জীবনে। এখন ভাই নাই কে বুঝাবে এমন করে? আমাদের সকলের প্রার্থনা আল্লাহ আমাদের এমন ভাল ভাইকে বেহেশত দান কর। তার শাহাদাত কবুল করে নিও। ভাইয়ার সাথে আরো যত ভাই শহীদ হয়েছে তাদের সকলের শাহাদাত তুমি কবুল করে নিও। আমিন। ■



icsbook.info

# শহীদ মুজাহিদ
# একটি নাম একটি স্মৃতি

মুহা. ইয়াছিনুল হাসান

হ্যাঁ, মসজিদ থেকে আসর নামায পড়ে বের হওয়ার মিনিট পাচেক এর মধ্যে এক সাথী ভাই আমাকে ডেকে বললেন, মুজাহিদকে নিয়ে স্মরণিকা বের করা হচ্ছে। যদি আপনি কোন লেখা পাঠাতে চান, তাহলে এই মাসের মধ্যে পাঠাতে হবে। আমি সাথে সাথে উত্তর দিলাম যদি আমরা লেখা না পাঠাই তাহলে কে লেখা পাঠাবে।

যাই হোক লেখা শুরু করার আগে আমি হঠাৎ থেমে যাই। আমি কখনও ভাবতে পারিনি উপরোক্ত শিরোনাম দিয়ে আমাকে কলম ধরতে হবে। আমি চিন্তাও করতে পারি-নি মুজাহিদ ভাই ইসলামকে ভালবেসে তার বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিবে। মনেও ভাবিনি তার শহীদি তামান্না এত প্রখর ছিল। যার সাথে দৈনিক গড়ে ৮-১০ বার দেখা না হলে ঐ দিন যেন কেমন অশান্ত হয়ে যেত। যখন চিন্তা করতে শুরু করেছিলাম মুজাহিদ ভাই সদস্য হয়ে গেছে এবার আমরা তার নেতৃত্বে লালকুঠিতে আরো বেশি ছাত্রের কাছে ইসলামের সুমহান দাওয়াত নিয়ে যাব। আমরা একত্র হলে ভাবতাম নিজেদের মান আগের থেকে আরো উন্নত কিভাবে করা যায়, সেই জন্য তার কাছ থেকে অনেক সুন্দর পরামর্শও আমরা পেতাম। যখন আমি চিন্তা করতাম মুজাহিদ ভাইয়ের অল্প সময়ে উপার্জিত নেতৃত্বের গুণাবলী অবশ্যই ১০নং ওয়ার্ডকে করবে পরিবর্তন, উড়বে কালিমার পতাকা কেটে যাবেই যাবে সকল অন্ধকার। ঠিক তখনই হঠাৎ করে বাতিলের লগি ও বৈঠার আঘাতে মুজাহিদ ভাই আমাদের কাছ থেকে শহীদি মর্যাদা নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজিরা দিলেন। মুজাহিদ ভাই আকাশের মেঘের ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট বিজলীর চমক। যা হঠাৎ আলোকিত হয়ে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে আবার চলে যায়।

মুজাহিদ ভাই এর সাথে আমার আবার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, শিশুকাল থেকে একই রাস্তায় খেলতাম, সে ছিলো আমার অত্যন্ত কাছের বন্ধু। আবার একই সাথে আমরা সংগঠন করতাম। এই মোতাবেক সে আমার দ্বীনি ভাই। কিন্তু সে অধিকাংশ সময়েই



icsbook.info

দ্বীনি পরিচয়টাই গুরুত্ব দিত। অর্থাৎ আমরা একে অপরের ভাই ছিলাম। মুজাহিদ ভাই আমার থেকে একাডেমিকভাবে এক বছর এগিয়ে। সে আমার পরে কর্মী হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের প্রতি তার প্রেম ভালোবাসা তাকে সঠিক সময়ে সাথী হতে সাহায্য করে। শুধু তাই-ই নয় আন্দোলনের স্পৃহায় সে সাথী হয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। রাসূলের (সা.) আন্দোলনের ভালবাসায় তাকে তাড়িয়ে বেড়াত সদস্য হবার মত চূড়ান্ত শপথের জন্য। শত শত প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে অবশেষে সে সদস্য শপথ নিলো। সে যে দুনিয়ার সকল চাকচিক্য ত্যাগ করে আন্দোলনের সাথে তার জীবন একাকার করে দিয়েছে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তার সদস্য শপথের দিনটি। সেই দিনটি ছিল একটি বিশেষ দিন। ৯ জুলাই ২০০৬। যেদিন ছিল ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলার দিন। সেদিন সারা বিশ্বের নজর ছিল ফ্রান্স-ইতালির ফাইনাল খেলার দিকে আর আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাই এর নজর ছিল কিভাবে শপথ নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

মুজাহিদ ভাই সদস্য শপথ নেয়ার পরই যেন হয়ে যায় সত্যিকারের মুজাহিদ। কথা ও কাজে যেন পাই অন্য রকম ছাপ। তার কথাবার্তা, আচার আচরণ দায়িত্বশীলদের আনুগত্য, কর্মী, সমর্থকদের সাথে চমৎকার ব্যবহার, বন্ধু-বান্ধবসহ সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে আন্তরিক সু-সম্পর্ক সবকিছুতেই মুজাহিদ ভাই যেন অনুকরণীয় আদর্শ। যা তাকে দিয়েছে জনপ্রিয়তা। মুজাহিদ ভাইয়ের পারিবারিক জীবন, একাডেমিক ক্যারিয়ার এবং সাংগঠনিক ক্যারিয়ার ছিল সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে সব সময়ই ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকত। পাশাপাশি ব্যক্তিগত পড়ালেখার ক্ষেত্রে মেধার প্রমাণ রেখেছে। ২য় ও ৩য় সেমিস্টার-এ Scholarship পেয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। তার পরিবেশনা ভঙ্গি এতই সুন্দর ও সাবলীল ছিল যে তার বন্ধুরা তার তৈরি অ্যাসাইনমেন্ট নকল করতে বাধ্য হত। সংগঠনের কাজের ফাঁকে সে মাঝে মাঝে চিন্তা করত তার ওয়ার্ডের অতীত স্মৃতিগুলো। সে খুব চেষ্টা করেছিলো সংগঠনের সাবেক দায়িত্বশীল ভাইদের নিয়ে Programme করার জন্য। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সাবেক ভাইদের নিয়ে প্রোগ্রাম করার মাধ্যমে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা, তাদের সংগঠন চালানোর দক্ষতা, যোগ্যতা, সাহস ইত্যাদির মাধ্যমে সে তার এলাকাকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য আরো একধাপ এগিয়ে নিতে পারবে। সকল তরুণ ছাত্রের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলবে। তার সামগ্রিক তৎপরতাও ছিল সেই কেন্দ্রীক। এই জন্যই দাওয়াত দানের ব্যাপারে সব সময় তাকে দেখতাম বেপরোওয়া। পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম আল্লাহ এই ধরণের লোকদেরকেই শহীদের মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

মুজাহিদ ভাইয়ের ব্যক্তিগত আমল নৈতিক-চারিত্রিক গুণাবলী তাকে করেছে আরো বলিষ্ঠ। তার নামায এতো উন্নত ছিলো– তার সাথে নামায না পড়লে বুঝা যায় না। নামাযের ফরয ওয়াজিব ছাড়াও সুন্নত এমনকি মুস্তাহাবগুলো পালন করার চেষ্টা করত। মনে হয় একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তার নামায। সে কখনও নামায ক্বাযা করত না। কদাচিৎ যদি নামায ক্বাযা হয়ে যেত এর জন্য সংগঠনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শাস্তি স্বরূপ নফল রোযা রাখার পাশাপাশি দান করত। এছাড়াও প্রায় সময়ই সে নফল



icsbook.info

রোযা রাখত। সে নামায এত ধীরে পড়ত মাঝে মাঝে দুষ্টুমিস্বরে জিজ্ঞেস করতাম– "তুমি কি সুরা বাকারা দিয়ে নামায পড়?" জবাবে সে সুন্দর একটা হাসি দিত। সংগঠনের দান ছাড়াও সামগ্রিক দানের ব্যাপারে সে ছিল উদার। তার এই দান আমাকে খুব বেশি প্রেরণা দিত। সামগ্রিকভাবে ২২ বছরের এই টগবগে যুবকের বয়স কম হতে পারে কিন্তু তার চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, দর্শন, কর্ম এত ব্যাপক, এত প্রশস্ত, এত দীর্ঘ যা আমার পক্ষে এই ক্ষুদ্র পরিসরে লেখা অক্ষমতারই বহি:প্রকাশ। মুজাহিদ ভাই আজ আমাদের জন্য একটি প্রেরণা, একটি গর্ব। আজ আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারি মুজাহিদ ভাইর রক্তে সিক্ত হয়েছে ১০নং ওয়ার্ডের ময়দান।

মুজাহিদ ভাইয়ের শাহাদাত ইসলামী আন্দোলনকে রক্তঋণে আবদ্ধ করেছে। বিশেষ করে আমরা যেহেতু তার সাথী ছিলাম আমাদের ঋণের বোঝাটা বেশি। তাই আল্লাহর কাছে কামনা করছি মুজাহিদ ভাইর রক্তে ভেজা এই ময়দানে জয়ের কেতন মোরা ওড়াবই। পরিশেষে আল্লাহর কাছে মুজাহিদ ভাইয়ের শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করছি- আমীন। ■



icsbook.info

# চেতনায় ২৮ অক্টোবর'০৬

হাফেজ মুহাম্মদ আবু তাহের

সাংগঠনিক জীবনের দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনা আমাকে ইসলামী আন্দোলনের পথে সক্রিয় থাকতে বেশি শক্তি যোগায়। একটি ঐতিহাসিক ২৬ জুলাই '০৪ লালদিঘীর ময়দানে ঘাদানি কমিটির ন্যক্কারজনক আক্রমণেদিনব্যাপী সংঘর্ষ। অন্যটি ২৮ অক্টোবর '০৬ জামায়াতের সমাবেশে আওয়ামী নেতৃত্বাধিন ১৪ দলের লগি-বৈঠাধারিদের সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা ।

২৮ অক্টোবরের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করতে ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় শ্রদ্ধেয় ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর রফিকুল ইসলাম খানের ফোন পেয়ে রাতেই চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় চলে আসি এবং সকাল সাড়ে ৯টায় নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে দৈনিক বাংলা মোড়ে উপস্থিত হই। সকাল সাড়ে ১০টায় প্রোগ্রামের সার্বিক প্রস্তুতি দেখতে দেখতে পল্টন মোড়ের কমিউনিস্ট পার্টির অফিস পর্যন্ত পৌঁছা মাত্রই আমাদের ভাইদের সাথে আওয়ামী নেতৃত্বাধিন ১৪ দলের ইট-পাটকেল ও লগি-বৈঠার মাধ্যমে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। মুহূর্তের মধ্যে সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে পল্টন মোড়, বিজয় নগর ও গুলিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার জীবনের সকল মায়া ভুলে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একজন দ্বীনের সৈনিক হিসাবে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতির দায়িত্বানুভূতি নিয়ে সমাবেশ বাস্ত বায়ন করতে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। সেদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সমাবেশ বাস্তবায়ন ও ১৪ দলের সশস্ত্র হামলার প্রতিরোধে সক্রিয় ছিলাম।

সংগঠনে আসার পর কুরআনকে নতুন করে জানতে আরম্ভ করলে অনেক আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে আমার কষ্ট হতো এবং আমার নিজের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন লুকায়িত ছিলো, যা কারো নিকট পেশ করতে সাহস পেতাম না। বিশেষ করে যে সকল আয়াতসমূহ বদর, ওহুদসহ বিভিন্ন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়।



icsbook.info

দীর্ঘ ১২ ঘন্টাব্যাপী আমি মহান রবের অনেক সাহায্য প্রত্যক্ষ করি। ১৪ দলের হাজার হাজার কর্মীকে আমাদের চেয়ে সংখ্যায় কম মনে হয়েছে, যা কুরআনের ভাষায় "ইয়ারাউ নাহুম মিছলাইহিম রা'য়াল আইন"। বার বার আমি আমার ডানে-বামে কর্মীদের দিকে দেখে আমার মনে হয়েছে সকলেই সংক্ষিপ্ত দুনিয়ার ভালবাসা ত্যাগ করে শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত হয়ে জান্নাতের পথের পথিক হিসেবে অপেক্ষমান। সেদিন আমি আমার চোখের সামনে অসংখ্য কর্মীকে দেখেছি, যারা আমার চেয়েও ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বাতিলের চাপিয়েদেয়া সংঘর্ষ মোকাবেলায় লিপ্ত রয়েছেন। হঠাৎ করে খবর এলো– প্রিয় ভাই মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাতের নাজরানা পেশ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। এই খবর মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে দ্বীনের সৈনিকদের মাঝে শাহাদাতের তামান্না আরো বৃদ্ধি পায়। সেদিন আমরা তায়াম্মুম করে ময়দানে খন্ড খন্ড জামায়াতের মাধ্যমে যোহর, আছর ও মাগরিব আদায় করি। সারাদিন আমরা ক্ষুধার অনুভূতি ভুলে গিয়েছিলাম। এক পর্যায়ে বিকালে একজন ভাই দুই বোতল মিনারেল ওয়াটার নিয়ে আসলে আবার সেই হুনাইন যুদ্ধের ত্যাগী ও কুরবানীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শত শত সৈনিক সামান্য পানিটুকু মুখে দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করার চেষ্টা করে। হঠাৎ করে দক্ষিণ দিকের বিল্ডিং থেকে বোমা হামলা শুরু হলে আমরা আবার দ্বিগুন শক্তি নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সন্ধ্যা পর্যন্ত এরূপ সংঘর্ষ চলতে থাকে।

সন্ধ্যার পর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের পরামর্শক্রমে ময়দান ত্যাগ করে কেন্দ্রীয় অফিসে চলে আসি এবং হাসপালে গিয়ে শত শত আহত ভাইকে দেখে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। ফলে হাসপালের করিডোরে বসে পড়ি আমার অজান্তেই। আজো ২৮ অক্টোবরের ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলে আমি নিজকে গর্বিত মনে করি এই বলে যে– শহীদ ফয়সাল, মুজাহিদ, শিপন ও মাসুমের সাথে একজন পল্টনে সাথী ছিলাম। তাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে তারা আমাদের উপর বিশাল জিম্মাদারী দিয়ে পরপারে চলে গেছেন। মহান আল্লাহ ২৮ অক্টোবরের শহীদদের কবুল করুন, আহত ভাইদের সুস্থ করে দিন। আমীন॥

*লেখক : কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির*



icsbook.info

# জিজ্ঞাসা

হাফেজ মাওলানা আব্দুস সাত্তার

দুই হাজার ছয় সালের আঠাশে অক্টোবর। পৃথিবীর ইতিহাসে এইদিনটি মুসলিম জাতির জন্য এক জঘন্যতম বর্বর দিন নামে আখ্যায়িত হয়েছে। এই দিনে বাংলাদেশে তিনটি বৃহৎ সংগঠন বিএনপি জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগ তারা নিজ নিজ দল থেকে আলাদা আলাদাভাবে সমাবেশের ডাক দেয়। বিএনপি এবং জামায়াত যথাক্রমে নয়া পল্টন ও বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেট। আর নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ পুরানা পল্টনে তাদের সমাবেশ ডাকে। সবাই নিজ নিজ মঞ্চ তৈরিতে ব্যস্ত। সকাল থেকেই সমাবেশের কাজ শুরু হয়েছে। জামায়াত-শিবির বায়তুলমোকাররমের উত্তর গেটে কাজ শুরু করলেই বাধার সৃষ্টি হয়। বাধার মধ্যে তারা সকল তোড় জোড় সম্পন্ন করেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে জামায়াতের মঞ্চ নিশ্চিহ্ন করার জন্য অব্যাহতভাবে হামলা করতে থাকে। জামায়াত-শিবিরের বাধার মুখে তারা ফিরে যায়। সভার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে সমাবেশ শুরু হবে। তবে আওয়ামী লীগ তাদের পরিকল্পনা মাফিক তাদের দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা মঞ্চে উঠে তিক্ত জ্বালাময়ী ভাষণ শুরু করেন। তার আগে শেখ হাসিনা নিজ দলের লোকদের বলেন, আমাদের প্রতীক যেহেতু নৌকা কিন্তু নৌকা নিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাই সবাইকে নির্দেশ দেয়, তারা যেন নিজ নিজ লগি-বৈঠা নিয়ে সমাবেশে হাজির হয়, নেতার নির্দেশের প্রতি আওয়ামী লীগ একান্ত অনুগত। তাই তারা নেতার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সবার হাতে সেদিন দেখা গেছে হয় লগি না হয় বৈঠা। আবার দেখা গেছে কোন কোন ব্যক্তির হাতে গুলিভরা পিস্তল। আবার কারও হাতে বোমার পাত্র। শেখ হাসিনার বিষ মিশানো জ্বালাময়ী বক্তব্যে তার দলের নেতা কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং জামায়াতের সমাবেশের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এবার শুরু হলো আক্রমণ। দফায় দফায় আক্রমণইট পাটকেল গুলি বোমা লগি বৈঠা ককটেলের সামনে জামায়াত-শিবিরের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। তারপরও যথা সময়ে জামায়াত তাদের সভার কাজ শুরু করে। এবার আওয়ামী লীগ মরিয়া হয়ে একযোগে আওয়ামী নেতারা তাদের কর্মীদের



icsbook.info

নির্দেশ দেয় সামনে বাড়ো। তারা নির্দেশের সাথে সাথে জামায়াতের মিটিংয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জামায়াতের মিটিং তছনছ করে, জামায়াত-শিবিরের নেতা কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে ছাড়ে। এক পক্ষের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র, অপর পক্ষের খালি হাত। কি নিয়ে লড়বে জামায়াত-শিবির? তাদের কোন দুরভিসন্ধি ছিলনা। এবার বেকায়দায় পড়ে গেল জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা। নিজেদের জান বাঁচাতে সবাই ব্যস্ত। উপরন্তু নেতাদের রক্ষা করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। হুলস্থুল কান্ড। আওয়ামী সন্ত্রসীদের মারমুখি আক্রমণের মুখে যারা পড়ে গেল, তারা আর রক্ষা পায়নি। আওয়ামী বাহিনীর হাতে শহীদ হলেন মুজাহীদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল, হাফেজ গোলাম কিবরিয়া, সাইফুল্লাহ মুহাম্মাদ মাসুম, রফিকুল ইসলাম এবং জামায়াতের একজন ভাই আর হাত পা চোখ হারিয়েছে অসংখ্য নেতা-কর্মী। পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে– তারও সংখ্যা কম নয়। আর বিভিন্নভাবে যখম হয়েছে- তা সব মিলিয়ে সাত শত জামায়াতের নেতা-কর্মীকে তারা ক্ষত-বিক্ষত করেছে।

তার ওপর আওয়ামী বর্বররা লগি-বৈঠা দ্বারা পিটিয়ে মেরে লাশের উপর লাফিয়ে উঠে ন্যক্কারজনকভাবে নৃত্য করেছে। যা কারবালা প্রান্তরকেও হার মানিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে কারবালার ঘটনা ছিল একমাত্র বর্বর হত্যাকান্ড। এবার আর একটা যোগ হয়েছে বাংলাদেশের রাজধানীর বুকে ২০০৬ এর ২৮ অক্টেবর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে। ঐদিন বিএনপি ছিল নয়া পল্টনে। তাদের সাহায্য পাওয়ার কোন উপায় ছিল না জামায়তের।

সেই থেকে এই পর্যন্ত একটি বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু তার কোন বিচার বাংলার মাটিতে এখনও হয়নি। জামায়াত কারও ওপর আক্রমণ করেনা। এরা বাংলার মানুষ আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী হোক, আল্লাহর কোরানের আইন মেনে চলুক, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু হোক– এই প্রচেষ্টাই করছে। এটাই কি তাদের অন্যায়? যার কারণে আওয়ামী বাহিনী জামায়াত-শিবিরকে লগি-বৈঠা দিয়ে মেরে রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করলো। তাছাড়া আওয়ামীলীগের শাসন আমলে যশোরের উদীচী নাট্যমঞ্চে হামলার জন্য ওরা সেদিন এই জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করেছিল। গোপালগঞ্জে টুঙ্গীপাড়া ৭৫ কেজি বোমা পাওয়া গেলে সেখানেও জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করে মাওলানা ইমদাদুল হককে হাজতে নিক্ষেপ করেছিল এবং ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় আইভি রহমানসহ যারা নিহত হলেন, তাদের হত্যার দায়ভারও জামায়াত-শিবিরের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। উপরন্তু বাংলা ভাই, শায়খ আব্দুর রহমানের যে 'সিরিজ বোমা' ৩৬৫টি থানায় ঘটিয়েছিল তাতেও নাকি জামায়াত-শিবির সংশ্লিষ্ট! এটাও একমাত্র আওয়ামী বাহিনীর উক্তি। সকল ক্ষতিকর অন্যায় কাজের জন্য এই জামায়াত-শিবিরকে তারাই দায়ী করে। এটা কোন ধরনের আচরণ? যারা কারও স্বার্থ ক্ষুন্ন করে না অথচ তাদের বিরুদ্ধে একটি মহল সদা সর্বদা মশগুল রয়েছে, এটাকি আইয়ামে জাহেলীয়ার যুগ? আওয়ামী লীগের নিজেদের চরিত্রের প্রতি তাদের কোন খেয়ালই নেই। তারাইতো যত অঘটনের মূল হোতা। এ দেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে ১৪৪ ধারা জারি করে মসজিদের অবমাননা করেছে, চট্টগ্রমের প্যরেড ময়দানে ৫দিন ব্যাপী তাফসির মাহফিলেও ১৪৪ ধারা জারি করে কোরআনের তাফসীর বন্ধ করেছিল



icsbook.info

তারাইতো। সকল ধর্মীয় কাজের বাধা সৃষ্টিকারী মুসলিম আদর্শকে ভূ-লুণ্ঠিত করেছে তো তারাই। বাংলদেশে সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম তো তাদের সময়েই হয়েছে। ট্রাম্পকার্ড, চট্টগ্রামে অস্ত্র বোঝাই ট্রাক সবইতো তাদের রাজত্বকালে লক্ষ্য করা গেছে। এর পরেও তারাই বলে ওরা নাকি বাংলা দেশের মঙ্গলকামী!

সুতরাং শুরু থেকে যারা ইসলামের সাথে বৈরীতা করে আসছে তাদের কাছ থেকে এমন ব্যবহারটি পাওয়া মোটেই দুঃখের কারণ নয়। যাদের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আছে সমাজতন্ত্রী মতবাদ, ধর্ম নিরপক্ষতা মতবাদ, কম্যুনিজম, পুঁজীবাদ ও আওয়ামী মতবাদ, তারাতো ইসলামের সাথে এমন আচরণ করবেই। তারা ইসলামের অনেক নাম দিয়েছে– মৌলবাদ, ফ্যাসিবাদ, কঞ্জারভেটিভ, জায়ন্তবাদ ইত্যাদি। তাই বিভিন্ন মতবাদে ভূষিত করেছে তারা জামায়াতে ইসলামীকে। আওয়ামী লীগের চোখে ইসলাম শব্দটি খুবই বেমানান। আওয়ামী লীগ এদেশ থেকে ইসলামকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। এ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ এর মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কোআনের আয়াত 'ইকৃরা বিছ্মি রাব্বিকাল্লাজি খালাক' পর্যন্ত মুছে ফেলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের নামের সাথে যে ইসলাম শব্দটি ছিল তাও তাদের সময় মুছে ফেলেছিল। জামায়তে ইসলামীকেও তারাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। মানুষের নামের প্রথমে মোহাম্মদ লিখা, হাজী, হাফেজ, ক্বারী, মাওলানা এবং বিছমিল্লাহ লেখা হয় তাও শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তদুপরি তাদের ক্ষমতার সময় তারা মাদরাসার বেতন বন্ধকরাসহ মাদরাসায় তালা লাগায় এবং 'মাদরাসায় তালেবান তৈরি হয়' তারাই বলেছিল। তারাই বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জুতা পায়ে হিন্দু পুলিশ ঢুকিয়ে, মুসল্লিদের বেধড়ক পিটিয়ে মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। জামায়াত শিবিরের সকল অফিসে ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ এবং ডাস্টবিনে কোরআন নিক্ষেপ তাদের সময়েই করা হয়েছিল। এই বাংলাদেশ যেখানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ সেখানে তারা এতসব ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ করে ইসলামকে কলূষিত করতে চেয়েছিল। ইসলামী আদর্শে লালিত এদেশের মাদরাসা শিক্ষকে তারাই কোণঠাসা করে রেখেছিল। সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে মাদরাসা শিক্ষাকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। তাদের চোখে ইসলামী শিক্ষিতরাই চোখের বালাই। দেশের সরকারি সুবিধা মাদরাসা শিক্ষিতরা কখনও পায়নি। আস্তে আস্তে ধীর গতিতে যখন জামায়াত-শিবির ক্ষমতা গ্রহণ করতে থাকে তখন তারা মরিয়া হয়ে ওঠে– এ দেশের ইসলামী পন্থিদের কি করে ঠেকানো যায়। তাই আওয়ামী লীগ গভীর পরিকল্পনা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, জামায়াত-শিবিরকে মেরে খতম করতে হবে।

এমনি ন্যক্কারজনক পরিকল্পনা নিয়ে জামায়াত-শিবিরকে ঠেকাতে তাদের নেতা-কর্মীরা লগি বৈঠা বোমা পিস্তল দিয়ে তাজা প্রাণগুলো শহীদ করে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা ছিল চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে আক্রমণ করে জামায়াত শিবিরের শীর্ষ নেতাদেরকে তারা শেষ করে ফেলবে। কিন্তু মহান আল্লাহ যাদের সাহায্যকারী, তাদেরকে এত সহজে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করা খুবই দুরুহ ব্যাপার। উল্লেখ্য আওয়ামী লীগ যখনি ক্ষমতায় এসেছে তখনই তারা ইসলামী আন্দোলনকারীদের শত্রুর চোখে দেখেছে। ■



icsbook.info

# রক্তাক্ত ২৮ অক্টোবর পাশবিক উল্লাসের প্রমান্যচিত্র দেখে চোখের পানিতে বুক ভাসাল দর্শক সুধীজন

আবু সুবাতা

জাহেলি যুগের কুখ্যাত হিন্দার কথা বোধ করি পাঠক ভুলে যায়নি। এই রাক্ষুসী, বীর সাহাবি রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর চাচা হযরত আমীর হামজা (রা.)কে হত্যা করিয়ে তার বুক চিরে কলিজা চিবিয়ে ইতিহাসে যে কলঙ্ককজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল দুনিয়াবাসী তা ক্ষণিকের জন্য ভুলে গিয়েছিলো। কিন্তু বিগত ২৮ অক্টোবর চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ পূর্তি উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের অনুষ্ঠানে লগি-বৈঠাধারীদের আঘাতে নিহত শিবির নেতা শহীদ মোজাহিদুল ইসলাম, শহীদ জসীম উদ্দিন, শহীদ শিপনসহ ৩৭ জন নেতা কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যার নারকীয় দৃশ্য দেখে এবং লাশের ওপর ওঠে উল্লাস ও উন্মাত্ত নৃত্য করার দৃশ্য দেখে সারা দেশবাসীর সাথে সাথে জগৎবাসীও শুধু হতবাকই হয়নি বরং তারা ১৫০০ বছর পূর্বের বর্বরতার কথা নতুনভাবে স্মরণ করেছে। এবং এর জন্য লগি-বৈঠার হুকুমের আসামী হিসাবে তাদের Wrong Headed নেত্রীকে নব্য হিন্দা হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। Wrong Headed নেত্রীর পিতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ এবং এই সময়ের কিছু পরজীবীর মায়াজালে আচ্ছাদিত আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরদের কর্মকাণ্ড নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারি 'রক্তাক্ত ২৮ অক্টোবর পাশবিক উল্লাসের প্রামাণ্যচিত্র' শীর্ষক ডকুমেন্টারি ফিল্মের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট গত ২৬ নভেম্বর আলফালাহ মিলানয়তনে আয়োজন করে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নান, জামায়াতের নায়েবে আমীর মুহাম্মদ মকবুল আহমদ, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিজেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লা, বিএনপির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী, সম্মলিত সাংস্কৃতিক মোর্চার আহ্বায়ক কবি মতিউর রহমান মল্লিক। সভাপতিত্ব করেন সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টের সমন্বয়ক কবি আসাদ বিন হাফিজ। ঐক্যফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শরীফ বায়জীদ



icsbook.info

মাহমুদের উপস্থাপনায় নির্ধারিত সময় বিকাল ৪টায় ক্বারি বেলাল হোসাইনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শীতের চমৎকার বিকালে অনুষ্ঠানের শুরুর দিকেই মিলনায়তন প্রায় ভরে যায়। এরপর সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর কিশোর শিল্পী মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের মিষ্টি কণ্ঠে আবু তাহের বেলালের কথা ও মশিউর রহমানের সুরে গান 'বৈঠা-লগির অজস্র আঘাতে' শুনে শ্রোতারা ফিরে যায় ২৮ অক্টোবরের পল্টনের রোমহর্ষক ময়দানে, কারো কারো চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। আলোচনা পূর্বে কবি মতিউর রহমান মল্লিক বলেন, আজকের এই পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ময়দানে যদি আমরা যথার্থ ভূমিমকা পালন করতে পারতাম, তাহলে আমাদের বিরোধী-রা এভাবে মিডিয়া জগৎ দখল করতে পারত না। সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টকে এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে হবে। রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী বলেন, সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টকে মোবারকবাদ এজন্য যে, তারা ২৮ অক্টেবরের বর্বরতাকে ভিসিডির মাধ্যমে জাতির কাছে তুলে ধরতে পেরেছে- লাঠি-বৈঠাধারীরা আমাদের মানচিত্রকে বদলে দিতে চায়। তিনি আরো বলেন, নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠানে যে বুদ্ধিজীবী বলেন, আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি বাঙালি, আমি তাকে ধিক্কার জানাই।

আব্দুল কাদের মোল্লা তার বক্তব্যে বলেন, আমরা অনেক আগে যা করার দরকার ছিল করছি তা বেশ পরে। আর এ কারণেই সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমরা পিছিয়ে আছি। সাইমুমসহ অন্য গ্রুপগুলোর গানের কথায় এবং সুরে আরো বৈচিত্র্য বা গভীরতা আসা প্রয়োজন, এতে করে বিপথগামীদেরকে এ মুখো করা সহজ হবে।

মো: মকবুল আহমদ তার বক্তব্যে বলেন, ২৮ অক্টোবর আওয়ামী বর্বরতা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্ববাসী দেখেছে, তাদের বর্বরতার জবাব আগামী নির্বাচনে জনগণ দেবে ব্যালটের মাধ্যমে।

তিনি সুশীল সামাজের সমালোচনা করে বলেন- তারা অনেক বড় বড় কথা, মানবাধিকারের কথা বলেন, কিন্তু ২৮ তারিখের ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এমনকি নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিটিও এব্যাপারে একটি কথাও বলেননি, যা দুঃখজনক।

শাহ আবদুল হান্নান বলেন, ২৮ অক্টোবরের শাহাদাতের ঘটনা সব হিসাব নিকাশ পাল্টে দিয়েছে। এতে করে মনে হচ্ছে আগামীতে চারদলীয় জোট আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য অন্যদের পাশাপাশি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের লোকদের আরো পরিশ্রম করতে হবে।

এরপর শিল্পী-সুরকার মশিউর রহমানের দরাজ কণ্ঠে কবি মোশাররফ হোসেন খানের লেখা গান 'অক্টোবরের ২৮ তারিখ রক্ত ঝরার দিন' গানটি মিলনায়তনের পরিবেশকে ভারী করে তোলে। প্রধান অতিথির হাতে 'রক্তাক্ত ২৮ অক্টোবর পাশবিক উল্লাসের প্রমাণ্য চিত্র'র ভিসিডি তুলে দেন কবি আসাদ বিন হাফিজ। অন্য মেহমানদেরকে ভিসিডি তুলে দেন ফ্রন্টের যুগ্ম সমন্বয়ক মো: আবেদুর রহমান।

প্রধান অতিথি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তার বক্তব্যে বলেন, মূলত আওয়ামী লীগ সে নির্বাচনে যেতে চায়, যে নির্বাচনে তাদের বিজয়ের নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু জনগণের পক্ষে তাদের এ নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়, তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী চালাতে চায়। প্রশাসনকে পকেটে নিয়ে, জনগণকে ভয়ভীতি দেখিয়ে একপেশে নির্বাচন করতে চায়। তাদের এ অপরাজনীতি মোকাবেলায় শুধু রাজনীতিবিদদের নয়, সুধী সমাজ, বুদ্ধিজীবীসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের লোকদেরও এগিয়ে আসতে হবে।



icsbook.info

জামায়াত আমীর আরো বলেন, গত ২৮ অক্টোবর ১৪ দল যে পৈশাচিকতা চালিয়েছে তা যদি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ধারণ না করত তাহলে লাঠিতন্ত্রের কাছে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হয়ে যেত।

যেসব চ্যানেল ১৪ দলের অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক আচরণের দৃশ্য ধারণ করে জাতি ও বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছে তিনি তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অনেক কষ্ঠে অর্জিত গণতন্ত্রের ওপর লাঠিতন্ত্রের বিজয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, মানবতার বিপর্যয় ডেকে আনা আসাধু রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

মাওলানা নিজামী আরো বলেন, তাদের আন্দোলনের ইস্যু ছিল কেয়ারটেকার সরকার প্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার। দুজনই চলে গেছেন কিন্তু তাদের অন্দোলন বন্ধ হয়নি। তাদের কারণেই রাষ্ট্রপতি কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারা মেনেও নিয়েছিল। এখন তাকেও সড়ে দাঁড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছে, তারা নির্বাচন কমিশন সংস্কারের কথ বলছে, ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এ নিয়ে দেশে, বিদেশে লবিং করে ধূম্রজাল সৃষ্টি করছে, তারা একের পর এক অযৌক্তিক দাবি পেশ করে যাচ্ছে। বর্তমান যে অবস্থা, তাতে ক্ষমতায় আসতে পারবে না জেনেই তারা এসব করছে। তারা যেসব দাবি করছে সেগুলো শুনলে ও মানতে গেলে ৯০ দিন দূরে থাক কয়েক বছরেও নির্বাচন করা সম্ভব নয়।

মাওলানা নিজামী বলেন, কয়েকজন আইনজীবী সুপ্রিমকোর্টের জমিদার সেজেছে, তারা যেটাকে সংবিধানসম্মত বলবেন সেটাই সংবিধানসম্মত, যেটাকে সংবিধানসম্মত নয় বলবেন, সেটা সাংবিধানসম্মত নয়। আওয়ামী লীগ আর তাদের এসব আইনজীবী বুদ্ধিজীবীর স্টাইল ও ধরণ প্রকৃত এক ও অভিন্ন। তারা কথা বলবে কিন্তু কাউকে কথা বলতে দেবে না।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা পর্বের সমাপ্তি ঘটে। মাগরিবের বিরতির পর শুরু হয় প্রদর্শনী। ইতোমধ্যে আলফালাহ মিলনায়তন কানায় কানায় পুরিপূর্ণ হয়ে যায়। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য আরো যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানসুর, নজরুল গবেষক শাহবুদ্দিন আহমদ, চলচ্চিত্র পরিচালক মোঃ হাফিজউদ্দিন, শিবির সেক্রেটারী জেনারেল মোঃ জাহিদুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহাদাতুল্লাহ টুটুল, সাইমুম পরিচালক বদিউজ্জামান সোহেল, অনুপম এর পরিচালক আব্দুল গনি বিদ্বান এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীবৃন্দ। বিশাল পর্দায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে হল ভর্তি দর্শক-শ্রোতারা প্রাণভরে উপভোগ করেন আর ২৮ অক্টোবরের সেই রোমহর্ষক দৃশ্য দেখে প্রধান অতিথিসহ উপস্থিত মেহমানরাও ডুকরে কেঁদে ওঠেন, কেঁদে ওঠেন শহীদের মা-বাবার মুখে তাদের সোনার টুকরা সন্তানদের গুণাবলির কথা শুনে, এমনকি কখনো কখনো দর্শকরা আবেগতাড়িত হয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

আমার চোখে দেশে এই প্রথম কোনো অনুষ্ঠান, যেখানে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য সকল মেহমানরা পুরো অনুষ্ঠান আগাগোড়া উপস্থিত থেকে উপভোগ করেন, এভাবেই সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট আয়োজিত একটি সফল অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। ■



icsbook.info

# আমি পল্টনে যা দেখেছি

শহীদুল ইসলাম শহীদ

"শহীদ ভাই, নামায পড়িনি, কি করা যায়।" চিটাগাং রোডস্থ সুগন্ধা ক্লিনিকের বেডে শায়িত আহত খলিল ভাইয়ের ক্লান্ত শরীরের নিচু স্বরে আওয়াজ। যার চোখ দিয়ে অশ্রু নয়, রক্তের লোহিত ধারা বইছে। আওয়ামী লগি-বৈঠাদের আঘাতে যার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে।

তার কথায় আমি সম্বিত ফিরে পেলাম– মাগরিবের সময় অতিক্রান্ত, আমাদের এখনো নামায আদায় হয়নি। এই যেন বদর প্রান্তে সত্য মিথ্যা সংঘর্ষের পেরেশানিতে নামায আদায় করতে ভুলে যাওয়া। আসরের অযু দিয়ে পাশের এক্স-রে রুমে নামায আদায় করলাম। তখনো আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ক্লিনিকে আহত ভাইদের হামলা চালানোর জন্য প্রবেশ পথে একত্রিত হচ্ছিল। আর ক্লিনিকে একেক জনের পর একেকজন আহত ভাই আসছিল। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে খলিল ভাইয়ের জন্য পানি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ল। অগ্যত্যা আমি নির্দেশ দিলাম তায়াম্মুম করতে। মেঝের ধুলো তার হাতে দিতে সে তায়াম্মুম করে বেডে নামায আদায় করল। তার ডান চোখ দিয়ে তখনো রক্ত ঝরছিল।

সেই দিন ঝরে পড়া রক্ত চিটাগাং রোডের পিচঢালা কালো পথকে রঞ্জিত করেছিল। রঞ্জিত করেছিল সিদ্ধিরগঞ্জ-এর প্রত্যেক সত্যাশ্রয়ী মুমিন হৃদয়কে। চিটাগাং রোডের শহীদি ময়দান কালের সাক্ষী হয়ে টিকে থাকবে। এখনো সেখানে শুনতে পাওয়া যায় সেই দিনের বুকফাটা আর্তচিৎকার ইমতিয়াজের– "আমার আব্বা, আমার আব্বা..." এই আওয়াজ শুনে সেই দিন পাশে তাকিয়ে দেখি একজন দাড়িওয়ালা লোককে ২/৩ জন চ্যাংদোলা করে হাসপাতালে নিয়ে আসছে। অদ্ভূত তার দাড়ি-চুলের রং। আওয়ামী লগি-বৈঠাধারীদের পৈশাচিক হামলায় সেগুলো পলাশ ফুলের মত লাল হয়ে গেছে। মাথাটি একটু হেলে পড়ায় সেই রং পথটিকে রঙিন করে দিচ্ছে। আর পিছনে পিছনে ইমতিয়াজ দৌড়াচ্ছে আর বলছে– "আমার আব্বা, আমার আব্বা..." আর বাকি কথাগুলো মুমূর্ষু পিতার রক্তের স্রোতের সামনে অবুঝ সন্তানের অসহনীয় বুকের পাঁজরে আটকে যাচ্ছে।



icsbook.info

দ্রুত রঙিন মাথায় হাত রাখলাম; হাতটি আমার হাত মনে হয়নি– যেন রক্তের পিন্ড হয়ে গেছে। ছোট বেলায় কুরবানীর গরুর রক্তে হাত-পা ভিজাতাম। ঠিক যেন সেই দিন আমার হাত ভিজল। তবে আওয়ামী হায়েনাদের হামলায় আহত মানুষের রক্তে।

আহতদের সারি আস্তে আস্তে বেড়ে চলল। রক্তাক্ত অবস্থায় ফয়সাল ও ফাহাদ ভাইকে আনলাম কয়েকজন মিলে। তারা দু'জনে ছিল ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী। সেই দিনের পরিস্থিতিতে লোক কম থাকায় তাদের আনতে কষ্ট হচ্ছিল। বেডে রাখার প্রায় ১০ মিনিট পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ফাহাদ ভাই। তার নিস্পলক চেহারায় রক্তের ছোঁপ ছাড়া কিছুই দেখা যায়নি। আওয়ামী হায়েনারা তার মাথায় পর পর এত আঘাত করে যে, পরবর্তীতে তাকে ৬০-৭০টি সেলাই দিতে হয়েছে। সেইদিন কিভাবে স্থির ছিলাম আজও মাঝে মধ্যে চিন্তা করি।

পাশের রুমে ছিল ফয়সাল ভাইয়ের বেড। মাথার ডান পাশটা বড় ধরনের গোল আলুর মত ফোলা। জ্ঞান তখনো ছিল। শুধু কোরবানির গরুর মত বড় বড় নি:শ্বাস ও মুখ দিয়ে ফেনা ছাড়ছে। অন্তরের ভাষাহীন ব্যাকুলতায় ফোলা পাশটায় হাত বুলালাম, পরনের গেঞ্জিটার বুতাম খুললাম। প্রায় আধাঘন্টা পর ধীরে ধীরে জ্ঞান হারাতে থাকে। পরে জানলাম– জয় বাংলার স্লোগানধারীদের নির্মম আঘাতে ফয়সাল ভাইয়ের ফোলা জায়গায় ভিতরের মগজ থেতলিয়ে গেছে। ফয়সাল ভাই পরের দিন সকাল বেলায় সত্যিই আল্লাহর রাহে কুরবান হয়ে চলে গেছে জান্নাতের ভুবনে। আল্লাহ্ তাকে শহীদি মর্যাদা দান করুন।

তারপর আহতদের মাঝে যোগ হল জলিল সাহেব। আওয়ামী হায়েনারা লগি-বৈঠার উপর্যুপরি আঘাতে থেতলে দেয় তার হাত-পা'র আঙ্গুল। তাকে মৃত মনে করে ফেলে রাখে রাস্তায়। আর দম্ভ করে বলতে থাকে– "জামায়াতের চারটা শেষ"। জলিল সাহেব এমনি ডায়াবেটিক রোগি। তার অবনতি ঘটলে দ্রুত বারডেমে ভর্তি করানো হয়।

সেই দিনটি ছিল ২৮ অক্টোবর ২০০৬। আমার দেখা বদরের দিন। এই দিনে দেখেছি সত্যের ঝান্ডাবাহী 'আল্লাহু আকবর' স্লোগান নিয়ে হকের দিকে অগ্রসর হওয়া আর অপরদিকে লগি-বৈঠাধারী বাতিল শক্তি সেই অগ্রসর রুখে দিতে চায়। কিন্তু হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য। ফলে বদরের দিনের মত ২৮ অক্টোবরে শহীদ হামজার মত জসিম, ফয়সাল, শিহাব, মাসুম, শাহজাহানদের রক্ত ঝরেছে। এই দিনে অনেককে দেখেছি আবদুল্লাহ্ বিন উবাইর মত অযুহাত পেশ করতে; অনেককে দেখেছি মা'য়াজ-মুয়াজ-এর মত লাঠি নিয়ে বাতিল শক্তিকে মোকাবেলা করতে। যে ময়দানে শহীদের রক্ত ঝরে; সেই ময়দান গায়রুল্লাহ'র আবাসভূমি হতে পারে না। শহীদ হামজার উত্তরসূরী শহীদ ফয়সাল, জসিমদের রেখে যাওয়া বাকি কাজ আমাদেরকে আঞ্জাম দিতে হবে। কেননা আমাদের মনজিল বহুদূর। তাই আমরা কুরআনের ভাষায় শপথ নিই– "আমরা নিথর হবো না, নিস্তব্ধ হবো না যতদিন না কুরআনকে সংবিধান পাব।" ■



icsbook.info

# বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে

আব্দুর রহিম

দীর্ঘ এক বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে, এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল শহীদের খুনিরা। এভাবেই যদি খুনিরা একের পর এক দেশের আগামী দিনের স্বপ্নদের হত্যা করে পার পেয়ে যায়, তাহলে কি প্রশাসনকে ব্যর্থ বলব নাকি খুনিদের সহযোগী বলব? খুনিরা ফয়সালকে হত্যা করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি– তারা শহীদের পরিবারকে রেখেছে ভয়ভীতি ও হুমকির মুখে। প্রশাসনকে জানানোর পরও প্রশাসন শহীদ পরিবারের যথাযথ নিরাপত্তা দিতে পারে নাই।

খুনিরা প্রশাসনের নাকের ডগার উপর দিয়ে চলাফেরা করলেও চিহ্নিত এই সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার কিংবা মামলার চার্জশিট পর্যন্ত এখনও দিতে পারে নাই। এভাবেই যদি সন্ত্রাসীরা একের পর এক সত্যের প্রচারক, আদর্শের পতাকাবাহীদের হত্যা করে পার পেয়ে যায় তাহলে হয়তবা আমাদের এই স্বপ্নের দেশ সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের আখড়ায় পরিণত হবে। স্বাধীন জাতি হিসেবে যা আমাদের জন্য চরম অবমাননাকর। তাই প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি যত দ্রুত সম্ভব দেশ বিরোধী এই সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে আমাদের শাসন ও বিচার বিভাগ জনগণের নিকট প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে।

আমাদের প্রেরণা : শহীদ ফয়সাল, মাসুম, মুজাহিদ, প্লাবন একেকটি নাম হাজার হাজার তরুণের প্রেরণা। ওরা মনে করেছে ফয়সালদের মেরে ফেললে সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু না, তারা জানে না ফয়সাল শুধু একটি নাম নয় একটি আদর্শ। আদর্শকে কখনো মেরে ফেলা যায় না। শহীদ ফয়সাল সম্পর্কে তার এক ছাত্রের অভিভাবকের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ফয়সাল কেমন ছিল? উত্তরে সে বলল, ফয়সাল স্যার এর মত অমায়িক ব্যবহার আমি আর অত্র এলাকায় দ্বিতীয়টি দেখিনি এটা শুধু আমার মন্তব্য নয় আপনারা এলাকার সব মানুষের কাছে একই উত্তর পাবেন। যখন তার এক ছাত্রের কাছে তার প্রিয় স্যারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল সে কোন উত্তর দিতে পারেনি। শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এই ছোট্ট শিশুর কান্নায় বেজে উঠল– যারা আমার প্রিয় শিক্ষককে



icsbook.info

হত্যা করেছে তারা মানুষ নয়, তারা জানোয়ার। আমরা যখন শহীদের ছোট ভাই ও মা এর কাছে যাই তাদের করুণ আর্তনাদ শুনে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। শহীদের মা যখন বলে উঠেন, ইয়া আল্লাহ তুমি আমার সবগুলো ছেলের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ছেলেটাকে কেড়ে নিলে। তখন বাকরুদ্ধ হয়ে যাই ও দু'চোখে অশ্রু বয়ে যায়, জেগে উঠে হৃদয়ের মাঝে এক নতুন প্রেরণা। আমি শহীদের জানাযায় দেখেছি হাজার হাজার জনতার দু'চোখের অগ্নি অশ্রু। এই অশ্রু যেনো বলে দিচ্ছে– তোমরা আব্দুল্লাহ আল-ফয়সালকে হত্যা করে মনে করেছো আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল মরে গেছে। কিন্তু না ফয়সালরা মরে না। ফয়সাল বেঁচে আছে আমাদের হৃদয়ে।

ঐ জানাযায় অংশগ্রহণকারী শিশু, কিশোর, যুবকদের কণ্ঠে যেন বেজে উঠল ফয়সাল তুমি নেই তাতে কি হয়েছে, আমরা তোমার উত্তরসূরি হয়ে বেঁচে আছি। আমরা তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করব। ফয়সাল তুমি এই জমিনে রক্ত দিয়ে আমাদের ঋণি করে গিয়েছো আমরা তোমার স্বপ্নকে পূরণ করেই তোমার রক্তের ঋণ পরিশোধ করব।

ফয়সালরা কখনো মরে না, ফয়সালরা হচ্ছে একেকটি প্রেরণার বাতিঘর। যেখান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে আর মানুষ সত্য পথের ঠিকানা খুঁজে পায়। ওরা এই আলোকে নিভিয়ে দিতে চায় ওদের মুখের ফুৎকারে। কিন্তু আল্লাহ তার এই আলোকে প্রজ্জ্বালিত করবেনই। ওরা মনে করে ফয়সালদের শেষ করে দিলেই সব শেষ হয়ে যাবে কিন্তু না, ফয়সালরা আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে প্রেরণা যোগায়, আমাদের পদযুগলকে দৃঢ় করে। আমরা বলতে চাই, ফয়সাল তুমি মরনি, তুমি বেঁচে আছ আমাদের হৃদয়ে। তোমার এই আত্মত্যাগের মহিমায় আবার আমরা উজ্জীবিত হলাম। তোমার অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণ করতে তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দান করতে আমরা লাখ লাখ নাবিক নতুন করে শপথ নিলাম আজ। ■



icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর
# বিভৎস রাজনীতির পতন ধ্বনি

ফিরোজ আহমাদ

বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হল সিদ্ধিরগঞ্জ। পূর্বাঞ্চলের ঢাকাগামী দরজা মুক্তি স্মরণি। সিদ্ধিরগঞ্জের এই মুক্তি স্মরণির পাশেই ২৮ অক্টোবর '০৬ পড়ন্ত বেলায় আমাদের তরুণ সাথীকে শহীদ করা হয়। দেশ, জাতি ও গণতন্ত্র বিরোধী ঐ অপশক্তির এজেন্টরা সেদিন প্রকাশ্য জনতার সামনেই শান্তিপ্রিয় মিছিলের উপর নিষ্ঠুর হামলা চালায়। তারা সন্ত্রাসী কায়দায় লাঠি, লগি-বৈঠা নিয়ে নিরস্ত্র, নিরীহ জামায়াত কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে রাজপথে ফেলে দেয় নেতাকর্মীদের। মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বজনাব ফাহাদ বিন আহসান, আনোয়ার শা'দাত, আ: জলিল, আবুল কালাম শিকদার, আবদুল্লাহ আল-ফায়সাল, খলিলুর রহমান, কফিল উদ্দীন প্রমুখ। আঘাত করতে করতে ধরাশায়ী করে পিটাচ্ছে দেখে বড় ভাই ফাহাদ বিন আহসানকে বাঁচাতে গিয়ে আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল সর্বোচ্চ মার খেয়েছে সন্ত্রাসী আওয়ামী গুন্ডাদের হাতে। তার রক্তে সেদিন রাজপথ রক্তিম হয়ে উঠে। জরুরিভাবে ঢাকায় ইবনে সিনা হাসপাতালে সর্বাত্মক চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু সবকিছু শেষ করে আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল ২৯ অক্টোবর '০৬ রাত সাড়ে আটটায় শাহাদাত বরণ করে। উদীয়মান এক মর্দে মুজাহিদ আব্দুল্লাহ আল-ফায়সাল আরেকবার প্রাণ দিয়ে বাতিলের উৎখাতে হকের প্রতিষ্ঠায় আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানিয়ে গেল। সারা বাংলাদেশের মত সিদ্ধিরগঞ্জের ইসলামী আন্দোলনকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিয়ে গেল।

২২ ডিসেম্বর '০৬ ফয়সাল হত্যার প্রতিবাদ সমাবেশ ছিল তারই ক্ষুদ্র আভাসে। এই প্রথম চিটাগাং রোডে পাঁচ হাজার ছাত্রজনতার প্রতিবাদ সমাবেশ হলো। স্বত:স্ফূর্ত আরো হাজার হাজার ছাত্র-জনতা সেদিন ফয়সাল হত্যার প্রতিবাদে অংশ নেয়। স্লোগানে স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে হাজার মুষ্ঠি উপরে তুলে। "ফয়সাল ভাইয়ের রক্ত



icsbook.info

বৃথা যেতে দিব না"– ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে লাওহে মাহফুজে গিয়ে পৌঁছে। নিষ্ক্রীয় তরুণেরা সক্রিয় হয়ে উঠে। জামায়াত শিবিরের পাল্লায় জনস্রোত ভেসে আসে। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী জামায়াতে যোগদান করে। তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ দেখা গেল ৩০ অক্টোবর '০৬ ফয়সালের জানাজার সময়। ফয়সালের আপন চাচা আমিনুল হক ছিল আওয়ামী লীগের সদস্য। সেদিন নেতৃবৃন্দ শোকগাথা পেশ করার সময় সে এসে মাইক কেড়ে নেয়। উপস্থিত হাজারো জনতার সামনে সে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিল– "আমি ছিলাম আওয়ামী লীগের কর্মী। আমার ভাইস্তার প্রতি জামায়াত শিবিরের ব্যবহার দেখে আমি এখন থেকে জামায়াতে যোগদান করলাম। আপনারা দোয়া করবেন।" শ্রোতামন্ডলী সবাই মারহাবা বলে তাকে অভিনন্দন জানালো। সারাদেশে এভাবেই আওয়ামী নৌকা ভেংগে চুরমার হয়েছে ইতিমধ্যে চারিদিকে বার বার।

বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। আমাদের দেশকে রক্ষা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আমরা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা মুসলমান সেরা জাতি। আমাদের জীবন বিধান ইসলাম দিয়েই শুধু আমাদের এই মাতৃভূমিকে রক্ষা করা সম্ভব। বিদেশী কোন মতবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষ কোন মতবাদ দিয়ে এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এ দেশবাসী তা বুঝতে শুরু করেছে ফয়সালদের শাহাদাতের বিনিময়ে। জামায়াত-শিবির সেই কারখানাই চালু করেছে। এই কাফেলা কখনও শেষ হবার নয়। এই কারখানার উৎপাদন বেড়েই যাবে। শেষ হবে বিভৎস রাজনীতি এভাবেই। ■



icsbook.info

# রক্তাক্ষরে লেখা নাম
# শহীদ ফয়সাল

আয়েশা খাতুন

'কি অপরাধ ছিল আমার ভাইয়ার? ওরা আমার এতিম ভাইটিকে কেন বেছে নিল? আমার সহজ সরল ভদ্র শান্ত ভাইটির গায়ে কেন হাত তুলল? ওদের কি কোন দয়া মায়া নেই? মানুষ এত নিষ্ঠুর কিভাবে হয়? আমার এতিম ভাই এর গায়ে হাত তুলতে ওদের দীল একটুও কাঁপলো না'?

সেদিন শহীদ ফয়সালের ছোট বোন শাম্মীর কান্নাজড়িত কণ্ঠের প্রশ্নগুলো আমার বুকে তীরের মতো বিদ্ধ হতে লাগল। আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। শাম্মীকে কি বলে সান্ত্বনা দিব, কিভাবে শাম্মীর এতগুলো প্রশ্নের জবাব দিব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অনেক কষ্টে কান্না চেপে ওড়না দিয়ে চোখ মুছে শাম্মীর পাশে বসে ধীরস্থিরভাবে বললাম, তোমার ভাই এর সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। তোমার ভাই আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করে এটা তাদের কাছে অসহনীয় ছিল।

রাসূল (সা.) বলেন, "কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর স্থির থাকবে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকবে। মহামহিম আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" –ইবনে মাজা।

তোমার ভাই ফয়সাল শহীদ হয়েছে। ফাহাদ গাজী হয়ে ফিরে এসেছে। তুমি শহীদ গাজীর গর্বিত বোন। তোমার আবার দু:খ কিসের। ফয়সাল মরেনি। ফয়সাল বেঁচে আছে। কারণ মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।" –সূরা বাকারা : ১৫৪ নং আয়াত।

সেদিন শহীদ ফয়সাল পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে আসা ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলা, রুকন, কর্মী, সুধী, সমর্থক প্রতিবেশী মহিলাদের ভিড়ে পা ফেলার কোন জায়গা ছিল না। সবার চোখেই ছিল পানি। একেকজন একেক কথা বলে ফয়সালকে স্মরণ করছিল। কিন্তু তখনো শহীদ ফয়সালের মা আমাদের শ্রদ্ধেয়া আপা হাসনা বানু ধীরস্থিরভাবে দোয়া কালাম পড়েই যাচ্ছিলেন। কোন রকম বিলাপ কিংবা হা-হুতাশ করেননি। আমার মনে হয়েছে, আপা শহীদের মা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। শহীদ



icsbook.info

ফয়সালের বড় ভাই ফাহাদ হাসপাতালে যখন অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখনো তার মুখে ছিল কুরআন হাদীসের বাণী। বার বার সে তার মাকে বলছিল, আম্মা আপনি ধৈর্য্য ধারণ করেন। আপনি শহীদের মা হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। শহীদ ফয়সালের বড় ভাই ফুয়াদ ছিল সেদিন বাকরুদ্ধ। ফয়সালের ছোট ভাই ফাহমিদ চট্টগ্রাম ভার্সিটি থেকে ভাই এর সংবাদ শুনে গভীর রাতে ছুটে আসে তার মাকে সান্ত্বনা দিতে। সবচেয়ে ছোট ভাই নাকীবের নির্বিকার চাহনী দেখে সেদিন মনে হয়েছে ওর কচি বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এখনো নাকীব স্বাভাবিক হতে পারেনি। বাবা মারা যাবার পর থেকে ফয়সাল নাকীবকে খুববেশি আদর করত, যাতে বাবার অভাব বুঝতে না পারে। তাই ফয়সাল শহীদ হওয়াতে নাকীব সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে। শহীদ ফয়সালের ছোট বোন ইসলামী ছাত্রীসংস্থার কর্মী সাকী ছিল সেদিন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। বার বার তার বড় বোন শাম্মীকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। শহীদ ফয়সালের মায়ের চোখের পানি দেখে মনে হয়েছে উনার চোখ থেকে আনন্দের অশ্রুধারা বইছে। আপার চোখের পানি জানিয়ে দিচ্ছিল আমি শহীদের গর্বিত মা। আর তোমরা সবাই ব্যর্থ মা। তোমরা সবাই তোমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দাও। তোমাদের সন্তানদেরকে ময়দানে নামিয়ে দাও। আমার ফয়সাল, মুজাহিদ, মাসুম, শিপনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে।

প্রিয়তম স্বামীকে হারানোর তিন বছরের মাথায় কলিজার টুকরা ফয়সালকে হারিয়ে আপা এখন শোকে পাথর হয়ে গেছেন। বাবাহারা সন্তানগুলোকে বুকে আগলে রেখে শত কষ্ট ভুলে ওদেরকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর হায়েনারা আপার বুকের ধনকে কেড়ে নিয়ে আপার আরামের ঘুমকে হারাম করে দিল। শহীদ ফয়সালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার গর্বিত মা বলেন, আমার ফয়সাল কখনো ভাল কোন খাবার খেতে চাইত না, বলত আম্মা আমি এমনিতেই বেশ সুস্থ আছি। আপনি সারাদিন পরিশ্রম করেন আপনার ভাল খাবার দরকার। আপনি খেয়ে নিন। কোন ফলমূল রাখলে নিজে না খেয়ে ছোট ভাইবোনদের ভাগ করে দিয়ে দিত। বাবার কষ্ট কখনো ভাই বোনদের বুঝতে দিত না। নিজে মোবাইল সেট না নিয়ে ছোট বোন শাম্মীকে মোবাইল সেট কিনে দিয়েছিল। স্কুলে চাকরি, টিউশনি, দোকান দেখাশুনা, তার উপর নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। তবুও ভাইবোনদের মুখে হাসি ফুটাতে মায়ের দু:খ ঘুচাতে শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরেছিল। শহীদ ফয়সালের ছোট খালা সিদ্ধিরগঞ্জ থানা মহিলা বিভাগের সেক্রেটারীসাইয়্যেদা কামরুন্নাহার আপা বলেন, ফয়সাল সবসময় শহীদি গান গাইত তাই আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করেছেন।

আরেক খালা হাসিনা বানু বলেন, ফয়সাল মিছিলে যাওয়ার একটু আগেই বাজার থেকে ব্যাগ ভর্তি তরকারি, কচি শশা কিনে নিয়ে আসে। তার মা বললেন, কিরে ঈদ চলে গেল শশা আনা হয়নি, আজকে শশা দিয়ে কি করবি? ফয়সাল শরীর দুলিয়ে হাসি মুখে জবাব দিল, জিহাদ করতে শক্তির দরকার। শশা খেয়ে শক্তি যোগাড় করে মিছিলে যাব। সেই শশা খাওয়ার সময় হলো না শহীদ ফয়সালের। তার খালু সাইফুল আলম ভাই এর ডাকে সাড়া দিয়ে ফাহাদ ফয়সাল দুই ভাই যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যেই লগি বৈঠাধারীরা নিস্তেজ করে দিল ফাহাদ ফয়সালের তাজা দেহকে। আনোয়ার সাদাত ভাই এর মাথাকে থেতলে দিয়েছিল হায়েনারা। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে তিনি বেঁচে যান। খলিলুর রহমানের একটি চোখ এমন ভাবে জখম করেছে যে, এখনো সেই চোখে কিছুই দেখে না। আরও অনেকেই সেদিন আহত হয়েছিল। সিদ্ধিরগঞ্জের মাটিতে এখনো রক্তের গন্ধ। সেই গন্ধ দূর করতে আমাদেরকে বলিষ্ঠ ইমানের পরিচয় দিতে হবে। ■



icsbook.info

# আমার দেখা ২৮ অক্টোবর

মু. রকিব উদ্দীন

দিনটা ছিল শনিবার। পড়তে বসেছিলাম। তখন বেলা তিনটা বাজে। কিন্তু কেন যেন পড়ায় মন বসছিলো না। যাই হোক হঠাৎ আমার এক সাথী দৌড়ে আমার কাছে আসল, আমি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই আমাকে জানালো যে, সারাদেশে আজ আওয়ামী দস্যুরা হামলা করছে এবং মানুষ হত্যা করছে। এ কথা শুনে আমি কেমন যেন একটা ব্যথা অনুভব করলাম এবং পরিস্থিতি অবলোকনের জন্য চলে আসলাম সিদ্ধিরগঞ্জ পুলে। সারাটি রাস্তায় একটা রিকশাও চলতে দিচ্ছে না। বুঝতে পারলাম কিছু একটা হতে যাচ্ছে। তাই আমার ভীতি যেন আরো বেড়ে গেল। আমি দোকানে দাঁড়িয়ে দেখছি মূলত ঘটনা কোন পর্যন্ত পৌঁছে। তবে একটা কথা পূর্বেই বলে রাখাই ভাল, আমি কিন্তু জানতামনা আজ ইসলামী ছাত্রশিবিরের শান্তিপূর্ণ মিছিল আছে কারণ আমাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল ২৯ অক্টোবর যেন আমি নারায়ণগঞ্জ মিছিলে যাই। তাই আমার ২৮ অক্টোবরে আর মিছিলে যাওয়া হয় নাই।

বেলা ঠিক ৪.৩০ বাজে। আমি সালাতুল আসর আদায় করে পুনরায় আসি। রাস্তায় দেখলাম দুটি মোটর যান, তবে এ দুটো ছিল আওয়ামী লীগের। এক পর্যায় আদমজি থেকে আরো কিছু সন্ত্রাসবাহিনী আসে। সকলে একত্র হয় সিদ্ধিরগঞ্জ পুলে। সেখান থেকে লগি-বৈঠা, রামদা, ছুরি ইত্যাদি নিয়ে রওনা হয় চিটাগাং রোড বিএনপির সমাবেশের দিকে। আমি বাড়িতে ফিরে যাই কিন্তু বাড়িতে ফেরার সময় দেখা হয় এক আওয়ামী কর্মীর সাথে। সে আমাকে লক্ষ্য করে উস্কানিমূলকভাবে বলতে থাকে যে, আজ সকালে শিবিরের অফিস ভাংচুর করে সব নিয়ে গেছি। এ কথা শুনার পর আমার শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে এবং আমি তাকে বলি, শিবিরের অপরাধটা ছিল কি? যে, তাদের অফিস ভাংচুর করা হল। সে বললো, তাদের অপরাধ তারা এ দেশে ইসলামী দল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না।

একজন মুসলিম দেশের মুসলমানের মুখে। কথাটা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি সেখান থেকে বাড়িতে গেলাম। কিন্তু মন বসছে না। শুধু মনে পড়ছে দেখে আসা সিদ্ধিরগঞ্জ পুলের সন্ত্রাসীদের তান্ডব। আমি পার্শবর্তী ঘরে খবর দেখার জন্য গেলাম। কিন্তু হায় আমি এ কোন খবর দেখার জন্য আসলাম! এতো দেখছি আল্লাহর সৈনিকদেরকে উপর্যুপরি আঘাত ও গুলির মাধ্যমে শহীদ করছে ঐ আওয়ামী সন্ত্রাস বাহিনী। শহীদ জসিমের মর্মান্তিক কাহিনী এখনও চোখের পর্দায় ভাসে। আমি যেন অশ্রু ধরে রাখতে পারছি না। কিন্তু এত সবের পরও ঐ হায়েনাদের মুখ থেকে শুনলাম আরো মার আরো মার। কথাটা আমার অন্তরে আঘাত হানে। তাই আমি কথার জবাব না দিয়ে পারলাম না। অমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ থেকে চলে আসল যে, যারা আজ আল্লাহর সৈনিকদের মারছে ওদের বাপ মা যদি এই মুহূর্তে দেখতে পেত তাদের ছেলেদেরকে আল্লাহ এর চাইতে বড় শাস্তি দিচ্ছেন, তাহলে তাদের কাছে কেমন লাগত। আল্লাহ কি তাদের বিচার করবেন না? তবে সে সময় বেশি দূর নয়। ■



icsbook.info

# আটাশে অক্টোবর
# প্রেরণার বাতিঘর

মুহাম্মদ নিজামুল হক নাঈম

সকাল ৯টা। ২০-২৫ জন ভাইকে নিয়ে উপস্থিত হলাম বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে। পূর্ব নির্ধারিত জামায়াতের সমাবেশে শৃঙ্খলা বিভাগের দায়িত্ব পালনই উদ্দেশ্য। প্রতিদিনের মত একটি সুন্দর সকালের ২৮ অক্টোবর। ক্রিড়া ভবনের উত্তর পাশে প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে, ধীরে ধীরে আমাদের ভাইয়েরা আসা শুরু করেছেন মাত্র। সবার মধ্যে ঈদের আমেজ। যার যার মত ঈদের শুভেচ্ছা সালাম বিনিময়, মোসাফা, মোয়ানাকা করে নিচ্ছেন। উপস্থিতি কম হলেও উত্তর গেটটি একটি ছোট খাট ঈদগা'র মতই মনে হচ্ছে। সুন্দর সাবলিল ঈদের আনন্দে সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সূর্যের প্রখরতার সাথে তালমিলিয়ে এযে এক বিষাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে তা হয়ত কারোরই জানা ছিল না। কেউ জানতেননা যে, জোট সরকারের বিদায়ের সাথে সাথে এক ঝাঁক ফুটন্ত গোলাপও ঝরে যাচ্ছে আমাদের সুন্দর সাজানো বাগান থেকে। একটি চেঙ্গীসীয় বর্বরতা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য, সূচীত হচ্ছে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের। অপর দিকে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য একটি প্রেরণার বাতিঘর নির্মিত হচ্ছে।

আমার সাথে নিয়ে আসা ভাইদেরকে রেখে সমাবেশের ব্যবস্থাপনা কক্ষে গেলাম আমাদের দায়িত্বশীল নূরুল ইসলাম বুলবুল ভাইয়ের খোঁজে। রুমে যেতেই জানা গেল, লালবাগ থেকে হাজী সেলিম, মৌচাক থেকে ডা. ইকবাল এবং মহাখালি থেকে এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনের নেতৃত্বে হাজার হাজার লোক মানিক মিয়া এভিনিউর দিকে আসছে। এ সংবাদ শুনে বুলবুল ভাই আমাদেরকে সাথে নিয়ে উত্তর গেট সংলগ্ন ওভারব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে কোন ধরনের অনাকাংখিত পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না হয়– সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তেই পল্টন মোড়ের দিকে বিচ্ছৃঙ্খলা লক্ষ্য করলাম। আমাদের আগেই বুলবুল ভাই সামনে এগিয়ে গেলেন, মুহূর্তের মধ্যেই ডা. ইকবালের নেতৃত্বে হাজার হাজার লগি-বৈঠাধারীর একতরফা আক্রমণে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

একদিকে ভাড়া করা বখাটে অস্ত্র ও লগি-বৈঠাধারি হাজার হাজার সন্ত্রাসীর উপর্যুপরি আক্রমণ, অপরদিকে সহজ সরল ও খালি হাতে থাকা ২০০/২৫০ লোকের মধ্যে এক অসম যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হলো পল্টন ময়দান। লগি-বৈঠাধারিদের আক্রমণে তারা যখন জামায়াতের নির্মাণাধীন প্যন্ডেলের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিল, তার মোকাবেলায় অল্পসংখ্যক ভাইদের জীবনপন প্রতিরোধের মুখে তাদের পিছু হটার দৃশ্য মোমিনদের সাথে আল্লাহর রহমত ও সহযোগিতার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম। বাতিলের মোকাবেলায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য, হিম্মত ও আল্লাহর প্রতি ভালবাসাকে পুঁজি করে ঘন্টার পর ঘন্টা ময়দানে টিকে থেকে একাধিকবার আহত হয়ে একের পর এক



icsbook.info

শাহাদাতের নজরানা পেশের মধ্যদিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়– আল্লাহর এই জমিনে বাতিল শক্তির বিদায়ের ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে। এই দিনের শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম, শহীদ শিপন, শহীদ হাবিবুর রহমান ভাইদের সাথে ঐ সকল ময়দানে কাজ করার সুবাদে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলেও শহীদ আব্দুল্লাহ আল-ফয়সালকে বাতিলের মোকাবেলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি একেবারেই কাছ থেকে।

২০০৫ সালে ৩মার্চের একটি ঠুনকো ঘটনাকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর আধিপত্যবাদি শক্তিগুলোর তান্ডবলীলা শুরু হয়। দিন যাওয়ার সাথে সাথে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের মুখোশ নগ্নভাবে উন্মোচিত হতে থাকে।

রাজধানীর বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু নয়, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী ছাত্রশিবির একক ছাত্র সংগঠনে পরিণত হতে গিয়ে নানান ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা থাকলেও রাজধানীতে নিকট অতীতে তেমন বড় ধরনের অভিজ্ঞতা বর্তমান জনশক্তির মাঝে ছিল না। এ সত্ত্বেও আল্লাহর কিছু জিন্দাদীল মুজাহিদ ও বিভিন্ন ময়দান মোকাবেলা করে আসা কিছু দায়িত্বশীলের সঠিক দিক নির্দেশনা ও কৌশলী ভূমিকার পাশাপাশি সারা দেশের আল্লাহর নেক বান্দাদের দোয়া, সর্বপরি আল্লাহর রহমতকে সাথে নিয়ে চলতে থাকে আমাদের পথচলা। যা ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা আলিয়া, ঢাকা কলেজ, তিতুমির কলেজ, সরকারি বাংলা কলেজ, এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত।

এ ক্যাম্পাসের চলমান কর্মসূচীতে যে কয়জন আল্লাহর সৈনিক দুঃসাহসি, স্বতস্ফূর্ত ও কৌশলী ভূমিকা নিয়ে ময়দানে বিচরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে শহীদ আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল অন্যতম। ২০০৬ সালের ১৫ ও ১৬ জুলাইয়ের রেশ ধরে ১৭ জুলাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আমাদের শতাধিক ভাইয়ের আহত হওয়ার মাধ্যমে জবির পিচঢালা ক্যাম্পাস রক্তে ভেজা ক্যাম্পাসে পরিণত হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ দিন ক্যাম্পাস বন্ধ থাকার পর ২ আগস্ট থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছিল ইসলামী ছাত্রশিবিরের সরব উপস্থিতি। তাতে উচ্ছৃঙ্খলতার নায়করাও অনুপস্থিত ছিলনা। এ সময়গুলোতে ক্যাম্পাসের প্রতিটি স্পটে আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল ছিলেন সদা সক্রিয়। কখনো তাকে দেখা যেত তার ফ্যাকাল্টি সভাপতি শাহীন আহমদ ভাইয়ের সাথে কলা অনুষদের বিস্তৃত চত্বরে। আবার কখনো দেখা যেত ভাস্কর্যের পাশে মূল স্পটে। আবার দেখা যেত শহীদ মিনারে বসে আল্লাহর দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তখন একটি বারের জন্য মনে হয়নি শহীদ মিনারের শহীদ শব্দটি তার নামের সাথে যোগহবে। এ সময়গুলোর কোন একদিন আমি আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে বিকাল বেলা ক্যাম্পাসের মূল ফটকদিয়ে বের হওয়ার সময় দেখতে পেলাম শহীদ মিনার চত্বরে কিছু সংখ্যক ছাত্র ইসলামী সংগীত গাইছেন। এ মুহূর্তটির পূর্বে আব্দুল্লা আল-ফয়সালকে ভালোভাবে না জানলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদমিনারে বসে ইসলামী সংগীত পরিবেশনে নেতৃত্ব প্রদানকারী আব্দুল্লাহ আল-ফয়সালকে দেখে আমার সাথে থাকা শাহীন আহমদ ভাইকে প্রশ্ন করলাম– ঐ ভাইটি আপনার কর্মী ফয়সাল না? তিনি জবাব দিলেন– হ্যাঁ। আমি তাকে উৎসুক মনে জিজ্ঞাসা করলাম– তাকে আমি আমাদের সাথে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে দেখি এবং তার ভূমিকা আমাদের অনেক জনশক্তির চেয়ে ভালো এরপরও সে কেন মান উন্নয়ন করছেনা? এ প্রশ্নগুলো করতে করতে শাহীন আহমেদ ভাই তার বিস্তারিত ঘটনা আমাকে খুলে বললেন– সে সাথী ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে পিতার মৃত্যুবরণের ফলে পারিবারিক কিছু



icsbook.info

সমস্যার কারণে তিনি সংগঠন থেকে ছাত্রজীবন শেষ করেছেন। তবে তিনি বর্তমানে আমাদের একটি উপশাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এবং পুনরায় সাথী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কথাগুলো অবলীলায় বলেছিলেন তৎকালীন কলা অনুষদের সভাপতি শাহীন আহমেদ ভাই। ফলে তাকে জানার জন্য আমার মধ্যে তীব্র স্পৃহা সৃষ্টি হলো। বললাম ফয়সালকে একটু আমার কাছে নিয়ে আসবেন। এর দু-একদিন পরে ফয়সাল ভাই রিপোর্ট বইটি নিয়ে আমার সামনে হাজির হলে বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে কোলাকুলি করেছিলাম। কোলাকুলি শেষে কোনকিছু জিজ্ঞাসা না করতেই নিজের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এই বলে শেষ করলেন– ভাইয়া পারিবারিক সমস্যা অনেকটা কেটে গিয়েছে এবং আমি আবার সাথী শপথ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার সঠিক আচরণ দেখে মনে হলো আমার ডাকার উদ্দেশ্য তিনি আমার বলার পূর্বে বুঝে ফেলেছেন। তিনি এমনভাবে তার অতীত বর্তমান ও পরবর্তী পরিকল্পনার কথা জানালেন যে, আমাকে আর কোন প্রশ্নই করতে হয়নি। এরপর ক্যাম্পাসে আমাদের উপস্থিতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আমরা ভাস্কর্যের টেবিল ছাড়াও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আরেকটি টেবিলে বসা শুরু করি। এতে অন্যদের ও গাত্রদাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জোট সরকারেরও শেষ মুহূর্ত হওয়ার কারণে সবার মধ্যে এক প্রকার টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। মনে হচ্ছিল, যে কোন সময় আবার আল্লাহর সৈনিকদেরকে বড় ধরনের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে।

তখন একটি দিনে আমি ক্যাম্পাসে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় আব্দুল্লাহ আল- ফয়সাল আমার রুমে এসে হাজির হয়ে প্রাথমিক কুশল বিনিময় শেষে বললেন– ভাইয়া একটি কথা বলার জন্য এসেছি, এ সময় আপনার রুমে কোন লোকজন থাকবেনা মনে করে সরাসরি চলে এলাম।

তার এ বাক্যটি বলার ধরন দেখে আমি একটু থমকে গিয়েছিলাম। এ সময়টিতে ময়দানের আকস্মিকতার কারণে দুর্বল ঈমানের কিছু কিছু ভাইয়ের কারণে-অকারণে ক্যাম্পাসে অনুপস্থিতির বিষয়টি সে সময় মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। ফয়সালের কথা বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল যে, সে এমন কোন কারণ উপস্থাপন করবেন কিনা? কিন্তু তিনি বললেন– ভাইয়া, আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার মিছিলে আরো যা কিছু করা দরকার তার সবকিছুর জন্য প্রস্তুত আছি। এ ময়দানের জন্য যদি আল্লাহ একজনকেও শহীদ হিসাবে কবুল করেন, তাহলে আমি সেই একজন হতে চাই। এজন্য আমার অনুরোধ হলো, ক্যাম্পাসের যে কোন পরিস্থিতিতে একটি মুহূর্তের জন্যও যেন অনুপস্থিত থাকতে না হয়। এ বিষয়টি আপনি খেয়াল রাখবেন। কেননা আপনি জানেন যে, আমার বাসা ক্যাম্পাস হতে একটু দূরে।

উপরোক্ত কথাগুলোর এক একটি শব্দ যখন আমার কানে প্রবেশ করছিল, তখন আমাকে সত্যি একজন অপরাধী মনে হচ্ছিল। তার কথাগুলো শুনার পর এর কোন প্রতিউত্তর দেয়ার মত যোগ্যতার সংকুলান আমার মধ্যে ছিলনা। শুধুমাত্র 'আল্লাহ তোমার সাথে আমাকেও কবুল করুন' এটুকু বলেই চুপ থেকেছিলাম। এ ঘটনাটির মাধ্যমে আমি বুঝতে পেরেছিলাম এ আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের জন্য জনশক্তির কাছে অনেককিছু শেখার আছে। এক একজন কর্মীও হতে পারেন তার দায়িত্বশীলের প্রেরণার বাতিঘর।

## শহীদ ফয়সালের শেষ রমজান ও শেষ দেখা

২০ অক্টোবর ২০০৬ বাসায় যাবার জন্য দাওয়াত দিলেন ফয়সাল। তার আগের বছরও তার বাসায় যাবার কথা ছিলো। কিন্তু আমি তাকে সেই ভাবে না চেনার কারণে



icsbook.info

তেমন গুরুত্ব দেইনি। এ ছাড়াও অন্য একটি প্রোগ্রাম থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সেক্রেটারি সুলতানুর রহমান ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। এ কারণে এবার একটু বেশি সোচ্চার থাকতে হয়েছে তাকে। নিজে অনেকবার ফোন করেই ক্ষান্ত হননি, আমার কাছে এতবেশি ফোন করলে কেমন দেখা যায় এই ভেবে শাহীন আহমেদ ভাইকে সার্বক্ষণিক ফোন করে আমাদের যাওয়া নিশ্চিত করেছিলেন। তার বাড়ি যাবার পর পথের দূরত্ব দেখে অবাক হয়ে ছিলাম যে, তার ক্যাম্পাসে স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতি কখনোই মনে হয়নি তিনি এতদূর থেকে আসেন। বরং আমার কাছে মনে হয়েছিল যে, তিনি আমাদের আশেপাশে কোথাও থাকেন। আমাদেরকে ব্রিজের কাছ থেকে এসে রিসিভ করার দৃশ্যটি জীবন্তই মনে হয়। সেই দিন হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে যেভাবে আপ্যায়ন করেছিলেন, তা দেখে সেদিন না বুঝলেও আজ আর বুঝতে বাকি নাই যে, তিনি তার প্রত্যাশিত মহান আল্লাহর আমন্ত্রণে মেহমান হয়ে শীঘ্রই উপস্থিত হচ্ছেন।

## শহীদ ফয়সালের সাথে শেষ কথা

২৮ অক্টোবর ২০০৬, জোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা। এ উপলক্ষে বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেটে জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশে শৃঙ্খলা বিভাগের জন্য আমাদের ১০০ জন উপস্থিতির কোঠা দেয়া হলো। ঈদের পরে ময়দানে জনশক্তির অনুপস্থিতির কারণে সকল দায়িত্বশীলদেরই মাথায় টেনশন কাজ করছে। প্রোগ্রামের দাওয়াত দেবার জন্য ফয়সালকে জানানোর ইচ্ছা থাকলেও ফয়সালের নিজের হাতে মোবাইল না থাকার কারণে সম্ভব হয়নি। কিন্তু রাত ৯টার দিকে আমার প্রিয় ভাইটি ফোন করে বললেন– ভাইয়া আগামীকালতো উত্তরগেটে প্রোগ্রাম শুনলাম। আমি কি আপনার বাসায় আসব না সরাসরি উত্তরগেটে চলে যাব?

তার দায়িত্বশীল সুলভ আচরণে সত্যিই বিমোহিত হয়ে ছিলাম এবং তাকে সরাসরি উত্তরগেটে চলে যেতে বলেছিলাম। এ বলাই ছিল তার সাথে আমার শেষ কথা।

২৮ তারিখ সকাল ৯টায় উত্তরগেটে গিয়ে জনশক্তি স্বল্পতায় তার উপস্থিতির খোঁজ নিয়েও অনুপস্থিতির কোন কারণ জানতে পারিনি। পরবর্তীতে শুনেছিলাম তিনি উত্তরগেটের উদ্দেশ্যে রওনা হলেও সিদ্ধিরগঞ্জের জামায়াতের প্রোগ্রাম থাকায় স্থানীয় দায়িত্বশীলদের অনুরোধে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। ২৮ তারিখ দিন শেষে রাত গড়াতেনা গড়াতেই শুনতে পেলাম ফয়সাল আহত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে। হাসপাতালে গিয়ে আব্দুল্লাহ আল-ফয়সালের সুন্দর মায়াবী চেহারার পরিবর্তে লগি-বৈঠাধারিদের উপহার হিসাবে একটি বিভৎস চেহারা দেখে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলনা। শুধু বুঝতে পেরেছিলাম যে, আল্লার দ্বীনের অকুতভয় সৈনিক একটি ক্যাম্পাসে শাহাদাতের ইচ্ছা পোষণ করতেন। মহান আল্লাহ তাকে কোন একটি ক্যাম্পাসের পিচঢালা রাস্তায় সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় ক্যাম্পাসের হাইওয়েতে কবুল করেছেন।

৩০ অক্টোবর সিদ্ধিরগঞ্জ কবরস্থানে তার দেহটি যখন রাখছিলাম, তখন আর আমার কাছে তার সেই অভিব্যক্তিটুকু বুঝতে মোটেই বেগপেতে হয়নি। আজ একটি বছর পেরিয়ে আবার সেই রমজান মাস চলে যাচ্ছে। এবার আর ফয়সালের পক্ষ থেকে দাওয়াত পেয়ে নয় বরং নিজেরা দাওয়াত নিয়ে সেই বাড়িটিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবার সেখানে গিয়ে হয়তো সবকিছুই পাবো, কিন্তু প্রিয় ভাই আব্দুল্লাহ আল-ফয়সালকে আর কোন দিন পাবো না। ■

icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর '০৬ আমার প্রেরণার উৎস

মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী চারদলীয় ঐক্য জোটের পাঁচ বছর পুর্তি ও আনুষ্ঠানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে ২৮ অক্টোবর '০৬ সমাবেশের আয়োজন করা হয় বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে। জামায়াত আয়োজন করে এই সমাবেশের। চারদিকে সাজসাজ রব। সারাদেশেও এর ইমেজ সৃষ্টি হয়েছে। দেশবাসীর চোখ ঢাকার বায়তুল মোকাররমের দিকে। এদিকে আওয়ামী লীগ সকল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। সকাল থেকে আমাদের চোখ টিভির পর্দায়। কখন যেন কি হয়ে যায়। এক অবিশ্বাস্য রকম উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে সময় যাচ্ছে। সকাল গড়িয়ে দুপুর ছুঁইছুঁই। আর ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার কল্যাণে টিভি পর্দায় দেখতে থাকি আওয়ামী তাণ্ডবলীলার রোমহর্ষক কাহিনী এবং প্রশাসনের নির্বিকার ভূমিকা।

আমরা যেখানে টিভি দেখতেছিলাম সেখানে বারবার বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সাপের মতো মানুষ পিটিয়ে হত্যার দৃশ্য দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক। কান্নায় চোখ লাল হয়ে গেছে। চোখের পানি মুছতে মুছতে রুমাল ভিজে গেছে। আবার আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই দৃশ্য দেখে সেন্সলেস হয়ে যাচ্ছিল।

যা হোক, এভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকাল। অন্যদিকে বারবার ফোন/মোবাইলে রিং আসছিল। কি হয়েছে ঢাকার রাজপথে। এর কি কোনো প্রতিকার নেই? আমাদের ভাইদের প্রস্তুতি দুর্বল ছিল কেন? আমাদের কয়জন ভাই শাহাদাতবরণ করেছে? কতজন আহত? আহতদের কি অবস্থা ইত্যাদি জানার জন্য বারবার ফোন আসছে। সাথে সাথে বিভিন্ন থানা থেকে ঐক্যজোট ও আওয়ামী লীগ এর প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের খবর আসছে। আসছে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার খবরও। জেলা শাখা থেকে বলে দেওয়া হল আজ কোনো সংঘাত নয় (২৮ অক্টোবর বিকাল), ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত। এমন সময় আমাদের শহরে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার খবর আসলে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে (পুরান থানা) পৌছলাম। দেখলাম বিএনপি ও ছাত্রদল এবং আওয়ামী



icsbook.info

লীগ ও ছাত্রলীগ পরস্পর দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে, পাল্টা পাল্টি মিছিল, স্লোগান ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ হচ্ছে। কেউ কেউ আহত হচ্ছে। আহতদেরকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে। কয়েক প্লাটুন পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ডিসি ও এসপি ঘটনাস্থলে আসে এবং উভয় পক্ষকে শান্ত থাকতে অনুরোধ জানায়।

রাতে জামায়াত ও শিবির যৌথভাবে বসা হলো। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরদিন তিনটায় বড়বাজার মোড়গ মহল থেকে বিক্ষোভ মিছল ও সমাবেশের কর্মসূচি হাতে নেয়া হলো। রাতে মোবাইলে, সকালে সাইকেল, রিকশা, মোটর সাইকেলসহ একযোগে শহরে ও সদরে দাওয়াতী কাজ করা হলো সমাবেশের। এ এক অভূতপূর্ব সাড়া, ভাবতেও পারিনি এতো আবেগ ও যোশ আমাদের কর্মীদের। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো দাওয়াত। তিনটা বাজতে না বাজতেই শত শত লোকের আগমণ। সকল কর্মী, সুধী, শুভাকাঙ্খি ও খোদ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মাঝেও এক অবিশ্বাস্য জাগরণ। সবারই একই কথা এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেওয়া উচিত।

যথারীতি প্রোগ্রাম শুরু হলো। নেতৃবৃন্দের জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মীরা মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উঁচু করে দ্বীপ্ত শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো– এ হত্যার সমুচিত জবাব দিতেই হবে। একে একে সবারই বক্তব্য শেষ দিকে। সর্বশেষ শিবিরের জেলা সভাপতি মাসুদুর রহমানের বক্তব্য এবং জেলা আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা তৈয়বুজ্জামানের বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ হলো সমাবেশ। সবার মাঝে টান টান উত্তেজনা। সবার হাত মুষ্ঠিবদ্ধ। মাইকে ঘোষণা হল সুশৃঙ্খলভাবে মিছিল হবে। নেতৃবৃন্দ সামনে গেলো। শুরু হলো মিছিল। মিছিলে হাজারও লোকের অংশগ্রহণ। সবাই সর্বশক্তি দিয়ে স্লোগান দিচ্ছে 'শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দিবো না, আমার ভাই মরলো কেন? খুনি হাসিনা জবাব দে'। এভাবে মিছিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে শহরেরু সব গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আখড়া বাজার হয়ে ট্রাফিক মোড়ে শেষ হয়। এর মধ্যে অনেকগুলো ঘটনাই ঘটে গেল। অনেকেই হয়ত জানেনা আর কোনো দিন হয়তো জানতোও না, কিন্তু ২৮ অক্টোবরের স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে সে ঘটনাগুলো বারবার মনে উঁকি দিচ্ছে। আজ বলেই ফেললাম। কেননা, যে ২৮ আমার জন্য প্রেরণা তা অনেকের জন্যও প্রেরণার উৎস হতে পারে।

যা প্রেরণার–

* অনেক নিষ্ক্রিয় কর্মীকে মিছিলের অগ্রভাগে সক্রিয় থাকতে দেখেছি।
* দাওয়াতী কাজের তুলনায় অনেক অনেক বেশি উপস্থিতি হতে দেখেছি। (অনেকের ধারণা কয়েক হাজার লোক হয়েছে মিছিলে, যদিও ৭০০ এর উপরে হবে না)।
* আমার বিশ্বাস আল্লাহ স্বয়ং এই মিছিলে ফেরেশতা দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন।
* এক কর্মীর নাম আমি জেনেছি যার পিতা কলেজের অধ্যাপক, মাতা একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সে মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু ভালো ছাত্র। আম্মা-আব্বা তাকে মিছিলে আসতে অনুমতি দিচ্ছিলো না। সে আন্টির বাসার কথা বলে বাসা থেকে বেড়িয়ে মিছিলের সামনে অবস্থান নিয়েছিল। মিছিল শেষে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি মিছিলে'? সে



icsbook.info

উত্তর দিল 'ভাইয়া, কি বলেন! ঢাকার রাজপথে আমাদের ভাইদেরকে এভাবে পিটিয়ে মারলো আর আমি মিছিলেও আসবোনা, একটু দায়তো শোধ করা উচিত।'

* এই মিছিলের পরবর্তী প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শহরে কানাঘুষা শুরু হলো, 'জামায়াত দারুন কাজটাই করেছে। দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে।'
* এই মিছিলের পরে জামায়াত-শিবির অফিসে আওয়ামী লীগ কর্তৃক হামলার আশঙ্কা কেটে যায়।
* মিছিল শেষ হতে না হতেই বিভিন্ন জায়গায় রিং আসতে লাগলো– মিছিল কেমন হয়েছে? মিছিলে কোনো গণ্ডগোল হয়নি তো ইত্যাদি জানার জন্যে সুধী, শুভাকাঙ্খি ও জনশক্তির আব্বা আম্মার দরদমাখা কণ্ঠে ফোন আমাকে অভিভূত করেছে। মনে হয়েছে এক জান্নাতি কাফেলার দায়িত্বশীল হয়ে আজ আমি ধন্য।
* আরেক কর্মীর কথা পরে শুনেছি– তার আম্মা-আব্বা তাকে মিছিলে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করলো। বললো, 'তোদের ভাইদেরকে যে এভাবে মারলো এর একটা জবাব তো দেয়া উচিত? তাহলে আমরা কিসের মুসলমান হলাম।'

মিছিল শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে চারদল ও এর অঙ্গ-সংগঠনের মিছিলের খবর পেলাম। আবারও শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। জেলা প্রশাসক আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মিটিং ডাকলেন। যথারীতি মিটিং শুরু হলো– কিশোরগঞ্জের পরিবেশ কিভাবে শান্ত ও সুন্দর থাকে এ ব্যাপারে আলোচনা হলো। আলোচনার এক পর্যায়ে জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা (শরীফ সাদী, সদর থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি)প্রশ্ন করলো যারা হাতে লাঠি নিয়ে, রিকশা ভর্তি ইটপাথর নিয়ে শহরে প্রকাশ্য মিছিল করলো তাদেরকে দ্বারা কি পরিবেশ শান্ত রাখা সম্ভব? এটা কি সন্ত্রাস নয়? (জামায়াতের মিছিলের ব্যাপারে তার মন্তব্য)। আশ্চর্য হলাম জনৈক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল (যে কোনো দিন জামায়াত করেনি) যারা মিছিলের নামে লগি-বৈঠার প্রদর্শনী করেছে এবং শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছে– শুধু তাই নয়, কেবল যশোদল (সৈয়দ নজরুলের গ্রামের বাড়ি; জন্মস্থান) থেকে পাঁচ হাজার লগি-বৈঠা এসেছে, তা-কি সন্ত্রাস নয়? ইত্যাকার কথার মাধ্যমে মিটিং-এর পরিবেশ অশান্ত হতে থাকলে জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপে পরিবেশ আবার শান্ত হয়। সভা শেষে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামীকাল থেকে সাড়া দেশেই যাই ঘটুক আমরা কিশোরগঞ্জে কোনো অঘটন ঘটতে দিবো না। এই মর্মে সকলেই একমত হয়ে মিটিং শেষ।

পরদিন অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর থেকে কিশোরগঞ্জ আর কোনো অঘটন ঘটে নাই। যদিও সারা দেশে তা অব্যাহত থাকে। এভাবে আস্তে আস্তে শেষ হলো ২৮ অক্টোবর '০৬ এর বিভিষিকাময় দুটি দিন। কিন্তু সেই লগি-বৈঠার তাণ্ডবলীলার কথা যখন হৃদয়পটে ভেসে ওঠে, তখন সেন্সলেস হয়ে যাই। আজও কানে এসে কড়া নাড়ে সেই মুজাহিদ ভাইয়ের হৃদয় ফাটা, আকাশ বাতাস মুখরিত করা আর্তনাদের কথা–

'হে লগি-বৈঠাওয়ালা বাহিনী আমাকে কেন এভাবে মা-র-ছ? আমার কি অপরাধ'? এই সেই ২৮ অক্টোবর '০৬ আমার প্রেরণার উৎস। চেতনার সন্দিপণ। ■



icsbook.info

# শহীদ শিপন ও শহীদ মাসুম

আবুল কালাম আজাদ

২৮ অক্টোবর। সকালে থানা অফিসে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে অনেক নেতা কর্মী উপস্থিত হয়েছেন। তাদের মাঝে আমার দুই প্রিয় ভাই শিপন এবং মাসুমও উপস্থিত। থানা অফিসে আসার পরে রাস্তায়ই শিপনের সাথে দেখা। অত্যান্ত মলিন মুখে শিপন আমাকে প্রথম সালাম দিল। সদা হাস্যোজ্জ্বল শিপনের মুখ মলিন! তা কি মেনে নেয় যায়? তাই জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মন খারাপ কেন? চিন্তিত বদনে শিপনের উত্তর, আজ মিছিলে অনেক উপস্থিতি দরকার। কিন্তু সব কর্মী এখনও উপস্থিত হয়নি। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, সবাইতো আর আসবেনা যারা এসেছে তাদের নিয়েই আসুন। কিছুক্ষণ পরই মাসুম ও শিপন তাদের ওয়ার্ডের কর্মীদের নিয়ে থানা অফিসে উপস্থিত হলেন। থানা সভাপতি সাইফুল্লাহ ভাই উপস্থিত সবাইকে বায়তুল মোকারমের উত্তরগেটে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। শিপন ও মাসুম দু'জনেই আমার সাথে মোসাফাহা করে রওয়ানা দিলেন। সভাপতির নির্দেশে তাদের গন্ত্যবে; চূড়ান্ত গন্তব্যে। আমি কি জানতাম? এই দেখাই আমার প্রিয় দু'ভাইয়ের সাথে শেষ দেখা। শেষ মোসাফাহা, যদি বুঝতে পারতাম তাহলে প্রিয় দু'ভাইকে গভীর আবেগে চুমু খেতাম। শিপন শাহাদাত বরণ করেছে ২৮ অক্টোবর ঘটনাস্থলেই আর মাসুম শাহাদাত বরণ করেছে ১ নভেম্বর রাত ৩:৪৫ মিনিটে।

মহানগরী সভাপতির নির্দেশ শিপন ও মাসুমের জন্য আর্টিকের লিখতে হবে। কিন্তু বার বার টেবিলে বসেও মনকে স্থির করতে পারি নি। যতবারই কলম ধরেছি ততবারই থমকে গেছে কলম। অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে সিক্ত হয়েছে সাদা পৃষ্ঠা। যে হাত দিয়ে আদর করেছি প্রিয় দু'ভাইকে। যে হাত দিয়ে অসংখ্যবার স্বাক্ষর করেছি প্রিয় দুই ভাইয়ের রিপোর্টে যে হাত তুলে দোয়া করেছি শিপন, মাসুমের সাথী শপথের জন্য, সেই হাত দিয়েই লিখতে হবে শিপন-মাসুমের শাহাদদের ঘটনা! এটা বড়ই কষ্টের এবং বেদনার একজন দায়িত্বশীলের জন্য। কিন্তু যে থানায় দুইজন শহীদের রক্ত ঝরেছে সেই থানার একজন কর্মী এবং শহীদের সহযোদ্ধা হিসাবে আমার চোখে অশ্রু বেমানান। তাই মুছে ফেলেছি বেদানাশ্রু। শপথ নিয়েছি নতুন করে। শিপন-মাসুমের স্বপ্ন বাস্তবায়ন



icsbook.info

করবই। বড় শখ ছিল শহীদের কফিন কাঁধে নেয়ার। যারা শহীদের কফিন কাঁধে নেয়ার সুযোগ পেয়েছেন! তাদের দেখলে ঈর্ষা হত। কিন্তু শহীদের কফিন এত ভারী যখন সাথীদের কফিন কাঁধে নিয়েছি, তখন মনে হয়েছে শুধুমাত্র শহীদের কফিন কাঁধে নেইনি, কাঁধে নিয়েছি শহীদের স্বপ্ন, অসমাপ্ত কাজ, শহীদের রক্তের ঋণ।

## শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপন

যখন ২৭নং দক্ষিণ ওয়ার্ডের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন শহীদ শিপন H.S.C প্রথম বর্ষের ছাত্র। শহীদ শিপনের বড় ভাই আমাদের স্কুলের দায়িত্বশীল ছিলেন। সেই সুবাদে পরিচয় অনেক আগ থেকেই শহীদ শিপনের সাথে। যখন প্রথম শিপনের বাসায় যাই তখন শিপনের বিনয়ী ব্যবহার। হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখে বিমোহিত না হয়ে পারিনি। শিপন ভাইকে উপশাখা সেক্রেটারির দায়িত্ব দেয়া হল। দায়িত্ব দেয়ার পর প্রথম Contact এ সাথী হওয়ায় গুরুত্ব বুঝাই। শিপন ভাই ওয়াদা করলেন H.S.C পরীক্ষার পর সাথী হবেন। H.S.C পরীক্ষার পর প্রিয় ভাইটি নিজেই এসে সাক্ষাত করলেন। বললেন ভাই, আমাকে সাথী হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিন। কিভাবে সাথী হতে হয় বুঝিয়ে বললাম। তিনটি শর্ত দিলাম। রির্পোট রাখতে হবে। সাংগাঠনিক কাজ প্রতিদিন তিনঘন্টা করে করতে হবে। উপশাখা শক্তিশালী করার জন্য কমপক্ষে ৮ জন কর্মী বৃদ্ধি করতে হবে। মাত্র ছয়মাসে আমার প্রিয় ভাই সব শর্তই পূর্ণ করলেন। ছয়মাস পর শিপন ভাইয়ের উপশাখাকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে সক্ষম হই। ২০০৪ সালের শেষের দিকে শিপন ভাই উপশাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০০৫ সালে ওয়ার্ডের ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক ছিলেন। ২০০৬ সালে ওয়ার্ডের অর্থ সম্পাদক ছিলেন। শিপন ভাইয়ের চারিত্রের যে দিকটি আমাকে বেশি আকর্ষণ করত তাহলো, মানুষের উপকার করা। তার এলাকার অনেক ছেলেকে তিনি বিনা পয়সায় আরবী পড়িয়েছেন। তার উপশাখার এক গরিব কর্মীকে তিনি বিনা পয়সায় প্রাইভেট পড়াতেন। ব্যস্ততার কারণে ঐ কর্মীকে কয়েক মাস পড়াতে পারেননি বলে ঐ কর্মীকে প্রতি মাসে টাকা দিতেন অন্য স্যারের কাছে পড়ার জন্য। সাংগঠনিক কাজের ব্যাপারে শিপন ছিলেন খুবই সিরিয়াস। তার উপশাখায় সামষ্টিক পাঠ, কর্মী বৈঠক কোন মাসেই বন্ধ থাকেনি। শিপনকে কখনোই রাগ করতে দেখিনি। সদা হাস্যোজ্জ্বল শিপন ছিল সবার কাছেই প্রিয়। তবে ছোটদের মহলে শিপন ছিল ভিষণ জনপ্রিয়। মানুষকে আপ্যায়নের ব্যাপারে শিপন ছিল ভিষণ উদার। ওর বাসায় ভাল কিছু তৈরি করলেই শিপন ফোন করে দাওয়াত দিত। এমনভাবে দাওয়াত দিত যে ওর দাওয়াত উপেক্ষা করার দু:সাহস কখনো করতাম না। বাদ এশা ওর বাসায় যতদিন গিয়েছি ভাত না খেয়ে আসতে পারিনি। ২৮ রমজান ২০০৬ শিপন এক শুভাকাঙ্খির বাসায় ইফতার মাহফিল করেছিল। মাহফিল শেষে শিপন এবং মাসুম দু'জনেই সকল থালা-বাসন নিজ হাতে পরিস্কার করে দিয়েছিল। এমনকি শুভাকাঙ্খির ঘরের মেঝেও পরিস্কার করে দিয়েছিলেন। ঐ শুভাকাঙ্খির মন্তব্য– এমন ছেলে শহীদ হবে না তো কে শহীদ হবে?

শিপন ছিল খুবই সাহসী। এপ্রিল ২০০৬ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলায় যখন আমরা আহত হই, তখন শিপনের প্রশ্ন– এত সাথী সদস্য জগন্নাথে থাকার পরও কিভাবে মারে।



icsbook.info

শিপন বলেছিল– আগামীতে জগন্নাথে কোন সমস্যা হলে আমি অবশ্যই যাব। অথচ শিপন জগন্নাথের ছাত্র ছিলো না। শিপন ছিল খুবই কৌতুক প্রিয়। কথায় কথায় কৌতুক বলে সবাইকে হাসানো ছিল শিপনের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। শিপন ছিল শান্তি প্রিয়। এলাকায় কোন সমস্যা দেখা দিলে শিপন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করতেন। সহীহ কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে শিপন ছিল ভিষণ সচেতন। কারো কোরআন তেলাওয়াতে ভুল হলে ব্যক্তিগত Contact এ শিপন সেই ভুলগুলো ধরিয়ে দিতেন। দায়িত্বশীলদের প্রতি শিপন ছিলেন ভিষণ শ্রদ্ধাশীল এবং অনুগত। শিপনের বাসায় গিয়ে ডাক দেয়ার সাথে সাথে শুধু গামছা গায়ে দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সামনে উপস্থিত হতেন। গামছা গায়ে দিয়ে আসার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শিপন ভাইয়ের জবাব ছিল "দায়িত্বশীল ডাক দেয়ার সাথে সাথে উপস্থিত হতে না পারলে সব আমলই তো বরবদ হয়ে যাবে।" মা ভক্ত শিপন প্রোগ্রাম থেকে বাড়িতে আসতে দেরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ফোন করে মাকে জানিয়ে দিতেন। ছোট বোনকে খুব ভালবাসত শিপন। প্রোগ্রাম শেষে বাসায় আসার পথে কিছু না কিছু নিয়ে আসা ছিল শিপনের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একজন দায়িত্বশীল হিসাবে শিপনের কাছাকাছি যতটুকু যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, তাতে এতটুকু জানতে পেয়েছি যে, শিপন আমাদের আন্দোলনের বাগানে একটি মূল্যবান হীরার নাম। একটি সুবাসিত ফুলের নাম। যে হীরক আলো ছড়িয়ে অন্ধকার বিদূরিত করে কিন্তু নিজে কখনও উজ্জ্বলতা হারায় না। যে ফুল অন্যকে সুবাসিত করার মাঝে সুখ খুঁজে পায়। কিন্তু নিজের সুখের কথা ভাবে না। শিপন আমাদের মাঝে বেঁচে আছে, থাকবে। যতদিন ইসলামী আন্দোলন আছে ততদিন থাকবে আমাদের হৃদয়ে, প্রেরণায়, অনুভূতিতে। জান্নাতে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় শিপন আমাদের সবাইকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ শিপনের শাহাদাতকে কবুল করুন এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন।

## শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম

মাসুমের সাথে পরিচয় ১৯৯৭ সাল থেকে। কিন্তু ওর সাথে ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ পেয়েছি ২০০২ সাল থেকে যখন আমার উপর ২৭ দক্ষিণ ওয়ার্ডের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। শহীদ মাসুম ও শিপন ২৭ নং দক্ষিণ ওয়ার্ডের সেক্রেটারী ও বায়তুলমাল সম্পাদক ছিল শাহাদাতের সময়। মাসুমের পুরো পরিবারটিই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। মাসুমের বড় ভাই শিবিরের সদস্য এবং সবুবজাগ থানার সভাপতি ছিল। মাসুমের মা, নানা, খালা সবাই জামায়াতের রোকন। মাসুমের ছোট খালু শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ। মাসুমের মায়ের মত মা যদি এদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে থাকত তাহলে এদেশে ইসলামী বিপ্লব শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার ছিল। যখন ওয়ার্ড সভাপতি হিসাবে মাসুমের বাড়িতে মাসুমের সাথে Contact করতে যাই তখন বুঝতে পেরেছি মাসুমের মত দুরন্ত আর সাহসী ছেলেকে সাথী বানাতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়তে হবে।

মাসুম ছিল ভিষণ একরোখা এবং এক কথার মানুষ তবে প্রচণ্ড ধৈর্য্যশীল। সবাই যখন ওর সংগঠনিক ভবিষ্যত নিয়ে ছিল হতাশ তখনও আমি মাসুমের ব্যাপারে হতাশ



icsbook.info

হইনি। আমার মনে হত মাসুম যদি শিবিরের সদস্য বানানো যেত, তাহলে সবুজবাগের কাজ অনেক এগিয়ে যেত। তাই আল্লাহর কাছে অনেক দোয়া করতাম যাতে আল্লাহ শিবিরের সাথী ও সদস্য হিসাবে কবুল করেন। দোয়া করার পাশাপাশি চেষ্টা শুরু করি। মাসুমকে ইসলামী সাহিত্য পড়ানো ছিল ভিষণ কষ্টসাধ্য। কারণ ওর যেমন ক্রিকেট খেলার প্রতি প্রচন্ড ঝোঁক তেমনি ওর ছিল অনেক বন্ধু। ক্রিকেট এবং বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে সাহিত্য পড়ানো ছিল সত্যিই কষ্টের। কিন্তু একদিন Contact করে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শহীদদের ঘটনা যখন ওকে বললাম। তখন ওর চেহারার মধ্যে একটা পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখতে পেলাম। তারপর ওকে সাহিত্য পড়ানোর জন্য আমাকে আর কষ্ট করতে হয়নি। সাথী হওয়ার পর ওর মা এবং ওর পরিবারের সবাই ভিষণ খুশি হয়েছিল। ও সাথী হওয়ার ৪/৫ দিন পর খালাম্মা আমার বাসায় এসে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, বাবা আমি তোমাকে চাইনিজ খাওয়াতে চাই। আমি খালাম্মাকে বলেছিলাম, খালাম্মা মাসুম যেদিন সদস্য হবে সেদিন চাইনিজ খাবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু মহান আল্লাহ যাকে জান্নাতের সদস্য হিসাবে কবুল করে রেখেছেন সে কিভাবে শিবিরের সদস্য হবে? এলাকার স্থানীয় ছেলেদেরকে সংগঠনে আনার জন্য ও ছিল ভিষণ পেরেশন। স্থানীয় ছেলেদের সংগঠনে আনার জন্য স্থানীয় ছেলের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে ও আয়োজন করত ক্রিকেট এবং ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের। ওর অনুরোধে অনেক ক্রিকেট ম্যাচে আমাকে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দিতে হয়েছে। ২০০৫ সালের মার্চ মাসে মাসুম আমার কাছে বায়না ধরল ফুটবল কিনে দেয়ার জন্য। ও যুক্তি দেখাল, যদি আমরা সবাই ফজরের পর ফুটবল খেলা শুরু করি তাহলে কিছু কর্মীকে আমাদের সাথে খেলায় নিতে পারলে একদিকে তাদের যেমন মজবুত সম্পর্ক তৈরি হবে অন্যদিকে তাদের নামাজ কাজাও বন্ধ হবে। মাসুমের এই যুক্তিপূর্ণ আবদারের জন্য আমি ফুটবলের ব্যবস্থা করি। মাসুমের ওয়ার্ডের এক উপশাখার সভাপতি "রাজাকে" সাথী বানানোর জন্য মাসুমের চেষ্টার অন্ত ছিল না। শহীদ হওয়ার কয়েকদিন আগে মাসুম আমাকে এসে খুব জোর দিয়ে ধরল যাতে আমি অবশ্যই রাজার সাথে Contact করে তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের গুরুত্ব বুঝাই। মাসুমের ওয়ার্ডের আরেকটি দুর্বল উপশাখা ছিল আদর্শপাড়া উপশাখা। সে উপশাখাকে শক্তিশালী করার জন্য ও দুইবার আমাকে অনেকটা জোর করে সে উপশাখায় নিয়েছে কর্মীদের সাথে Contact করানোর জন্য।

গত রমজান মাসে মাসুম আমার কাছে অনেকবার সময় চেয়েছে যাতে আদর্শপাড়া উপশাখায় একটি ইফতার মাহফিলে উপস্থিত থাকি। কিন্তু সময়ের অভাবে আদর্শপাড়া উপশাখায় আর যাওয়া হয়নি। মাসুমের আম্মা মাসুমকে টাকা দিয়েছিল ঈদে নতুন জুতা কেনার জন্য কিন্তু সেই টাকা দিয়ে মাসুম ইফতার মাহফিল করে। আর ঈদ উদযাপন করে পুরনো জুতা সেলাই করে। অথচ এই কথাটি সে ঈদের আগে তার মাকে বললে তার মা অবশ্যই তাকে নতুন জুতা কিনে দিত কিন্তু সে বলেনি। মাসুম ছিল বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারি। প্রতিটি মিছিলে মাসুমের বলিষ্ঠ কণ্ঠের স্লোগান এবং দৃপ্ত পদক্ষেপ ছিল অন্ত্যন্ত আকর্ষণীয়। গত ২৮ অক্টোবর ভোট বিপ্লব দিবসে পুরো মিছিলে স্লোগানের নেতৃত্ব দিচ্ছিল মাসুম একাই। সেই ২৮ অক্টোবর যেদিন মাসুম আহত হয়েছিল সেদিনও



icsbook.info

মাসুমই দৈনিক বাংলা থেকে মিছিলের স্লোগানের নেতৃত্ব দিয়ে সবুজবাগের মিছিলকে এগিয়ে নিচ্ছিল। মুখে নারায়ে তাকবির– আল্লাহ আকবর ধ্বনি তুলে বাতিলদের সামনে গিয়ে হেঁকেছিল প্রচণ্ড হুংকারে। মাসুমের সেই হুংকারে ভয়ে পিছপা হয়েছিল বাতিলরা। মাসুমের সাথে যারা ছিল এদের পিছনে ফেলে মাসুম অনেক সামনে এগিয়ে গিয়েছিল একেবারে সন্ত্রাসীদের হাতের নাগালে। আর সন্ত্রাসীরা হাতের নাগালে পেয়ে আঘাত করল একবিংশ শতাব্দীর খালেদ বিন ওয়ালীদের মাথায়। আহত অবস্থায় ৪দিন হাসপাতালের বেডে শুয়েছিল আমার প্রিয় ভাই মাসুম। চোখের পানিতে বুক ভিজিয়ে মাসুমের সুস্থতার জন্য দোয়া করেছি আল্লাহর কাছে। কিন্তু আল্লাহ যাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনের মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করবেন সে কি গাজী হয়ে আমাদের মাঝে বেঁচে থাকতে পারে। মাসুমকে হারিয়ে আমাদের দু'চোখে অশ্রুর বান ডেকেছে এ কথা যেমনি সত্যি, ঠিক তেমনি এ কথাও সত্যি সেই চোখে প্রতিশোধের আগুনও জেগেছে। যে আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হবে বাতিলের প্রাসাদ। মাসুমকে হারিয়ে আমরা হৃদয় আঘাত পেয়েছি এটা সত্য কিন্তু সে আঘাত আমাদের হৃদয়কে চৌচির করেনি বরং বজ্র কঠোর করেছে। বজ্র কঠোর হৃদয়ে শপথ নিয়েছি মসুম হত্যার প্রতিশোধ নিবই আগামী দিনে বাংলার এই জমিনে ইসলামী বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে। ■



icsbook.info

# আমার অনুভূতি

মোসাঃ মাহবুবা খাতুন শম্পা

'স্বাধীনতা এক গোলাপ ফুটানো ফুল'

মনে কিছু নিয়েন না। দেশাত্মবোধক গানের লাইন দিয়ে শুরু করলাম। ফুল সকলেই পছন্দ করে। আর সেটা গোলাপ ফুল হলে তো কোনা কথাই নেই। ফুলের সাথে স্বাধীনতাকে তুলনা করা ভুল হবে বলে মনে হয় না।

Liberty, শব্দের বাংলা হচ্ছে 'স্বাধীনতা'। যার অর্থ দাঁড়ায় নিজের ইচ্ছামত কাজ করা বা চলাফেরা করা প্রভৃতি।

আর এ এক লাইন 'কথার' মধ্যে জড়িয়ে আছে অসংখ্য বিষয়। তন্মধ্যে থাকবেনা কোন হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, মারামারি, ঝগড়া-বিবাদ, অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার, থাকবেনা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, রাহাজানি, খুন-খারাবি, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি মন্দ বিষয়।

তন্মধ্যে থাকবে মনখুলে কথা বলার, পথ চলার এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করার মূখ্য অধিকার।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের ধ্বনিতে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। মানুষ ভাবতে থাকে অর্থাৎ আমরা ভাবতে থাকি আমরা আর পরাধীন থাকবো না, আমাদের মুখের ভাষা কেউ আর কেড়ে নিতে পারবেনা, অগনিত মা-বোন আর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হবে না, নির্মমভাবে শিশুকে আর কেউ হত্যা করতে সাহস পাবে না।

"শান্তিপূর্ণ এক নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি হবে"

অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রটি হবে শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র। কিন্তু..... এ কোন স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটছে আমাদের এই ছোট্ট রাষ্ট্র টি-তে! ভাবতে অবাক লাগছে, চোখকে যেন বিশ্বাস করা দায় হয়ে পড়েছে।

২৮ অক্টোবর ২০০৬ ঈদ-উল-ফিতর, এর আনন্দঘন পরিবেশ পার না হতেই আকস্মিক এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। তবে ঢাকার রাজপথের ঐ দৃশ্য সত্যিই হৃদয় বিদারক ঘটনা।



icsbook.info

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মানুষকে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পথ চলতে, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে বাধা দিচ্ছে, স্বাধীন রাষ্ট্রের সুশীতল ছায়ায় বসবাসরত আরেক দল "মনুষ্য পিশাচ"।

তারা বিনা কারণে অন্যায়ভাবে মানুষকে মারতে মারতে লাশ বানাচ্ছে- আর সেই রক্তাক্ত লাশের উপর উল্লাসে মেতে উঠছে। ইস.....। চোখ আর বাধ মানতে পারছে না..এসব দৃশ্য অবোলকন করে। এমন ঘটনা এক নতুন নিষ্ঠুরতার ইতিহাস রচনা করল যা ইতিহাস বিরল।

ছোট্ট একটি অনুভূতি আমার স্মৃতিচারণ হয়ে উঠছে তবে এর ভাবমর্যাদা বিচার করলে অনেক ব্যাপক।

অসহায় শিশুটি বাবার লাশের পাশে বসে বার বার বাবাকে ডাকছে- বাবা উঠ! বাবা উঠ! তুমি উঠছো না কেন?

কিন্তু তার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সবাই ব্যর্থ।

স্বামীহারা নারীটি যেন বার বার স্বামীর শোকে অচেতন হয়ে পড়ছে। 'মা' তিনি তো তার প্রাণের টুকরা 'সন্তানকে' হারিয়ে অধিক শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন। তার বুক ফাঁটা কান্না চোখ দিয়ে কেন যেন ঝরছে না। তিনি হাততুলে প্রভুর কাছে বিড় বিড় করে বলতে থাকেন, "হে প্রভু তোমার দরবারে হাত তুলেছি তুমি ফিরিয়ে দিওনা। আমার প্রাণের টুকরাকে শহীদ করে নাও। জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে চির জান্নাত নসীব করে দাও"।

আমরা স্বাধীনতা লাভ করে এরূপ ফল ভোগ করছি যা নিতান্তই আমাদের দুর্ভাগ্য। এতে প্রশ্ন উঠে আসে স্বাধীনদেশে বসবাস করে, স্বাধীনতা পাওয়া যাবে কিভাবে? সেই কারণে বলতে হবে "স্বাধীন রাষ্ট্রকে আবার আমাদের স্বাধীন করতে হবে"। আর এ জন্য কুরআনের একনিষ্ঠ অনুশাসন অত্যন্ত জরুরী।

এর বিকল্প কিছু অনুভব করতে আমার মন সায় দিচ্ছে না বা দেয় না। ■



icsbook.info

# রক্তিম জোয়ার

মোঃ ওবায়দুল্লাহ

জোয়ার শব্দের শাব্দিক অর্থ হল চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে নদীতে পানিস্ফীতি। পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর মহাসাগরে সমুদ্র স্রোত ও তরঙ্গ ব্যতীত পানি রাশির আরেকটি গতি রয়েছে। এর ফলেই কিছু সময়ের জন্য প্রতিদিন সমুদ্রে পানি ফুলে ওঠে। আর একে জোয়ার নামে অভিহিত করা হয়। চন্দ্রের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার সংঘটিত হয়। তার বিপরীত স্থানে চন্দ্রের আকর্ষণ কম থাকা ও পৃথিবীর আবতর্নের কারণে গৌণ জোয়ার সংঘটিত হয়।

আর পৃথিবীতে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির, উগ্র চরিত্রের লোক থাকার কারণে স্থল 'ভাগে ও' কৃত্রিমভাবে জোয়ার সংঘটিত হয়। যেমন এদেশে চলছে দুর্নীতির জোয়ার। ক্ষমতাসীন রাঘোব বোয়ালরা যে, যেখানে যতটুকু পেয়েছে সে সেখানে ততটুকু আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে। দুর্নীতি থেকে রেহাই পায়নি দুই, একজন খোদাভীরু লোক ছাড়া অধিকাংশ নেতারা। অধিকাংশ নেতাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে দুর্নীতির অভিশাপ। সুতরাং এটাকে বলা যায় দুর্নীতির জোয়ার। এদেশে রয়েছে মিথ্যার জোয়ার। যে কোন বিচারকার্যে যে ব্যক্তি যত বেশি মিথ্যা কথা বলতে পারবে বিচারের রায়ও তার পক্ষে হওয়ার ততবেশী সম্ভাবনা থাকবে।

অন্যান্য জোয়ারের ন্যায় এদেশ আরো রয়েছে রক্তিম জোয়ার। যা সংঘটিত হয়েছিল ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সামনে। সেদিন একদল মনুষ্য পিশাচ লগি-বৈঠা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইসলাম পিপাসু লোদের উপর। এদেশে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের উপর ছিল সেদিনের আক্রমণ। কারণ এদেশে যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে তারা দুর্নীতি করতে পারবেনা। তারা পারবেনা সুদ-ঘুষের কারবার করতে। তারা পারবে না অন্যায়ভাবে অন্যের উপর যুলুম করতে। তাই এদেশ থেকে ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই সেদিন আক্রমণ চালিয়েছিল নিরীহ মুসলিমদের উপর। সেদিন মনুষ্য পিশাচের একটি দল লগি-বৈঠা দিয়ে মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। শুধু হত্যা নয়



icsbook.info

মৃত দেখে নৃত্য করেছিল। তাদের এ অমানবিক আচরণ কোন জাতি গ্রহণ করতে পারেনি। শুধু বাংলাদেশ নয় শুধু মুসলিম দেশ গুলি নয় গোটা বিশ্ব তাদেরকে তীব্রভাবে নিন্দা জানিয়েছে।

আমরা বাঙালি জাতি। আমাদেরকে বলা হয় "মাছে ভাতে বাঙ্গালী" এদেশের ১০০% লোকই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাছের উপর নির্ভরশীল। হাজার হাজার জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করছে। জেলেরা মাছ ধরার জন্য মহাসমুদ্রে যাচ্ছে এবং মাছ ধরার জন্য লগি- নৌকা বৈঠা ব্যবহার করছে মাছ ধরার উপকরণ হিসাবে। যেখানে জেলেরা লগি-বৈঠা ব্যাবহার করছে জীবিকা নির্বাহের উপকরণ হিসাবে সেখানে একদল মনুষ্য পিশাচ লগি-বৈঠাকে ব্যবহার করছে মানুষ মারার উপকরণ হিসাবে। এটা কি নতুন প্রজন্মের চিন্তাকে কলুষিত করেনা?

২৮ অক্টোবর সেই রক্তিম জোয়ার শুধু রাজপথ রক্তে ভাসিয়ে দেয়নি। তারা ক্ষুন্ন করেছে এদেশের মান সম্মান। সে রক্তিম জোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। রক্ষা পায়নি এদেশের আদর্শ সাংবাদিক গণ, যারা সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে চেয়েছিল। সেই রক্তিম জোয়ার অবশেষে কেড়ে নিয়েছিল ৫টি তাজা কচি প্রাণ। তাদের একমাত্র আপরাধ ছিল তারা এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, তারা মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়েছিল।

এদেশের মানুষ সেদিন রক্তিম জোয়ার দেখেছিল। রক্তিম জোয়ারের মুখ তারা আর দেখতে চায় না। যে জোয়ারে শুধু রাজপথে রক্তের স্রোত বয়ে যায়না বরং স্রোতের পাশাপাশি মানুষকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। মৃত দেহে নৃত্য করা হয়। যে রক্তিম জোয়ারে শহীদ হয় আমার ৫ জন ভাই। অথচ তারা ছিল খুবই মেধাবী ছাত্র। তারা এদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন হয়ে ইসলামের অনেক উপকার করতে পারত। কিন্তু তার পূর্বেই তারা ইসলামের জন্য জীবন বিলীন করে দিয়ে তাদের উপর অর্পিত কর্তব্যকে তারা শেষ করে বাকি কর্তব্য বা দায়িত্বকে আমাদের উপর অর্পন করেছেন। আমরা সে সকল শহীদ ভাইয়ের মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করে বিনা হিসাবে বেহেশত নসীব করুন এবং আমাদেরকে স্বত:স্ফূর্তভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন। ■



icsbook.info

# কেমন আছি আমরা ?

তাছলিমা আক্তার সুমাইয়া

পরিচিত জনের সাথে দেখা হলে অথবা ফোন রিসিভের সময় সালাম বিনিময়ের কুশল বিনিময়ান্তে জিজ্ঞাসা করি কেমন আছেন? সাথে সাথে মুখ ফসকে বের হয়ে যায় ভালো আছি। আসলেই কি সত্যিই আমরা ভালো আছি? এ এক অনন্ত জিজ্ঞাসা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এরপরও আবার মুসলমান জাতিকে সেরা জাতি হিসেবে মার্যাদা দিয়েছেন কিন্তু সে সম্মান আর মর্যাদা আমরা কতটুকু বহাল রাখতে পেরেছি?

আজকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত নিষ্পেষিত নীপিড়িত হচ্ছেন মুসলমান জাতি ও মুসলমানরা। যে মুসলীম খলিফারা ধূলার তখতে বসে অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছিল, যে মুসলমানদের গর্জনে শয়তান পন্থীরা কেঁপে উঠত। সে মুসলমান জাতির আজকে এ অবস্থা? তার পরেও আমরা কি বলতে পারি আমরা ভালো আছি?

আমরা যদি আমাদের দেখা ও আন্তজার্তিক বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি তবে আমরা দেখতে পাই– দেশ বলি আর বিদেশ বলি মূলত মুসলীম বিশ্ব আজ অসহায়। কিন্তু এ অসহায়ত্ব একজনের বা একদিনের সৃষ্ট নয় বহু দিনের অবহেলা ও দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিনাম আজকের এ অবস্থা। দৃষ্টান্তের জন্য বাইরের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দেশে অসংখ্য উদাহরণ বিরাজমান।

২৮ অক্টোবর ২০০৬, পুনর্বার আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। এ ঘটনা জাতির ইতিহাসে কলংকময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মূলত এভাবে সাপের মত পিটিয়ে মানুষ হত্যা, লাশের উপর নৃত্য, লাশ চুরি এ ঘটনাগুলো দ্বারা বুঝা যায়– যারা এ কাজগুলো করছে আর করিয়েছে তারা কত বর্বর। যাদের বর্বরতা চেঙ্গিসীয় বর্বরতাকে হার মানায়। আসলে আর্দশের ভিন্নতার কারণে মানুষ এত হিংস্র হতে পারে, তা ময়দানেই সেদিন প্রমাণিত হয়েছিলো।

এরকম একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা, এরকম হিংস্রতা একটা পশু আরেকটা পশুর উপর করতে পারেনা। পাখপাখালির দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় কাকের বাচ্চা না



icsbook.info

হলেও সে কোকিলের বাচ্চাকে মায়ের মমতা দিয়ে গড়ে তোলে কিন্তু সেদিন নব্য হিন্দাদের মনে এতটুকু মায়া জাগেনি এভাবে মায়েদের কলিজার টুকরাগুলোকে হত্যা করতে?

মূলত এ থেকে বুঝা যায় শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের নৈতিকতার কি অবস্থা এ অবস্থায়ও কি আমরা বলতে পারি আমরা ভালো আছি?

২৮ অক্টোবর আমাদের দেশের সম্পদ তরুণ মেধাবীদের যেসব মীরজাফররা হত্যা করেছিলো, পারবে..পারবে কি তারা এরকম একটা দুইটা মেধাবী ছাত্রকে উপহার দিতে, পারবে না। কারণ তারা শুধু নিতে পারে, দিতে পারেনা। মূলত এরা হচ্ছে মেধা হত্যাকারী।

এ ঘটনা ঘটার পর এক বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে অথচ আজ পর্যন্ত এর কোন বিচার হয়নি। মূলত কোন কালেই প্রশাসন ইসলাম পন্থীছিল না। যারা এভাবে মেধাবী ছাত্রদের হত্যা করেছিল তারাই এখন সুশীল সমাজের সদস্য। তারা লোকচক্ষুর সম্মুখে অনায়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা।

মূলত এদের বিচার হচ্ছেনা বিধায় আজ আরো অন্যায় বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৬৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের জন্য ১৩০ জন ছাত্রনেতা শহীদ হয়েছে। যদি এর বিচার না হয় তাহলে দেশ আরো তরুণ মেধাবী সম্পদগুলোকে হারাবে। মূলত অন্যায় কাজ করা শুধু অন্যায় নয় বরং অন্যায়ের প্রতিরোধ না করাও অন্যায়। দুজনই সমান পাপী, আল্লাহ সুবিচারকারী। আমরা এ আশা করি, দুনিয়ার আদালতে এর বিচার না পেলেও আল্লাহর আদালতে সুবিচার পাবে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা চেয়েছিল এদেশ হতে ইসলামের নাম নিশানাকে মুছে ফেলতে, আমরাও শপথ করলাম প্রয়োজনে জীবন দিব তবুও জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও ইসলামের কথা বলে যাব এবং আমাদের শহীদদের স্বপ্ন পূরণ করে যাব। কাজী নজরুলের ভাষায় সবার প্রতি আহ্বান-

"সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের
খোদার রাহে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের"

■



icsbook.info

## ২৮ আক্টোবর '০৬ এর নির্মম পৈশাচিকতা ও

# একজন মুক্তিযোদ্ধার অনুভূতি

মো: ইব্রাহিম খলিল

২৮ আক্টোবর ২০০৬। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার টিভি খবর দেখার জন্য একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। যথারীতি সংবাদ শুরু হলো। সংবাদের এক পর্যায়ে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় আওয়ামী বর্বর গুণ্ডাদের হামলা ও জামায়াত শিবির কর্মীদের প্রকাশ্য দিবালোকে লগী বৈঠা দ্বারা পিটিয়ে হত্যার পৈশাচিকতার কিছু দৃশ্য দেখলাম। টেলিভিশনের সামনে বসে থাকা কিছু দর্শক এ পৈশাচিক দৃশ্য দেখে হা হুতাশ ও ঐ মানবরূপী জানোয়াদের ধিক্কার দিতে লাগলো। অবশ্য কিছু সংখ্যক তাদেরই দোসর নরপশু উল্লাসে ফেটে পড়লো। আমি চিৎকার দিয়ে শুধু একটি কথা বলে স্থান ত্যাগ করলাম "আল্লাহ এই বর্বর পশুদের উপর গজব নাজিল কর।" এ স্থান থেকে আধা কিলোমিটার দূরত্বে আমার বাসা। নিদারুন এক অস্থিরতা নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। এশার নামাজান্তে প্রাণভরে আল্লাহপাকের দরবারে এই নরপশু হায়েনাদের বিচারের জন্য প্রার্থনা করলাম। রাতে ভালো ঘুম হলোনা শুধু ঐ চিন্তায়। ইসলামের ইতিহাসের অনেক কাহিনী স্মরণ করতে লাগলাম। মনে পড়ে গেল কারবালায় ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের বিয়োগান্তক কাহিনী। ইমাম হুসাইন (রা:) শাহাদাতের পর কুখ্যাত এজিদের প্রধান সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ বি, যিয়াদের নির্দেশে কতিপয় ঘোড় সওয়ার ইমাম হুসাইনের মৃত দেহের উপর দিয়ে কয়েকবার ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছিল। সারা দুনিয়ার মানুষ মাতম করেছিল হায় হোসেন, হায় হোসেন। এ নরাধমদের যেমন বেহেশতের বালকদের সর্দারের, প্রিয় নবীজির প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রের পবিত্র দেহের উপর ঘোড়া ছুটিয়ে দলিত মথিত করণে হৃদয় কাঁপে নাই ঠিক তেমনিভাবে লগি বৈঠাধারী এই মানুষরূপী জানোয়ারদের হৃদয় কাঁপে নাই নিরপরাধ যুবকদের ঠাণ্ডা মাথায় প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে মৃত দেহের উপর উল্লাস করতে। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার পর অনুরূপ একটি বিয়োগান্তক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো ৮৫ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশের রাজধানীর জাতীয় মসজিদের পাশেই। বাংলাদেশসহ বিশ্বের যে সকল স্থান থেকে টি.ভি চ্যানেলের মাধ্যমে এই ঘটনা যারা প্রত্যক্ষ করেছেন



icsbook.info

নি:সন্দেহে তাদের মধ্যে আরেকটি কারবালার মাতম শুরু হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধকালীন সময়ের অনেক ঘটনা আমি দেখেছি। কিন্তু ২৮ তারিখের নির্মম পৈশাচিকতা আমি দেখিনাই কোথাও। পূর্ব ঘোষিত একটি শান্তিপূর্ণ জনসভায় হামলা চালিয়ে নিরীহ নিরপরাধ সম্ভাবনাময় যুবকদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এর উদাহরণ বিরল। মানবরূপী একজন ডাইনির নির্দেশে তার পোষা জানায়োরগুলির এ অপকর্মের শাস্তি দুনিয়ায় হবে আর শেষ বিচারের দিনে মর্মন্তুদ শাস্তিও তাদের জন্য অবধারিত থাকবে- মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমীনের কাছে এ দোয়াই করছি। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে প্রার্থনা করছি- আল্লাহপাক আমার ভাই জসিমউদ্দিন, মুজাহিদ এবং শিপনসহ সকলকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং শহীদদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন আর এ মহান শহীদদের রক্তে যে যমীন সিক্ত হয়েছে সে যমীনকে আল্লাহ পাক ইসলামের জন্য কবুল করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!

---

*লেখক : আহবায়ক- ন.জু.মি. মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ড, নওয়াপাড়া, যশোর*



icsbook.info

# স্কুল শিক্ষকের চোখে মুজাহিদ

মুজাহিদ ছিল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোর ঝিলিক। মিষ্টিভাষী, সদালাপী, অমিত ব্যবহার ও সচ্চরিত্রের অধিকারী। মুজাহিদ ছিল ছোট বড় সবার জন্য একটি অনুকরণীয় আদর্শ। মুজাহিদ ছিল আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ও প্রিয় ছাত্র। তার আচরণই আমাকে এবং আমার সহকর্মী সকল শিক্ষক শিক্ষিকাকে মুগ্ধ করেছে, স্নেহশীল করেছে। আমরা আরো মুগ্ধ হয়েছি এই অল্প বয়সে তার মধ্যে খোদাপ্রীতি ও ধর্মীয় অনুরাগ দেখে। আল্লাহ পৃথিবীতে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিশেষ একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আমরা হয়তো বুঝতে পারিনি কিন্তু মুজাহিদ ঠিকই সেই উদ্দেশ্যকে বুঝতে পেরেছিল। আর তাই সে নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক হায়েনারূপী মানুষ তাকে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দিল না। তাকে নির্মম ভাবে পিটিয়ে হত্যা করল। ধিক! শত ধিক! ঐ সব হায়েনার দলকে। আল্লাহ নিশ্চয় ওদের বিচার করবেন। আমরা শিক্ষক সমাজ তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। দোয়া করি আমাদের প্রাণপ্রিয় ছাত্র মুজাহিদ জন্নাতবাসী হোক।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
সিনিয়র শিক্ষক, হযরত শাহআলী মডেল হাইস্কুল

# শহীদের প্রতিবেশীর চোখে মুজাহিদ

মুজাহিদ আমাদের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী। মুজাহিদ ছিল ভদ্র, বিনয়ী, নম্র, ধর্মপরায়ণ এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। সে নিয়মিত নামাজ পড়ত এবং অর্থসহ কোরআন মজিদ পাঠ করত। কোনদিন কারও সাথে কথা কাটাকাটি হতে দেখিনি। দেখা হলেই সালাম বিনিময় করে কুশল জিজ্ঞাসা করত। মহল্লা এবং পরিচিত সবার হৃদয়ে সে একটা আসন করে নিয়েছিল। তার অকাল শাহাদাত আমাদের মহল্লা এবং পরিচিত এমন কেউ নেই যে চোখের পানি না ফেলেছে। মুজাহিদের নাম আমাদের হৃদয়ের মিনারে চিরদিন লেখা থাকবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এমন নৃশংস ঘটনা যেন বাংলাদেশের মাটিতে আর না ঘটে।

ওমর ফারুক মোল্লা
তৃতীয় কলোনী, মিরপুর, ঢাকা।



icsbook.info

# সহপাঠীর চোখে মুজাহিদ

পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য শব্দের সাথে আমার পরিচয় ২৮ অক্টোবরের "রাজনীতি"। রাজনীতি এত জঘন্য আমার জানা ছিলনা। রাজনীতি মানুষের কত বড় সম্পদ কেড়ে নেয় বা নিতে পারে তা আমার জানা হয় ২৮ অক্টোবর। কি দিয়েছে আমাদের? কি পেয়েছি আমরা? শুধুই খোয়ানো। জীবনের মাঝ পথে আসতে না আসতেই এক হীরার মত বন্ধু হারানো। আর মুজাহিদ সেতো ....। ও আমাকে দিয়েছে অনেক হাসি, ওকে কিছু দিতে পারলাম না বা সুযোগ দিলনা। কেন? এত জলদি কেন? আর কিছুদিন কি একসাথে থাকা যেত না? আমি জানিনা ও আমার কাছে কত কিছু পায়। ও কি আমাকে মাফ করবে? আমি এখনও মানতে পারছিনা। হয়তো কোনদিন মানতে পারবোও না। আমি ভাবতে পারি না এখন ওকে নিয়ে শুধু স্মৃতিচারণ করতে হবে, পূর্বে যা ঘটেছে তাই সারাজীবন ভাবতে হবে। বন্ধু হয়ে এ যে কত বড় যন্ত্রণা.....। আমি আর কাউকে হারাতে চাইনা। আমরা আর কারও অতীত নিয়ে সারাজীবন ভাবতে চাই না। আমি ও আমরা সবাই একসাথে থাকতে চাই। আপনারা কি আমাদের একসাথে থাকতে দেবেন না? আস্সালামু আলাইকুম। মুজাহিদ তুমি জান্নাতি হও।

মুঃ হাবীবুর রহমান (শিপলু)
সহপাঠী

# স্কুল ম্যানেজিং কমিটির চোখে মুজাহিদ

যারা একটি আদর্শের আলোকে নিজেদের জীবন গঠন করে তারা নিঃসন্দেহে মহৎ। আর মুজাহিদ ছিল সেই আদর্শের একজন নির্ভীক সৈনিক। যা মুজাহিদ ২৮ অক্টোবরের শাহাদাত এর মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রমাণ করে গেল। আমি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতি হওয়ার কারণে আমার কাছে মুজাহিদ মাঝে মাঝেই আসতো। আমি তাঁর আচরণে মুগ্ধ ছিলাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর শাহাদাৎ কবুল করুন। (আমীন)।

হাজী আঃ মান্নান
সহ-সভাপতি, হযরত শাহ আলী মডেল হাই স্কুল



icsbook.info

# জান্নাতী পাখি হয়ে উড়ে এসো একবার

আল আমীন বিন আমির

কোনো অপরাধের কারণে শহীদ হতে হলো আমার ভাইদের? কি ছিল তাদের অপরাধ? কেউ কি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে? তাদের অপরাধ তো এটাই- তারা সত্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মিথ্যার মূলচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। স্মৃতির কড়িডোরে যখন তাদের স্মৃতি উঁকি দেয়, যখন রক্ত মাখা সাদা কাফনের কাপড়ে জড়ানো সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো আলোক উজ্জ্বল চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে তখন বেদনা-বিধুর হৃদয় ডুকরিয়ে কেঁদে ওঠে। অশ্রু সজল নয়ন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আকাশের দিকে তাকিয়ে জানতে চায় হে আল্লাহ কেন আমার ভাইদেরকে খুন করা হলো তাদের তো কোনো অপরাধ ছিল না। একমাত্র তোমার দ্বীন তোমার এই জমিনে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের জীবনে লক্ষ্য উদ্দেশ্য। তাদের সেই প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করে তাদের খুনের প্রতিশোধ নেওয়ার তাওফিক দাও। শহীদ ভাইদের শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে দাখিল কর।

মাসুম ভাই, শিপন ভাই শাহাদাতবরণ করেছে, এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, একথা বিশ্বাস করতে অনেক কষ্ট অনুভব হয়। মনে হয় তারা দুনিয়া ছেড়ে যায়নি। এইতো কিছুক্ষণ পূর্বে এক সাথে প্রোগ্রাম, মিছিল করে আসলাম। এইতো মিছিলের অগ্রভাগে মাসুম ভাই তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে মাথাকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে অগ্রসর হচ্ছে। এসব কল্পনাকে যখন বাস্তবতার চাদর এসে ঢেকে দেয়, তখন হাউমাউ ধ্বনিতে হৃদয়ে চাপা বেদনার বহি:প্রকাশ ঘটে। হৃদয় তখন বলে উঠে-হে বন্ধুদ্বয়? তোমরা তো সত্যিই চলে গেছ। জান্নাতী পাখা মেলে উড়ে এসে একবার আমাদের সাথে দেখা কর। তোমাদের সাথীরা রক্ত মাখা মুখ স্মরে তোমাদের পথপানে তাকিয়ে আছে।



icsbook.info

আমি যখন সাথী শপথ গ্রহণ করি বাবুল ভাই নামে একজন সাথী ইন্তেকাল করেন। আমি বাবুল ভাইকে ততোটা চিনতাম না এবং শিপন ভাইকে চিনলেও নামটা জানা ছিল না। না চেনার কারণে আমি ধারণা করি শিপন ভাই ইন্তেকাল করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকদিন পর এক সাথী সমাবেশে দেখি শিপন ভাই উপস্থিত। শিপন ভাই এর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে শিপন ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কিছু বলবেন- আমি বললাম, আমি আপনাকে বাবুল ভাই মনে করেছিলাম। শিপন ভাই বলেছিলেন আল আমিন ভাই আমি মরি নাই। এখনো ঐ কথা আমার হৃদয়ে তুফান তোলে। সত্যি তোমরা মরনি। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত বল না, বরং জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (আল বাকারা- ১৫৪)।

সুরা আল ইমরানের ১৬৯ আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'যারা আল্লাহ পথে মৃত তাদের মৃত মনে করো না। প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক পাচ্ছে'। কোন নেশায় মাসুম, শিপন তাদের জীবন সর্বোস্ব বিলিয়ে দিল, কেন আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হয়েও সম্মুখ পানে এগিয়ে গিয়েছিল? এসব জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে ইতিহাস থেকে মনে পরে। পল্টন প্রান্তরে (আওয়ামী নরপিশাচদের প্রান্তরে) শিপন, মাসুম ও মুজাহিদসহ সকল শহীদ ভাইয়েরা জান্নাতের সুঘ্রাণ পেয়েছিল তাই জান্নাত লাভের ঐ চরম মুহূর্তে দুনিয়ার সকল কিছু ভুলে হাজারো লগি বৈঠা এবং আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত হাস্য সহ্য করে সম্মুখে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

সর্বোপরি পরম করুণাময়ের প্রতি আবেদন। তিমির রাতের অবসানে শিশির স্নাত পদ্মের মতো উৎফুল্ল নয়নে তোমার পানে আমাদেরকে বিকশিত করো। বাতিলের বাধার সাত সমুদ্র পারি দিয়ে, সৈকতে উপনীত হয়ে তোমার দ্বীনের নিশান গগণপানে তুলে ধরার শক্তি, সাহস, ধৈর্য্য আমাদেরকে দান কর। শহীদ ভাইদের শাহাদতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান কর। তাদের রেখে যাওয়া কাজে আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দাও। শহীদ ভাইদের খুনিদের বিচার এই ভূমিতে দেখাও। সকল পরিস্থিতিতে তোমার দ্বীনের পথে চলার তাওফিক দাও। ■



icsbook.info

icsbook.info

icsbook.info

# হৃদয় বিদারক স্মৃতি

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

দিনটি ছিল রমজানের ঈদের ঠিক তিন দিন পরে রোজ শনিবার ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সাল। ঈদের আনন্দ উৎসবের রেশ তখনও বিদ্যমান। দেশে যে গণতান্ত্রিক, সুন্দর ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় ঈদের ৩ দিন পরই সফলভাবে ৫ বছর দেশ পরিচালনা করে জোট সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কেয়ারটেকার সরকারের কাছে। শান্তিপ্রিয় মানুষ যখন এ ঐতিহাসিক মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে, সে সময়ই এক অজানা আশঙ্কা ভর করছে সবার মনে। কোলাহলমুক্ত ঢাকা শহরে এক অদ্ভুত মর্মে নীরবতা, গ্রাম-গঞ্জে আটকে পড়া শহরমুখী মানুষ এক অবর্ণনীয় দুশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে টিভি এবং রেডিওর সামনে– সকলের মনে একই প্রশ্ন দেশের অবস্থা কি হচ্ছে? রেওয়াজ অনুযায়ী ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বিদায়ী ভাষণ দিলেন। ঠিক তার পর পরই পরিকল্পিতভাবে সারাদেশে সৃষ্টি করা হল এক চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। এ যেন সেই পুরনো দৃশ্য ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও, লুটপাট ও সড়ক অবরোধ। পরদিন ২৮ অক্টোবর, সব জায়গায় মর্মে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। টিভি চ্যানেলে যখনই কোন সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কী পরিস্থিতি তা জানার জন্য। বিকেল এবং সন্ধ্যায় প্রায় সব কটি টিভি চ্যানেলে যখন সচিত্র সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছিল পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের চোখ তখন স্থির।

ঢাকার পল্টন মোড়ে একি রোমহর্ষক, হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখছে তারা? লগি, বৈঠা, কিরিচ, লাঠি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একদল উন্মত্ত মানুষ কিভাবে নির্বিচারে অত্যাচার চালাচ্ছে আরেকদল মানুষের ওপর। কিভাবে পিটিয়ে খুঁচিয়ে আঘাতের পর আঘাতে জীবন্ত যুবকদের হত্যা করছে, হত্যার পর মৃত লাশের উপর দাঁড়িয়ে উল্লাস নৃত্য করছে। পুলিশের সামনেই মুহুর্মুহু গুলি ও বোমা ফাটিয়ে শত শত বনি আদমকে আহত করছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাজপথ। উহ্! এ দৃশ্য দেখে মূর্ছা গেছেন অনেক মা-বোন, কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মানবিক চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ। গণতান্ত্রিক সভ্যতার যুগে এ কেমন ভয়ঙ্কর রূপ।



icsbook.info

পূর্বদিক থেকে এ দিনটির সকালের আলো অন্যান্য দিনের আলোর তুলনায় মনে হল যেন বেশি উজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। দিনের সূর্য যতই বেড়ে চলল তার সাথে তাল মিলিয়ে এ দেশের ইতিহাসে একটি কালো দিনের সংযোগ ঘটানোর জন্য একটি রাজনৈতিক দল তার হায়েনার তান্ডব নিয়ে সারাটা দেশের সুন্দর উদিয়মান আলোকিত দিনটিকে লগি-বৈঠার আঘাত ও জায়গায় জায়গায় আগুন দিয়ে সারাটা দেশ যেন অন্ধকারময় করে তুলল।

তখন ঈদের ছুটি চলার কারণে রাজধানীসহ দেশের প্রতিটি শহরের জনপদ ছিল কোলাহলমুক্ত। মানুষ তখনও ঈদের আমেজ কাটতে পারেনি। ঠিক তেমনি মুহূর্তে আওয়ামী নামক একটি দলের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলার ইতিহাসে কিছু ফ্যাসিবাদী ও বাম দল মিলে তাদের টাকায় হায়ার করা সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে রাজধানীর রাস্তাগুলোতে হায়েনার মতন মেতে উঠল। তাদের অবস্থা দেখে মনে হলো যেন তারা এ দিপ্ত শপথ নিয়েছে যে, কে কত শান্তিপ্রিয় জীবের রক্ত বের করে নিতে পারে আর কে কত এ গরীব দেশের সম্পদ ধ্বংস করতে পারে তার প্রতিযোগিতা করছে।

আওয়ামীসহ তথাকথিত ১৪ দল মিলে গাড়ি ও দোকানপাট ভাঙচুরসহ রাস্তার সাধারণ লোকদের উপর অতর্কিত হামলা চালাচ্ছে। ওখান থেকে গাড়ি না পেয়ে পায়ে হেঁটে পল্টনের দিকে যেতে লাগলাম।

পল্টন গিয়ে সেখানের অবস্থা দেখে মনে হলো যেন ইতিহাসে যে চেঙ্গীস বাহিনীর কথা পড়েছি তার চেয়েও যেন ভয়াবহ অবস্থা হাসিনার লগি-বৈঠা বাহিনী ঘটাতে যাচ্ছে। তাদের ভাড়া করা সন্ত্রাসী বাহিনী আমাদের নিরস্ত্র ও লাঠি সোটা বিহীন লোকদের উপর প্রত্যেকটি গলি থেকে অতর্কিত হামলা চালাচ্ছে। তাদের হামলা দেখে মনে হচ্ছে যেন এদেশে তাদের সমর্থিত লোক ভিন্ন অন্য কোন দলের লোক বসবাস করার অধিকার রাখে না। তারা দফায় দফায় আমাদের উপর হামলা চালিয়ে আমাদের প্রোগ্রামস্থলসহ কেন্দ্রীয় অফিস দখল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে ছিল। কিন্তু আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমাদের মজবুত অবস্থানের কারণে তাদের কোন সন্ত্রাসী বাহিনী আমাদেরকে ভেদ করে তাদের অবাস্থার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি।

যার ফলে আওয়ামী নরপিচাশদের হামলায় শান্তিপ্রিয় আমাদের অসংখ্য ভাইয়ের শরীর থেকে অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগল। দেখতে দেখতে আমাদের কয়েকজন ভাই তাদের গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু তার পরেও আমাদের কেহই পিছনের দিকে ফিরে আসতে রাজি হল না। শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী বাহিনী আমাদের কয়েকজন ভাইকে ওদের মধ্যে ধরে নিয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় তাদের উপর লগি-বৈঠা দ্বারা আঘাতের পর আঘাত করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে সেই লাশের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে উল্লাস করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। আমার বাক শক্তি হারিয়ে ফেললাম। অনেক্ষণ পরে আমি স্বাভাবিক হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলাম হায় আল্লাহ তুমি আমাকে এ কি দৃশ্য দেখালে। তোমার সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও তারা এতো বড় জঘন্য কাজ করতে পারে। তুমি এর বিচার কর। দেখলাম তারা আমাদের কয়েক জন ভাইকে হত্যা করে ও অসংখ্য



icsbook.info

মানুষের রক্ত জড়িয়ে রাজপথে রক্তের শ্রোতের বন্যা বয়ে দেয়ার পরও ওরা ওদের হায়েনার মত হামলা একের পর এক চালিয়েই যাচ্ছে। একের পর এক বোমা ফাটাচ্ছে, আগুন জ্বালিয়ে গরিব হকারদের সামান্য মাথা গোজার সামান্য চৌকিগুলোও পুড়িয়ে দিল। শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী বাহিনী সকাল থেকে তাদের হামলা শুরু করলেও তারা সর্বশেষ বিকেল চারটায় যখন আমীরে জামাত বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালো, তখনও তারা পাশের একটি ভবন থেকে একের পর এক বোমা নিক্ষেপ করতে লাগল এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা চালালো। কিন্তু তারা এতো হামলার পরও আমাদের দৃঢ় অবস্থান দেখে আর সামনে আগাতে সাহস পেল না। আমীরে জামাতের শান্তিপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের প্রোগ্রামের সমাপ্তি টানা হল। কিন্তু আমীরে জামাত কোন প্রকার উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিলেন না। অথচ আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সারাটি দিনের হামলার ফলে আমাদের কয়েকজন শান্তিপ্রিয় ভাইয়ের অকালে জীবন দিয়ে শাহাদাত বরণ করতে হলো এবং অসংখ্য নিরাপরাধ লোককে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হলো।

এ ঘটনা যত লোক টিভি ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেখেছে। দল মত নির্বিশেষে সকলেই বলেছে যে, এতো সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি দলের প্রোগ্রামের উপর আওয়ামী লীগ কিভাবে হামলা চালাতে পারল। এরা আবার কেমন গণতন্ত্রের দাবিদার। এরা মানুষের কেমন প্রতিনিধির দাবিদার। যারা নির্দেশ দিয়ে প্রকাশ্যে রাজপথে পিটিয়ে খুঁচিয়ে মানুষ হত্যা করে। তারা কোন দিন মানুষের কোন উপকারে আসতে পারে না। টিভি সেটের মাধ্যমে বড় পর্দায় এ দৃশ্য গ্রামের লোকজনকে দেখানোর পরে যারা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছিল তাদেরও বলতে শুনলাম, আমরা এতো বড় একজন জঘন্য নরপিশাচ নেত্রীর পক্ষে কথা বলতাম যা আমরা আর কোন দিন চিন্তাও করতে পারিনি। কারণ আমরা জানতাম যে আমাদের নেত্রী একজন জনদরদি নেত্রী। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে আমাদের মনে হলো যেন আমাদের নেত্রী চেঙ্গিস ও হিটলারের চেয়েও একজন জঘন্য দানব যে মা জাতি হয়েও এ রকমের রাস্তায় মায়েদের সন্তানদের হত্যা করার নির্দেশ দেয়।

বর্তমানে জন সমাজে এ কথা সর্বত্র শুনা যায় যে দেশেরবর্তমান পরিস্থিতির জন্য হাসিনার ক্ষমতার লোভ ও একগুয়েমী রাজনীতিই দায়ী। কারণ তার একটি জ্ঞানহীন বক্তৃতার ফলে দেশের অনেক লোকের জীবন ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং গরীব দেশের অনেক সম্পদের ক্ষতি করা হয়েছে। সর্বপরি জনগণের প্রত্যাখ্যাত দলটির নির্বাচন বর্জনের কারণে রাষ্ট্রপতি এদেশে সেনা সমর্থিত সরকার আনতে বাধ্য হয়েছেন।

আমার মতে তারা তাদের এই লাশের ও জোর জুলুমের রাজনীতির ফল তাদের শরীরের প্রতিটি শিরায় শিরায় উপলব্ধি করছে। কারণ তাদের সাথে আজ আর কোন লোক নেই যে তাদের লগি-বৈঠার সমর্থন নিয়ে তারা এ দেশে আবার কোন দ্বিতীয় ২৮ অক্টোবরের জন্ম দিতে পারে। ■



icsbook.info

# স্মৃতির ফ্রেমে বাঁধা

মো: নাসির উদ্দীন

"তুমি আছ হৃদয়ের গভীরে, ভুলবো তোমায় বল কি করে?"

হাসি মাখা মুখ আর নজর কাড়া সৌন্দর্যের অধিকারী এই ছেলেটির সাথে আমার প্রথম পরিচয় এভাবে- তোমার নাম? উত্তর– মুজাহিদ। বল্লাম ভারী সুন্দর নাম কোথায় কিসে পড়? জবাব : ইম্পেরিয়াল কলেজে এইচএসসি। আমার পরিচয় দেবার পালা, আমার পরিচয় দিতে গেলে হাসিমুখে বলল– আপনাকে আগে থেকেই চিনি কিন্তু কোথায় পড়েন তা জানিনা। আমি সাথে সাথেই বললাম– তোমার কলেজের বিপরীত দিকে ঢাকা কলেজে মাস্টার্স পড়ছি। আন্দোলনের সূত্রে পরিচিত হই। পরবর্তীতে সময়ের আবর্তনে আমরা একে অপরের সাথে আন্তরিকভাবে মিশেছি।

ব্যক্তিগত পড়ালেখা ও সাংগঠনিক কিছু পরামর্শ দিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। পরবর্তীতে মুজাহিদকে নিয়ে অনেক ভেবেছি এ কথা ঠিক, কিন্তু সে সবার প্রিয় এতো আলোচিত হবে, শিশির বিন্দুর মত তার জীবন স্থায়ী হবে এবং আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাবে তা কখনো চিন্তা করিনি।

সত্যিকার অর্থে যিনি শহীদ হবেন তার মধ্যে শাহাদাতের পূর্বেই বিভিন্ন লক্ষণ ফুটে ওঠে। আমার একান্ত প্রিয় শহীদ মুজাহিদের মাঝেও তা লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন সময় তাকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে ও অন্যমনস্ক হতে দেখেছি। শহীদের জীবনী ও শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চেয়েছে এবং শাহাদাতের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে। শাহাদাতের পূর্বের দিন তার প্রিয় সঙ্গী-সাথীদের কাছে অকপটে স্বীকার করেছে তার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নের কথা। তার মনোবাসনা পূরণের দোয়া চেয়েছে আর বলেছে, "আমি যদি শহীদ হই, খুব ভাল হবে" শহীদ মুজাহিদ শহীদি গান খুব পছন্দ করতো। তাইতো শাহাদাতের আগের রাতেও নিবিষ্ট মনে শহীদি গান শুনেছে। আর শাহাদাতের মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে যখন বাসে চড়ে পল্টন যাচ্ছিল তখন পাশের সিটেই ঘুমিয়ে পড়ে প্রেস ক্লাবের কাছে আসলে তার সব সময়ের সাথী ইয়াসিন, জীবনসহ অন্যরা তাকে জাগালে



icsbook.info

বলেছে "তোমরা আমাকে ডাকলে কেন? আমি সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখছিলাম।" আমরা মনে করি শহীদ মুজাহিদ মূলত জান্নাতেরই স্বপ্নে বিভোর ছিল, যার বাস্তবায়ন ঘটেছে একটু পরেই।

শহীদি মৃত্যু সকল মুমিনই কামনা করে কিন্তু সকলেরই এ তামান্না পূরণ হয়না। ক্ষুদ্র সাংগঠনিক জীবনের এই ১৬/১৭ বছরে অনেক ভাইয়ের সাথে মিশেছি, কথা হয়েছে, ব্যক্তিগত সাক্ষাতে অসংখ্য ভাইয়ের শহীদি মৃত্যু কামনা করতে শুনেছি কিন্তু কতজনের এই প্রত্যাশায় প্রাপ্তি ঘটেছে, হাতে গোনা দু'এক জন এই মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছেন। আমি জানি সবার এ আকাঙ্খা পূরণ হবার নয়। তারপরও আজ বার বার আমার মনে হচ্ছে শহীদ মুজাহিদের পরিবর্তে যদি আমি শহীদ হতে পারতাম তা হলে কতইনা আনন্দের হত; আমার জিন্দেগী সফলতায় পূর্ণ হয়ে উঠতো।

শহীদ মুজাহিদ স্বল্প সময়েই সবাইকে আপন করে নিতে পারতো, মহানগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড হচ্ছে ১০নং ওয়ার্ড। যেখানে মুজাহিদের শৈশব ও কৈশোর জীবন কাটিয়ে যৌবনে পদার্পন করেছে। এই ওয়ার্ডের সাংগঠনিক অবস্থান সবসময়ই মজবুত ছিল, আমরা যখনই এই ওয়ার্ডে সফরে গিয়েছি তখনই লক্ষ্য করেছি, শহীদ মুজাহিদ অন্যদের থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির, সবার সাথে বিশেষ করে সমবয়সীদের সাথে তার সখ্যতা একটু বেশিই। ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের সাথে তার আচার ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে মনে হত এক্‌দেহ একপ্রাণ, কুরআনের ভাষায় "বুন ইয়ানুম মারসুস" এর মত। কখন কারও সাথে কোন মনোমালিন্য হয়েছে এমন একটা দৃষ্টান্ত কেউ দিতে পারবে না। সাহসিকতা, বিনয়, ধৈর্য্যশীলতা এবং আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে শহীদ মুজাহিদকে কখনও পিছপা হতে দেখিনি। তার এই বিনয়ীভাব ও নম্র আচরণ আমাদের সবাইকে মোহিত করেছিল। আমি যতটুকু জানি তার মহল্লাবাসীরা তার বিনয়ী আচরণে মুগ্ধ ছিলেন। ধৈর্যশীলতার মহৎগুণটি বিদ্যমান ছিল শহীদ মুজাহিদের মধ্যে, সকল প্রকার বাঁধা বিপত্তি, বিপদ-মুসিবতেও সে ধৈর্য্যহারা হতো না। মু'মীন জীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আনুগত্যপূর্ণ জীবন। শহীদ মুজাহিদকেও আনুগত্যের ময়দানে পিছপা হতে দেখিনি, বরং বিভিন্ন সময় আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে।

২৮ অক্টোবর '০৬ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বর্বরতম অধ্যায় রচিত হল। পল্টন মোড়ে প্রকাশ্যে দিবালকে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে আহ্বান গ্রহণকারী আওয়ামী অপশক্তি আর দেশের ১৪ দলের সন্ত্রাসীরা নারকীয় তান্ডব পরিচালনা করে, তারা নিরস্ত্র আন্দোলনের কর্মীদের উপর হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে ও খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে হত্যা করে ৫/৬ টি তাজা প্রাণ, তারা হত্যা করেই থেমে যায়নি, লাশের উপর নেচে উল্লাস প্রকাশ করে যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। যার দৃশ্য ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্ব অবলোকন করে বিস্ময় হতবাক হয়েছে। এমন বর্বর হত্যা যজ্ঞ আর পৈশাচিকতা সকল যুগের হিংস্রতাকে হার মানিয়েছে। এই নৃসংশ হায়নাদের ছোঁড়া বোমা ও পিস্তলের গুলি ও লগি বৈঠার আঘাতে ৬ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়। এই নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার স্বীকার হয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে শহীদ মুজাহিদ আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেল ওপারের সুন্দর ভুবনে। ■



icsbook.info

# আটাশে অক্টোবর আবেগময় স্মৃতি

মুহাম্মদ ইমরান হোসাইন

সকাল বেলায় সোবহানবাগের রাস্তায় হাটছিলাম কিছুটা অলস মুডে। হঠাৎ দেখলাম মহানগরী সভাপতি আঃ মান্নান ভাই রিকশায় যাচ্ছেন। আমাদের দেখে দ্রুত পল্টনে আসতে বললেন। ওনাকে খুব চিন্তান্বিত মনে হচ্ছিল।

পল্টনে এসে দেখি অধিকাংশ ভাইরা মহানগরী পশ্চিমের। অনেক ভাইদের সাথে হাত মিলালাম ও কোলাকুলি করলাম। শহীদ মুজাহিদের সাথে হ্যান্ডশেক করার সময় মনেই হয়নি কত মর্যাদাবান তরুণের সাথে হাত মিলিয়েছি। হায়, যদি জানতাম এই তরুণ হবে জান্নাতের সবুজ পাখি, তাহলে প্রাণভরে কোলাকুলি করতাম, বুকে কান পেতে শুনে নিতাম বিপ্লবের স্পন্দনগুলো .....

সংঘর্ষ যখন প্রবল হলো আমাদের ভাইরা বারবার পিছিয়ে যাচ্ছিল। স্টেজ থেকে মাইকে যখন বিপুল বিক্রমে ডাক দেয়া হয় তখন ভাইরা সবাই সমস্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ অনুভূতি উজাড় করে দিয়ে আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে ওঠে। বিশ্বাসের সেই উত্তাল ঢেউয়ে গোটা পল্টন প্রকম্পিত।.....

এক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি মাসুদ ভাই কোত্থেকে এসে হাজির হলেন। যুদ্ধের মোড় পাল্টে গেল। কর্মীরা জীবনবাজি রেখে মাসুদ ভাইয়ের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জানবাজ সেনাপতি তার কর্মীবাহিনী নিয়ে বাতিলদের পল্টন মোড় থেকে আরো দূর পর্যন্ত ধাওয়া করলো। এ যেন অষ্টম শতক। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র মুসলিম সেনাদল যুদ্ধে নেমেছে লক্ষাধিক শত্রুর বিরুদ্ধে। চোখে মুখে দৃপ্ত শপথ–জীবন অথবা মৃত্যু।

হায়, আমি কি করে ভুলে যাবো সেসব বিশ্বাসী তরুণদের মুখগুলো, যাদের মাথাগুলো থেতলে গেছে ইটের আঘাতে, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে শরীর থেকে, তবুও মুহুর্মুহু



icsbook.info

তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে বাতিলের বিরুদ্ধে, কিছুতেই তাদের পেছনে পাঠানো যাচ্ছে না।.....

আরেকটি ছোট্ট ঘটনা। এক ভাইয়ের মাথায় একটি ইটের আঘাত লাগায় তিনি গালি দিয়ে উঠলে সাথে সাথেই কয়েকজন ভাই বললেন, প্লিজ গালি দিবেন না। তারা উক্ত ভাইকে জড়িয়ে ধরে ধৈর্য্য ধারনের উপদেশ দিলেন। এটি সূরা আসরের শিক্ষার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

আরেকটি ঘটনা। আমাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে বামপন্থিদের একটি প্রতিষ্ঠান ছিলো কয়েকজন ভাই তাতে ইট নিক্ষেপ করতে গেলে তাদেরকে সবাই থামিয়ে দিলো। ইসলামী যুদ্ধনীতির আরেকটি নমুনা সেদিন দেখতে পেলাম।

শুধু সকালে নাস্তা হয়েছে। অনেকের তাও হয়নি। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় সবাই কাতর। তবুও লাঠি হাতে সবাই দাঁড়িয়ে কারো হাত একটুও কাঁপছে না। কেন্দ্রীয় সভাপতির হাতে গামছা দিয়ে একটি ব্যান্ডেজ বাঁধা হলো এবং মাথায় ও ব্যান্ডেজ করা হলো। কেন্দ্রীয় সভাপতির অটল, অবিচল, দৃঢ় সংবদ্ধ মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে সকল কষ্ট সেদিন ভুলে ছিলো সবাই। সবার জন্যে পাউরুটি, কলা ও পানির ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু তা পর্যাপ্ত ছিল না। অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলো সবাই। যে ভাইটির হাতেই একটি রুটি আসে তিনি তা বাড়িয়ে দেন আরেকজনের হাতে। এভাবে করতে করতে দেখা যায় অনেক ভাই-ই রুটি পাননি। পল্টনের প্রান্তর সেদিন পরিণত হয়েছিলো মুতার প্রান্তরে।

শহীদ মুজাহিদ ভাইয়ের সাথে সর্বশেষ সদস্য বৈঠকের একটি স্মৃতি না লিখে পারছি না। গ্রুপ গ্রুপ করে সদস্য ভাইরা ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ করছে। সৌভাগ্যক্রমেমুজাহিদ ভাই ও আমি একই গ্রুপে পড়েছি। তার ব্যক্তিগত রিপোর্ট শুনে আমরা বিস্মিত হয়েছি। নিয়মিত কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন, জামায়াতে সালাত, ৫ঘন্টা পড়া-শুনা এবং নিয়মিত কর্মী যোগাযোগ। একটি চমৎকার ব্যালান্সড রিপোর্ট সেদিন শুনেছিলাম। আমাদের কারো কোন প্রশ্ন ছিল না। মহানগরী পশ্চিমের সর্বোত্তম সদস্য ভাইটিকেই আল্লাহ বাছাই করে নিয়েছেন তার নিজের জন্য।

শহীদ শিপনের বড়ভাই মামুন ভাই ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ছাত্র ছিলেন ও আমাদের এক সময়কার দায়িত্বশীল ছিলেন বলে তার সুবাদে তাদের বাসায় গিয়েছি কয়েকবার। শিপন ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিলো, কোলাকুলিও করেছিলাম কিন্তু কখনো ভাবিনি তিনি এত বড় মর্যাদায় আসীন হবেন। মামুন ভাই ও আমি একই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হওয়ায় ও একই জেলায় বাড়ি হওয়ায় মামুন ভাইকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। রাতে প্রচণ্ড ক্লান্তি নিয়ে রুমে ফিরলে ফুয়াদ ভাই ফোনে জানালেন– মামুন ভাইয়ের ছোট ভাই শহীদ হয়েছে। সাথে সাথে ফোন দিলাম মামুন ভাইকে। তিনি কান্নাজড়িত স্বরে বলতে লাগলেন, এই মাত্র শিপনের লাশ দেখে এলাম ঢাকা মেডিকেলের ফ্রিজে। ইমরান, আমার মাথায় কিছুই কাজ করছে না। বাসায় যেয়ে কি বলবো আব্বা-আম্মাকে।..... আমি স্তব্ধ, কোনো কথাই বলতে পারলাম না। একজন শহীদের বড়ভাইকে আমি কিইবা



icsbook.info

বলবো, শুধু পরদিন জানাযা শেষে জড়িয়ে ধরেছিলাম শক্ত করে। কয়েকদিন পর মামুন ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম শহীদ শিপন সম্পর্কে। তিনি বললেন, "আমরা দুই ভাই ক্যারিয়ার নিয়ে খুব টেনশন করতাম কিন্তু শিপন কখনো এসব বিষয়ে টেনশন করতো না। সে বিছানায় শুয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে যেতো এলাকার ছোট, বড় সবাই তাকে চিনতো। শিপন এলাকার বখাটে, উগ্রদের পিছনে বেশি কাজ করতো, তাদের দাওয়াত দিয়ে সংগঠনে নিয়ে আসতো। এভাবে অনেক ছেলেকে সে কর্মী বানিয়েছে। সংগঠন নিয়ে সবসময় তাঁর পেরেশানী ছিল। সে খুবই আনুগত্য পরায়ণ ছিল।" শহীদ শিপন ভাইয়ের স্মরণে এলাকার মসজিদে দোয়ার অনুষ্ঠানে শরীক হয়েছিলাম। অনেক ছোট ছোট বাচ্চাকে দেখেছি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আটাশে অক্টোবরের কয়েকদিন পর ঢাকার ওয়ার্ড দায়িত্বশীলদের নিয়ে কেন্দ্রের একটি প্রোগ্রাম ছিল। প্রোগ্রাম শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি মুনাজাত পরিচালনা করছিলেন। সকল ভাইরাই কাঁদছিলেন, এ যেন কান্নার জোয়ার। সে পবিত্র, হৃদয়গ্রাহী পরিবেশটি কখনো ভুলার নয়।

মুজাহিদ ভাইয়ের শাহাদাতের পর মহানগরী পশ্চিমের প্রথম সদস্য বৈঠক। ক্লান্ত, আহত সদস্য ভাইরা যথাসময়ে বৈঠকে পৌছলেন। শাহাদাতের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে বৈঠক শুরু হলো, ওয়ালা তাকুলু লিমাইয়ুকতালু..... সদস্য ভাইরা মাথা নিচু করে বসে আছেন, সবার চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় শুধু অশ্রু ঝরছে, কেউ কেউ জোরে জোরে আল্লাহু আকবার বলতে লাগলেন। মহানগরী সভাপতি কাঁদতে কাঁদতে বৈঠক শুরু করলেন। সেদিনের বৈঠক ছিল অশ্রু দিয়ে সিক্ত। আপন ভাই হারানোর বেদনা ছিল সকলের মাঝে। ■



icsbook.info

# একটি আদর্শ একটি ইতিহাস

মুহাম্মদ আবু হানীফ

হঠাৎ করেই মুজাহিদের মোবাইল থেকে একটি ফোন এল। রিসিভ করেই জিজ্ঞাসা করলাম– মুজাহিদ তুমি কোথায়? ওপ্রান্ত থেকে বলল– আমি মুজাহিদ নই, আপনি কে বলছেন? আমি বললাম– আমি মুজাহিদের বড়ভাই এটা তো মুজাহিদের নাম্বার। আপনার কাছে কেন? সে বলল– আপনার ভাইকে আমরা পল্টন মোড়ে মাইরা ফালাইয়া রাইখা আইছি। আপনি আইসা নিয়া যান। আমি জিজ্ঞেস করলাম– আপনি কে বলছেন? জবাব এল– আমি গুন্ডা পান্ডা। বলে আরও কয়েকজনের সাথে হাসাহাসি করতে লাগল।

মুজাহিদকে সাড়ে বারটার দিকে ফোন করে ওদের অবস্থান জানতে চাইলাম। ও জানালো ওরা সকলে পল্টন মসজিদের সামনে আছে। বললাম, আমি খাবার নিয়ে আসছি। এসে তোমার সাথে যোগাযোগ করব।

এর ঠিক পাঁচ মিনেট পর মুজাহিদের মোবাইল থেকে আমার মোবাইলে অই কলটি এল। আমি বারবার হ্যালো হ্যালো বলছিলাম। কিন্তু কোন উত্তর আসছিল না। প্রচন্ড হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল। বুঝলাম মারামারি শুরু হয়েছে। সাথে সাথেই আব্দুর রশীদ ভাইকে বিষয়টি জানালাম। আর সব দায়িত্বশীলদের কাছে ফোন করে মুজাহিদের অবস্থা জানতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু কেউই ওর অবস্থান সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছিল না। সবাই জানালো পল্টন মোড়ে এবং পল্টন মসজিদের সামনে আওয়ামী লীগের মিছিল হতে আমাদের সমাবেশের উপর আক্রমণ হয়েছে এবং ওরা লগি, বৈঠা, লাঠি ও বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের ভাইদেরকে প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করছে।

এ অবস্থায় সাথে সাথেই সমাবেশস্থলের দিকে যাত্রা করলাম। সাথে ছিলেন আব্দুর রশীদ ভাই ও ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগরী পশ্চিমের বায়তুলমাল সম্পাদক মঈনুদ্দিন ভাই। কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালের কাছাকাছি আসার পর মহানগরী পশ্চিমের সেক্রেটারি ফখরুদ্দিন মানিক ভাই মঈন ভাইয়ের মোবাইলে ফোন করে হাসপাতালে যেতে বললেন। তখনও মুজাহিদ সম্পর্কে কিছুই জানিনা। হাসপাতালে ঢোকার পর লিফটের সামনে গিয়ে দেখলাম ১০নং ওয়ার্ডের কর্মী ইমন বসে আছে। সারা শরীর রক্তে ভেজা। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে বলল, হানিফ ভাই মুজাহিদ ভাই আমার কোলেই শাহাদাতবরণ করেছে। এতক্ষণ যা আশঙ্কা করছিলাম তাই সত্যে পরিণত হল। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। প্রচন্ডভাবে কান্না আসছিল।



icsbook.info

ইমনকে জিজ্ঞেস করলাম, মুজাহিদ এখন কোথায় আছে। ও জানালো চতুর্থ তলায়। আমরা তৎক্ষণাৎ চতুর্থ তলায় গিয়ে দেখলাম সাদা চাদর দিয়ে কাকে যেন ঢেকে রেখেছে। কাছে গিয়ে চাদর ওঠাতেই দেখলাম মুজাহিদের রক্তাক্ত মুখ। যেন শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। হায়েনারা ওর মাথা আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এত সুন্দর মুখে কিভাবে ওরা এতগুলো আঘাত করল বুঝতে পারলাম না। কোন মানুষের দ্বারা এটা সম্ভব নয়। বুঝতে পারলাম মানুষরূপী জানোয়ারেরাই একাজ করেছে। মুজাহিদের মামা খিজির আহমেদ এবং মিজান আহমেদ হিমু ভাইকে ফোন করে হাসপাতালে আসতে বললাম। মুজাহিদের শাহাদাতের কথা জানালাম না। পরবর্তীতে ফোন করলাম ওর নানা মানসুর আহমেদ সাহেবকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খিজির ভাই, হিমু ভাই ও মুজাহিদের বাবা হাসপাতালে এলেন। এরপর যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো তা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। আমি আর তাদের সামনে থাকতে পারলাম না।

শহীদ মুজাহিদের লাশ ময়না তদন্তের জন্য নেয়া হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজে। ময়না তদন্ত শেষে পরদিন ২৯ অক্টোবর দুপুরে মুজাহিদের নানা মানসুর আহমেদ সাহেব শিবিরের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে মুজাহিদকে শেষবারের মতো গোসল দিলেন। বিকাল ৫:০০টায় মগবাজারে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে অন্য দুই শহীদ শিপন ভাই ও হাবিবুর রহমান ভাইয়ের সাথে আমীরে জামায়াতের ইমামতিতে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হলো। সেখানে শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি, আমীরে জামায়াত ছাড়াও বিএনপি ঢাকা মহানগরী সভাপতি সাদেক হোসেন খোকা বক্তব্য দিলেন। শহীদের সাথীসহ জানাজায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল।

যে মসজিদে মুজাহিদ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত সেই বায়তুর রহমান জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হলো। এত মানুষের সমাগম ছিল কল্পনাতীত। মিরপুরে আর কারও জানাযায় এত লোক হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। জানাযার পূর্বে মুজাহিদকে যখন ওর বাসার সামনে নেয়া হলো তখন সেখানে ওকে শেষবারের মতো দেখার জন্য মহিলাদের ঢল নামলো। আধা ঘন্টা ধরে দেখানোর পরও অনেকেই বাকী রয়ে গেলেন। ভীড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশকে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। এদিকে জানাজার সময় হয়ে যাচ্ছে। তাই মুজাহিদের কফিন মসজিদের সামনে নিয়ে আসা হলো। কফিন সামনে রেখে বক্তব্য রাখলেন মুজাহিদের বাবা দেলোয়ার হোসেন, নানা মানসুর আহমেদ, মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি আব্বাস উদ্দিন, ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগরী পশ্চিম সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং শহীদি কাফেলার কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ। জানাযা শেষে কফিন খুলে দেয়া হলো। লাইনে দাঁড়িয়ে প্রায় আধা ঘন্টা ধরে শেষবারের মতো মুজাহিদকে দেখলেন তাঁর বন্ধু, আত্মীয়, শুভাকাংখী ও অন্যান্য মানুষ। পরে লাশ নিয়ে যাওয়া হলো মাজার রোডে জমিদারবাড়ি কবরস্থানে। কবরে লাশ রাখলেন মুজাহিদের নানা মানসুর আহমেদ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগরী পশ্চিমের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান। কবরস্থানের পশ্চিম দক্ষিণের কোণের কবরটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছে আমাদের প্রাণপ্রিয় ভাই মুজাহিদ।

## কেমন ছিল মুজাহিদ?

মুজাহিদের শাহাদাতে শুধু ইসলামী আন্দোলনের লোকজন নয়, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও সমভাবে দু:খ প্রকাশ করেছে। তাঁর জানাযায় সকল স্তরের মানুষ সমবেত হয়েছিল। সকল মানুষের কাছে



icsbook.info

সমভাবে জনপ্রিয় ছিল মুজাহিদ। কারও সাথে কখনও উচ্চস্বরে কোন কথা সে বলেনি। তাঁর পরিবারের কেউ তাকে বকা দিলেও সে চুপচাপ শুনেছে। কোনও প্রতিবাদ করেনি। পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের কারণে প্রাপ্ত বৃত্তির টাকা দিয়ে সে উপহার কিনে দিয়েছে তাঁর মামা, মামী ও পরিবারের অন্যদেরকে। বাবা তাকে আন্দোলনের কাজে যেতে নিষেধ করতেন, কিন্তু তারপরও সে তাঁর বাবার সাথে কোনদিন সামান্যতম খারাপ আচরণ করেনি বা মনে কষ্ট দেয়নি। মাকে বলে বের হয়ে যেত। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছেও মুজাহিদ ছিল একজন আদর্শ ছেলে। বিএনপি নেতা আব্দুল মান্নান, আনোয়ারুল হক আনু, আওয়ামী লীগ নেতা রেজাউল কাদের, সাজেদুর রহমান রাসেল সহ সকলের মুখেই শোনা গেল মুজাহিদের প্রশংসা। সবাই আফসোস করছিল এমন একজন ছেলেকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করায়। সাংগঠনিক দায়িত্বশীলদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে মুজাহিদ ছিল সবার জন্য আদর্শ। প্রশ্নহীন আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল সে। সাংগঠনিক কাজকে কিভাবে আরও গতিশীল করা যায়, তা নিয়ে সে সবসময় চিন্তিত থাকত। তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যে কোন ছোট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও সে বর্তমান ও সাবেক দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ করত। মুজাহিদ বৃহত্তর সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করত। এমনকি ২৮ অক্টোবর, ২০০৬ সমাবেশে যাবার পূর্বেও বৃহত্তর সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ করেছে।

সামাজিক কাজে মুজাহিদ ছিল অগ্রপথিক। সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে সদা তৎপর। কারও বিপদ হলে সাংগঠনিক বিষয় চিন্তা না করে তাকে সাহায্য করতে সে এগিয়ে যেত।

মুজাহিদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ। তাকে মন খারাপ করে থাকতে খুব একটা দেখা যেত না। এমনকি কেউ কোন কঠিন কথা বললেও সে মুচকি হাসি দিয়ে চুপ করে থাকত।

মুজাহিদের স্বপ্ন ছিল একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করার। সে চেয়েছিল এর মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রদেরকে ইসলাম তথা বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে। তাঁর সে স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত ইবাদতের ক্ষেত্রে মুজাহিদ ছিল সদা সতর্ক। তাঁর নামাজ ছিল ধীর স্থির, মনোযোগ ছিল অনুকরণীয়। অন্যান্য ইবাদতেও সে ছিল খুবই মনোযোগী। তাঁর ছোট ভাই বোনদেরকে ব্যক্তিগত ইবাদতের ক্ষেত্রে সবসময় উৎসাহিত করত। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তাঁর প্রথম শ্রেণীতে পড়া ছোট বোন মালিহা গত রমযান মাসে ১৭ টি রোজা রেখেছে। এভাবে তাঁর অন্যান্য আত্মীয়দেরকেও সে ইবাদতের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করত। এভাবে মুজাহিদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলীই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর তাই শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাকে তাঁর নিকটবর্তী করেছেন।

মুজাহিদ তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নিজের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস তাঁর জীবনকে বিসর্জন দিয়েছে, শহীদ হয়ে সে এখন ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক। আমরা যারা বেঁচে আছি, তাদের দায়িত্ব হলো তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। আমরা মুজাহিদের হত্যার বদলা নেব তাঁর স্বপ্নের ইসলামী বিপ্লব কায়েম করার মাধ্যমে। আর তাহলেই সার্থক হবে মুজাহিদের জীবন দান, সফল হবে তাঁর আত্মত্যাগ। আল্লাহর কাছে আমরা সে তৌফিক কামনা করছি। –আমীন! ■



icsbook.info

# শহীদ মুজাহিদ
# বাগানের শ্রেষ্ঠ গোলাপ

ডা. মো: মনোয়ার হোসেন (সুমন)

শহীদ মুজাহিদের স্মৃতি স্মারকের জন্য কিছু লিখতে হবে এই ভেবে সাদা কাগজে কলমের আঁচড় টানতে গিয়েই থেমে যাই– নিজেকে কোনভাবেই ক্ষমা করতে পারিনা। বার বার শুধু অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে। যখন মানুষের মুখে শুনি রাজনৈতিক নেতারা কর্মীদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেরা নেতৃত্ব দেয়– তখন বার বার মনে হয় আঙ্গুলী নিজের দিকে উঠেছে। আমিইতো সেই ব্যক্তি যে মুজাহিদকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে জামায়াতের সমাবেশে। আসলে দুনিয়ার বিচারে আমি তার দায়িত্বশীল হলেও আল্লাহর বিচারে সেই ছিল আমাদের দায়িত্বশীল। কারণ দায়িত্বশীল হওয়ার যোগ্যতা তাঁরই যিনি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। আর আল্লাহতো বেছে নেন বাগানের উৎকৃষ্ট ফুলটিকেই। অতএব মুজাহিদইতো আল্লাহর বিচারে উৎকৃষ্ট দায়িত্বশীল।

হয়তোবা সে কারণেই ২৮ তারিখ সকাল বেলা মুজাহিদকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম ১৫ জনের একটা তালিকা করতে। তালিকা করার পর সবার উপরে আমি মুজাহিদের নাম লিখে তাকে গ্রুপ লিডার বানিয়ে বায়তুল মোকারমের উত্তর গেটে বসিয়ে দিলাম শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে। শাহাদাতের জন্যে যাকে আল্লাহ তায়ালা বাছাই করে নিয়েছেন তার নামতো উপরে থাকবেই। মুজাহিদ ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় বেশি দিনের নয়, মাত্র কয়েক মাসের। এরই মধ্যে এত স্মৃতি যা শুধু দৃষ্টির দর্পনে আঁকা যায়, কাগজে লেখা যায় না। ১০ জুলাই'০৬ ষান্মাসিক সদস্য বৈঠকে নতুন সদস্য হিসেবে যে সমস্ত সদস্য ভাইয়েরা দাঁড়িয়েছে, এক পলকে যে সবার দৃষ্টি কেড়েছে সে হলো মুজাহিদ ভাই। ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকা সেই ছেলেটির চেহারা আমার মানসপটে আজীবন গেঁথে থাকবে। নিষ্কলুষ, আকর্ষণীয়, রুচিশীল, নম্রতা-ভদ্রতার সংমিশ্রণে গাঁথা, মায়াবী দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এক চেহারা দেখে আমি সাথে সাথেই মন্তব্য করলাম, দীর্ঘ দিন পর মিরপুর পশ্চিম থানায় একজন স্থানীয় যোগ্য দায়িত্বশীল পাওয়া গেল। যে আগামী দিনে এ অঞ্চলের নেতৃত্ব দিতে পারবে। কিন্তু সেদিন বুঝতে পারিনি আল্লাহ তার জন্যে এর চেয়েও উচ্চ মর্যাদার



icsbook.info

আসন পেতে রেখেছিল। তার দুইমাস পরই সেপ্টেম্বরে আমার উপর দায়িত্ব আসে মিরপুর পশ্চিম থানার। বছরের শেষ ৩ মাস। কাজ বুঝিয়ে দেয়ার চেয়ে কাজ আদায় করে নেয়ার গুরুত্ব এখন বেশি। স্বাভাবিকভাবেই ওয়ার্ড দায়িত্বশীলদের উপর থানা সভাপতির পক্ষ থেকে প্রচন্ড চাপ। কিন্তু সকল চাপই তিনি সহ্য করতেন অকপটে। মা-নানাসহ ময়দানের সাথীদের সাথে পরামর্শ করতেন থানার টার্গেট পূরণের জন্য। লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবসময়ই পেরেশান ছিলেন। কিন্তু কখনো হতাশ হননি। এতবড় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন আমার প্রিয় ভাই মুজাহিদ, আমাকে কখনো আশাহত করেনি। তার উপর সবসময় আস্থা রাখা যেতো আর তাইতো ২৭ তারিখ দিবাগত রাতে থানা অফিসে একা থাকার কারণে ফোন করে মুজাহিদ ভাইকে বললাম, আমি অফিসে একা ২-৩ জনকে নিয়ে আসলে ভালো হয়। মুজাহিদ ভাই কালবিলম্ব না করে রাত ১০টার দিকে জীবন ও ইয়াসিনকে সাথে নিয়ে থানা অফিসে চলে আসে। ইতিমধ্যে ১২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি নাসির ভাইও ২ জনকে সাথে নিয়ে আসলেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে থানা অফিসে হামলার আশংকা থাকায় ২ ঘন্টা করে ২ জন পালাক্রমে জাগ্রত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। জীবন এবং ইয়াসিন বারান্দায় বসে পাহারা দিচ্ছে, বাকিদের ঘুমাতে বললাম। কিন্তু মুজাহিদ ভাই ঘুমাচ্ছে না। মনে হলো কেমন যেন ছটফট করছে, কখনো চেয়ারে বসে, কখনো শুয়ে পরে আবার উঠে আমার রুমে এসে CD player-এ নির্বাচিত শাহাদাতের গান শোনে। এভাবে কাটে তার সারারাত। রাত তিনটার দিকে বারান্দা হতে ইয়াসিনের কাছ থেকে বিদায় নেয়। কেন যেন বিদায় কালে ইয়াসিন বলে বসে, "আল্লাহ হাফেজ, শহীদ হলে দেখা হবে জান্নাতের সিঁড়িতে।"

মহানগরী সেক্রেটারিফোন করলেন, যে যেখানে আছে সবাইকে নিয়ে সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে বায়তুল মোকাররম উত্তরগেটে চলে আসতে হবে। সাথে সাথে ওয়ার্ডগুলোতে ফোন করলাম। সাড়ে নয়টার দিকে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে পৌঁছে দেখি আমাদের থানার বেশকিছু সাথী ভাই সেখানে পৌঁছে গেছে। মুজাহিদকে না দেখে কল দিলাম। কল রিসিভ না করে স্বভাব সুলভ মিষ্টি হাসি দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সে যে কেমন মিষ্টি এবং নিষ্কলুস হাসি তা লেখনি দিয়ে বুঝান যাবেনা। আনুগত্যের মাথা নত করে বললো- "সুমন ভাই কি করতে হবে"। আমি তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম। বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেটে যখন তার নেতৃত্বে ১৬জন ভাই সুশৃঙ্খল ভাবে বসে আছে, তখন আমি সেখানে গেলাম এবং সবাইকে চা খাওয়ালাম। চা খেতে খেতে সে উপস্থিত সাথীদের বলতে লাগল, যদি আজ আওয়ামী লীগ এখানে আক্রমণ করে তবে নির্ভয়ে তাদের মোকাবেলা করতে হবে, আপনারা ভয় পাবেননা– যদি আজ কাউকে শহীদ হতে হয় তো আমিই প্রথম শহীদ হবো। কি আশ্চর্য অভিব্যক্তি মাত্র দু ঘন্টা পরে যে জান্নাতের সিঁড়িতে পা রাখবে মনে হয় তার অগ্রিম বার্তা সে পেয়েই গেছে। তা না হলে এখন যার থাকার কথা এয়ারপোর্ট-এ হজ্ব ফেরত পরম প্রিয় নানা-নানুকে রিসিভ করতে কিন্তু সেখানে না গিয়ে কেন এখানে চলে আসবে! প্রোগ্রাম তো ছিল বিকাল ৩টায়। ততক্ষেণ সে দায়িত্বশীলকে বলে এয়ারপোর্ট-এর কাজ সেরে আসতে পারতো। তাছাড়া আগের রাতে থানা অফিসে দায়িত্ব পালন করার কারণে দায়িত্বশীলকে বললে এতটুকু ছাড় তাকে অবশ্যই দিত। কিন্তু সে ছুটিতো চায়নি বরং জানায়ওনি। বাসা থেকে বের হতে সে মাকে বলেছে, "আজ নানাকে আনতে এয়ারপোর্ট-এ যেহেতু যেতে পারছি না, তো নানার দেয়া প্যান্ট আর ফতুয়া পরেই প্রোগ্রাম-এ যাব।"



icsbook.info

১০টার দিকে নওশাদ ভাই ঐ ১৬জন সহ আরও ১১জনকে নিয়ে আমার নেতৃত্বে ২৮জনের একটা গ্রুপকে শৃঙ্খলার দায়িত্বে আজাদ প্রোডাক্টস এর গলিতে পাঠায়। সেখানে থেকে পরে সাড়ে ১০টার দিকে পল্টন মসজিদের গলি বা কস্তুরীর গলিতে সাব্বির টাওয়ারের সামনে পাঠানো হয়। এ পথ দিয়ে যাতে সন্দেহভাজন কেউ আমাদের অফিসের দিকে না আসতে পারে এজন্যে এ সতর্কতা। সেখানে গিয়ে শুনতে পাই আওয়ামী লীগের একটা মিছিল নয়া পল্টনের দিক থেকে লগি-বৈঠাসহ আক্রমাণাত্মক ভঙ্গীতে আমাদের প্রোগ্রামের দিকে আসছে। তবুও আমরা আমাদের জনশক্তিকে শান্ত থাকতে বলি এবং সংঘর্ষ যাতে না হয় সেরকম পরামর্শ দেই। আমি যখন সবাইকে পরামর্শ দিচ্ছিলাম তখন আমি মুজাহিদ ভাইকে কিছুটা অন্যমনস্ক লক্ষ্য করলাম। আমি তখন তাকে কিছুটা কমান্ডিং স্টাইলে কাছে আসতে বললাম এবং পরামর্শ দিলাম এ ধরণের পরিস্থিতিতে চোখ-কান সজাগ রাখতে। মুজাহিদ ভাইয়ের সাথে এ আমার শেষ কথা। এ সময় তৎকালীন মহানগরী সেক্রেটারিমানিক ভাই, আমান ভাই, রফিক ভাইসহ কয়েকজন আমাদের সাথে দেখা করতে আসলেন। তাদের সাথে কথা হচ্ছিল। ঠিক সে সময় আওয়ামী লীগের একটি মিছিল লগি-বৈঠা নিয়ে আমাদের গলির দিকে ঢুকে হায়েনার মত আক্রমণ শুরু করে। প্রথমে আমরা ইটের আঘাত সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ইট দিয়ে পাল্টা আঘাত করি এবং নারায়ে তাকবির স্লোগান দিই, এতে হায়েনারা ভয় পেয়ে পিছু হটে। কিছুক্ষণপর তাদের কয়েকটি মিছিল একত্রিত হয়ে শত শত লগি বৈঠা আর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর। আমরা মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ জন। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। একের পর এক আহত হচ্ছে আমাদের ভাইয়েরা। নূরনবী ভাই এর মাথা ফেটে গেল, যায়েদ ভাই এর চোখ কেটে গেল। এক এক করে অফিসে চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। লোক কমে যাচ্ছে। রক্ত আর রক্ত। তিন দিক থেকে হায়েনারা ঘিরে আসছে কিন্তু কারো মনে এতটুকু ভয় নেই। এক এক জন আহত হয়ে নিজেই নিজেকে সামলে নিচ্ছে। ধরতে গেলে বলে আমাকে ধরা লাগবেনা ঐদিকে দেখেন। এ কোন ময়দানের সাথে তুলনা করব, বদর না ওহুদ। মনে হয় সব। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি কখন যে ইটের আঘাতে, মোজা রক্তে ভিজে গেছে টেরই পাইনি, পকেট থেকে রুমাল বের করে পা বেঁধে নিলাম তবুও রক্ত বন্ধ হচ্ছেনা। ঠিক এ সময় আমার মোবাইল-এ রিং এলো ১০নং ওয়ার্ড জামায়াত সেক্রেটারি আবু হানীফ ভাইয়ের। জিজ্ঞেস করলেন মুজাহিদ কোথায়। হঠাৎ এরকম একটি ফোন পেয়ে শংকিত হলাম। এতক্ষণে আমাদের সকলের দিকে তাকালাম। দেখলাম আগের অনেকেই নেই, অনেক নতুন যোগ হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই আছেন, জাহিদ ভাই, রেজাউল ভাই, নেয়ামুল ভাই, কিন্তু মুজাহিদ, জীবন, ইয়াসিন কেউই নেই। প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলাম। শরীর দুর্বল হয়ে এলো। মুজাহিদ এর মোবাইল-এ ফোন করলাম অন্যরা ধরল। আবোল তাবোল বলছে, গন্ডগোলের শব্দ কিছুই বুঝা যাচ্ছেনা। তখন ধরে নিলাম হয়ত মোবাইল তার পকেট থেকে পড়ে গেলে অন্যরা নিয়ে গেছে। ফোন দিলাম নওশাদ ভাইকে। তিনি বললেন, মুজাহিদ হাসপাতালে। কেমন আছে জিজ্ঞেস করলে বললেন, ভালো আছে। মনে করলাম অনেকেই তো আহত হচ্ছে সেরকম কিছু। হানীফ ভাইকে ফোন দিয়ে জানালাম। কিন্তু তার ভিন্ন সুরে আমার মন আরও ভেঙ্গে গেল। হাসপাতাল যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। কিন্তু এ অবস্থায় এখান থেকে যাওয়াও ঠিক হবে না ভেবে থেকে গেলাম। কিছুক্ষণ পর যখন ডান হাতে প্রচন্ড ব্যথা পেলাম। তখন আর ওখানে থাকাটা মোটেও সাধ্যে কুলালো না। কেমন যেন অবচেতন মানসিকতা তৈরি হলো আমার মধ্যে- এদিকে সংঘর্ষ চলছে



icsbook.info

অথচ আমি পিছনের দিকে যাচ্ছি। মন মানতে চাইছে না, ততক্ষণে কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল সম্পাদক মুজাহিদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি আজাদ প্রোডাক্টস এর সামনে আমাকে দায়িত্ব দিলেন। এখানে সংঘর্ষ নেই শুধু দাঁড়িয়ে থাকা। তবু ময়দান থেকে চলে যাওয়ার চেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভালো মনে করলাম। যখন আসরের আযান দিচ্ছিল নওশাদ ভাই ফোন করলেন আপনি এখনই ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হসপিটালে চলে আসুন। আমি জিজ্ঞেস করলাম মুজাহিদের কি অবস্থা, কিছুই বললেন না। তখন মুজাহিদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি কিছু জানেন। তিনি বললেন নিজেকে শক্ত রাখুন, মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছে। যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মাথার উপর। মাত্র এক মাস হলো এ থানার দায়িত্ব পেয়েছি। আজ আমার কাঁধে শহীদের লাশ। কাল থেকে মুজাহিদ আমার সাথে, আমি ওর বাবা মায়ের সামনে যাবো কিভাবে? সবচেয়ে বড় কথা মুজাহিদ কি আমাকে ক্ষমা করবে? আমি জীবিত অথচ ও চলে গেছে। আমি যে ওর প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে যাবো সে শক্তিও আমার নেই। হাসপাতালের দিকে দৌড়াচ্ছি আর নানা স্মৃতি- এসে জড়ো হচ্ছে। জীবন, ইয়াসিন, নাঈম কাউকেই কল করে পাচ্ছিনা। ওরাতো সবাই এক সাথে ছিল, চিৎকার করে আল্লাহর কাছে বলতে লাগলাম, ইয়া আল্লাহ এক শহীদের কথা তুমি শুনিয়েছ, আর যেন কারো কথা না শুনি। বাকি সবাইকে তুমি ফিরিয়ে দাও। হাসপাতালে গিয়ে দেখি আমার প্রিয় মুজাহিদ নিথর হয়ে বেঞ্চের উপর পরে আছেন। মুখের কাপড় তুলে দেখি আগের চেয়েও জ্যোর্তিময় এক আভা মুখে নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছেন। অসংখ্য আঘাত শরীরে কিন্তু চেহারাতে একটুও কষ্টের ছাপ নেই। কি আশ্চর্য! শহীদরা বুঝি এমনি হয়।

আলতো করে কপালে একটি চুমো খেয়ে, পা দুটোকে জড়িয়ে ধরেছি আমার বুকের সাথে। আর বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করেছি একই ময়দান থেকে তুমি কখন জান্নাতে চলে গেলে আমি টেরও পাইনি। তোমার সাথে আমার অনেক কথা রয়ে গেলো, মিরপুরের ময়দানকে কিভাবে ইসলামী আন্দোলনের ঘাঁটিতে পরিণত করা যাবে তার অনেক পরিকল্পনা তোমার মাথায় ছিল তাতো আমাকে বলা হয়নি, আমার উপর তোমার অনেক এহতেসাব আছে তাতো করোনি, কখন করবে এগুলো? তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আর জান্নাতে তোমার সাথে আমার যেন দেখা হয়। তুমিতো ৭০জনকে জান্নাতে নিতে পারবে। তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে আমাকে তোমার সাথী করো। কিছুক্ষণ পর আমাদের সকলের গর্বিত পিতাসহ মামারা আসলে তাদের বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। নিজেকে আড়াল করে নিলাম। কারো সামনে যেতে নিজেকে খুব লজ্জিত লাগছে। আমি মুজাহিদের সভাপতি। আমি জীবিত অথচ আমার সাথী চলে গেছে।

হাজার হাজার নারী পুরুষ ভীড় জমিয়েছিল শহীদকে এক নজর দেখার জন্যে। রাত ৮টার দিকে শহীদকে তার নিজের ওয়ার্ডেরই জমিদার বাড়ি কবর স্থানে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় চির-শায়িত করা হয়। যখন শহীদের লাশ কবরে নামানো হয় তখনো তুলতুলে শরীর, সহজ ভাবেই ঘাড় ঘুরিয়ে পশ্চিমে মুখ করে দেয়া হয়। চেহারায় তখনো সেই জ্যোতির্ময় আভা, পরিচিত হাসি। এ যেন কবির সেই উক্তি–

যেদিন প্রথম তুমি এসেছিলে ভবে,
কেঁদেছিলে তুমি শুধু হেসেছিল সবে,
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন। ■



icsbook.info

# যে স্মৃতি আজো কাঁদায়

মো: কামরুজ্জামান সোহাগ

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাংগঠনিকভাবে আমাকে ১০নং ওয়ার্ডের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন আমি আমার কাজের সংগী হিসেবে যাদের পেয়েছি মুজাহিদ ছিল তাদের অন্যতম, তখন শহীদ মুজাহিদকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। মুজাহিদের স্বভাব সব সময়ই শান্ত প্রকৃতির। কারো সাথে রাগ করত না, কারো সাথে ঝগড়া করতো না এবং কোন কাজের কথা বললে তা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত। তখন মুজাহিদসহ বেশ কয়েকজন ভাইকে ফজরের নামাজে আমি ডেকে দিতাম, তবে মুজাহিদকে নামাযে ডাকা সব চাইতে সহজ ছিল। সে যে রুমে ঘুমাতো তা রাস্তার পাশে হওয়ায় জানালায় নক করলে সে উঠে যেতো। ২০০৩ সালে সে সাথী এবং ২০০৬ সালের ৯ জুলাই মাসে সদস্য শপথ নেয়। সাথী হওয়ার পর থেকেই সে সংগঠনকে নিয়ে সুদূর প্রসারী চিন্তা করতো। চিন্তা করতো কিভাবে সাধারণ ছেলেদের সংগঠনে সম্পৃক্ত করা যায়। বিশেষ করে মেধাবী ছাত্রদের সংগঠনে আনার ব্যাপারে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমি লক্ষ্য করেছি। মুজাহিদ সাথী হওয়ার সময় আমি থানা সভাপতি। আমি তাকে আদর করে অনেক দিন বলেছি– তুমি সাথী হয়েছো সেই উপলক্ষে তোমার বাসায় একদিন দাওয়াত খাব। কিন্তু তারপরে সে সদস্য হয়ে গেল। সদস্য হওয়ার পরও আমি তাকে বললাম, তোমার বাসায় কিন্তু দাওয়াত খাওয়া হয়নি। আর সে হেসে বলতো সোহাগ ভাই দাওয়াত দিবো। কিন্তু সেই দাওয়াত আমার ভাই মুজাহিদের সাথে আর খাওয়া হলো না। এখন কিন্তু তাদের বাসায় দাওয়াত খাই, আম্মা খাবারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। কিন্তু পাশে থাকে না আমার প্রিয় ভাই মুজাহিদ। সে সদস্য হওয়ার পর একদিন আমি বলি, মুজাহিদ তুমি কিন্তু এখন সদস্য। অতএব প্রতিটি কাজ আরো ভেবে চিন্তে করতে হবে। তখন সে আমাকে বলল সোহাগ ভাই আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যাতে দায়িত্বশীলদের আরো অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হতে পারি। হ্যাঁ, সেই মুজাহিদ এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে রইল।



icsbook.info

## ২৮ অক্টোবর যে ভাবে শেষ কথা

ঐ দিনে ফজরের পরে মহানগরী সভাপতি আমাকে বললেন চলেন পল্টনে যেতে হবে, আমি তৈরি হয়ে মহানগরী সভাপতির সাথে পল্টনে যাই। অফিসে ঘন্টা খানেক থাকার পরে প্রোগ্রাম স্থল উত্তর গেটে আসি। তখন সেখানে স্টেজে কাজ চলছিল। আমাদের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মনজু ভাই আমাকে একটি ঔষধ আনতে দিলে আমি রওনা হই। অবরোধ থাকায় সেদিন সব দোকান বন্ধ ছিল। তখন বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে দেখি মুজাহিদসহ তার ওয়ার্ডের বেশ কয়েকজন সাথী কর্মী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সবার সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম এবং মুজাহিদকে বললাম তোমাদের মধ্যে থেকে নাইমকে নিয়ে গেলাম, একটু কাজ সেরে আবার আসছি। তখন সে মুচকি হেসে বলল সোহাগ ভাই শুধু নাঈমকেই মনে করে, এই ছিল ২৮ অক্টোবর তার সাথে আমার শেষ কথা। তারপর আর কোন কথা হয়নি। আর কোনদিন হবেও না এবং সেই মুচকি হাসি দিয়ে আর কোন কথা বলবেও না আমার প্রিয় মুজাহিদ। তবুও এ আশায় বুক বেঁধে রইলাম, পরকালে যদি জান্নাতে তার সঙ্গী হতে পারি!

২৮ অক্টোবর শহীদ মুজাহিদকে যখন ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে তখন আব্বা (মুজাহিদের আব্বা)কে নিয়ে সিএনজি যোগে আমি বাসায় আসছিলাম। তখন বাবা হৃদয় বিদারক আর্তনাদ করে বলেছিলেন, আমার মুজাহিদকে ফিরিয়ে দাও! আমার মুজাহিদ কোথায়? সে তো কারো ক্ষতি করেনি। কেন আমাকে পিতা হয়ে তার লাশ দেখতে হলো? ওর মা কেন মুজাহিদকে ধরে রাখতে পারল না। সেদিন মায়ের বুক ফাটা বোবা কান্নার জবাব, ছোট বোনের না বোঝা হতবাক হয়ে চেয়ে থাকা, ছোট ভাই রাফির নিষ্পাপ কান্নার জবাব আজ পর্যন্ত আমরা কেউ দিতে পারিনি। আর কোন দিনও দিতে পারবো না। হয়তো তার বাবাকে বাবা ডেকে, মাকে মা ডেকে শোককে ভুলিয়ে দিতে পারব, কিন্তু কিভাবে পূরণ করব মুজাহিদের শূন্যতা। তার মতো সোনার টুকরো ছেলেতো হতে পারব না, পারব না মায়ের অপূর্ণতাকে পূরণ করতে। যাই হোক, পারি বা না পারি তবুও আমাদের গর্ব, মুজাহিদের কোন স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, মুজাহিদ শহীদ হয়েছে! আমরা শহীদ মুজাহিদের সাথী, তার উত্তরসূরী।

এই গর্ব তার মায়েরও। এই গর্ব নিয়ে ময়দানে ছুটে বেড়াবে তার উত্তরসূরীরা। আর মা গর্ববোধ করবে যে, সে শহীদের মা। এটাই তার বড় পাওয়া।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুজাহিদের সাথীদের মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা পালন করা উচিত। আল্লাহ সকলকে তৌফিক দিন। আল্লাহ হাফিজ। ■



icsbook.info

# টুকরো স্মৃতি

মোঃ হাবিবুর রহমান

জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ক্রুটি হেরী,
জাগো অগনন ক্ষুধিত মুখের নীর ভ্রুকুটি হেরী!
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরি, কত দেরি॥

মুসলিম জাতির প্রতি কবি ফররুখ আহমেদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই আমাদের যাত্রা। সেই যাত্রা পথের দুই মাঝি, যারা তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন– এই মুসলমানদেরকে সঠিক পথ অর্থাৎ কোরআনের পথের দিকে আহ্বানের মাধ্যমে। হ্যাঁ, তাদের কথাই বলছি। আমার প্রিয় ভাই শহীদ মাসুম ও শহীদ শিপনের কথা। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি এই শহীদের খুব কাছাকাছি থাকতে পেরেছি। তাদের জীবনযাত্রা আচরণসহ যাবতীয় বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছি বলে। শহীদের মৃত্যু নেই, তারা জীবিত। তাদের আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু উপলব্ধি করতে পারি। তা আজ পুরোপুরি প্রমাণিত। আমাদের মধ্যে যে দু'টি চরিত্র সবার কাছে প্রিয় ছিল তা হচ্ছে শিপন ও মাসুম। তাদের চিন্তা-ধারায় ছিল সাংগঠনিক ভিত্তি। তারা সব সময় সংগঠনকে তাদের নিজেদের জীবনের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতো। তাইতো কোরআনের পথে জীবন দিতে তারা এক পাও পিছু হটেনি। শহীদ মাসুম ভাই সম্পর্কে একটি ঘটনা বলতে চাই, মাসুম ভাইয়ের জীবনের শেষ রমজান মাস, দায়িত্বশীলের নির্দেশ সব উপশাখার ইফতারের আয়োজন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে বাগানবাড়ি উপশাখার ইফতার চক্রের তারিখ নির্ধারিত হলো এবং তা ভালোভাবে সম্পন্ন হলো। কিন্তু সবার মনে প্রশ্ন এই ইফতারের খরচ বহন করলো কে? ভাবতেই চোখে পানি এসে যায়, আমার প্রাণের ভাই মাসুম তার ঈদের জুতা না কিনে সেই টাকা দিয়ে ইফতারের আয়োজন করেছিলেন। যার হৃদয় এমন হতে পারে সে কি কখনো কোনো খারাপ কাজ করতে পারে? মাসুম ভাই এলাকার বড় ছোট সবার কাছে খুব পরিচিত ছিল। অত্র এলাকার যে কোনো বিপদে সে পাশে দাঁড়াতো। নানা উন্নয়নমূলক কাজে মাসুম ভাই সক্রিয়ভূমিকা পালন করতো। তার চরিত্র থেকে বুঝা যেতো যে, আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কেন এত পছন্দ করেছিলেন।



icsbook.info

শিপন নামটি এই এলাকার সবার কাছে খুব প্রিয়, বিশেষ করে ছোটদের কাছে। আমার সাথী হবার পেছনে সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিপন ভাইয়ের কিছু বিশেষ গুণাবলী ছিল। শিপন ভাইয়ের বাসার আশপাশে কোন ছেলেটি আর্থিক সমস্যার কারণে পড়াশোনা করতে পারছে না, কে ভালোভাবে ইফতার করতে পারছেনা, সে দিকে সব সময় দৃষ্টি থাকতো তার। সে প্রতিদিন একজন কর্মীকে নিয়ে ইফতার করাতো। যে ছেলেটি কোরআনে হাফেজ সে যে মেধাবী তা বলার অপেক্ষা থাকে না। শহীদ শিপন আধুনিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত ছিলেন। সে সবাইকে ইংরেজি শেখার ব্যাপারে উৎসাহ দিতো। আমাদের সমাজের কিছু লোক আছে যাদের জন্মই হয় মানুষের উপকার করার জন্য, সেই রকমের একটি মন ছিল শিপন ভাইয়ের। তাইতো তার শাহাদাতের পর লাখ জনতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। শহীদ শিপন সবাইকে অনেক আনন্দ দিতে পারতো। সে ছোটদের মাথায় হাত রেখে সব সময় স্নেহ করতো। সে সব সময় কাজের মূল্য দিতো। যে কোনো ছোট বড় সাংগঠনিক কাজকে প্রাধান্য দিতো। তাছাড়া নানা সামাজিক ও মসজিদ ভিত্তিক কাজে সে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। কি দোষ ছিল এই মেধাবী, নিষ্পাপ ছেলের। আর কত মা হারাবে তার সন্তান, আর কত বোন হারাবে তার ভাই, দেশ হারাবে তার ভবিষ্যত স্বপ্ন সন্তান? জাতির কাছে এই প্রশ্ন।

শহীদের রক্ত বৃথা যায় না, যদি তাই হয়
তবে একদিন হবেই হবে ইসলামের জয়।

■



icsbook.info

# শহীদ রুহুল আমীন

মোহাম্মদ আলী

*গাজীপুরের প্রথম শহীদের অনুভূতি– 'এবারের ইতেকাফ তৃপ্তি সহকারে করেছি।'*

ঢাকা থেকে মহয়মনসিংহ রোডে চান্দনা চৌরাস্তা। চৌরাস্তা থেকে গাজীপুর শহরের প্রবেশ পথে কিছু দূর গেলে রাস্তার উত্তর পাশে বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ (টিএন্ডটি) এর ৪৫০ বিঘা জমির ওপর বিশাল এলাকার পূর্ব পার্শ্বের প্রাচীর সংলগ্ন প্রায় দেড়শত বছরের দেয়ালে ফাটল ধরা পুরাতন একটি মসজিদ অবস্থিত। সেই মসজিদেই জীবনের শেষ ইতেকাফে বসেছিলেন মুক্তিযোদ্ধার কৃতি সন্তান ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মী গাজীপুরের প্রথম শাহাদাতবরণকারী শহীদ রুহুল আমীন।

মসজিদটির সামনে একটি বাড়ি ছাড়া চারদিকে ফাঁকা ধুধু প্রান্তর। আশপাশে কিছু ঝাড় ও গাছপালা। একদম নিরব নিস্তব্ধ। পবিত্র রমজান মাসের শেষের দশ দিন এ রকম একটি নিরিবিলি জায়গায় ইতেকাফে বসেছিলেন শহীদ রুহুল আমীন। ইতেকাফ থেকে বের হয়ে তার নিকটতম প্রতিবেশী মোহাম্মদ আলী মিয়াকে ইতেকাফের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'এবারের ইতেকাফ তৃপ্তি সহকারে আদায় করেছি'। হয়তো সে জানত না এটাই তার জীবনের শেষ ইতেকাফ হবে।

ইতেকাফ থেকে বের হয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করেন শহীদ রুহুল আমীন। তার ঠিক দুই দিন পর গত ২৭.১০.০৬ তারিখ রাত প্রায় ৮টার সময় রাজধানীসহ সারাদেশে আওয়ামী লীগের হায়নাদের তাণ্ডবের শিকারে গাজীপুরে শাহাদাত বরণ করেন শহীদ রুহুল আমীন। পবিত্র এশার নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হতেই হায়েনারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। উপর্যুপরি লাঠির নির্মম আঘাতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। মুসল্লিদের সহযোগিতায় কষ্ট করে হামাগুড়ি দিয়ে মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। আসলে অজ্ঞান নন ইতোমধ্যেই তিনি চলে গেছেন মহান প্রতিপালকের আসল ঠিকানায়। যার প্রমাণ মিলেছে সদর হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তার কর্তৃক মৃত ঘোষণা হওয়ার মাধ্যমে।



icsbook.info

## গাজীপুরে প্রথম শহীদ রুহুল আমীন

একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরির সুবাদে গাজীপুরে আসার পর প্রায় দেড় বছর হতে শহীদ রুহুল আমীন ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সংগঠনের অফিসমুখী কর্মব্যস্ত মানুষ হিসাবে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি তাকে। ব্যক্তিগত যোগাযোগের সুযোগে তার জীবনের কিছু ঘটনা শুনার সুযোগ হয়েছিল। এক সময় বাম রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন তিনি, পরবর্তীতে ইসলামের সুমহান আদর্শ গ্রহণ করে ইসলামী আন্দোলনের পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যান। তাই অল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলামী আন্দোলনের জেলা পর্যায়ে শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনসহ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শহীদ আব্দুল মালেককে যখন শহীদ করা হয় তখন সেই সংবাদ পাকিস্তানে মাওলানা আবুল আল মওদূদী (রহ.) এর নিকট পৌঁছানো হলে তিনি বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) শহীদ আব্দুল মালেক প্রথম শহীদ হলেও শেষ শহীদ নন। তার একথার বাস্তব প্রমাণ আজও দেখতে পাচ্ছি। শত শত ভাইকে জীবন দিতে হচ্ছে, আরো দিতে হবে। শহীদ রুহুল আমীনের রক্তের বদৌলতে গাজীপুরের মাটি ইসলামী আন্দোলনের জন্য উর্বর হয়েছে। গাজীপুরে শহীদ রুহুল আমীন প্রথম শহীদ হলেও শেষ শহীদ হয়তো নয়। বরং দ্বীন কায়েমের প্রয়োজনে আরো জীবন দিতে হবে যদি আল্লাহ চান। রংপুরে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন কারমাইকেল কলেজের নির্বাচিত কমনরুম সম্পাদক শিবির নেতা শহীদ আব্দুল আজিজ, যিনি তার বন্ধুদের বলতেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেন 'রংপুরে যদি কেউ শহীদ হয় আমিই যেন হই সেই শহীদ'। আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেছেন তাই এখন পর্যন্ত রংপুরে ছয় শহীদের নেতৃত্ব তিনিই দিয়ে যাচ্ছেন। শুধু রংপুর নয় গাজীপুরসহ অসংখ্য শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলার এই জমিন। শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের রেখে যাওয়া কাজ আমাদের আঞ্জাম দিতে হবে।

## শহীদ পরিবারের অনুভূতি

শহীদ রুহুল আমীন লক্ষ্মীপুর জেলার বাসিন্দা হলেও বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে গাজীপুর জিলার অন্তর্গত গাজীপুর পৌরসভার পুলিশ লাইনের পেছনে লক্ষ্মীপুরা গ্রামে জমি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। স্ত্রী, দুই ছেলে ও তিন মেয়ে নিয়েই ছিল তার পরিবার। তিন মেয়ের মধ্যে দুই মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে, ছেলে দুই জন এখনও পড়াশুনা করছে। কনিষ্ঠ মেয়েটি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যায়নরতা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম অভিভাবককে হারিয়ে গোটা পরিবারটি যেন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অভিভাবকহীন এই পরিবারটিকে হয়ত আল্লাহ সহযোগিতা করবেন। কিন্তু স্ত্রী কি আর কোনো দিন ফিরে পাবে তার স্বামীকে, ছেলে মেয়েরা পাবে কি আর কোনোদিন আব্বা বলে ডাকতে?

## বাস্তব স্বাক্ষ্য হিসেবে শহীদ রুহুল আমীন

মুসলমানদের আসল পরিচয় ঈমান আনার পর বাস্তব স্বাক্ষ্য প্রদান করা। শহীদ রুহুল আমীন আমাদের মাঝে যেন বাস্তব স্বাক্ষ্য প্রদান করে স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে।



icsbook.info

মেয়ের কাছ থেকে জানা যায়, তার বাবা সব সময়ই তাদেরকে নামাজের কথা বলতেন, কুরআন ও হাদিস পড়ার কথা বলতেন এবং পারিবারিক বৈঠক করে সদুপোদেশ দিতেন। ইতেকাফ চলাকালীন সময় তিনি প্রতিবেশীর একটি চায়ের ফ্লাস্ক ব্যবহার করতেন। কিন্তু সেই ফ্লাস্কটি যে কারণেই হউক ভেঙ্গে গিয়েছিল। পরে ইতেকাফ থেকে বের হয়েই তিনি তা ক্রয় করেছিলেন এবং যেদিন শাহাদবরণ করেছিলেন সেদিনই বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সে ফ্লাস্কটি পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। আমানতের যেন খেয়ানত না হয় এটাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। শাহাদতের পূর্বে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সুযোগও তাকে আল্লাহ দান করেছিলেন। তার দায়িত্বশীলরা আজ অকপটে স্বীকার করছেন শহীদ রুহুল আমীন একজন আনুগত্য পরায়ণ ও নিবেদিত প্রাণ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। সংগঠনের প্রতি ভালোবাসা ও সঠিকভাবে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যেই তিনি ২০০১ সালে সমরাস্ত্র কারখনার সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন। নিজ বাড়ি ছেড়ে জামায়াত অফিসেই সময় ব্যয় করা তার কাছে অধিক প্রিয় ছিল। তাইতো যে কোনো প্রয়োজনেই দায়িত্বশীলরা সহজেই তাকে কাছে পেতেন।

## কুরআন পাগল শহীদ রুহুল আমীন

কুরআনের সাথে শহীদ রুহুল আমীন এর নিবিড় সম্পর্ক ছিল যা তার নিজ হাতে লেখা নোট বই থেকে বিস্তারিত জানা যায়। গত ১০-১১-২০০৬ তারিখে সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় তার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার ঐ লেখাটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সেখানে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষার বাণী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গা থেকে সূরা ও আয়াত নম্বরসহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিন, মুত্তাকি ও মুহসীনদের গুণাবলী কি হওয়া দরকার এবং কি কি কাজ থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যায়ন ও লেখার পাশাপাশি তিনি সিডি ও টিভির মাধ্যমে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের বিভিন্ন তাফসীর মাহফিল শুনতে পছন্দ করতেন। তাই মাঝে মধ্যে দেখা যেত গাজীপুর জেলা জামায়াত অফিস থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে রাস্তার পাশে বড় টেলিভিশনে মাহফিল দেখার জন্য ব্যবস্থা করতেন। নিজে দেখতেন এবং অন্যকে দেখতে উৎসাহীত করতেন।

শহীদ রুহুল আমীনসহ যারা আল্লাহর জমিনে তার দ্বীন কায়েমের জন্য জীবন দিয়েছেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তাদের শাহাদাত যেন আল্লাহ কবুল করুন। আর হাদিসের ভাষা অনুযায়ীও রিজিক বেহেশতের ফল হউক তাদের নিত্যদিনের আহার। আর ধিক্কার জানাই তাদেরকে যারা ইসলামী আন্দোলনের নিরীহ কর্মীদের হত্যা করেছে। আজ হোক কাল হোক শাহাদাদের সিঁড়ি বেয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজ কায়েম হবেই হবে। এই হোক আমাদের প্রত্যাশা। ■



icsbook.info

# সেই স্মৃতি কি করে ভুলব আমি

হাফেজ আব্দুল কাহ্হার

মানুষের জীবনে এমন কিছু স্মৃতি থাকে, যা মনে পড়লে জীবনে দু:খ কষ্ট ভুলে অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়, সামনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যোগায়। কিন্তু শিপন, মাসুম, মুজাহিদরা যে স্মৃতির সাগরে আমাদেরকে ভাসিয়ে দিয়ে গেলেন, তা মনে পড়লে অন্তরকে টুকরো টুকরো ক্ষত-বিক্ষত করে শরীরের শিরা উপশিরায় তা ছড়িয়ে দেয়, মুখের হাসি, হাতের কলম বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

আবার মুসলিম ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে সান্ত্বনা নেয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। বাবা ও মায়ের আদর স্নেহে বড় হয়েছি, দেখতে দেখতে স্বল্প জীবন থেকে ২৫ বছর প্রায় অতিবাহিত হয়ে গেল, দ:খ বেদনা কেমন জানতাম না। এর ছোঁয়াও আমাদের গায়ে লাগতে দেয়নি। তবে এখন বুঝতে পারছি বাবা ও মা, কি যে কষ্ট করেছে, তা কলমে লিখে শেষ করা যাবে না। হে পরওয়ারদিগার! আমাদের বাবা ও মাকে উত্তম যাযা দিও, যা নিয়ে তারা খুশি থাকবে। হে প্রভু, তুমি জান আমাদের বাবা ও মা'র মতো কি শহীদের স্বজনেরা কষ্ট করে স্নেহ মায়া দিয়ে তাদেরকে বড় করে নাই? যদি তাই হয়, তাহলে তাদেরকে জান্নাতে নবীদের মত শহীদের মতো সম্মানিত কর আর মৃত্যুর সময় যে ক্ষত-বিক্ষত চেহারা স্বজনদের দেখতে হয়েছে, তা পরিবর্তন করে জান্নাতি চেহারায় তাদের সাথে মিলিত করে দিও। আমার লিখা দু:খ বেদনার কথা উল্লেখ করার কারণ হল, ১২/১৩ বছর বয়সে নিজের দাদাকে হারিয়েছি, লাশের কাছে বসে কুরআন তেলাওয়াত করেছি। কিন্তু চোখের এক ফোঁটা পানি পড়েছে বলে মনে পড়ছে না। কিন্তু ২৮ অক্টোবর এর মানবরূপী দানবদের বর্বরোচিত পাশবিকতা দেখে কত যে কেঁদেছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পরবো না। আমার মনের কাবা যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। মন চাইছে রাস্তায় বেরিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে আর বলতে– ও আমার দেশবাসী, তোমরা কি এখনো মানবরূপী পশুদের চিনবে না? ঘুম ভাঙতে আর কত দেরী? পশু পশুকে হত্যা করে, মানুষ মানুষকে কি হত্যা করতে পারে? তবুও কি তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে না? আর নতুন প্রজন্মের জন্য কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে– তা হলো, শহীদেরা তো তাদের জীবন দিয়ে তাদের ঈমানের দাবি পূরণ করে রবের সাথে দিদার করে সবুজ পাখি হয়ে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে, আমাদেরকে রবের সামনে হাজির হতে হবে কি হবে



icsbook.info

না? যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের বসে থাকার সময় কোথায়? তারাতো জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন। তাদের রেখে যাওয়া কাজে আমরা যদি শীতলতা দেখাই তাহলে শহীদের সাথে বেঈমানী করা হবে। আমাদের সময় মাল সম্পদ জীবন অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার শপথ নিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে হবে সোনালী সেই প্রভাতের দিকে, সকল বাধা ও মিথ্যা প্রচারের মোকাবেলা করতে হবে, উন্নত চরিত্র মাধুর্য সততা ভালোবাসা দিয়ে। আর একটা কথা মনের মধ্যে বারবার দোলা দিচ্ছে– তা লিখে এখানে সমাপ্তি করতে ইচ্ছে করছে না। তা হল, নতুন প্রজন্মকে শত্রু-মিত্র চিনতে হবে, এক শ্রেণীর মানুষের আচরণ দেখে মনে বড় ব্যথা হয়। তারা মুসলিম নামে পরিচিত, এক শ্রেণীকে দেখাই যায় মানব অধিকারের বুলি আওড়াতে, আর এক শ্রেণী নিজের বুদ্ধি বিদেশের কাছে বিক্রয় করে দেশকে তাঁবেদার রাষ্ট্র বানাতে স্বচেষ্ট, তাদের দেখে মনে হয় ২৮ অক্টোবর হৃদয় বিদারক ঘটনায় তারা যেন খুশি হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে বলছেন, হে রাসুল তুমি মুনাফেকদেরকে দেখতে পাবে মুমিনদের দুঃখ কষ্টে তারা আনন্দ পায়। আর ভালো কিছু দেখলে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আবার তোতাপাখির মতো গণতন্ত্রের কথা বলতে শোনা যায়। তাই যদি না হবে, তাহলে ২৮ অক্টোবরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ওরা একটি বিবৃতি দিতে পারলো না কেন? মুখে যেন কুলুপ এঁটেছে! গণতন্ত্রের অর্থই হচ্ছে বিভিন্ন দলমত থাকবে। সবার মত প্রকাশ করার অধিকারকেই তো গণতন্ত্র বলে। সম্প্রতি আইন উপদেষ্টা বলেছেন, মতলববাজ বুদ্ধিজীবীদের সত্য উপলব্ধি করার জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। এদের কাছে দেশের চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে ব্যক্তি বড়।

ষড়যন্ত্রকারীরা ইসলামকে ধ্বংস করতে পারবে না। ইসলাম ছিল আছে এবং থাকবে। কারণ ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহর নিজেই নিয়েছেন। ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে, তরুণ যুব সমাজকে এদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে। ইতিমধ্যে কোটি কোটি জনতা এদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে দিন বেশি দূরে নয়, ১৫ কোটি মানুষ এদের প্রতি ঘৃণা জানাবে।

শহীদদের স্বজনদের জন্য কিছু না লিখলে লিখা যেন অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। শুধু এতটুকু বলবো, বাবা ও মা আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সন্তানেরা তিল তিল করে বড় হয়েছিল, তাদেরকে হারিয়ে আপনাদের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত। তবে এটাও সত্য, আপনারা এক সন্তানকে হারিয়ে লাখ লাখ সন্তানের মা ও বাবা হয়েছেন। এক মুজাহিদ, এক শিপন, এক মাসুম আপনাদের জন্য হাত তুলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতো। আল্লাহর কসম এক দুই নয়, লাখ লাখ মাসুম, মুজাহিদ, শিপন আপনাদের জন্য হাত তুলে দোয়া করছে, আপনাদের ধৈর্যের পাহাড় হতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমার নবীর রক্ত যেখানে ঝরেছিল, সেখানে আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীর (রা.)এর আর্ভিভাব হয়েছিল। এই সুফল কোটি কোটি জনতা ভোগ করেছে। বাংলার জমিনে কুরআনের রাজ কায়েম হবেই ইনশাল্লাহ। আপনারা ধৈর্য্য ধারণ করুন। আর জান্নাতের শহীদদের সাক্ষাতের অপেক্ষা করতে থাকুন। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের সকলকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন, আমিন!! ■



icsbook.info

# রক্ত ঝরা ২৮ অক্টোবর

রোকেয়া বেগম

"যে স্মৃতি কাঁদায় আমারে সে স্মৃতি গেঁথে আছে
২৮ শে অক্টোবরে"

হ্যাঁ, তাইতো! সত্যিই– '২৮ অক্টোবর' ইতহাসের সেই জঘন্যতম দিন, যে দিনের কথা স্মরণ হতেই শরীরের প্রতিটি পশম শিউরে ওঠে। এটি সেই দিন যে দিন লগি-বৈঠাধারি আওয়ামী হায়েনারা ক্ষুধার্ত হিংস্র জানোয়ারের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আল-কুরআনের বিপ্লবী আহবানে সাড়া দানকারী টগবগে তরুণ সৈনিকদের প্রতি।

"২৮ অক্টোবর" মানেই রক্ত ঝরা একটি দিবস, যে দিবসে আওয়ামী হায়েনাদের বর্বর ছোবলে নিষ্পেষিত হয়েছিল মজলুম জনতা। রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল শত শত মুজাহিদদের তাজা খুনে। যারা আল্লাহর এই সবুজ ভূমিতে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দীপ্ত শপথে বলীয়ান।

লগি-বৈঠাধারি বর্তমান যুগের ফেরাউনরা ভেবেছিল ২৮ অক্টোবর মুজাহিদ মাসুম আর শিপনের শাহাদাতের মাধ্যমে বাংলার এই সবুজ ভূমিতে কালিমা খচিত পতাকাকে উড্ডীন করার দীপ্ত শপথে বলিয়ান সৈনিকদের রোখা সম্ভব। কিন্তু হায়েনারা ভুলেই গেছে যে, রক্তের এবং মরণের ভয় দেখিয়ে এই সৈনিকদের রোখা যাবে না। কারণ তারা শাহাদাতের তামান্নায় উদগ্রীব। যে কথার বাস্তব সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সুরেলা কণ্ঠের গান–

"মরতেই হবে যখন শহীদী মরণ
দিও আমাকে
শাহাদাত জানি শুধুই জীবন
সে জীবন দিও আমাকে"

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠে যে, পৃথিবীর প্রাথমিক দিক হতেই বাতিল শক্তি রক্ত ঝরানোর মাধ্যমে পৃথিবী হতে নিঃশেষ করে দিতে। কিন্তু বাতিল শক্তির রক্তচক্ষু দলিত মথিত করে ইসলামের মহান সৈনিকগণ আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিজেদেরকে ইসলামের জন্য বিলিয়ে



icsbook.info

দিয়েছেন। আর ইসলামের চিরশত্রু যুগের 'ফিরাউনরা ও' একইভাবে ২৮ অক্টোবরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ঢাকার পল্টন ময়দানে তাদের হিংস্র থাবার মাধ্যমে রক্ত ঝরিয়ে চেয়েছিল বাংলার সবুজ জমিন হতে ইসলামের সংগ্রামকে উৎখাত করে দিতে। যুগের ফেরাউন যতই চেষ্টা করুক না কেন তারা কখনো ইসলামকে বাংলার ভূমি হতে উৎখাত করতে পারবে না। কারণ কাফেরদের মনোকষ্ট যতই হোক না কেন আল্লাহ তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেনই। আর আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেন :

"তারা চায় মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে আর আল্লাহ তার নূরকে প্রজ্জ্বলিত করবেনই যদিও তা কাফিরদের নিকট কষ্টকর হয়"।

লগি-বৈঠাধারি আওয়ামী হায়েনাদের জেনে রাখা উচিত লগি-বৈঠার ভয় দেখিয়ে কিংবা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকদেরকে আন্দোলন হতে হটানো যাবে না। মুসলমানদের মন্ত্রের সাধন হবে কিংবা শরীর পাতন হবে তবুও তারা বাতিল শক্তির কাছে মাথা নত করবে না। কারণ মুসলমান এমন জাতি যারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করে না। জনৈক কবির কণ্ঠে ভেসে উঠে-

"আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে
নোয়াই নাকো আমার মাথা
এই দুনিয়ায় ছড়িয়ে চলি
মুক্ত মালায় হৃদয়ে গাঁথা।"

আর হ্যাঁ বাতিল শক্তিকে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রদর্শিত পথই সত্য পথ। আসমান, যমিন হতে শুরু করে সকল কিছুই হচ্ছে সত্যের বাস্তব সাক্ষ্য। আর আল্লাহ একদিন সত্যকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। তাইতো শিল্পীদের সুরের ঝংকার-

"সত্যের জন্য আসমান যমিন ও
সত্যের জন্য কুল মাখলুক
একদিন সত্যের জয় হবে নিশ্চয়
উজ্জ্বল হবে মহা সত্যের মুখ।"

রক্তঝরা ২৮ অক্টোবর মুজাহিদ, শিপন আর মাসুম সহ যারা তাঁদের বুকের তাজা খুন ঢেলে দিয়েছেন তারা আমাদের জন্য প্রেরণা হয়ে রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাহ এবং জান্নাতের উড়ন্ত সবুজ পাখি। তাঁরা আমাদের মাঝে চিরকাল অমলিন হয়ে থাকবেন। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত তাদেরকে হারানো শোককে শক্তিতে পরিণত করে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। আর তাইতো আল-কুরআনের সৈনিকদের সুরের মূর্ছনায় শুনা যায়–

"আমার ভাইয়ের শাহাদাতে
চোখের পানি কেউ ফেল না
ওরা আমাদের গর্বের ধন
ওরা মাবুদের প্রিয় জন।"

মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন ২৮ অক্টোবরের শহীদদের শাহাদাত কবুল করেন। ■



icsbook.info

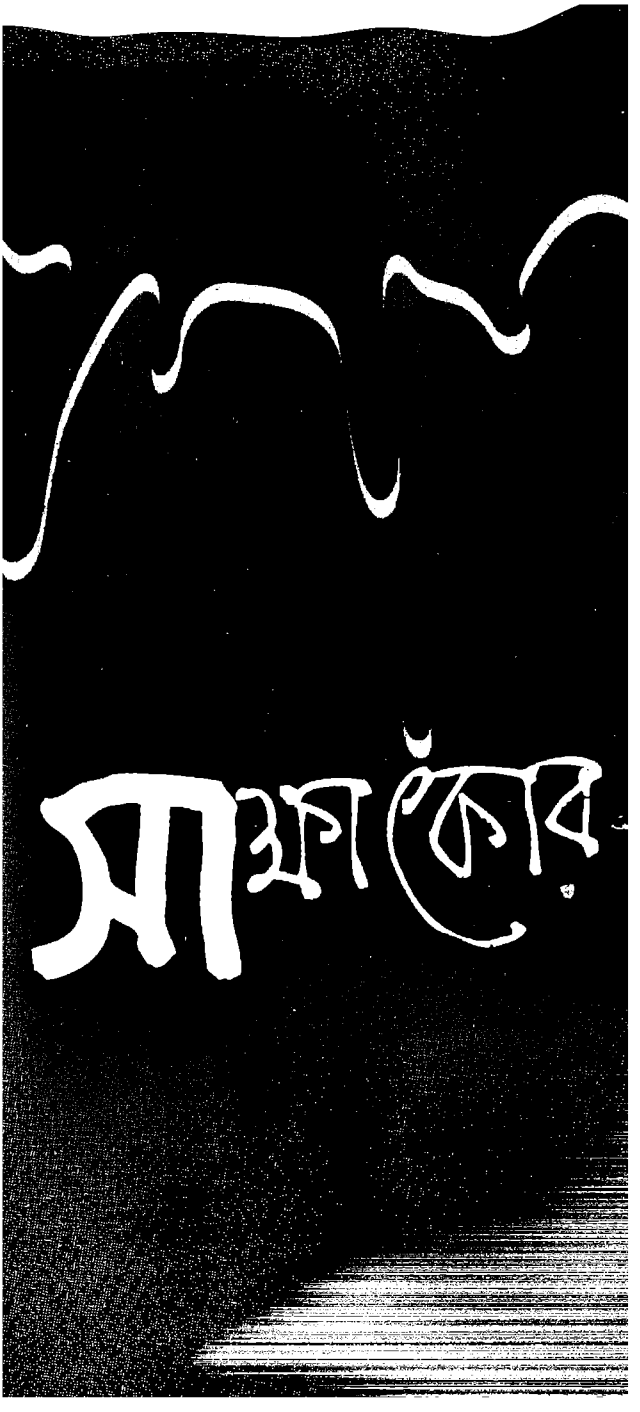


icsbook.info

icsbook.info

# শহীদ মায়েদের
# সাক্ষাৎকার

২৮ অক্টোবর, ২০০৬-এ পল্টন মোড়ে জামায়াতের সমাবেশে আওয়ামী লগি-বৈঠা বাহিনীর নির্মম আঘাতে জামায়াত ও শিবিরের ৬ নেতা-কর্মী শাহাদাতবরণ করেন। এখানে প্রশ্নালোকে ক'জন শহীদ জননীর সাক্ষাৎকার উপস্থাপন করা হল। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ :

১। আপনার সন্তানের শাহাদাতের খবর শুনে আপনার কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?
২। সর্বশেষ সাক্ষাতে তার সাথে কি ধরনের কথা হয়েছিল?
৩। আপনার সন্তানের কোন বিষয়টি আপনার পরিবারের সবাইকে নাড়া দেয়?
৪। পরিবারে তার অবস্থান কি ছিল?
৫। তার কোন দিকটি পরিবারের সবার কাছে প্রিয়?
৬। আপনার সন্তানের মৃত্যুতে পরিবারে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে?
৭। ইসলামের প্রতি পূর্ব থেকে তার কোন আকর্ষণ লক্ষ্য করেছেন কিনা?
৮। ইসলামী আন্দোলনের জন্যে নিবেদিত সন্তানদের প্রতি আপনার পরামর্শ কি?
৯। আপনার সন্তানের স্মরণীয় একটি ঘটনা বলুন।
১০। দেশের দলীয় রাজনীতিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

## শহীদ মুজাহিদের আম্মা মাহমুদা মানসুরী মুন্নী

১। আমি এমন এক মা, যে মায়ের কাছে তার সন্তান সব সময় একটি দোয়া চাইতো, আর তা হলো– মা, তুমি দোয়া কর আমি যেন আল্লাহর পছন্দনীয় পথে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি। আর তাই যখন শুনলাম আমার আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ, আমার নাড়ীছেঁড়া ধন, আমার স্বপ্ন, আমার অতি আদরের মুজাহিদ তার মাকে ফাঁকি দিয়ে শাহাদাতবরণ করেছে তখন তার অতৃপ্ত বাসনা পূরণ হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া



icsbook.info

আদায় করলাম। নিজেকে বড় ভাগ্যবান এক মা মনে হয়েছিল, কারণ মৃত্যু মানুষের এক অবধারিত নিয়তি। আর যদি সে মৃত্যু হয় আল্লাহর নির্দেশিত পথে তবে তার চেয়ে সার্থক মৃত্যু আর কি হতে পারে বলো?

২। ২০০৬ সলের ২৮ অক্টোবর, শনিবার। সেদিন মুজাহিদের নানা-নানু অর্থাৎ আমার বাবা মা উমরা হজ্ব করে দেশে এসেছিলো। দুপুর ১২টায় তাদের ফ্লাইট ল্যান্ড করবে এয়ারপোর্টে। তাই বাসায় সকাল বেলাই সব আপনজনেরা এসে ভিড় করছে। তাই সকলকে সকালে নাস্তা করানোর জন্য আমি অনেক রুটি বানানোর জন্য আটার ময়ান করে রুটি বেলতেছিলাম। সকাল আনুমানিক সাড়ে ৬টার সময় মুজাহিদ আমাকে বলল, আম্মু আমার খুব ক্ষিধা পেয়েছে। আমাকে খেতে দাও। আমি বললাম, বাবা সবুর কর, রুটি সেঁকে দিচ্ছি। ও বলল, আমি রুটি খাবো না। ঘরে পান্তা ভাত থাকলে আম্মু দাও। তখন আমার হাতে আটা লাগানো। তাই নিজে ভাত না দিয়ে আমার ছোট বোনটিকে বললাম ১টা ডিম ভেঁজে ওকে ভাত দিতে। ওকে ভাত দেওয়া হলে অর্ধেক পরিমাণ ভাত খেয়ে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। আমি ড্রাইনিং রুম থেকে উঠে এসে বললাম, বাবা কোথায় যাও?

ও বলল, আম্মু আজ পল্টনে আমাদের সমাবেশ আছে। কয়জন সাথী ভাই যাবে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করতে। আমি একটু ওদের বাস টার্মিনাল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। আমি বললাম মানিক (আদর করে) তুমি কখন যাবে? ও বলল, আম্মু আমি ১২টার পর যাবো। তবে আম্মু তুমি আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করো– বলে এগিয়ে যায় ওদের নিয়ে। এই ছিল ওর জবানবীতে আমার শোনা শেষ কথা।

তারপর ওর সাথী ভাইদের নিয়ে টার্মিনাল যাবার পথে নাকি ওর মোবাইলে দায়িত্বশীলদের কল আসে যে, মুজাহিদ তুমিও চলে আসো ওদের সাথে। তখন ও ফিরে এসে আর মাকে বলে যেতে পারেনি। ও কোনদিন ভুলেও কক্ষণো আমাকে না বলে কোথায়ও যায়নি। যখন জানতে পারলাম তখনতো ও পল্টন না, ও দুনিয়া ছেড়ে ওর প্রিয় মাকে ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওপারে। ছেলে চলে যাবার পর সেই ৭টার দিকে আমি আমার ছোট জার বাবার বাসায় যাই। ওর প্রসব বেদনা শুরু হয়েছিল, তাই ওকে নিয়ে হাসপাতালে যাই। বাসায় ফিরে আসি আছর নামাজের পর। ইত্যেবসরে আমার কলিজার টুকরা মুজাহিদের আম্মু ডাক শোনা চির দিনের জন্য শেষ হয়ে গেল।

৩। যদি আদর্শের কোন সংজ্ঞা থাকে তবে তার উত্তম উদাহরণ হলো মুজাহিদ, আমার কলিজার টুকরা মুজাহিদ। ও ছিলো সব দিকে থেকে আদর্শবান, নমনীয়, শান্ত, মার্জিত ও অত্যন্ত ভদ্রছেলে। আসলে আমি ওর মা বলে বলছি না। ও ছিলো সত্যিকার অর্থে বাবা-মার অতি আদরের হৃদয় জুড়ানো চক্ষুশীতলকারী সন্তান। আল্লাহর প্রতি ছিলো ওর প্রগাঢ় ভালবাসা। ও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ পড়া ও তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতো। কখনো বড়দের সাথে বেয়াদবী ও ছোটদের সাথে তর্ক ও শাসাতো না। এলাকাতে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সকলকে একবাক্যে সম্মান করতো। আপন-পর সকলের আবদার পূরণ ও নিজের কর্তব্য মনে করতো সব সময়। কেউ শুনেনি বা দেখেনি ওকে কোন কাজ করতে বলা হলে ওর যতই কষ্ট হোক না কেন, না বলতে শিখেনি। 'না' শব্দটা ওর ক্ষুদ্র জীবনের ডায়েরীর পাতায় লিখা ছিলোনা। যৌথ পরিবারের সবার সাথে ভালো



icsbook.info

ব্যবহার করে সকলের আবদার পূরণ করে সকলের মনে সে সুবিশাল জায়গা করে নিয়েছে।

৪। পরিবারে তার অবস্থান ছিলো সবার বড় সন্তান সে।

৫। ও এমন একটি মূল্যবান রত্ন ছিলো যে, তাঁর সকল কিছুই প্রিয় ছিল। অপ্রিয় বলতে কোন কিছু ছিলো না ওর মাঝে কখনো কোনদিন।

৬। মুজাহিদ আমাদের পরিবারের সকলের আশার আলোয় উজ্জ্বল আলোকময় এক স্বপ্ন ছিলো। পরিবারের প্রত্যেকের নির্ভরতার প্রতীক ছিলো সে। স্বাভাবতই ওকে হারিয়ে আমরা সবাই একটা বড়ো ধরনের শোক পেয়েছি। পরিবারের বড় সন্তান হাবার কারণে ওর আব্বুর প্রচুর আশা ছিল যে, সন্তান তাঁর সকল অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপ দিবে। তাঁর স্বপ্ন সাধও ছেলের মাধ্যমে বাস্তাবে রূপ দিবে। আশা ছিল ছেলে লেখা পড়া শেষ করে তাঁর সংসারের হাল ধরবে। আর সে কিছুটা নিস্কৃতি পাবে তার ব্যস্ততা থেকে। কিন্তু কাল ২৮ অক্টোবর তার বাবার স্বপ্ন, সাধ, আকাঙ্খাকে নিরাশায় পরিণত করে দিয়েছে। নান-নানী, ফুফু, খালা, চাচা-চাচী, মামা-মামী এমনকি ছোট ভাইবোন কাউকে কক্ষণো সে দুঃখ দেয়নি, কটু কথা বলেনি, সকলের আবদার পূরণকে হাসিমুখে কর্তব্য মনে করে পালন করতো। কেউ বলতে পারবেনা যে কোন কাজের হুকুম কেউ দিলে সাথে সাথে তা করেনি। হাজারো কষ্ট হলেও সেটা তামিল করতো যত্নসহকারে। তবুও তাঁকে দুঃখ দিয়ে মুখের উপর না বলতে পারতো না কক্ষণো।

আর আমার মুজাহিদের আদর্শ ছিলো ওর নানা। আর মুজাহিদ ছিল তার নানার কাছে ইসলামী আন্দোলনের জন্য তার সমস্ত অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপ দেবার এক যোগ্য প্রতিনিধি। কিন্তু ওর নানাও হয়তো কখনো ভাবতে পারেনি যে মুজাহিদ তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে এতটা সম্মানে ভূষিত করবে। মুজাহিদ বেঁচে থাকলে হয়তো পরিবারের জন্য বড় সম্পদে পরিণত হতো। কিন্তু এতোটা সম্মানিত করতে পারতো না আজ বিশ্বদরবারে তার পরিবারকে। আমার নয়নমণি, আমার মুজাহিদ সবার চোখের সামনে না থেকে প্রতিটি মুহূর্তে আপন পর সবার মনে উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের দ্যুতি ছড়াবে আমৃত্যু।

৭। মুজাহিদ জন্ম থেকেই ছিল আলাদা বৈশিষ্ট্যের। প্রচন্ড লাজুক এবং শান্ত, ধীরস্থির ও নম্র স্বভাবের ছিল। প্রত্যেকটি শিশু থেকে আলাদা ছিল ও। একদম কান্নাকাটি করেনি বললেই চলে। অসুখ হলে সামান্য বিরক্ত করত নতুবা খাবার খেলেই কি না খেলেই কি, কান্নাকাটি তেমন করতে জানতো না ও। আর একদম শিশু বাচ্চা বয়স থেকে ওর হাতে যাই থাকতো কেউ চাইলে সে পরিচিত হোক আর অপরিচিত হোক সাথে সাথে দিয়ে দেওয়া ছিল ওর স্বভাব। দিয়ে সেটা আবার কখনো ফেরত চাইতো না। ছোট বেলা থেকে নানার সাথে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতো। বিরক্ত করতো না মোটেও। যার দরুন শিশুবয়স থেকেই সবাই ওকে খুব ভালবাসতো। ওর শখের জিনিস কেউ নিলেও কান্নাকাটি করতো না। আমাকে বলতো আম্মু আমাকে আরেকটা এনে দিও। আমার কাছে কেউ সাহায্য চাইতে এলে আমাকে কেমন ধাক্কা দিতো আর বলতো আম্মু ওকে টাকা দেওনা। ও বড় হবার পরও এইসব অভ্যাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি। জান দিয়ে চেষ্টা করতো সকলকে সাহায্য করতে। নিয়মিত নামাজ পড়তো। কুরআন তেলাওয়াত করতো।



icsbook.info

তাহাজ্জুদ আদায় করতো। ৬/৭ বছর বয়স থেকে রেগুলার সব রোজা থাকতো। ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন তাঁর প্রিয় বিষয় ছিলো। ইসলামী সংগঠনের প্রতি তার ভালবাসা এতো প্রবল ছিলো যা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সাংগঠনিক কোটা পূরণ করতে না পারলে তার ঘুম হারাম হয়ে যেতো। আমার কাছে হাত পাততো। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম ওকে সহায্য করার জন্য। তার ছোট বেলা থেকে নানার সান্নিধ্য অনুপ্রেরণায় মুজাহিদ একজন সত্যিকার মুজাহিদে পরিণত হয়।

৮। আমরা সকলে মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তার হুকুমে আমাদের দুনিয়াতে আগমণ আবার সময় হলে তার হুকুমেই প্রত্যাবর্তন। কারো কোন শক্তি নাই তার এ হুকুমকে রোধ করতে পারে। আর আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতে অবস্থানকালীন সময়ে সঠিক পথে টিকে থাকার জন্য জীবনবিধান স্বরূপ আল-কুরআন নাজিল করেছেন। তাই বলি, আমরা কি প্রতিনিয়ত কুরআন পড়ছি, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলছি, কি আমল নিয়ে যাচ্ছি অন্ধকার কবরে। তাই অনুরোধ, এসো আলোর পথে, থেকো না অন্ধকারে। আল্লাহর জবাবদিহিতার হাত থেকে যেন আল্লাহ সকলকে রক্ষা করে সেই যোগ্য আমল প্রত্যেকে গড়ে তুলি। আর কুরআনের আলোকে নিজেদের জীবন গড়ি। তাহলে কোন কিছু হারানোর নেই বরং আছে চিরস্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা। তাই সকল দুনিয়াবী ভয়ভীতি উপেক্ষা করে আন্দোলনের বিজয়ের স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সব সময় সব মুহূর্তে– তবেই না বাতিল পরাভূত হবে এবং এই জমিনে ইসলামের শাশ্বত পতাকা বিজয়ের আলোয় উদ্ভাসিত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চলাতে হবে সকলকে। মুজাহিদদের আসমাপ্ত কাজগুলো যাতে পূর্ণতায় রূপ দিতে পারি আমরা। মহান আল্লাহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা কবুল করুন তার পছন্দনীয় পথে। সকলে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারি সেই যোগ্যতা ও সুস্থতা দান করুন সকলকে।

৯। মুজাহিদের আব্বু খুবই হিসেবী মানুষ। বেহিসেবী চলা তার অসহ্যের বিষয়। একদিনের একটি ঘটনা যা কোন দিন ভোলার মত নয়। ছাত্রসংগঠন থেকে পিকনিকে যাবে কক্সবাজার। সে এসে আবদার করলো আম্মু আমি ভাইয়াদের সাথে পিকনিকে যাবো। প্লিজ মা, তুমি অন্তত নিষেধ করো না। আম্মু দাওনা আমায় পিকনিকের চাঁদার টাকা। বলে আমার হাত চেপে বসে রইলো সে। এত ভালো একটা ছেলে আমার যে, ও কোন কিছু চাইলে দিতে না পারলে বুকটা আমার ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ওকে কিছু দিতে পারলে ওর মুখের হাসি দেখলে আত্মাটা আমার জুড়িয়ে যেতো। পিকনিকের চাঁদা ছিলো ৮০০ টাকা। নিজের কাছে কিছু ছিলো আর কিছু টাকা ধার করে ওকে এনে দেই। তখন ও ভুবন ভোলানো যে হাসি দিয়েছিলো তা আজো আমার চোখে অমলিন। বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, পিকনিকের চাঁদার চাইতে এক টাকাও বেশি দিতে পারিনি আমি। তবে পিকনিক থেকে ফেরার পথে ওখানকার শপিংয়ে যায় সকলে। তখন ও ওর কোন এক ভাইয়ের থেকে কিছু টাকা হাওলাদ করে ছোট ভাই রাফির জন্য ১টি ফতুয়া, বোন মালিহার জন্য ১টি উপজাতীয় মেয়েদের পোশাক আর ওর আম্মার জন্য চমৎকার লালরংয়ের তাঁতের একটি ওড়না কেনে। দোকানী নাকি ওকে বলে, ভাই আপনার জন্য কিছু নিবেন না? মুজাহিদ উত্তর দিলো, আমার জন্য আমার অম্মুই যথেষ্ট। আমার আম্মুই আমার সবকিছু কিনে দেন। আমার কিছু লাগবে না ভাই।



icsbook.info

ও ধার করেছিলো ৫০০ শত টাকা। কিন্তু ওর সদাই করা জিনিসের দাম ছিলো আরো বেশি। দোকানী ওর কথায় মুগ্ধ হয়ে বলে, এমন ছেলেতো দেখিনি কখনো। যে নিজের চিন্তা না করে মা, ভাই, বোনের চিন্তা করে। দোকানী খুশি হয়ে বলে, দাও তোমার ৫০০ শত টাকাই দাও। তবে দেখো এ দাম আর কাউকে বলতে যেওনা। ও যখন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলো এবং গিফটগুলো আমায় দিলো তখন অমি খুশিতে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। আর চোখ দিয়ে কেবল আনন্দাশ্রু বের হচ্ছিল। যেখানে সবাই নিজের জন্য কিনছে সেখানে উঠতি বয়সের ১টা ছেলে হয়েও তার শখকে মাটি দিয়ে মুজাহিদ করলো তার ব্যতিক্রম।এমন ছেলের জন্য সেদিন আমি আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করে ভাবলাম যে, সত্যিই আমার জন্ম সার্থক হয়েছে যে, আমি মুজাহিদের মতো ছেলের মা হয়েছি।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের আলোকে দেশের চলমান দলীয় রাজনীতি মূল্যায়ন করা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানেরই সবচেয়ে সহজ। কারণ বর্তমান সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের আলোকে দেশে বর্তমানে দুটি ধারার রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের সন্ধান পাওয়া যায়।

এক. যাঁরা রাজনীতিকে নিজের উপরে অর্পিত দায়িত্ব হিসেবে মনে করে এবং স্রষ্টার পথ নির্দেশনা অনুযায়ী তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত করে। যার ফলশ্রুতিতে যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে ইহলৌকিক মোহে পথভ্রষ্ট হয় না। যার উপযুক্ত প্রমাণিত দৃষ্টান্ত বিগত সরকারের জামায়াতের দুই মন্ত্রী। সবচেয়ে তৃপ্তি লাগে যখন দেখি দেশের সমস্ত মিডিয়া একজোটে প্রাণান্তকর চেষ্টার পরও এদের দুর্নীতির ছিঁটা-ফোঁটাও আবিস্কারে ব্যর্থ হয়ে তথাকথিত সমালোচনায় মেতে ওঠে।

দুই. যারা রাজনীতিকে ইহলৌকিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে শুধু মাত্র নিজেদের পাপের খাতাটাই সমৃদ্ধ করে।

## শহীদ মাসুমের আম্মা শামসুন্নাহার রুবি

১। আমি আমার সবচেয়ে আদরের প্রাণপ্রিয় সন্তান মাসুমের শাহাদাতের খবর শুনে কান্না ভুলে গিয়েছিলাম। সেই মুহূর্তে শুধু আলহামদুলিল্লাহ পড়েছি ও দু'রাকাত নফল নামাজের মাধ্যমে ওর শাহাদাত কবুল হবার দোয়া করেছি। আমি জ্ঞান হারাইনি। কারণ আমার পরিকল্পনাই ছিল আমার সন্তানরা অসত্য উৎখাত করে হক প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ''হয়তো শহীদ নয়তো গাজী'' হবে। সাইফুল্লাহ মোহাম্মাদ মাসুম নামের মর্যাদা রক্ষা করবে। আমি শহীদের মা হব, গাজীর মা হব। আল্লাহপাক আমার দোয়া সত্যি কবুল করেছেন।

২। সর্ব শেষ সাক্ষাতের সময় শহীদ মাসুমের সাথে আমার কোন কথা হয় নাই। আমি রান্না ঘরে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আর শহীদ মাসুম পল্টনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ও এলাকার সব কর্মী ভাইদেরকে ডেকে সাথে নিয়ে পল্টনে চলে গেল।

৩। শহীদ মাসুম ছিল খুবই মিশুক। দূর-দুরান্তের আত্মীয়তা রক্ষায় সে ছিল তৎপর। সে ছিল বন্ধুভাবাপন্ন। সবার সাথে সহজেই মিশে যেতে পারতো।



icsbook.info

৪। পরিবারের ৫ ভাই-বোনের মধ্যে সে ছিল সবার আদরের। কেন জানি সবাই তাকে বেশি ভালবাসতো। চাচা, মামা খালাদের পরিবারেও সে ছিল সবচেয়ে প্রিয়। তাকে ছাড়া কারো ভাল লাগতো না।

৫। শহীদ মাসুম ছিল স্মার্ট, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। সব সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতো। সে ছিল শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের। এই জন্য আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ভালবাসতো। শহীদ মাসুম ছিল ত্যাগী যুবক। সে মানুষকে দিতে পছন্দ করতো। অন্যকে সাহায্য সহযোগিতার বেলায় সে ছিল সদা তৎপর এক সৈনিক।

৬। মায়ের সবচেয়ে আদরের সন্তানটিকে আল্লাহ পাক শাহাদাতের মৃত্যু দিয়েছেন। বর্তমানে পরিবারের সবার ভিতরে জিহাদী জযবা আরো বেড়ে গেছে। সারাক্ষণ মুখের মধ্যে একটা প্রশ্ন উদিত হয়, শহীদ মাসুম ইসলামের জন্য জীবন দিয়ে দিল আর আমরা বর্তমানে কতটুকু কাজে তৎপর হয়েছি। ভালভাবে আন্দোলনের কাজ করতে হবে এই অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে।

৭। ইসলামের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল শিশুকাল থেকে। সে ৫/৬ বৎসর বয়স থেকে রোজা রাখতো এবং ৭ বৎসর বয়স থেকে জামায়াতে নামাজ পড়তো। একটা ঘটনা এখন মনে পড়ে। ও ছোট বেলায় মাথায় টুপি দিয়ে রাখতো। টুপি পরে কোচিংয়ে গিয়েছিল। কোচিংয়ে যাওয়ার রাস্তায় টুপি নিয়ে ঠাট্টা করেছিল বলে সে এ কোচিংয়ে পড়া বন্ধ করে দিয়েছিল। আই.এস.সি পড়া অবস্থায় ঘরে একজন বুয়েট স্টুডেন্টকে শিক্ষক হিসেবে রেখেছিলাম। শহীদ মাসুমের টেবিলে কুরআন হাদীসের বই দেখে মোল্লাদের সম্পর্কে কটাক্ষ করে কিছু কথা বলেছিল সেই গৃহশিক্ষক। শহীদ মাসুম শিক্ষকের ইসলাম বিরোধী মনোভাব দেখে শিক্ষক চলে যাওয়ার পর আমাকে বলে, আম্মু আমি আর এই শিক্ষকের কাছে পড়বো না। শেষ পর্যন্ত পরদিন শিক্ষক মাসুমকে পড়াতে আসলে কিন্তু মাসুম সেই শিক্ষকের কাছে আর পড়লো না। তার ইসলামের প্রতি ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা। ইসলামের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ ছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে সে সহ্য করতে পারতো না।

৮। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সন্তানদের প্রতি আমার পরামর্শ হল– কিশোর ও যৌবনকালই হলো আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। যৌবনের একবার আল্লাহ ডাক বৃদ্ধের ৭০ বারের সমান। যৌবনের ঘুম বৃদ্ধের এবাদতের সমান সওয়াব। অতএব, সময় অযথা নষ্ট না করে লেখাপড়ার পাশাপাশি আল্লাহর দ্বীন ইসলাম আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যার যার circle-এ একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। সহপাঠিদের মাঝে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা তুলে ধরে একদল চরিত্রবান মানুষ তৈরি করা। যত তাড়াতাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দাওয়াত পৌঁছানো যাবে, ততই ইসলামের বিজয় তড়ান্বিত হবে। আলল্লাহ যেন তোমাদেরকে সুযোগ্য দায়ী ইলাল্লাহ বানান সেই দোয়া করছি।

৯। মাসুম ছিল অসম্ভব সাহাসী ছেলে। ও রাতের বেলা কাজ করতে ভয় পেত না। প্রায়ই শহীদ মাসুম ওয়াল রাইটিং, পোস্টারিং এর কাজ করত গভীর রাতে। এই শিক্ষা পেয়েছে বড় ভাই শামসুল আলম মাহবুব থেকে। একবার গভীর রাতে কয়েকজন কর্মীভাই নিয়ে পোস্টারিংয়ে গিয়েছিল। গভীর রাতে পুলিশের গাড়ি এসে এদের ধরে



icsbook.info

নিয়ে গেল থানায়। আর আমিতো জানি আল্লাহর কাজে গিয়েছে। প্রতিদিনের মতো কাজ সেরে ফজর নামাজ পড়ে বাসায় এসে ঘুমাবে। কিন্তু দেখা গেল ফজর পার হয়ে সূর্য উঠে গেল। মাসুম আর আসেনা। আমিতো পেরেশান মাসুমের চিন্তায়। নফল নামাজ পড়ে দোয়া করছি। তারপর মন মানছে না। বড়ই পেরেশানিতে সময় কাটতে লাগলো। না জানি আর মাসুমকে ফিরে পাবো না। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ঘরের বাইরে বের হলাম মাসুমের খোঁজে। শহীদের বড় ভাই শামসুল আলম মাহবুব খবর আনল মাসুম নানুর বাসায়। তারপর আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম।

রাতের গভীরে মাসুম নানুর বাসায় ফোন করলো ''আমরা পোস্টারিংয়ে বের হলে পুলিশ ধরে নিয়ে এসেছে।" খবর শুনে মাসুমের নানা ও বড় ভাই মাহবুব সেখান থেকে উদ্ধার করে আনে।

মাসুমকে হারানোর ব্যথায় বুক ভেঙ্গে যায়। শহীদ মাসুম সেই রাতেও তো নিখোঁজ হয়ে যেতে পারতো। সন্ত্রাসীরা সেই রাতেও মেরে ফেলতে পারতো। জীবনকে হাতে নিয়ে আল্লাহর কাজ করতে মরণকে সে ভয় পেত না। মানুষ মরণশীল। একভাবে না একভাবে মানুষের মৃত্যু আসবেই। শহীদী মরণ ক'জনে পায়? এই সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে আছি। একরাতে ওকে না পাওয়ায় কিযে ব্যথা অনুভব করেছি তা ব্যক্ত করার ভাষা পাচ্ছি না। আজ মাসুম এমন এক জায়গায় চলে গেছে যার ঠিকানা জান্নাত। সেখানে আল্লাহর পছন্দনীয় আমল ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয়। তার খোঁজ পাওয়াও সম্ভব নয়। যদি আমল ভাল হয় তাহলে আশা, যতদিন বেঁচে থাকবো তত দিন এই বুক ভরা ব্যথা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। সবর করে বেঁচে থাকতে হবে ঐ আশায় যদি শহীদের শাফায়াত আল্লাহপাক নছীব করেন।

১০।দেশের ভিতর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে। তারা আদর্শ বিবর্জিত দল। তাদের টার্গেট হল দুনিয়া পাওয়া। তাদের রাজনীতিতে কোন আদর্শ নেই। তারা খুন খারাবি করে মানুষ মেরে ক্ষমতায় যেতে চায়। আদর্শ বিবর্জিত দল দ্বারা কোনদিন জাতির মঙ্গল হতে পারে না। আল্লাহপাক আমাদের সৃষ্টি করে একা ছেড়ে দেননি। আমাদের দিয়েছেন পথের দিশা। পাঠিয়েছেন জীবন বিধান আল কুরআন, সঠিক পথ বাতলে দেয়ার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

মানুষ সমাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সুন্দর সুশীল সমাজ গড়ার দায়িত্ব আল্লাহ মানুষকেই দিয়েছেন। মানুষ কুরআনের আলোকে সুন্দর সুশীল সমাজ গঠন করতে পারে।

কুরআনের আলোকে যে সমাজ তৈরি হবে, সেই সমাজে থাকবে না মারামারি, কাটাকাটি। সে সমাজে থকবে শুধু শান্তি আর শান্তি।

আসুন আমরা কুরআনের রাজ কায়েম করি। কুরআনের রাজ কায়েম হলে দেশের প্রতিটি মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলিমরা ভাই ভাই হয়ে বসবাস করবে। একে অপরের সুখ-দু:খের সাথী হবে। আর ছেলেহারা মায়ের কান্না, স্বামীহারা বোনের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হবে না।



icsbook.info

সবাই সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারবে। আল্লাহপাক আমাদের দেশকে দেশের মানুষকে হেফাজত করুন আমীন।

## শহীদ শিপনের আম্মা মাহফুজা বেগম

১। আমি আমার প্রিয় ছেলে শিপনের শাহাদাতের খবর পেয়ে প্রথমে মানবিক দুর্বলতার কারণে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। কিন্তু পরক্ষণেই চোখের পানি মুছে ফেলে আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করি এই ভেবে যে, আমার ছেলেতো শহীদ হয়েছে। আমিতো শহীদ জননী। শহীদের মর্যাদা আল্লাহপাকের নিকট অনেক বেশি। তাছাড়া আমিতো নিজেই তাকে ইসলামী আন্দোলনের রাস্তায় পাঠিয়েছি। যে আন্দোলনের সর্বোচ্চ ত্যাগ হচ্ছে শহীদ। আর তাই শহীদের মা হয়ে আমি গর্ববোধ করি।

২। শাহাদাতের দিন শহীদ শিপন ছিল খুবই ব্যস্ত। এলাকার বিভিন্ন ছেলেদেরকে সংগঠিত করে কিভাবে পল্টনের সমাবেশে নেয়া যায় শিপন সেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শিপনের মিছিলে যাওয়ার পেরেশানীর কারণে তেমন কোন কথা হয়নি। বাসা থেকে বের হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আমাকে বলেছিল 'মা' মাসুম বাসার বাইরে অপেক্ষা করছে তাড়াতাড়ি কিছু খাবার দেন। পরে তারা দু'জনে শাহাদাতবরণ করেছে।

৩। শহীদ শিপন ছিল অত্যন্ত হাসিখুশির। কখনো কোন বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করতো না। পরিবারের কিংবা বাইরের কারো কখনো মন খারাপ হলে গল্প ও কৌতুকের মাধ্যমে সে মন ভালো করে ফেলত। সে ছিল অত্যন্ত মিশুক। খুব অল্প সময়েই মানুষের সংগে মিশতে পারত। মানুষকে আপন করতে পারত। যে একবার তার সংগে মিশত সেই তার বন্ধু হয়ে যেত।

৪। পরিবারের ৪ ভাই-বোনের মধ্যে সে ছিল সবার পছন্দের। তার ছিল কথা বলে মানুষকে আকৃষ্ট করার অপূর্ব ক্ষমতা। যার কারণে পরিবারের ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার নিকটে সে প্রিয় ছিল।

৫। শহীদ শিপন ছিল অত্যন্ত মাতৃভক্তিসম্পন্ন ছেলে। সে সারাক্ষণ আমার খোঁজ-খবর রাখত। আমাকে কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, কখন ঔষধ খেতে হবে, কখন কি প্রয়োজন, সমস্ত বিষয়ে সে দেখাশুনা করত। সে তার ড্রেস-আপের দিক দিয়ে ছিল অত্যন্ত সৌখিন, সব সময় সুগন্ধি ব্যবহার করত, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকত।

৬। শহীদ শিপন ইসলামী আন্দোলনের জন্য তার জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ করে শহীদ হয়েছেন। শহীদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট অনেক বেশি। তাই আমাদের পরিবারের সবার মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের জন্য ত্যাগের মানসিকতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামী আন্দোলনে আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়হবার অনুভূতি সবার ভিতর জাগ্রত হয়েছে।

৭। শহীদ শিপনের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ ছিল সেই ছোটবেলা থেকে। যার কারণে সে খুব অল্প বয়সেই কোরআনের হাফেজ হয়ে যায়। পাশাপাশি আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিলে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। ছোটবেলা থেকেই মসজিদে তারাবীহ পড়াত। পাশাপাশি এলাকার গরীব ছেলেদের ফ্রি কুরআন শরীফ পড়াত।



icsbook.info

৮। ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিবেদিত সন্তানদের প্রতি আমার পরামর্শ– যৌবনকাল হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়। যৌবনের ইবাদাত আল্লাহ বেশি কবুল করেন। তাই এই বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কয়েমের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে।

৯। শহীদ শিপনের স্মরনীয় যে ঘটনাটি সারাক্ষণ আমার মনে পড়ে, তা হলো- শিপন বাসায় যতক্ষণ থাকত সারাক্ষণই মা মা করে ডেকে আমাকে অতিষ্ট করে ফেলত। যখনই আমি বিরক্ত হয়ে যেতাম তখনই সে বলত আমি মারা যাওয়ার পর ঠিকই আমার গুরুত্ব বুঝবেন। আর প্রায়ই ফজরের নামাযের পর আমি যখন বিছানায় শুয়ে পড়তাম তখন ও ফ্লোরে বসে আমার পায়ে মাথা রেখে আমার নিকট দোয়া চাইতে চাইতে শুয়ে পড়ত।

১০। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। তার বেশিরভাগই দুনিয়ামুখি, আদর্শ বিধানমতই তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতি করে কিভাবে টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি কেনা যায়, এমপি, মন্ত্রী হয়ে কিভাবে দেশটাকে লুটপাট করে খাওয়া যায়।

আদর্শ বিবর্জিত কোন দলই দেশের মঙ্গল আনতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি আমাদের সবার জন্য দিয়েছেন কুরআনের মত সংবিধান। তাই আমি মনে করি, আল্লাহর জমিনে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে আল্লাহর আইন কায়েমের কোন বিকল্প নেই। তাহলেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। হবে না কোন লগি-বৈঠার মিছিল, শোনা যাবে না কোন মায়ের সন্তান হারানোর আর্তনাদ কিংবা স্বামী হারা কোন স্ত্রীর কান্না।

পরিশেষে আমি সবাইকে অনুরোধ করব আসুন, আমরা কোরআনের রাজ কায়েমের মাধ্যমে ইহকলীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভ করি।

## শহীদ ফয়সালের আম্মা হাসনা বানু

১। চিটাগাং রোডের মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক ঘটনার খবর শোনার সাথে সাথে আল্লাহর উপর তাওয়াকুল করে বের হয়ে পড়লাম। অনেক বাঁধা বিপত্তি অতিক্রমকরে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছলাম। দুই ছেলের মুমূর্ষু অবস্থা দেখে এমন কান্না আসল যে, দুনিয়ার কোন সান্ত্বনা আমাকে থামাতে পারলো না। চব্বিশ/পঁচিশ বছরের দুই তরতাজা ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে অস্থির হয়ে গেলাম। আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। পিতৃহারা আমার পবিত্র সন্তানদের সাথে আওয়ামী হায়েনাদের এহেন আচরণ আমার কাছে যে কিরূপ কষ্টদায়ক তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

ফাহাদ-ফয়সলকে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যখন গড়িতে উঠানো হল তখন বড় ছেলে ফুয়াদ বুঝতে পারল ফয়সাল হয়তো বাঁচবে না। ওর মাথাটা আওয়ামী হায়েনারা লগি-বৈঠা দিয়ে একদম চ্যাপ্টা করে ফেলেছে। ফয়সাল একটু আধটু শ্বাস নিচ্ছে। এ জন্য ফুয়াদ ফয়সালকে ধরে রাখলো এবং আমাকে ফাহাদের কাছে থাকতে দিল।

ফাহাদ একটু একটু চোখ খুলছে। কিন্তু ফয়সাল আর চোখ খুলছে না। ফাহাদ চোখের ইশারায় আমাকে কিছু সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু ওদের শরীরের রক্তের বন্যা আমার চোখের পানিকেও হার মানায়। ফাহাদকে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হসপিটালে



icsbook.info

ভর্তি করা হয়। কিন্তু ফয়সালকে ইবনে সিনাতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফুয়াদ ফয়সালকে নিয়ে যায় এবং আমাকে ফাহাদের কাছে রেখে যায়। সারারাত আল্লাহর কাছে কান্নাকাটিতে কেটে যায়। এদিকে আত্মীয়-স্বজনরা অস্থির হয়ে ফোন করতে থাকে। কিন্তু কান্না ছাড়া আমার আর কোন ভাষা ছিল না। সব চেয়ে কষ্টদায়ক আমার ছোট ছেলে নাকিব ফোনেই কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ ভাইয়াদের কি হয়েছে? ওর প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছি কিন্তু তাও আমার জন্য অসাধ্য হয়ে গেলে। ফাহাদ আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো ''আম্মা আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন। আপনার ফয়সলকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে কবুল করবেন। ২৯ অক্টোবর ফাহাদকে মারাত্মক আহতাবস্থায় হাসপাতালে ফয়সাকে শেষ বারের মত দেখানোর জন্য আমাকে আমার ভাই হাসান ইমাম ইবনে সিনাতে নিয়ে এলেন। ফয়সালকে দেখে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম– ''হে আল্লাহ তোমার ফয়সালইতো আমাকে মানতে হবে, তবে আমার নিরাপরাধ ছেলেকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যদা দিও।" এটাই আমার ফরিয়াদ।

২। সর্বশেষ সাক্ষাত ২৮ অক্টোবর। প্রতিদিনের মত ফয়সাল তার কর্ম স্থলে বেরিয়ে পড়ল। ১১টা ৩০মিনিটে সকালের খাবার খেল। খাওয়ার পর বাজারে গেল। বাজার থেকে দেরীতে ফিরতে দেখে আমি বোরখা পড়ে বের হব এমন সময় ফয়সাল বাজার করে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো। সেদিন আমার প্রাণটা কেনই জানি ছটফট করতে লাগলো। ফয়সালের আনা বাজার গুছাতে লাগলাম। ফয়সলের বাজারের মধ্যে কতগুলো শশা ছিল খুবই তরতাজা। আমি ফয়সালকে জিজ্ঞেস করলাম, এই শশা কেন এনছ? ঘরে তো গোশত নেই! ফয়সাল বসা থেকে দাঁড়িয়ে বলল, ''শশা খেয়ে জিহাদ করতে হবে না!" এমন সময় ফাহাদ এসে ফয়সালকে ডাকতে লাগলো, "ফয়সাল তাড়াতাড়ি আয় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা জামায়াত শিবিরের থানা অফিসে হামলা করেছে। সেখানে যেতে হবে"। ফয়সাল পকেট থেকে কিছু টাকা এবং কাগজপত্র রেখে আমার নিকট বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওরা যাওয়ার সময় বড় মেয়েটা বললো, ভাইয়া সাবধানে থেকো। দাড়িওয়ালা দুই ভাই যাচ্ছ। শয়তানদের তোমাদেরকে চিনতে অসুবিধা হবে না। ফয়সাল বললো, ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই। বেশি কথা বলার সময় হয় নাই ফয়সালের সাথে। সেই ডাল-ভাতই আমার ফয়সালের ঘরে শেষ খাওয়া। আমার ফয়সালের আর ঘরে ফেরা হলো না। দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে আমাকে শোকের সাগরে রেখে ফয়সাল চলে গেল আল্লাহর সান্নিধ্যে।

৩। ফয়সাল ছিল অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তার চেহারা ছিল যথেষ্ট ব্যক্তিত্বপূর্ণ। ফয়সাল কখনো মুখ ভার করে থাকতো না। সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, সুন্দর আচরণ, অমায়িক ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করতো। আমিও তার প্রতি সবসময় খুব সন্তুষ্ট ছিলাম। ২০০৩ সালের ১৯ জুন তার আব্বা হঠাৎ করে ব্রেন স্ট্রোক করে মারা যাওয়াতে আমি এবং ফুয়াদ ও ফাহাদ খুবই হতাশ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার ফয়সাল হতাশ হল না। আমাদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য সান্ত্বনা দিতে লাগলো। এরপর থেকে সে কঠোর পরিশ্রমে লেগে গেলো। সকালে কিন্ডার গার্টেনে শিক্ষকতা, এরপর দোকানে সময় দেয়া, আর ভার্সিটিতে দুপুরে ক্লাস করতে যেতো। ক্লাস থেকে বাসায় না ফিরেই বরাবর টিউশনিতে চলে যেতো। টিচার ছিলো প্রভাতী শাখার কিন্তু পড়াতো নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের। শিক্ষক হিসেবে তার যোগ্যতা ছিল প্রশংসনীয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সে



icsbook.info

খুব আদর করতো। পরিবারের ভাই-বোনদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল অন্য রকমের। ছোট ভাই-বোনদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সে সর্বদা তৎপর ছিল। ভাল খাবারের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। দামি দামি পোশাকের প্রতিও তার লোভ ছিল না। ছোট ভাই-বোনদের দিতে পারলেই সে খুশি হতো। তার অনুপস্থিতিতে পরিবার একজন দায়িত্বশীল, সহনশীল ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভাই এবং আমিও আমার সন্তানকে হারালাম।

৪। পরিবারে অবস্থান আমার প্রাণপ্রিয় সন্তান আবদুল্লাহ আল ফয়সাল সাত ভাই বোনের মধ্যে তৃতীয়। তৃতীয় হলেও ফয়সালের ভূমিকা ছিল পরিবারে অন্যন্য। ফয়সালের উপার্জনের সমস্ত টাকা পকেট ঝেড়ে উজাড় করে দিয়ে দিত। এমনকি শেষ বিদায়ের সময়ও করেছিল। নিজের স্বার্থ বলতে কিছু বুঝত না। নিজের শরীরের একটু আরামের চিন্তাও করত না। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে তাঁর স্বাস্থ্য ছিল টলটলে। কেউ দেখলে ফয়সালের পরিশ্রমের কথাটা ধারণাও করতে পারত না। সুন্দর চেহারা উচ্চ লম্বা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকরী ছিল ফয়সাল। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে এসেছে। স্যার বলে, এই ছেলে তুমি নিয়মিত ক্লাস করা না। ফয়সাল বলল, স্যার আমার আব্বা নেই। আমাকে উপার্জন করতে হয়। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে নিয়মিত ক্লাস করতে পারি না। স্যার বলল, তোমার চেহারায় তো বুঝা যায় না। ফয়সাল ছিল আবেগপ্রবণ, মিষ্টভাষী ও সদালাপী। হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা তার মনের কছেও স্থান পেত না। সে ছিল পরিবারের আশা ভরসার স্থল। তার অনুপস্থিতে পরিবার সবচেয়ে আপনজনকে হারাল।

সর্বশেষ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার সর্বোত্তম সন্তান ফয়সালকে দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে শাহাদাতের সর্বোত্তম মর্যদা দেন।

৫। বই পড়ার প্রতি তার এত নেশা ছিল যে, বিশেষ করে ইংরেজি। খুব কম বই তার পড়ার বাকী ছিল। ক্লাস থেকে সে প্রায়ই বই পড়ার জন্য ইসলামিক ফউন্ডেশনে চলে যেত। বই বেশি পড়ার কারণে তার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। পরিবারের সবাইকে যখন দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হতে দেখত তখনই সে নবী করীম (সা.) ও তার সাহাবাদের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করত। পরিবারে সবার প্রতি ছিল সহনশীল। আম্মার কষ্টের কথা বেশি চিন্তা করত। নুডুলস এবং ভূনা খিচুরী খুব পছন্দ করত। কিন্তু আম্মার কষ্ট হবে ভেবে সে কোন দিন বলত না। ইচ্ছা করে কোন দিন রান্না করলে সে খুশি হত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে ভাই বোনদের সাথে আন্তরিকতার সাথে আলাপ আলোচনা ও গল্প করত। শত পরিশ্রমের ভিতরেও সে মন খারাপ করত না, মুখে হাসি ফুটেই থাকত। ফয়সাল যখন ঘরে ফিরত হাসিমাখা মুখেই গান গাইতে গাইতে আসত। তার ছোট ভাই বোনেরা তাকে শিল্পী ভাইয়া বলত। বিশেষ করে জিহাদী গান, শহিদী গান গাইতে পছন্দ করত। পরিবারের সবার প্রতি তার আচরণ ছিল সুন্দর এবং অনন্য। সর্ব মানুষের কাছেও তার আচরণ সুন্দর ছিল।

৬। ফয়সালের মৃত্যুতে আমাদের পরিবারের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ফয়সালের মৃত্যু আমাদের পরিবারের গতিধারায় বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। ২০০৩ সালে ফয়সালের আব্বা মারা যাওয়ার তিন বৎসর না যেতেই আমার ফয়সালের মৃত্যু আমাদের পরিবারের জন্য বিরাট ট্রাজেডি। ফাহাদ চরমভাবে আহত এবং ফয়সালের মৃত্যুতে পরিবার সম্পূর্ণ স্তব্দ হয়ে গেছে। অধিক শোকে আমি পাথর হয়ে গেছি। ফয়সালের মৃত্যুতে পরিবার আর্থিক,



icsbook.info

মানসিক সর্ব দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ফাহাদ ও ফয়সাল ব্যবসাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের understanding ছিল যে, ফাহাদের কথায় ফয়সাল উঠাবসা করতো। খবরের কাগজে ফাহাদ ও ফয়সালের এই দু:খজনক ঘটনা পড়ে পুরো এলাকার লোকজন দু:খ করেছে এবং বলেছে, পরিবারের বুদ্ধিমান ছেলে দুটিই শেষ হয়ে গেছে। ছোট ভাই-বোনদের লেখা পড়ার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা ছিল অনন্য। পুরো পরিবারটাকেই উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এমনি মৃত্যুতে এই পরিবারে এমন ফাটল ধরল তা কোনদিন পুরণ হবার নয়। সর্বশেষ এটাই সান্ত্বনা যে, আল্লাহতায়ালা সুরা আল বাকারা ১৫৩ ও ১৫৪ নং আয়াতে বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের মৃত বলো না বরং তারা জীবিত'। সে সম্পর্কে তোমাদের যেন চেতনা হয় এটাই আল্লাহর কাছে কামনা করি। আল্লাহই যেন ফয়সালকে জীবিত রাখেন এবং উত্তম রিযিক প্রদান করেন এবং শহীদি মর্যাদা প্রদান করেন ও শহীদি কাফেলায় শামিল করেন।

৭। ছোট বেলা থেকেই ফয়সালের ইসলামের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। ফজরের পর ওর আব্বা যখন কুরআন পড়তেন ফয়সালের এক দেড় বৎসর বয়সের সময়ে ফয়সাল উঠে যেত এবং তার আব্বার সাথে সাথে পড়ার চেষ্টা করত। তিন চার বৎসর থেকেই মক্তবে যাওয়া, আরবী পড়া, নামাজ পড়ার প্রতি আকর্ষণ ছিলো। সাত আট বছর বয়সেই সংগঠনের সাথে জড়িত হলো। শিবিরের ছেলেরা তাকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে নিয়ে যেত। এতে সে খুব আনন্দ পেত এবং আট বৎসর বয়স থেকেই ফয়সালের পড়ার নেশা ঢুকে গেল। তার এই অতিরিক্ত প্রবণতা দেখে আমি একটু শক্ত হয়ে পাহারাদারী করতে লাগলাম। তার বাবার মৃত্যুর পর কিছুদিন একটু শিথিল ছিল। নবম শ্রেণীতে উঠে আবার তার সংগঠনের প্রতি ঝোঁক বেড়ে গেল। আমি তাকে বিজ্ঞান বিভাগে দিয়ে দিলাম। কিন্তু তার সংগঠনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম, মিছিল, মিটিং এবং বই পড়া দেখে রাগ করে আবার তাকে দমিয়ে দিলাম। সে সংগঠনে ভাল অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যদিও আমি এই ব্যাপারে অপরাধী কিন্তু সত্য না বলে পারলাম না। তিন চার বৎসর ফয়সাল তার সংগঠনে অগ্রসর হতে পারল না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ফয়সালের আবার সংগঠনের প্রতি প্রেরণা জেগে উঠল। কিন্তু পারিবারিক দায়িত্বের কারণে সংগঠনের কাজে সময় দিতে পারছিল না। কিন্তু তার আন্তরিকতা ছিল যথেষ্ট। ২৮ অক্টোবর তার জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে এটাই প্রমাণ করে গেল।

৮। ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিবেদিত সন্তানেরা এ দেশের গৌরব। তারা আমার পবিত্র নেককার ও সাদকায়ে জারিয়ার সন্তান। তারা নিজেরা যেমন ব্যক্তি জীবনে নিজেদেরকে ইসলামের আলোকে গড়তে চায় এবং তার পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। এই সমস্ত পবিত্র সন্তানেরা আমার চেয়ে জ্ঞানে গুণে অনেক উর্ধ্বে। তবু ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোকে মা হিসেবে একটু পরামর্শ, বাবারা তোমরা দুনিয়াবী লেখাপড়ার পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ী করতে হলে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। এতে পিছপা হওয়া



icsbook.info

যাবে না। মৃত্যুকে পরওয়া করা যাবে না। মৃত্যুর ফয়সালা আল্লাহর কাছেই হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি যদি একমাত্র কাম্য হয় তাহলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। আমি দোয়া করি আল্লাহ ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ী করেন।

৯। ফয়সাল ছোট্ট বেলা থেকেই শান্ত স্বাভাবের ছিল। ছোট বেলার একটি ছোট্ট ঘটনা আমার সব সময় মনে পড়ে। ওর আব্বা তখন চট্টগ্রামের হালিশহর সেনানিবাসে চাকরিরত। তখন আমরা ক্যাম্পের বাইরে একটা বাসায় ভাড়া ছিলাম। তখন ফুয়াদ, ফাহাদ, ফয়সাল ওরা ছোট্ট। ছোট বয়সের হলেও বয়স কম হওয়াতে তিন জন এক সঙ্গেই খেলত। খেলতে গিয়ে ঝগড়া বেঁধে গিয়ে ফয়সাল একটা ভাইকে খারাপ গালি দিয়ে ফেলছিল। আমি পাশের রুম থেকে শুনতে পেয়ে একটা সুঁই সুতা নিয়ে ভয় দেখিয়ে বললাম, এখনই তোমার মুখটা সেলাই করে দিব। ছোট্ট মানুষ ফয়সাল ভয়ে কেঁদে ফেলল। এবং বলল, আম্মা আমি আর কোন দিন খারাপ কথা বলব না। এর পর থেকে ফয়সাল আর কোন দিন একটা গালি দূরে থাকুক খারাপ কথাও বের করত না। আমি এ নিয়ে অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সাথে গর্ব করতাম। তার আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, চাল-চলন সবই ছিল সুন্দর।

১০। বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রয়েছে। এদেশের বর্তমান রাজনীতি প্রধানত দুটি ধারায় বিভিক্ত। একটি ধারায় রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ এবং তার সাথে জোটবদ্ধ বামপন্থি গোষ্ঠী। অপর ধারায় রয়েছে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থিদের মিলন। আমার মতে, প্রচলিত ধারার সবগুলো রাজনৈতিক দলই রাজনীতির নামে পেটনীতি করছে। হাসিনার রক্তপিপাসার কারণেইতো ২৮ অক্টোবর ২০০৬ ছয়টি ফুটন্ত গোলাপকে ঝরে পড়তে হয়েছিল। জামায়াত একটি ইসলামপন্থি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। জামায়াত আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কতে চায়। এজন্য তারা প্রচেষ্টাও করছে। কুরআন সুন্নাহর অনুসরণের ক্ষেত্রে আরো সচেষ্ট হতে হবে। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ যেভাবে প্রচলিত রাজতন্ত্রকে ভেঙ্গে দিয়ে অনাড়ম্বর ও তাকওয়াবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠিক সেভাবে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীনদের মত ত্যাগের মহীমায় উজ্জীবিত হতে না পারবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। ইসলামী আন্দোলনের তৃনমূল পর্যায় থেকে শুরু করে আমীর পর্যন্ত ইসলামের সুমহান ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কুরআন সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসরণে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকলে ইনশাআল্লাহ ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। ■



icsbook.info

# শহীদ শাহজাহানের আম্মার প্রতি প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ আপনার সন্তানের শাহাদাতের খবর শুনে আপনার কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

উত্তর ঃ আমি আমার সন্তানের শাহাদাতের খবর শুনে সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি এবং পরবর্তীতে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এসে আমাকে সান্ত্বনা দেয়।

প্রশ্নঃ সর্বশেষ সাক্ষাতে তার সাথে কি ধরনের কথা হয়েছিল?

উত্তর ঃ সর্বশেষ সাক্ষাতে আমার ছেলের সাথে কথা হয়েছিল, সে বলেছিল আমি ভালভাবে পড়ালেখা করে মাস্টার্স পরীক্ষা দিব। পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য আমি টাকা দিলাম, সোমবারে টাকা নিয়ে কলেজে গিয়ে ফরম পূরণ করেন এবং বৃহস্পতিবারে শাহাদাত বরণ করেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার সন্তানের কোন বিষয়টি আপনার পরিবারের সবাইকে নাড়া দেয়?

উত্তর ঃ সে ছিল সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সব সময় হাসি ঠাট্টা করত এবং ছোট ছেলেদের সাথে আনন্দ করত। এসকল কথা মনে হলে, সকলের মনে ও হৃদয়ে নাড়া দেয়।

প্রশ্ন ঃ পরিবারে তার অবস্থান কি ছিল?

উত্তর ঃ পরিবারে তার অবস্থান ছিল ভাল। তার উদ্দেশ্য ছিল সৎ। পরিবারকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তার পেরেশানী ছিল উল্লেখযোগ্য। সকলের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল।

প্রশ্ন ঃ তার কোন দিকটি পরিবারের সবার কাছে প্রিয়?

উত্তর ঃ শহীদ শাহজাহানের সব চেয়ে প্রিয় দিকটি আমাদের কাছে প্রিয় ছিল তার হাসি মুখে কথা বলা।

প্রশ্ন ঃ আপনার সন্তানের মৃত্যুতে পরিবারে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে?

উত্তর ঃ পরিবারের সকল সদস্যের ইসলামের প্রতি দুর্বলতা এবং সংগঠনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামের প্রতি পূর্ব থেকে তার কোন আকর্ষণ লক্ষ্য করেছেন কি না?

উত্তর ঃ ছোট বেলা থেকে ইসলামের প্রতি ও সংগঠনের প্রতি আকর্ষণ ছিল। প্রথম পর্যায়ে পারিবারিকভাবে বাধা দিলে সে আমাদের বুঝিয়ে ইসলামের প্রতি দুর্বল করে তুলেছিল।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আন্দোলনের জন্যে নিবেদিত সন্তানদের প্রতি আপনার পরামর্শ কি?

উত্তর ঃ বর্তমানে যারা ইসলামের দায়িত্ব পালন করছে, আল্লাহ ও তার রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য জীবনের সব কিছুর বিনিময়ে এ কাজ চালিয়ে যাওয়া ও একজন শাহাজাহানের বিনিময়ে হাজার ছেলেকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া।

প্রশ্ন ঃ আপনার সন্তানের স্মরণীয় একটি ঘটনা বলুন।

উত্তর ঃ সংগঠনে যোগদানের পর আমি তাকে বাধা দিয়েছিলাম। সে বলত আমার লেখাপড়ার কোন ক্ষতি হবে না এবং সত্যিই সে কোন পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করেনি।

প্রশ্ন ঃ দেশের দলীয় রাজনীতিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর ঃ কোন রাজনৈতিক দল সংগঠিত নেই, কারণ তারা জনগণের জন্য অভিশাপ, একমাত্র ইসলামই জনগণের শান্তি দিতে পারে। ইসলামের বিজয় হওয়া দরকার। এজন্য সবাইকে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে কাজ করতে হবে।



icsbook.info

icsbook.info

icsbook.info

# আমাদের মিছিল

## আল মাহমুদ

আমাদের এই মিছিল নিকট অতীত থেকে অনন্ত কালের দিকে।
আমরা বদর থেকে ওহুদ হয়ে এখানে,
শত সংঘাতের মধ্যে এ শিবিরে এসে দাঁড়িয়েছি।
কে জিজ্ঞেস করে আমরা কোথায় যাবো ?
আমরা তো বলেছি আমাদের যাত্রা অনন্তকালের।
উদয় ও অস্তের ক্লান্তি আমাদের কোনদিনই বিহ্বল করতে পারেনি।
আমাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত।
আমাদের রক্তে সবুজ হয়ে উঠেছিল মোতার প্রান্তর।
পৃথিবীতে যত গোলাপ ফুল ফোটে তার লাল বর্ণ আমাদের রক্ত।
তার সুগন্ধ আমাদের নিঃশ্বাসবায়ু।
আমাদের হাতে একটি মাত্র গ্রন্থ– আল কুরআন।
এই পবিত্র গ্রন্থ কোনদিন, কোন অবস্থায়, কোন তৌহিদবাদীকে থামতে দেয়নি।
আমরা কি করে থামি?
আমাদের গন্তব্য তো এক সোনার তোরণের দিকে, যা এই ভূপৃষ্ঠে নেই।
আমরা আমাদের সঙ্গীদের চেহারার বিভিন্নতাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না।
কারণ আমাদের আত্মার গুঞ্জন হু হু করে বলে,
আমরা একআত্মা, একপ্রাণ।
শহীদের চেহারার কোন ভিন্নতা নেই।
আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে পা রেখেছি।
কেউ পাথরে, কেউ তাঁবুর ছায়ায়, কেউ মরুভূমির উষ্ণবালু কিংবা সবুজ কোন ঘাসের দেশে।
আমরা আজন্ম মিছিলেই আছি।
এর আদি বা অন্ত নেই।
পনেরো শত বছর ধরে সভ্যতাগুলোর উত্থান-পতনে আমাদের পদশব্দ থামেনি।
আমাদের কত সাথীকে আমরা এই ভূ-পৃষ্ঠের কন্দরে কন্দরে রেখে এসেছি।
তাদের কবরে ভবিষ্যতের গুঞ্জন একদিন মধুমক্ষিকার মত গুঞ্জন তুলবে।
আমরা জানি।
আমাদের ভয় দেখিয়ে শয়তান নিজেই অন্ধকারে পালিয়ে যায়।
আমাদের মুখবয়বে আগামী ঊষার উদয়কালের নরম আলোর ঝলকানি।
আমাদের মিছিল ভয় ও ধ্বংসের মধ্যে বিশ্রাম নেয়নি, নেবে না।
আমাদের পতাকায় কালেমা তাইয়্যেবা।
আমাদের এই বাণী কাউকে কোনদিন থামতে দেয়নি।
আমরাও থামবো না।



icsbook.info

# আটাশে অক্টোবরের কাহিনী

মতিউর রহমান মল্লিক

আটাশে অক্টোবরের কাহিনী
চোখ খুলে দিয়ে গেছে,
শত্রু চেনার সকল কুটিল
বাধা তুলে দিয়ে গেছে।

সাহসে ভরা সে দিন,
রবে চির অমলিন,
বিশ্বাসী প্রাণে অনুপ্রেরণার
আগুন ছড়িয়ে গেছে।
আটাশে অক্টোবরের কাহিনী তপ্ত রক্ত মাখা,
তবুও সম্ভাবনার দীপ্র-দীপ্ত স্বপ্ন আঁকা।

রাতকে করেছে দিন,
ভীরুকেও ভয়হীন,
আঁধার বিনাশী আলোর অশেষ
দিশারী গড়িয়ে গেছে।

## লিমেরিক

এক.
রাজনীতিতে অভদ্রতার প্রভাব পড়ছে খুব
বদলে যাচ্ছে রাজনীতিরই কল্যাণীয়া রূপ
যে যার মত করছে ক্ষতি
হোকসে জামাই-ভগ্নিপতি
সুযোগ মত মারছে গুঁতো থাকছে না কেউ চুপ।

দুই.
রাজনীতিতে খিস্তি-খেউড় বাড়ছে নিত্যদিন
এই ব্যাপারে একটি পক্ষ– দক্ষ সীমাহীন
নেত্রী তাদের রঙহেডেড্ আর
সাঙ্গপাঙ্গে ঘোর-ত্যাড়া-ঘাড়
এই অবস্থা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ।

তিন.
রাজনীতিতে সহিংসতার দাপট যাচ্ছে বেড়ে
নিত্যদিনই নিচ্ছে জীবন সহিংসতাই কেড়ে
ভন্ড-গণতন্ত্র-সেবক
গণতন্ত্রের দিচ্ছে সবক
গণতন্ত্রের লেবাসে তাই তান্ডব আসছে তেড়ে।

চার.
রাজনীতিতে গণতন্ত্র জিত্তে পারছে না
আমজনতা গণতন্ত্র শিখতে পারছে না
যে-ভাবে হোক নির্বাচনই
করতে হবে তাই এখনই
তা না হলে গণতন্ত্র টিকতে পারছে না।



icsbook.info

# অক্টোবরের আটাশ তারিখ

মোশাররফ হোসেন খান

অক্টোবরের আটাশ তারিখ রক্ত ঝরার দিন,
জাতির বুকে তুফান জাগা স্মৃতি অমলিন ॥

হায়েনাদের বৈঠা-লাঠি
কাঁপিয়ে গেল দেশের মাটি
জাতির জন্য নরঘাতক বড়ই অর্বাচীন।
অক্টোবরের আটাশ তারিখ রক্ত ঝরার দিন ॥

সন্তান হারার আহাজারি
আকাশ বাতাস করছে ভারী
মায়ের বুকে শোকের নহর কষ্ট সীমাহীন।
অক্টোবরের আটাশ তারিখ রক্ত ঝরার দিন ॥

আমার ভাইকে মারলো যারা
দেশ-জনতার শত্রু তারা
শহীদ হলো যেসব ভাই শুধবো তাদের ঋণ।
অক্টোবরের আটাশ তারিখ রক্ত ঝরার দিন ॥

এই জনতা জাগলে আবার
ভয় কি আছে দেশ হারাবার?
রক্ত-সাগর টপকে তারা আনবে সুখের চিন।
অক্টোবরের আটাশ তারিখ রক্ত ঝরার দিন ॥



icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর ভয়াল দৃশ্য

## ইব্রাহীম মণ্ডল

অশান্ত পৃথিবী যখন
অন্ধকার চাঁদর গায়ে ঘুমিয়ে পড়ে
নিঝুম রাতের তারকাগুলোও
প্রশান্তির কোলে মাথা রাখি
চোখের পাতায় চেপে বসা হিমালয়
ক্রমশ অন্তর দৃষ্টি পাখনা মেলে
ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়–
হাজার বছরের ইতিহাস কলঙ্কিত করে
বেঁচে থাকা নারী হিন্দার লোভাতুর
জিভ থেকে ঝরছে বিষাক্ত লালা
লালা থেকে জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য হায়েনার
উন্মত্ত লগি-বৈঠায়
মেতেছে নৃশংস পৈশাচিকতায়
লোমশ হাত ঢুকিয়ে দেয় হামজাদের বুকে
চিবিয়ে খাচ্ছে মাসুমের কলিজা
কাঁপছে জমিন থর থর আল্লাহর আরশ
অবাক পৃথিবী শুধু বিস্ময়ে চেয়ে রয়
সন্তানহারা মা, পিতা হারা সন্তানের আর্তনাদ
ধ্বনিত হয় আকাশে বাতাসে
অন্তর ছেদ করে ঘুমের ঘোরে এখনো চিৎকার করে উঠি
২৮ অক্টোবর ভয়াল দৃশ্যে।



icsbook.info

# দংশিত বিবেকের ধিক্কার

মহিউদ্দিন আকবর

কখনো কখনো এমন হয় যে, অপ-রাজনীতিকের হৃৎ নিশানায়
নেমে আসে খোদার লানত– আসমানী অভিশাপ!
ওরা তখন আর মানুষই থাকে না; হয়ে যায় ইয়াজুজ মাজুজ।

থিতু সমাজের ধস নামাতেই উন্মাদনার সাত পাঁকে পড়ে–
টেনে হিঁচড়ে মর্ত্যলোকেই নামিয়ে আনে জাহান্নাম...
হাতে তুলে নেয় মারণাস্ত্র, সাজে সাক্ষাৎ ইবলিশ,
অত:পর সহসাই মেতে ওঠে হত্যা লীলায়।

নাস্তিক্যবাদের ছত্রছায়ায় হায়েনা ইয়াজুজ মাজুজের সেই কুর্দন–
আমরা দেখেছি আটাশে আক্টোবর দু'হাজার ছয় সালে,
ওরা বৈঠা-লগির নিষ্ঠুরতায় পুরো পল্টন-তোপখানা-গুলিস্তানে
জাহান্নামের লেলিহান জ্বেলে দিয়েছিলো মানুষের মাঝে।

বিভৎস উন্মাদনায় অগনিত ইয়াজুজ মাজুজ–
মানুষের সমাবেশে হামলে পড়ে মেতেছিলো হত্যালীলায়
দিয়েছিলো বয়ে রক্তের ঢল; কী হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য!
আজো আমাদের অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে...

হায়েনার বৈঠার আঘাতের নিষ্ঠুরতায়, ঝরে গেলো এ জাতির–
মাথার মুকুট; সেরা সেরা সব সন্তান...

আহা! বুক পাঁজরের প্রতি ভাঁজে ভাঁজে আজো বেদনার–
কালো-নীল প্রবাহ। আজো চোখে ভাসে সেই নারদের হুঙ্কার,
শহীদের পবিত্র বুকের ওপর ইয়াজুজ মাজুজের নৃত্য-মাতম-উল্লাস!

কোটি জনতার সাথে দংশিত বিবেকের এই ধিক্কার–
হায়েনারা নিপাত যাবেই যাবে; কসম খোদার।



icsbook.info

# হিন্দাকে নিন্দা

খালীদ শাহাদাৎ হোসেন

নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশের উজ্জ্বলতা গন
দেশের সুনাম ঘুচিয়ে দিল হায়েনাদের প্লান
মিডিয়া যোগে ছড়া সেদিন কি নিদারুণ দৃশ্য
নারকীয় সেই তাণ্ডব দেখে হতভম্ব বিশ্ব

তরতাজা মানুষ যেবাবে পিটিয়ে করেছে খুন
খুশিতে ঘাতক উল্লাসে  মাতে উৎসাহে দ্বিগুণ
লুটিয়ে পড়া নিরব নিথর ক্ষতবিক্ষত লাশ
লাশের উপরে উগ্রচণ্ডে দানবের উল্লাস

এমন দৃশ্য দেখেছে যাহারা সকলের চোখে জল
পাষাণ বুকের হৃদয় চিড়ে নেমেছে ব্যথার ঢল
বীভৎস এই মৃত্যু দেখে কেঁদেছে জগৎবাসি
একটি হৃদয় কাঁপেনি বরং মুখে ছিল তার হাসি

জিন্দা মানুষ পিটিয়ে মারে যে জিঘাংসু হিন্দা
ধিক তোমাকে ঘৃণাভরে জগৎবাসীর নিন্দা।

# জান্নাতের সবুজ পাখিদের প্রতি

প্রিয় সাথীরা আমার!
আমারও মন চায় যে আসি ওখানে!
কিন্তু দেখ, পৃথিবীর বিষাক্ত বাতাসে
আমার যে বিকলাঙ্গ পাখা
আরশের অডিটোরিয়ামে ওই কবিতা সন্ধ্যায়
আসার গেট, পাস নেই যে আমার!



icsbook.info

# একটি আনাকাঙ্ক্ষিত পদ্য

সালেহ মাহমুদ

আমি এক নিঃসঙ্গ শেরপা
দেখো, আমি আজ এভারেস্টর যে শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি
সেখানে ইতোপূর্বে আর কেউ আরোহণ করেনি, এমনকি–
হিলারি, তেনজিংও এই শৃঙ্গে সাথে পরিচালিত নয়
কারণ, এর জন্ম হয়েছে তাদের পদচিহ্নকে ঢেকে দিয়ে,
দেখো–
আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার চেয়ে উঁচু আর কিছু নেই
এমনকি তোমার কল্পনাও এ রকম একটি শৃঙ্গের কথা ভাবতে পারে না,
এর চারপাশ জুড়ে আছে শুধু আমার ভালোবাসা
আমার শ্বেতশুভ্র কল্পনারাশি আর আজন্ম লালিত সহস্রমুখ
উষ্ণ প্রস্রবণের কেন্দ্রভূমি...
তুমি তোমার খোলস থেকে বেরিয়ে যে হিংস্র নখর দিয়ে
আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করতে চেয়েছিলে আটাশে অক্টোবর
তাতে কি আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়েছে,
না হয়নি
বরং তুমিই এখন জগৎশুদ্ধ সকলের ঘৃণা, ধিক্কার আর অভিশাপে জর্জরিত
আজও তোমার নাম শুনে কেঁদে ওঠে অবুঝ শিশু,
যুবতীরা আব্রু বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে
আর মায়েরা তাদের সন্তানকে বাঁচাতে আঁচল বিছিয়ে দেয়
বলো, এরপরও কি তুমি নিজেকে মানুষ বলে দাবি করতে পারো?
না, তুমি মানুষ নও, তুমি পশু, বরং তারও চেয়ে অধম এবং হিংস্র
তুমি হালাকু আর চেঙ্গীস খানের প্রেতাত্মা
একাত্তর থেকে পঁচাত্তর, ছিয়ানব্বই থেকে দু'হাজার এক আর
আটাশে অক্টোবর দু'হাজার ছয়
তোমার পশুত্বের সাক্ষী হয়ে থাকবে চিরকাল
তোমার ভয়াল মূর্তি যারা আগে কখনো দেখেনি
যারা তোমার সব বুলি সত্যি বলে মেনে নিতো নিঃসংকোচে
তোমার অবগুণ্ঠনের আড়ালে থাকা হিংস্র মূর্তি আজ তাদের কাছেও স্পষ্ট।



icsbook.info

# আটাশে অক্টোবর

তারেক সিদ্দিকী

আটাশে অক্টোবর
সকাল থেকে দিন ভর
পল্টনে ঘটেছে কি ?
একটু বলবে কি ?
কি আর বলবো যা ঘটেছে
অবিশ্বাস্য
লাশের উপর নাচ আর
অট্টহাস্য!

ওরা করা ? কি ওদের কাহিনী ?
ওরা সব খুনি আর
নেত্রী ওদের ডাইনি।

খুন করে যারা হাসতে পারে
লাশ নিয়ে যারা খেলতে পারে
এরা ভাগ্য বদলাবে দেশের ?
এরা সেবা করবে দশের ?

ছিঃ তাদের নৃশংসতা
ধিক তাদের কপটতা।

এরাই শ্বাস ফেলে
কাল নাগিনীর
এ শ্বাসেই শান্তি বিনষ্ট
সুন্দর ধরনীর।
অক্টোবরের আটাশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্তে
রাজপথ ছেয়ে গেল
মুজাহিদদের রক্তে

কেন তাদের মারতে হল
কি তাদের অপরাধ ?
লগি বৈঠায় নিভল কেন
ওদের সব স্বপ্ন সাধ ?

এই সব খুনিদের
বিচার কর হে প্রভু
এই জমিনে লগি বৈ ঠা যেন
উঠতে না পারে কভু।



icsbook.info

# ছড়াগুচ্ছ

নিজাম সিদ্দিকী

## লঠি বৈঠা

লগি আর বৈঠার
একি বাঁশি বাঁজছে
মানুষের মেরে মেরে
উপরে সে নাচছে।
হারিয়ে যে তাল খেল
এ দেশের জনগণ
সব যায় রসাতলে
কবে কাজে দিবে মন।

## হোলি খেলা

রাস্তায় বেরোলেই
মৃত্যুর একি ভয়!
রক্তের হোলিখেলা
মানুষের কত সয়।
দুই নারী, দুই সারি
বৈঠা কাস্তে
বেঁচে থাকি আমি বাবা
তুমি মর আস্তে।

## নদী

পল্টনে রক্ত
লাইভ দেখি চ্যানেলে
নদী নদী কোন নদী
পল্টন ক্যানেলে
বৈঠার উৎসবে
কত বুক নিঃস্ব
উৎসব দেখে দেখে
কাঁদে সারাবিশ্ব।

## কসরত

লগি আর বৈঠার
একি মহা কসরত
রক্তের নদী হয়
পিচঢালা রাজপথ
লাল লাল রক্তে
ডুবে যায় লগি রে
চ্যানেলে লাইভ দেখি
মহাকাল ছবি রে।

## কালো

লগি আর বৈঠার
একি খেলা চলছে
ভালো ভালো লোকগুলো
একে একে টলছে।
মন্দরা জিতে গেল
হেরে গেল ভালো
অধ্যায় হয়ে গেল
ইতিহাস কালো।

## ভাগবি

পল্টনে স্রোতধারা
বয়ে যায় রক্তের
একি দেখি! কাঁপে বুক
সীমারের ভক্তের,
লাইভ দেখে চ্যানেলে
কাঁদে সারাবিশ্ব
রাক্ষসী হাসে শুধু
হাসে তার শিষ্য
উৎসবে আর কত
ডুবে ছবি আঁকবি
জনরোষে পড়ে যাবি
দেশ ছেড়ে ভাগবি।



icsbook.info

# সমকালীন ছড়াগুচ্ছ

মুহাম্মদ আলী আজম

## ঢুকবে গুলি

ঢুকবে গুলি ঢুকবে বুলেট
হোক না শহীদ সব
দ্বীনের বিজয় হলেই পরে
আমাদের উৎসব।

জীবন দিলাম সঁপে
মুখে স্বং 'আল্লাহু' নাম জপে
জীবন দিলাম প্রভুর রাহে সঁপে।

## কালো কোট

চোখের অশ্রু হারিয়ে গেছে
ঝরছে দ্রোহের রক্ত
কালো সে কোট জালিয়ে দিলাম
হলাম শহীদ ভক্ত।

## পশুই পারে

পশুই পারে হিংস্র হয়ে
মানুষ তেড়ে আসতে,
বৈঠা মেরে জীবন কেড়ে
জয়ের হাসি হাসতে।

## জাগুন

পিশাচ তুল্য হায়না ওরা
জনতা জাগুন।
রক্তে বারুদ জ্বালিয়ে দিল
বিপ্লবী আগুন।

## লাঠি

ভয়ের গায়ে ভাঙল লাঠি
মড় মড়ু
ওরা কত হিংস্র এবং বর্বর।

## আমি

আমি!
অল্পতে কি থামি
রক্ত দেখেই ঘামি?
বজ্র হয়ে হাঁক ছেড়ে খুব
অগ্নি হয়ে নামি।

## উত্তরসূরি

তিনি নাকি দলের প্রধান
মস্তবড় গুণী
আটাশ তারিখ পল্টনেই
রক্ত খেকো খুনি
ছিঃ ছিঃ এ- কি শুনি!

## নেতা

যে নেতা খুব ন্যায়ের পথে
অটল রাখে শির
তার তরে রোজ ধরতে পারি
নারায়ে তাকবির।



icsbook.info

# লগি-বৈঠার কবিতা

কামরুজ্জামান কাজল

এক সন্ধ্যায়ই কারা যেন এই প্রিয় নগর
আগুনের নগর বানিয়ে দিল, জ্বলছে আগুন–
পুড়ে যাচ্ছে সামান্য সম্বল ফুটপাতের
ব্যবসায়ীর কাঠের চৌকি বেসাতির পসরা।
পুড়ছে মিনিবাস, ট্রাক, রিকশা, ভ্যান, সিএনজি,
হাসপাতাল, বাড়িঘর, অফিস-আদালত, দোকানপাট।

মাইক্রোফোন থেকে ভেসে আসছে বারংবার
অবরোধে অচল করা হবে স্বদেশ আমার,
সড়কের মোড়ে মোড়ে জ্বলে পরিত্যক্ত গাড়ির টায়ার
পুরো ঘরে আগুন দিয়ে কারা শীতের তাপ পোহাতে চায়?
এখন তো শীতের কাল নয়, নগরে কেউ
গরম জামাও তোলেনি গায়ে সন্ধ্যায়
তবে কেন আগুন, আগুন চৌদিকে।

স্বজনের সান্নিধ্য থেকে যারা ফিরবে
জীবিকার আশ্রয় প্রিয় এই প্রাণবন্ত নগরে
কারা যেন লগি-বৈঠায় অবরোধ করে আছে পথ।

কে বলে দিল লগি-বৈঠার সন্ত্রাস নিয়ে আসতে নগরে,
দিন দিন এ নগর চলেছে বেড়ে নাগরিক মুগ্ধতায়
ফ্লাইওভার, ওভারব্রিজ, শপিংমল আধুনিকতায়
লগি-বৈঠা, লগি-বৈঠা সে তো খুঁজবে পানি
এক বাও মেলে না, দুই বাও মেলে না...

নগরে এত পানি কোথায়, এখানে কেনো লগি-বৈঠা?
আগুন জ্বেলে কারা নিয়ে এলো লগি-বৈঠার সন্ত্রাস।
পানির বদলে মানুষের রক্ত নিতে রাজপথে,
আহা নৃশংস মৃত্যু, হায় লগি-বৈঠা, হায় লগি-বৈঠা।



icsbook.info

# অন্বেষণ

## সাইফ মুহাম্মদ আবুবকর

*(সূরা আনআমের আংশিক ভাবানুবাদ*
*আয়াত ৭৬-৭৯)*

গভীর রজনী তিমির ধরণী
ধরাধাম নিশ্চুপ;
ছোট্ট বালকের চোখে নেই ঘুম
ব্যথা ভরা তার বুক।

ব্যথার সাগর ফেনিয়া উঠে
হৃদয়েতে হুতাশন;
কার ইশারায় চলছে বালক
কে সে তার মহাজন।

পরম পুলকে তাকায় বালক
শত কোটি তারার দিকে;
পেয়েছি পেয়েছি উচ্ছ্বাসে চলে
এত দিন খুঁজেছি যাকে।

কিন্তু ক্ষণিক পর :
তরল সোনায় ভরপুর ত্রিভুবন চরাচর।

চোখ তুলে ওই ছোট্ট বালক
ভিষণ অবাক হলো;
চন্দ্রের কাছে তারাদের কোন
দাম আছে নাকি বল?

বুঝেছি বুঝেছি তারা নয়–
তুমিই আমার রব;
এখন হতে তুমিই বন্ধু
তুমি আমার সব।

রজনী কাটলো সূর্য জাগলো
বালক মেললো আঁখি;
হায় হায় হায় চাঁদ তারা বুঝি
দিয়েছে তাহাকে ফাঁকি।

চোখ কচলিয়ে সূর্যিকে তাই
শীতল কণ্ঠে বলে;
আমার সঙ্গে রাগ করে বুঝি
উঠেছ ভিষণ জ্বলে?

তোমার হৃদয়ে অত মহাতেজ
বুঝি নাই আমি কভু;
অযথা ভেবেছি তোমাকে ছাড়িয়া
ক্ষমা কর মোর প্রভু।

গুটি গুটি পায়ে দিন ক্ষয়ে এল
জাগিল রাতের আঁধার;
পণ্ডশ্রমে দু' আঁখিতে জল
বুকেতে দুখের পাথার।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললো বালক
ফিরলাম তাঁর সম্মানে
যার রোশনাই সদা উজ্জ্বল
জমিন আর আসমানে।



icsbook.info

# শহীদ মাসুম ভাইয়া

তাসনিয়া বিনতে সরওয়ার

ভাইয়া তুমি জীবন দিলে
ইসলামের জন্য,
খোদার নিকট তোমার জীবন
অনেক অনেক ধন্য
সত্য ন্যায়ের পথে
ছিলে সর্বদাই তুমি–
তাইতো তুমি রক্ত দিয়ে
উর্বর করেছ ভূমি।
ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন
আবুবকর, ওমর
তাদের মতো যেন তুমি
হতে পারো অমর।

# দুই মিনিটে লাশ

আলী আব্দুল মুনতাকিম

জ্যান্ত যুবক লগির ঘায়ে
মাটিতে লুটায়
বাঁচবে না মোর পুত্রধনে
জানতো কি তার মায়।

নৃত্য করে নরপশু
লাশের উপর বেশ,
বৈঠা নিয়ে অট্টহাসি
নেতা কি যে ফ্রেশ।

নেতারা দেয় হাততালি
চল এগিয়ে চল
গুন্ডারা সব ধেয়ে আসে
পেয়ে নেতার বল।

একে একে শহীদ করে
ছয় মায়ের সন্তান,
হাত কাঁপল না বুক কাঁপল না,
বললো জয় মাস্তান।

হাসপাতালে হাজার খানেক
কাতর যন্ত্রণায়,
নরপশু নরঘাতক আজো
শাস্তি নাহি পায়।

আর্মি পুলিশ প্রশাসন
বিচারকদের সবিনয়ে বলি
দুই মিনিটে লাশ বানানো
কেমনে থাকেন ভুলি।

ওয়ান এলেভেন খোদার রহমত
বিচার হবে ভাবি,
কাঁদতে পারি বলতে পারি
দুখি মায়ের দাবি।

চির জনম ইতিহাসে
অক্টোবরের আটাশ
দ্বীনের নির্দেশ বক্ষে ধরে
হয় মাসুমের লাশ।।



icsbook.info

# প্রেরণার বাতি

সায়মা সাদিয়া

মাসুম ভাইয়া তুমি আমাদের নওতো শুধু স্মৃতি,
তুমি হলে দ্বীনের কাজে প্রেরণার বাতি।
সকল কাজে স্মরণ রাখতে আল্লাহকে ঠিক
ঠিকানা হিসেবে নিয়েছিলে জান্নাতের মসজিদ।
করতে তুমি আল্লাহর কাজ নি:স্বার্থভাবে
তোমার সকল কাজ চিরদিন স্মরণীয় হয়ে রবে
তোমার কাজের উদ্দেশ্য যেন সফল করি মোরা,
ইসলামের বিজয় আনতে যাক পড়ে যাক সাড়া।

# শিপন-মাসুম

ইউসুফ ইসলাম

শিপন সেদিন গিয়েছিল সৎ কাজে,
পরখ করলেন আল্লাহ ঈমানকে।
নত নাহি হলেন বাতিলের কাছে, সে
প্রাণ দিলো কোরআন প্রতিষ্ঠার কাজে।
মাসুমের মুখে ছিল তাকবীর ধ্বনি,
সুবেলায় বলে শাহাদাৎ দেবে মুক্তি।
মরজি তার খোদার পথে দেবে প্রাণ
মুক্তি চায় জালিম থেকে মুসলমান।
কালিমার নিশান হাতে চলছে তারা,
ভয় নাহি করে রক্ষা আল্লাহতায়ালা।
ছাড়লো না যে তারা শিপন, মাসুমকে
ফেলে রেখে সেদিন পল্টন ময়দানে
চলে গেল যে তারা এই পৃথিবী ছেড়ে,
রেখে গেল হাজার স্মৃতি, মোদের মাঝে।



icsbook.info

# স্বর্গবাসী

মুহাঃ রাশেদুল হাসান

ভয় নেই, ভয় নেই শহীদ তুমি হওনি অন্তর্ধান;
দ্বীনের জন্য বিলিয়ে দিয়েছো তাজা রক্ত প্রাণ।
ভাই শিপন হারিয়ে যাওনি তুমি খরস্রোতা নদীর বুকে
বেঁচে আছো তুমি বাংলাদেশের কোটি জনতার মুখে
মোরা শত লাখো ভাই করি হায় হায়! কোথায় গেল
তুমি নেই তাই আজ মা-বাবার পৃথিবীটা এলোমেলো
চারদিকে আজ অনুভব করি ফয়সাল ভাইয়ের কায়া
তোমার লাগি বোনদের হৃদয়ে নেমেছে শোকের ছায়া
ভাই মুজাহিদ তোমার জন্য দোয়া করি সকাল দুপুর সাঁঝে
পাথর বেঁধে বেঁচে আছেন বাবা শূন্য হৃদয়ে মাঝে।
মাসুম ভাইয়ের জননীর আজ দিকে দিকে প্রয়োজন,
খোদার পথে বিলিয়ে দিতে নিজ বুকের ধন,
শহীদ হয়ে সাক্ষ্য দিলে দ্বীন কায়েমের পথে
মরে গিয়ে বেঁচে আছ তোমরা পাক কোরআনের বুকে।
জীবন দিয়ে শিখিয়ে গেলে রাখতে দেশের মান
আসুক যতো বিপদ বাধা, দুঃখ অনির্বাণ
হৃদয়ে মোদের দীপ্ত শপথ জালিমের পথ মোরা রুখবোই
বেঁচে থেকো চিরদিন মোদের মাঝে ওহে স্বর্গবাসী
তোমাদের খুনে বিজয় যেন সহসাই পৌঁছে আসি।



icsbook.info

# শহীদি স্লোগান

আব্দুল্লাহ আল নোমান

পেলব জমিনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিচুটি জমেছে চোখে
আর কতকাল দিন যাবে তোর রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে!
জাতির মাথার উপরে যখন মৃত্যুও ফরমান,
খঞ্জর হাতে যখন পেছনে দাঁড়িয়াছে শয়তান,
তখন কেন এ অলস নিন্দ্রা কেন এই প্রহসন
শীতল রক্তে আগুন জ্বালতে বল আর কতক্ষণ
ঘোষেটি বেগম, রায়দুর্লভ, জগৎ শেঠেরা সবে,
মেতেছে আবার নব-উদ্যমে খুনের মহোৎসবে।
পিচঢালা পথ লাল হলো দেখ তোমার ভাইয়ের খুনে,
নাড়ি ছেঁড়া ধন হারায়ে জননী কাঁদে চেয়ে আসমানে
আর কত দিন কত যুগ পিছনে হঠবি তোরা,
আর কত কাল সইবি আঘাত কুঁজো করে শিরদাড়া
কে আসিস বীর অসম সাহসে আয় সাথে আয় মম,
জীবন বিলাব খোদার পথে খুচরো পয়সা সম।
বুক পেতে নেব তপ্ত বুলেট পুষ্প বৃষ্টি ভেবে,
দিবসের শেষে হয়তো বিজয় নয়তো মরণ হবে।
পতঙ্গ সম তপ্ত অনলে পুড়ব আকস্মাৎ,
ফাঁসির মঞ্চ পার হয়ে নেবো প্রশস্ত জান্নাত।
খালেদের মতো উদ্যোমী হব বাতিলের উৎখাতে
ওমরের মতো সামনে আগাবো খোলা তলোয়ার হাতে।
হামজার মত অন্তর ছিঁড়ে দেব হিন্দার মুখে,
দুজনার ন্যায় অজস্র তীর হাসি মুখে নেব বুকে।
মোদের খুনের কালিতে জমির নতুন দলীল হবে,
যেখানে সত্য ন্যায় কল্যাণ চির অম্লান রবে।
হয়তো তখন আকাশে বসবে শহীদি সম্মেলন,
তাহাদের মাঝে আমরাও রব নবীন শহীদগণ।



icsbook.info

# স্মৃতিতে ভাসমান

আবু ইসহাক

চলছি ঘুরছি, প্রোগ্রাম করেছি এক সাথে
সময়ে সময়ে দুষ্টুমি করেছি তাদের সাথে,
শববেদারি, টিএস টিসি'তে
সোনালি স্মৃতিগুলো এখনও ভাসছে ঝলমল করে
মনে হয় এখনও হয়নি শহীদ মাসুম কিবরিয়া
খেলছে, ঘুরছে, আড্ডা দিচ্ছে তারা,
খেলার মাঠে খেলতে গিয়ে দাওয়াত দিত নামাজের
মসজিদে গিয়ে দাওয়াত দিত কোরআন পড়ার
দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে ধৈর্য হারা হতেন না।

বৈঠকেতে পরামর্শ দিতে কোন দ্বিধা করতেন না
ঈদের দিনে একই জামা পরতেন সকলে
সাথী, কর্মী, সুধী রাস্তায় বের হতেন একত্রে
আনন্দতে ভরে যেতো সবার মনের কোণে
কালো চশমা পরে চোখে
অভিনয়ে পাঠ নিয়েছে র‍্যাবের
আনন্দটা করেছে যত আজাদ ভায়ের সাথে
এত আনন্দ কারো সাথে করার সুযোগ ছিল না তাদের
দীনের পথে হলে শহীদ ঋণী করলে আমাদের
আমরা যেন পারি এ ঋণ শোধ করতে তোমাদের।

স্বপ্নে যখন দেখলাম খেলছো তোমরা জান্নাতে
মন ভরে সাহস বেড়েছে দ্বীনের পথে চলতে
এই ভুবনে নেই তো তোমরা আমরা আছি বেঁচে
দেখা হবে আশাকরি জান্নাতের সোফাতে।



icsbook.info

# রক্ত

মু: মুজাহিদুল ইসলাম

রক্ত, শুধু রক্ত আর রক্ত ঝরে
মানুষের রক্ত আজ ঝরে রাস্তায়
রক্তে রাঙা হয়ে গেছে আজ কালো রাজপথ
লাশের উপর উল্লাস করে হায়েনায়।

আজ বাতাস ভারী হয়ে উঠে
ডুকরে কেঁদে উঠেন মা
মানবতা আজ ধ্বংস করে
ওদের হাতের লগি-বৈঠা
ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের দল
আজ মেতেছে পৈশাচিকতায়
জানিয়ে দিচ্ছে আজ
কতটা পারদর্শী তারা মানুষ মারায়
স্বজনের আহাজারী কান্নার রোল
খালি হয়ে গেছে দেখো শত মায়ের কোল
বর্বরতা দেখে বুক ফেটে আসে কান্না
রক্তে মাখা স্বজনের মুখ দেখে যায় না চেনা
কি অপরাধ ছিল এদের
ভালবেসে আল্লাহকে, ধরেছিল পথ রাসূলের
এটাই কি ছিল তাদের অপরাধ?
তবে জেনে রাখ ব্যর্থ তোরা
শাহাদাৎ লাভই যে ছিল তাদের সাধ।



icsbook.info

# Shaheed Masum

Sayma Sadia

Masum Bhaia you are great
We fell proud by your death.
Because you are Shaheed
We have no more need.
Your walking way was Islam
You always read Holly Quran.
You Maintained what the Quran say
So you will get the Jannat with
smile and gay.

# ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সাল

মো: মাজহারুল ইসলাম (মুজিব)

আটাশ অক্টোবর রক্তে হয়েছিল লাল
ঐদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল
লগি-বৈঠা দিয়ে যারা হত্যা করল অনেক প্রাণ
হত্যা করে শেষ নয় লাশের উপর করে নাচ ও গান
জাহেলি যুগের সকল বর্বরতাকে ঐদিন হার মানায়
টিভি স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখে 'মানুষ ও' জ্ঞান হারায়
সে দিনের চোখের পানি আল্লাহর আরশ কাঁপায়
মুজাহিদরা অই দিন আল্লাহু আকবার হাকায়
মানুষেরা ত্যাগ করে ধর্মনিরেপক্ষ মতবাদ
শহীদদেরকে জানায় প্রাণখোলা জিন্দাবাদ।
ঐ দিন যারা কেড়ে নিল অনেক তরতাজা প্রাণ
মাবুদ তুমি তাদেরকে করো হোদায়াত দান।



icsbook.info

# বুক ফাটা কান্নার রোল

মোহাম্মদ নজমুদ্দীন

আকাশে সূর্য হাসে
হাসে রাতের ঐ পূর্ণিমা চাঁদ।
তবে কেন আজ আমার মায়ের
মধুর জ্যোতিতে মলিনতার সাজ?
কিসের বেদনাতে
দুখের যন্ত্রণাতে
বুকফাটা কান্নার রোল
কার বিদায়ে মা কাঁদছ তুমি?
দেখছ কি ভোল?
আমার ভাইয়ের বিদায়ে কি মা
মলিন করেছ মুখ
ফিরেনি যে তাই
যন্ত্রণাতে কাতর কি মা বুক?
মা ওদের পথ চলা ক্ষণিকের নয়
আল্লাহর প্রেম বুকে বিশ্ব ওদের জয়।
মা শুন ওরা মৃত নয়,
আল্লাহর ঘোষণা পবিত্র কালামে
ওরা সুখ সমৃদ্ধ সব দেখেও
চলছে আল্লাহর পানে।
ওরা ছুটছে শান্তির দীপ্ত সুখে
ওরা চলছে আরশের ছায়ানীড় আশ্রয় খুঁজে
মা তোমার মলিন মুখ ওদের ব্যর্থ বলা হয়
মা তোমার হাসি মুখ জ্যোতিতে
ওদের প্রাণে তৃপ্ততা বয়।
হাসো মা হাসো উদার বক্ষ নিয়ে
অশ্রু তবে ঝরতে পারে স্রষ্টার গুণ গেয়ে।



icsbook.info

# ভুলি নাই ভুলবো না

পাপিয়া হালিম

কাঁদে আসমান কাঁদে জমিন
কাঁদে শিশু ফাতিমা
কোথা মোর ভাইজান
ফেটে যায় ছাতি মা।

পাগলিনী বেশে কাঁদে
বধু মাতা ভগ্নি
কেন মোর বাছারে
কেড়ে নিল ডাইনী?

মৃত্তিকা মাটিরও চোখে জল আজি
বুকে চেপে শহীদের লাশ
পুত্রের জানাজায় পিতার বিলাপ
পৃথিবীর বুক চিরে বহে ঘন শ্বাস।

হায় শিপন, হায় মুজাহিদ
বলে ওঠে রোল সারা বাংলায়
আজি সীমারেরও চোখে জল
বধূ মাতা ভগ্নির কান্নায়।
কোথা বাবা জসিম, কাছে আয়
শোকে বুক ঝাঁঝরা
তাই দেখে ঈমানীদের
ফেটে যায় পাঁজরা।

ফুল পাতাও আজি খসে খসে
পড়ে যায়, বহে শোকাতুর বায়ু
ছিঁড়ে গেছে ঈমানীদের কলিজা
ধরণীরও যেন আজ শেষ আয়ূ।

মুজাহিদের বুকে আছড়ে পড়ে
যেন জবাই করা কবুতর
ভাইজান কই? খুঁজে মালিহা
একবার বাহির একবার ঘর।

নিভে গেল মাসুমের মুখের হাসি
পড়ছে খসে আজি চন্দ্র তারা
পুত্রহারা জননীর শোকে
ফেরেস্তাকুলও বুঝি দিশেহারা।

সাচ্চা ছিল ঈমান যাদের
শহীদ হলো তারা মরে
ঐ কাফেরদের মতো পিঠ ফেরাইনি
শুধু প্রাণটা হাতে করে।

মোরা মুসলিম সিপাহসালার
জীবনের চেয়েও প্রিয় মোদের দ্বীন
শুধু হায় মুজহিদ! হায় শিপন!
করে যেন পার না হয় দিন।

জেগে ওঠো মুসলিম
হাঁকো হায়দারি হাঁক
শহীদের তাজা খুনে আজ
তামাম দুনিয়া লাল হয়ে যাক।

ইব্রাহিমের মতো দিতে হবে
আরো সন্তান কোরবান
জসিম শিপনের স্বপ্ন পূরণে
যায় যাবে আরো লক্ষ প্রাণ।

শহীদের এক ফোঁটা রক্তও যেন
বাংলার জমিনে বৃথা যায় না
আল্লাহর শপথ তোমাদের স্বপ্ন পূরণে
মোরা কভু পিছপা হবো না।



icsbook.info

# তুমি অক্টোপাসের হিংস্র থাবা

মো: আবদুল কাদির

২৮ অক্টোবর!
তুমি অক্টোপাসের হিংস্র থাবা
তোমার ঐ বিশ্রী লেজগুলো
পেঁচিয়ে ধরেছে বিশাল আকাশে
ছড়িয়ে থাকা এক ঝাঁক নক্ষত্র।

২৮ অক্টোবর!
তুমি হায়েনাদের পেটে ধরেছো!
খোলা আকাশের নিচে জামায়াত-শিবির
এক ফুটন্ত গোলাপের বাগান
হায়েনার দলগুলো গোলাপ হতে না পেরে
হিংস্রতা শুরু করেছে।

২৮ অক্টোবর!
তুমি নির্লজ্জ বেহায়া
তোমার শরীরে আছে লাশের দুর্গন্ধ
তুমি রাক্ষুসী জানোয়ার, তুমি হত্যাকারী।

২৮ অক্টোবর!
তুমি সূর্যের ধ্রুবকে গ্রাস করতে চাও
তুমি চোখ মেলে আলো দেখতে পারো না
তোমার অস্তিত্ব জুড়ে অন্ধকার।

২৮ অক্টোবর!
তুমি বেদনার্ত ক্লান্ত পাপী
আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গেছো
বালার্ক দীপ্তি সম আলোর দিশারী
যাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত সমস্ত বিশ্বকে করে উজ্জীবিত।



icsbook.info

# শহীদদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

| নং | নাম | বয়স | সাংগঠনিক মান/দায়িত্ব | শহীদ হওয়ার তারিখ | ঠিকানা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | শহীদ হোসাইন মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম পড়ালেখা : ৩য় বর্ষ বিবিএ অনার্স স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, পিতা : মো: দেলোয়ার হোসেন, পেশা : ব্যবসা, মাতা : মাহমুদা দেলোয়ার (মুন্নি), ভাই : ২, বোন : ১ | ২২ | শিবিরের সদস্য ও মিরপুর ১০নং ওয়ার্ড সভাপতি | ২৮/১০/০৬ | বর্তমান ঠিকানা : ডি-২৩, ৩য় কলোনী, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : কুলশ্রী, পো: দরগাবাজার উপজেলা : চাটখিল জেলা : নোয়াখালী | বায়তুল মোকাররমের উত্তর সড়কে ১৪দলের হামলায় আহত হয়ে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে শহীদ হন। |
| ০২ | শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন, পড়ালেখা : ২য় বর্ষ অনার্স, পদার্থ বিদ্যা, ঢাকা কলেজ, পিতা : মো: তাজুল ইসলাম, পেশা : সরকারি চাকুরিজীবী, মাতা : মোছা: মাহফুজা বেগম, পেশা : গৃহিনী, ভাই : ৩, বোন : ১ | ২১ | শিবিরের সাথী ও ২৭নং ওয়ার্ড বায়তুলমাল সম্পাদক | ২৮/১০/০৬ | বর্তমান ঠিকানা : ১১৯/১/খ, পূর্ব বাসাবো, ঢাকা-১২১৪। স্থায়ী ঠিকানা : ১১৯/১/খ,পূর্ব বাসাবো, ঢাকা- ১২১৪ | বায়তুল মোকাররমের উত্তর সড়কে ১৪দলের হামলায় আহত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শহীদ হন। |
| ০৩ | শহীদ সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম, পড়ালেখা : ১ম বর্ষ অনার্স, ইংরেজি সরকারি তিতুমীর কলেজ, পিতা : মুহাম্মদ মাহতাব উদ্দিন আহমদ, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত, মাতা : শামছুন নাহার রুবি, পেশা : শিক্ষিকা (উপাধ্যক্ষ, ব্রাইটফোর ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা), ভাই : ২, বোন : ৩ | ১৬ | শিবিরের সাথী ও ২৭নং ওয়ার্ড দক্ষিণ সেক্রেটারি | ০২/১১/০৬ | বর্তমান ঠিকানা : ১৩০/১৬, বাগানবাড়ি, মাদারটেক, বাসাবো, সবুজবাগ ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা : ঐ | বায়তুল মোকাররমের উত্তর সড়কে ১৪ দলের হামলায় আহত হয়ে ২/১১/০৬ ভোর ৪টায় ইবনে সিনা হাসপাতালে শহীদ হন। |
| ০৪ | শহীদ আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল, পড়ালেখা : ২য় বর্ষ অনার্স, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, পিতা : মৃত : মো: আহসানুল হাই, মাতা : সাইয়্যেদা হাসনা বানু, পেশা : গৃহিনী, ভাই : ৫, বোন : ২ | ২৪ | শিবিরের কর্মী ও অধ্যয়নরত বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক | ২৯/১০/০৬ | বর্তমান ঠিকানা : পাইনাদী, মোস্তফানগর, সানারপাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। স্থায়ী ঠিকানা : ঐ | সিদ্ধরগঞ্জ চিটাগাংরোডে আহত হয়ে ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শহীদ হন। |



icsbook.info

| নং | নাম | বয়স | সাংগঠনিক মান/দায়িত্ব | শহীদ হওয়ার তারিখ | ঠিকানা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০৫ | শহীদ রফিকুল ইসলাম, পড়ালেখা : এসএসসি পরীক্ষার্থী '০৭, পিতা : মো: আমির হোসেন, পেশা : কৃষক, মাতা: মোছা: রোকেয়া খাতুন, পেশা : গৃহিনী, ভাই : ২, বোন : ২ | ১৫ | শিবিরের সাথী ও ইউনিয়ন সেক্রেটারি | ২৮/১০/০৬ | বর্তমান ঠিকানা : সোভনদহ, ঘোগাদহ, কুড়িগ্রাম স্থায়ী ঠিকানা : চরযাত্রাপুর, যাত্রাপুর, কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম পৌরসভা সড়কে আওয়ামী লীগের লগি-বৈঠার আঘাতে শহীদ হন। |
| ০৬ | শহীদ মো: শাহজাহান আলী, পড়ালেখা : এমএ (ইসলামিক স্টাডিজ), পিতা : মৌলভী সিরাজুল ইসলাম, ৬ ভাই, ২ বোন | ২৫ | শিবিরের সদস্য লাঙ্গলকোট থানা দক্ষিণ সভাপতি | ৩১/১০/০৬ | গ্রাম : উত্তর দূর্গাপুর, পো: দূর্গাপুর বাজার, উপজেলা : কুমিল্লা সদর, জেলা : কুমিল্লা | লাঙ্গলকোট কলেজ মাঠের সন্নিকটে সন্ত্রাসীদের হামলায় শাহাদাতবরণ করেন। |
| ০৭ | শহীদ মুহা: হাবিবুর রহমান, পিতা : মুহা: মকীম মৃধা, মাতা : সাহেরা বেগম, স্ত্রী : আছিয়া বেগম, ছেলেমেয়ে : ২জন, পেশা : ব্যবসা | ৪০ | জামায়াত কর্মী ও ইউনিট সভাপতি, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন | ২৮/১০/০৬ | বর্তমান ঠিকানা : শাহ আলীবাগ, মীরপুর পশ্চিম, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মৃধাকান্দি, শিকার মহল, পো: মিয়ার হাট, কালকিনি, মাদারীপুর। | ২৮ অক্টোবর'০৬ বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট। |
| ০৮ | শহীদ মো: জসীম-১, পিতা : আব্দুর রশিদ খান | ৩৪ | জামায়াত কর্মী | ২৮/১০/০৬ | বর্তমান ঠিকানা : ৭, বকশী বাজার, মিটফোর্ড রোড, লালবাগ (৬৬ নং ওয়ার্ড), ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম+ডাকঘর+পো:+উপজেলা : লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ। | পল্টন মোড়ে লগি-বৈঠা দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করে হত্যা করা হয়। |
| ০৯ | শহীদ মো: জসীম-২, পিতা : মৃত হাজী আনোয়ার উল্লাহ, পেশা : চাকুরি (দক্ষিণ আফ্রিকা), মাতা : ফাতেমা বেগম, ভাই : ৪, বোন : ২, স্ত্রী : নারগিস আক্তার | ৩৪ | জামায়াত কর্মী | ২৮/১০/০৬ | বর্তমান ঠিকানা : ১৪৪০, আউটার সার্কুলার রোড, মুরাদপুর, শ্যামপুর, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : সুধিয়া, পো: বলাখাল, থানা : হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর | পল্টন মোড়ে লগি-বৈঠা দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করে হত্যা করা হয়। |


icsbook.info

| নং | নাম | বয়স | সাংগঠনিক মান/দায়িত্ব | শহীদ হওয়ার তারিখ | ঠিকানা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০ | শহীদ জনাব রহুল আমিন, পিতা : মৃত আবু জাফর, স্ত্রী : সুলতানা রাজিয়া, ছেলে : ২, মেয়ে : ৩ | ৪৫ | রুকন ও জেলা অফিস সম্পাদক | ২৭/১০/০৬ | গ্রাম : লক্ষীপুর, ডাকঘর : জয়দেবপুর, সদর, গাজীপুর | এশার নামাজ আদায় করে ফেরার পথে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় শাহাদাতবরণ করেন। |
| ১১ | শহীদ আরাফাত হোসেন সবুজ, পিতা : ওয়ালিয়ার রহমান, মাতা : সালেহা খাতুন (রুকন), ভাই বোন : ২ ভাই, ২ বোন | ২৩ | জামায়ত কর্মী | ২৮/১০/০৬ | গ্রাম : দরি, পো: পলিতা, সদর, মাগুরা। | বেলা ১১টায় আওয়ামী লীগের হামলায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাতবরণ করেন। |
| ১২ | শহীদ আব্বাস আলী, পিতা : জহুরুল হক, স্ত্রী : আম্বিয়া খাতুন, পেশা : ব্যবসা, ছেলে : ৩ , মেয়ে : ৩ | ২৬ | জামায়ত কর্মী | ২৮/১০/০৬ | গ্রাম : হিজুলী, (হিজুলী হামদর্দ), পো: আমঝুপি, সদর, মেহেরপুর। | মেহেরপুর শহরে আওয়ামী লীগের গুলিতে বিকাল ৫টায় শাহাদাতবরণ করেন। |
| ১৩ | শহীদ জাবিদ আলী, পিতা : হোসেন আলী গাজী, স্ত্রী : আম্বিয়াখাতু, ছেলে : ৩, মেয়ে : ৩, পেশা :ব্যবসা | ৫৫ | জামায়ত রুকন ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি | ২৮/১০/০৬ | গ্রাম : কাপসন্ধা, ইউনিয়ন : খাজুরা, পোস্ট : খাজুরা, উপজেলা : আশাশুনি, সাতক্ষীরা | সন্ধ্যায় সামাবেশ থেকে ফেরার পথে আওয়ামী লীগের হামলায় শাহাদাতবরণ করেন। |
| ১৪ | শহীদ সাবের হোসেন, পিতা : আতিয়ার রহমান, স্ত্রী : ফেন্সী বেগম, ছেলে : ৩ ছেলে, মেয়ে : ১ | ৩২ | জামায়াত কর্মী | ৩০/১০/০৬ | গ্রাম : পূর্ববালা, উপজেলা : জলঢাকা, পো: বালাগ্রাম, জেলা : নীলফামারী | আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হন, পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সন্ধ্যায় শাহাদাতবরণ করেন। |



icsbook.info

icsbook.info

# এলবাম

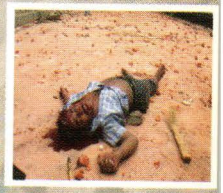

icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর আওয়ামী হামলায় শহীদ যারা

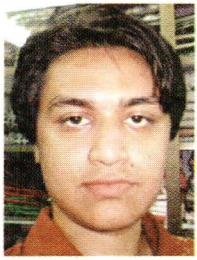

শহীদ মুজাহিদ

শহীদ মাসুম

শহীদ শিপন

শহীদ জসিম-১

শহীদ আরাফাত

শহীদ হাবিব

শহীদ রফিক

শহীদ সাদের

শহীদ জসিম-২

শহীদ ফয়সাল

শহীদ আব্বাস

শহীদ রুহুল আমীন

শহীদ জাবেদ আলী

শহীদ শাহজাহান আলী

icsbook.info

# আওয়ামী নির্যাতনের বিভৎস চিত্র

শহীদ জসিমের ওপর নির্যাতনের এ দৃশ্য শুধু শান্তিপ্রিয় মানুষ নয় আওয়ামী নেতা-কর্মীদের বিবেককেও করেছে দণ্ডিত

হত্যার পর খুঁচিয়ে উল্লাস করা সন্ত্রাসীদের এ দৃশ্য দেখে কি স্বাভাবিক থাকা যায়?

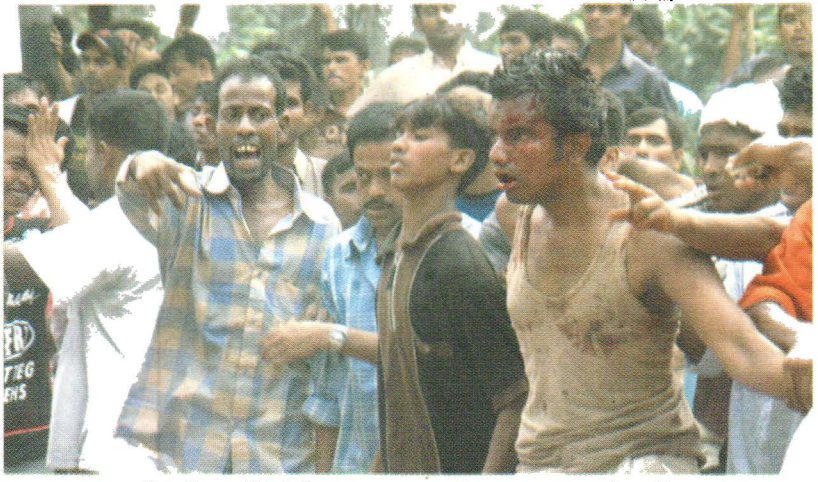

শহীদ জসিমকে লগি-বৈঠা দিয়ে মাথায় আঘাতের পর আঘাত করছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা

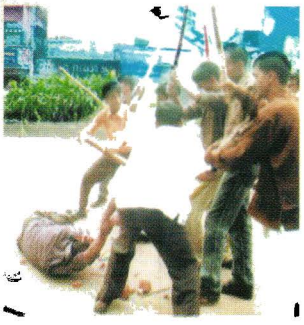

নির্যাতনের এই নির্মম দৃশ্য হার মানায় চেঙ্গিসীয় বর্বরতাকেও

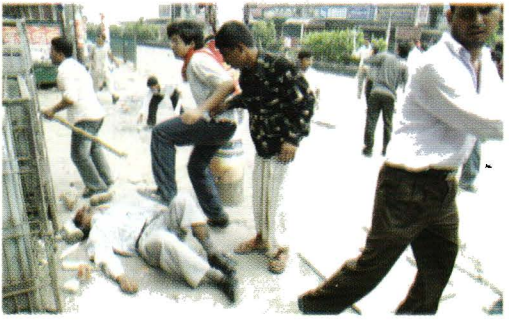

এটি '৭৪-এর রক্ষীবাহিনীর আক্রমণ নয়, ২০০৬ সালের (নব্য রক্ষীবাহিনী) আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তান্ডব

icsbook.info

শহীদ হাবিবুর রহমানের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে যাচ্ছেন তার সাথীরা

জামায়াত কর্মী হাবিবুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করে এভাবেই ফেলে রাখে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা

icsbook.info

শহীদ মুজাহিদকে পিটিয়ে হত্যার পর হাতের পালস দেখে মৃত্যু নিশ্চিত করছে এক যুবলীগ সন্ত্রাসী

আওয়ামী বর্বরতা নির্দয়ভাবে আঘাত করে এভাবেই ক্ষতবিক্ষত করেছে এক জামায়াত কর্মীকে

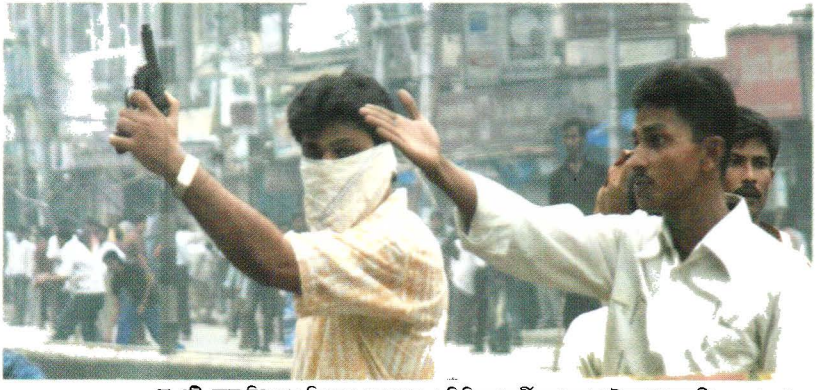

না এটি কোন সিনেমার চিত্র নয়, জামায়াত ও শিবিরের কর্মীদের হত্যার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীদের এ্যাকশান

icsbook.info

পল্টনে জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা

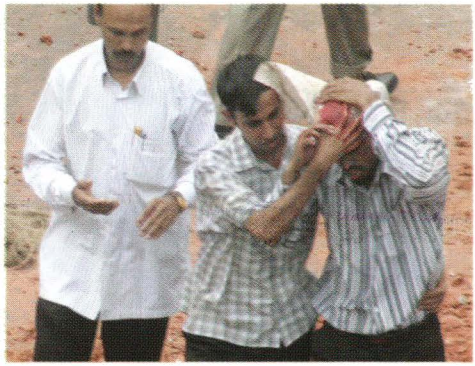

আহত জামায়াত কর্মীকে হাসপাতাল নিয়ে যাচ্ছেন সাথীরা

কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তাকে এভাবেই বিবস্ত্র করে হায়েনারা

মায়ের বুকের শিশুও রেহাই পায়নি আওয়ামী হায়েনাদের হাত থেকে

icsbook.info

গরীব নিরীহ জনগণের দোকানে আওয়ামী লুটেরা এভাবেই আগুন ধরিয়ে কেড়ে নেয় সর্বশেষ আশ্রয়টুকুতে

অগ্নি সংযোগ করে উন্মত্ত আক্রমণ করার জন্য লগি-বৈঠা নিয়ে প্রস্তুত আওয়ামী সন্ত্রাসীরা

আয়েগ্নাস্ত্রে সজ্জিত আওয়ামী সন্ত্রাসীদের কাছে সেদিন পুলিশও ছিল অসহায়

icsbook.info

শুধু আল্লাহর কাছেই বিচার চাইলেন শহীদ মাসুমের গর্বিত মা

শহীদ স্বজনদের এই আহাজারি থামাবে কে?

icsbook.info

ভাবা যায়? শহীদ মুজাহিদের হাসিমাখা এই মায়াবী মুখ আর কোন দিন দেখা যাবে না

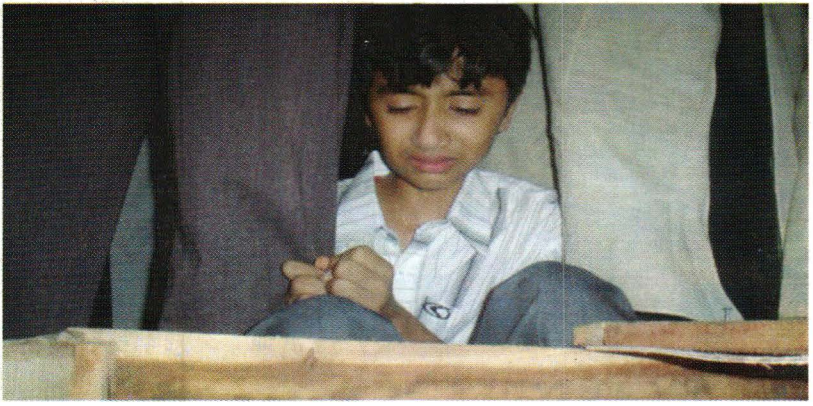

কফিনের সামনে শহীদ মুজাহিদের বাকরুদ্ধ এই ছোট ভাইয়ের নিস্তব্ধতার কি জবাব দেব আমরা?

icsbook.info

শহীদ পরিবারের সাথে মতবিনিময় করছেন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

শহীদ পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

icsbook.info

২৮ অক্টোবরের আওয়ামী ও ১৪ দলীয় সন্ত্রাসীদের রুখতেই এই ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকার সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দের

সারাদেশে আওয়ামী সন্ত্রাসের প্রতিবাদ সমাবেশে চারদলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ

চারদলীয় জোটের সমাবেশে শ্রোতাদের একাংশ

icsbook.info

# শহীদের জানাজা

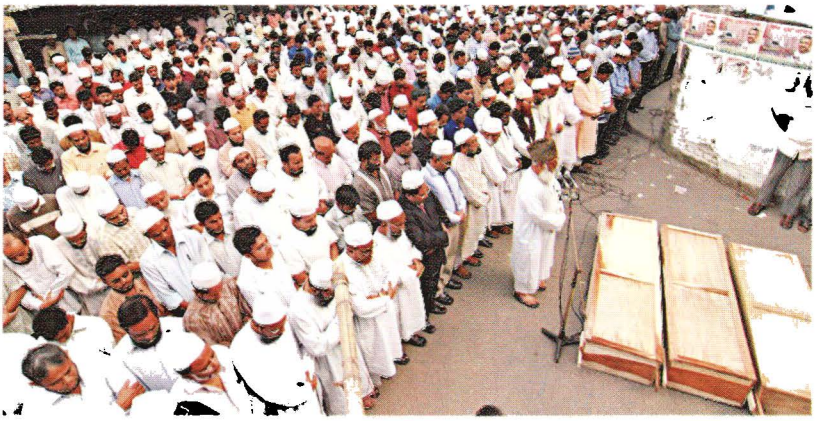

শহীদদের জানাযায় ইমামতি করেন আমীরে জামায়াত

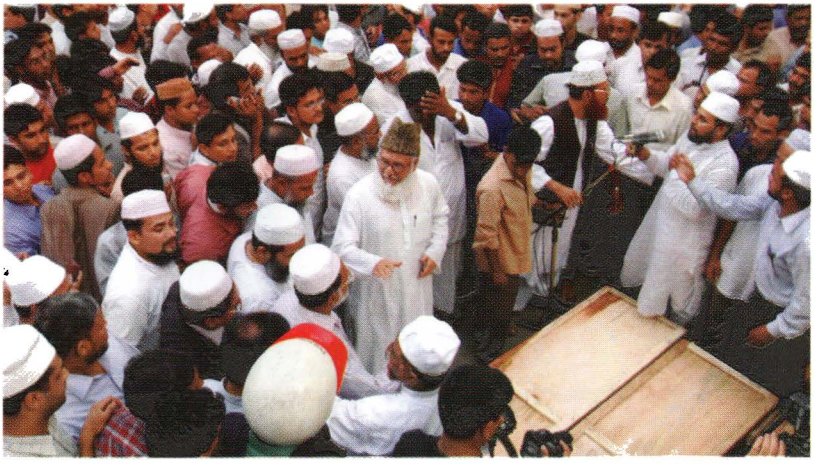

শহীদদের জানাযার পূর্বে বক্তব্য দিচ্ছেন নেতৃবৃন্দ

শহীদদের জানাযায় হাজারো শোকাহত জনতার ভিড়

icsbook.info

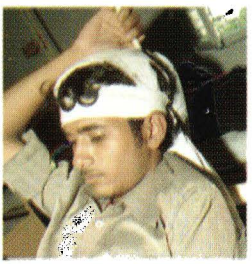

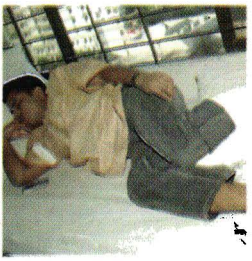

icsbook.info

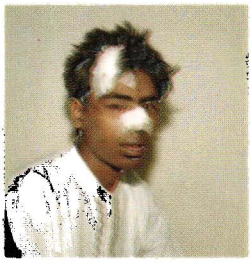

icsbook.info

icsbook.info

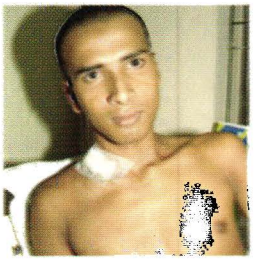

icsbook.info

# আওয়ামী নির্যাতনে গাজী যারা

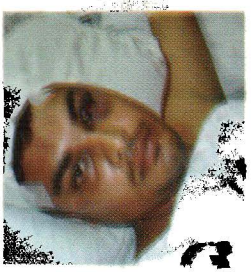

icsbook.info

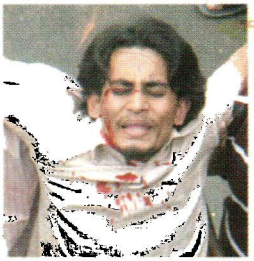
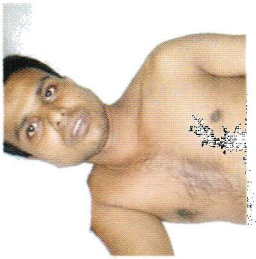

icsbook.info

# চট্টগ্রামে আওয়ামী নির্যাতনের চিত্র

চট্টগ্রামের অলংকারে লগি-বৈঠা হাতে ভাংচুর চালাচ্ছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা

চট্টগ্রামে লগি-বৈঠা হাতে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা

আহত চট্টগ্রাম মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি জাহিদুল ইসলামকে দেখতে হাসপাতালে যান সাবেক মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান
আমীর খুসরু মাহমুদ চৌধুরী ও জামায়াতে ইসলামীর মহানগরীর আমীর
মাওলানা শামসুল ইসলাম সহ নেতৃবৃন্দ

icsbook.info

আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বোমা ও গুলিবর্ষণের মধ্যেও চলতে থাকে জামায়াতের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ

২৮ অক্টোবর '০৬ পল্টনে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের হামলার শিকার আহত ভাইদের দেখতে যান আমীরে জামায়াত

icsbook.info

আহত শিবির কর্মীর পাশে মোনাজাতরত ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সভাপতি

সারাদেশে আওয়ামীলীগের হত্যাযজ্ঞ, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ছাত্রঐক্যের প্রেস ব্রিফিং

শহীদদের স্মরণে এভাবেই রাজপথে বেরিয়ে আসে শোকাহত লাখো সাথীরা

icsbook.info

২০০১ সালে এভাবেই ডা. ইকবালের নির্দেশে আওয়ামী মিছিল থেকে গুলি করে ৪টি লাশ ফেলা হয়

শেখ হাসিনার ঘোষণা– লগি-বৈঠা ছাড়া আসবেন না- তাইতো ওদের এই রণসজ্জা!

পিটিয়ে মেরে ফেলে রাখার এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক গোটা বিশ্ব

icsbook.info

শেখ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া লগি-বৈঠা বাহিনী এভাবেই মেরে রেখে যায় দু'জন জামায়াত কর্মীকে

সভ্যতার এ কোন ভয়াল রূপ! (হায়েনাদের কবলে শহীদ জসিম)

এক শিবির কর্মীকে রামদা ও কিরিচ দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা

icsbook.info

# শহীদ স্বজনদের এই আহাজারী থামাবে কে?

মাসুম মরেনি বেঁচে থাকবে চিরকাল

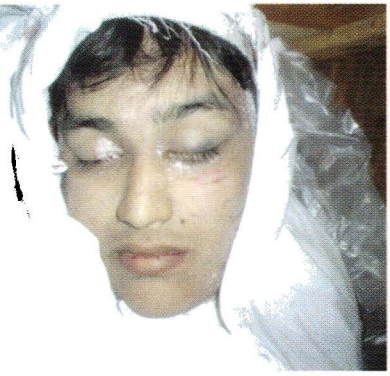

শহীদ মুজাহিদের নিথর দেহ

জাতি জানতে চায়– এই কান্নার শেষ কোথায়? (শহীদ হাবিবুর রহমানের পরিবার)

icsbook.info

পল্টনে আওয়ামী হায়েনার দল এভাবেই পিটিয়ে হত্যা করে শহীদ জসিমকে

শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী ক্যাডার বাহিনী লগি-বৈঠা নিয়ে বেরিয়ে আসে আক্রমনের জন্য

মানবতা বিবর্জিত ১৪ দলের হায়েনারা হাসপাতালে গিয়ে আহতদের ওপর চালায় ২য় দফা চেঙ্গীসীয় বর্বরতা

icsbook.info

চট্টগ্রাম মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি জাহিদুল ইসলামের উপর নৃশংস হামলার দৃশ্য

আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় হাসপাতালের বেডে আহত চট্টগ্রাম মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম

আহত মহানগরী সভাপতি জাহিদুল ইসলামকে হাসপাতালে দেখতে যান কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ

icsbook.info

আহত শিবির নেতাকে ক্লিনিকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁর সাথীরা

ঢাকায় চিকিৎসাধীন শিবিরের সিলেট মহানগরীর সভাপতিকে দেখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ

ঘটনার পর সিলেটের রাজপথে বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতার মিছিল

icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর '০৬
# নারায়নগঞ্জে আওয়ামী নির্যাতনের চিত্র

আওয়ামিলীগ সন্ত্রাসীরা শিবিরের অফিস ভাংচুর করে মটর সাইকেল জ্বালিয়ে দিচ্ছে

২৮ অক্টোবর লগী-বৈঠা হাতে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা রাস্তায় মহড়া দিচ্ছে

২৮ অক্টোবর আওয়ামী হায়েনাদের অস্ত্র ও লাঠি-বৈঠারর আঘাতে আহত শহীদ আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

২৮ অক্টোবর আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার পর অচেতন অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে শহীদ আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল ও ত বড় ভাই ফাহাদ

icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর '০৬
# কুড়িগ্রামে আওয়ামী নির্যাতনের চিত্র

শহীদ রফিক

শহীদ রফিকের কফিন ঘিরে দাঁড়িয়ে সাথীরা

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান

পুড়ে যাওয়া মোটর সাইকেল

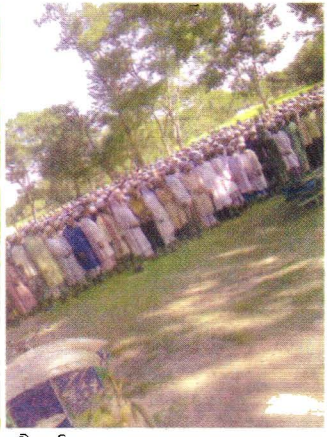

শহীদ রফিকের জানাযার নামাযে শোকাহত জনতা

icsbook.info

বন্ধুদের সাথে শহীদ রফিক ডানে

জানাযা পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কুড়িগ্রাম জেলা আমীর অধ্যাপক আজিজুর রহমান স্বপন

সন্ত্রাসীদের আঘাতে যেন কাঁদছে বালিয়া জামায়াত অফিস

icsbook.info

এভাবেই ভাংচুরে অংশগ্রহণ করে আওয়ামী আইনজীবীরা

হাইকোর্ট চত্বরে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

icsbook.info

প্রধান বিচারপতির এজলাসে এভাবেই জাতীয় পতাকে ভূলুণ্ঠিত করে হামলাকারীরা

icsbook.info

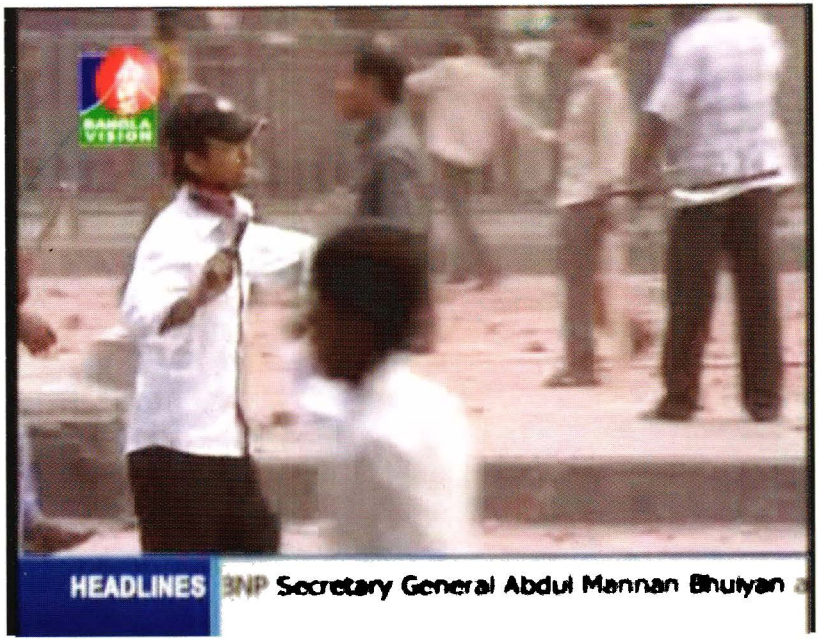

২৮ অক্টোবর '০৬ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ চিত্র ধারণ করছেন তাঁদের ক্যামেরায়

icsbook.info

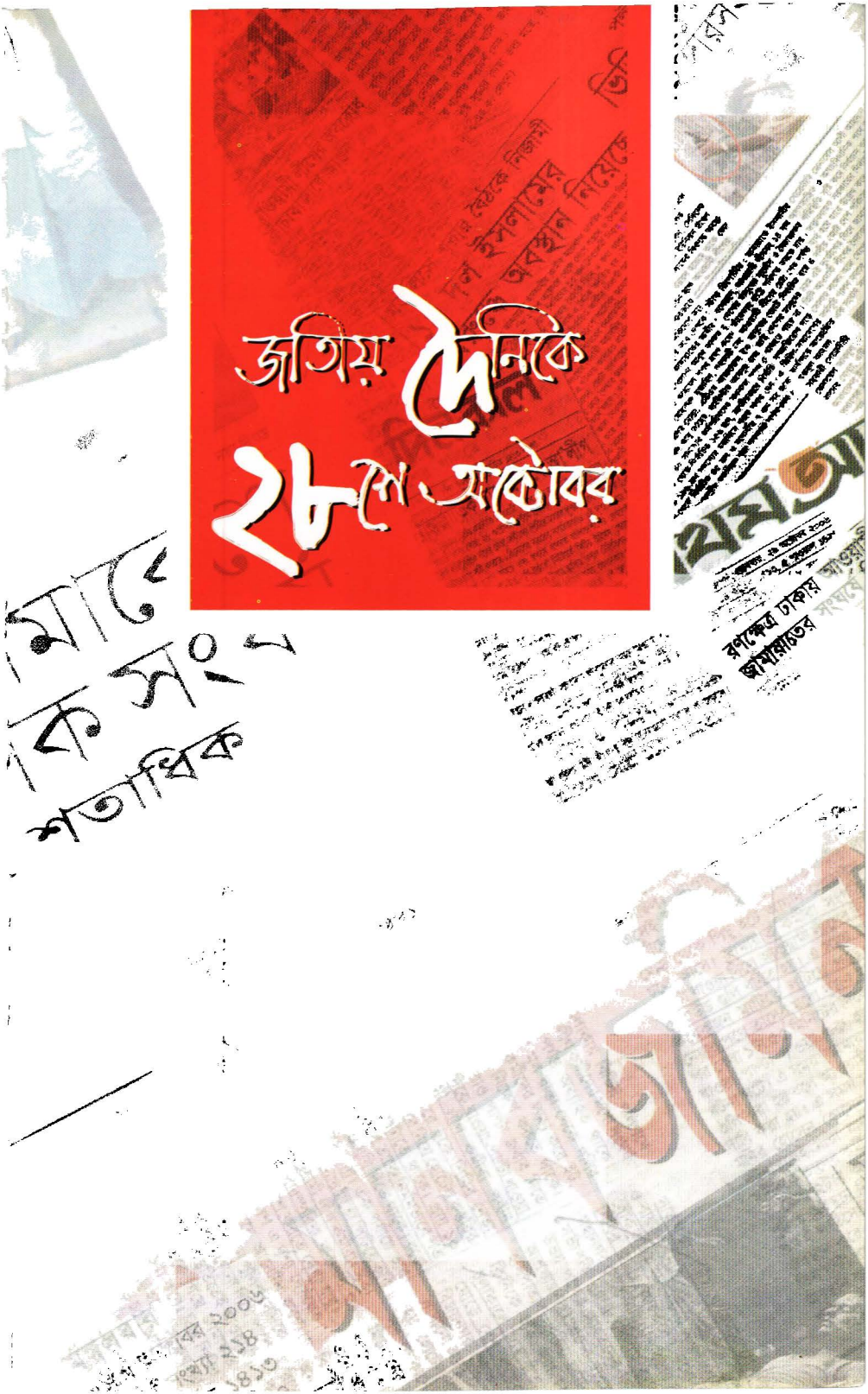


icsbook.info

# মিডিয়ার দৃষ্টিতে
# ২৮ অক্টোবর '০৬

icsbook.info

আইন-শৃঙ্খলার অভিভাবক ও রক্ষক মন্ত্রীরা (সাজেদা চৌধুরী, মোফাজ্জল চৌধুরী মায়া, নাসিম) আদালতের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিলের নেতৃত্ব দেন

চেনা যায় কি? এটা বিচারপতির এজলাস?

icsbook.info

# সুপ্রিম কোর্টে আওয়ামীলীগের হামলা ও ভাংচুর

প্রধান বিচারপতির এজলাসও রক্ষা পায়নি হামলাকারীদের হাত থেকে

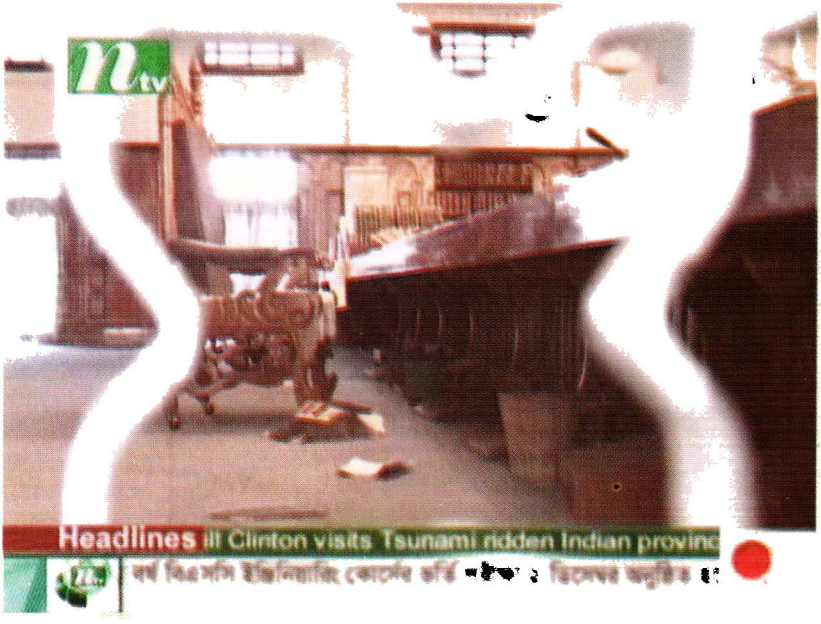


এটি কোন পরিত্যক্ত কক্ষ নয় এটি হামলা পরবর্তী প্রধান বিচারপতির এজলাস

icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর '০৬
# গাইবান্ধা জেলায় আওয়ামী নির্যাতনের চিত্র

২৮ অক্টোবর '০৬ লগি বৈঠার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত সাদুল্যাপুর উপজেলা জামায়াত অফিস

ভাংচুর কৃত গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর উপজেলা জামায়াত অফিস

২৮ অক্টোবর '০৬ ভাংচুর কৃত গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা (বোনারপাড়া) উপজেলা জামায়াত অফিস

২৮ অক্টোবর '০৬ ভাংচুর কৃত জামায়াতের সাদুল্যাপুর থানা সেক্রেটারী এনামুল হকের ব্যক্তিগত মটর সাইকেল

icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর '০৬ ফরিদপুরে জামায়াত-শিবিরের অফিসে আওয়ামী সন্ত্রাসীদরে হামলা

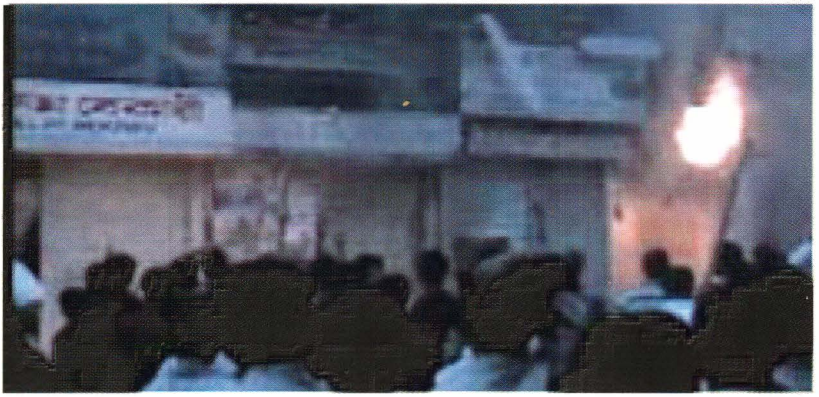

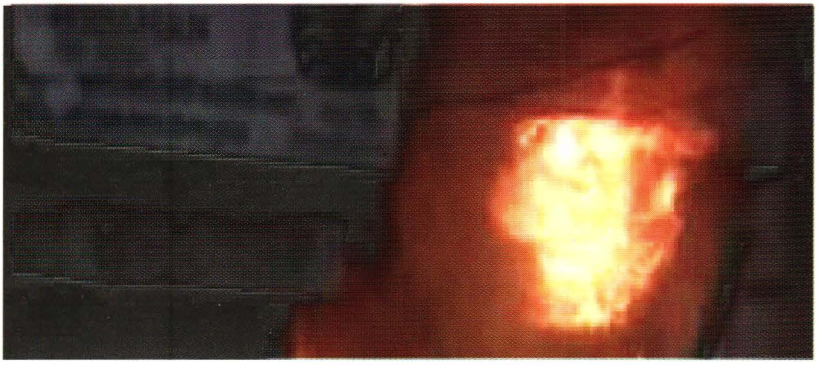

icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর '০৬
# কুমিল্লায় আওয়ামী নির্যাতনের চিত্র

১৩১ তম শহীদ শাহজাহানের ১ম জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয় কুমিল্লা টাউনহল ময়দানে, জানাজা পড়াচ্ছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ম. আ. রব

কুমিল্লা টাউনহল ময়দানে শহীদ শাহজাহানের কফিন সামনে রেখে বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোঃ তাহের এম.পি

জানাজা পূর্ব সমাবেশে ক্রন্দনরত অবস্থায় বক্তব্য রাখেন শহীদ শাহজাহানের ছোট ভাই আলমগীর হোসেন

কুমিল্লায় শোকাহত সাথীদের বিক্ষোভ মিছিল

icsbook.info

# ২৮ অক্টোবর '০৬
# সিলেটে আওয়ামী নির্যাতনের চিত্র

সিটি কমিশনার আজাদের নেতৃত্বে শিবির নেতৃবৃন্দের উপর সন্ত্রাসীদের হামলার দৃশ্য

আহত সিলেট মহানগরী সভাপতিকে দেখতে যান সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান

icsbook.info

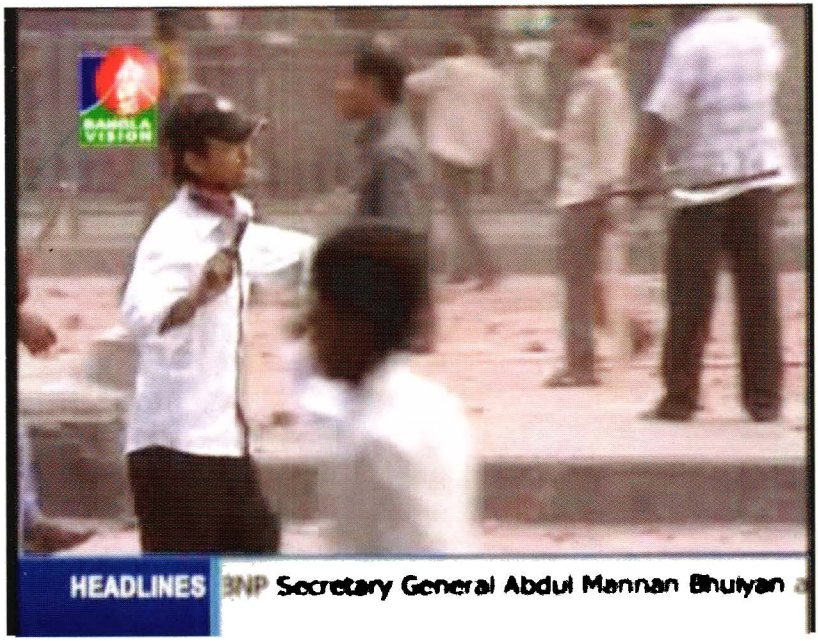

২৮ অক্টোবর '০৬ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ চিত্র ধারণ করছেন তাঁদের ক্যামেরায়

icsbook.info

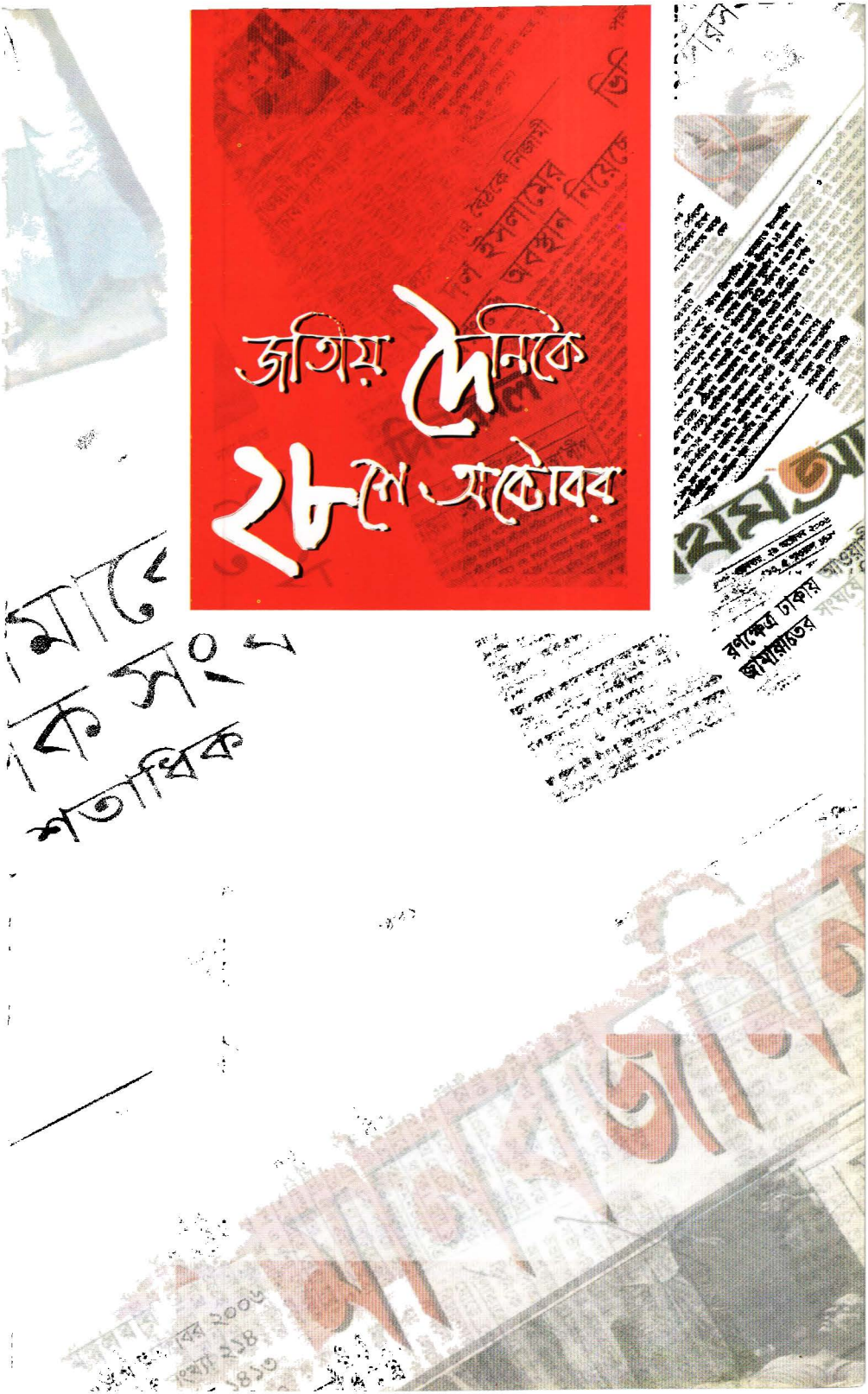


icsbook.info

# পত্রিকার পাতায়
# ২৮ অক্টোবরের আওয়ামীলীগ

মানবজমিন

সাতক্ষীরায় জামায়াত নেতাকে কুপিয়ে হত্যা
সংঘর্ষে আহত ৯০

ঢাকায় মানুষ হত্যার দৃশ্য বিশ্ব মিডিয়ায়

31 OCTOBER 2006

ইত্তেফাক

আশাশুনিতে জামায়াত নেতা খুন

The Daily Star

Jamaat sues Jalil, Inu, Menon

সংগ্রাম

লাঠি-বৈঠা নিষিদ্ধ হলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নে

রাজধানী জুড়ে ১৪ দলের নারকীয় হামল

জামায়াত ও শিবিরের ৪ কর্মীসহ ৭ ব্যক্তির

ভাংচুর বোমাবাজি ও গুলিবর্ষণ

সমকাল

পল্টন রণক্ষেত্র নিহত ৫

আমার দেশ

১৪ দলের অবরোধে রাজধানী অচল

পল্টন-গলিস্তান রণক্ষেত্র

icsbook.info

icsbook.info

# নয়া দিগন্ত

... ১০ কার্তিক ১৪১৩ ... শাওয়াল ১৪২৭, ২৯ অক্টোবর ২০০৬

... পোস্ট ১৪ জন কর্মীসহ নাটোরে পৌঁছে ... ফিরে ... ছবি : ... নয়া দিগন্ত

# জামায়াতের সমাবেশে হামলা : ব্যাপক সংঘর্ষ

## নিহত ৫, আহত ৫ শতাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদক

... ১৪ দল ... সমাবেশে ... হামলা ... ৫ ... ১৪ ... ৫ শতাধিক ... ১৪ দলীয় ... ৫ ... ১৪ ... ৫ ... ১৪ ... ৫ ... ১৪

icsbook.info

# পত্রিকার পাতায়
# ২৮ অক্টোবরের আওয়ামীলীগ

মানবজমিন

সাতক্ষীরায় জামায়াত নেতাকে কুপিয়ে হত্যা
সংঘর্ষে আহত ৯০

ঢাকায় মানুষ হত্যার দৃশ্য বিশ্ব মিডিয়ায়

31 OCTOBER 2006

ইত্তেফাক

আশাশুনিতে জামায়াত নেতা খুন

The Daily Star

Jamaat sues Jalil, Inu, Menon

সংগ্রাম

লাঠি-বৈঠা নিষিদ্ধ হলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নে

রাজধানী জুড়ে ১৪ দলের নারকীয় হামল

জামায়াত ও শিবিরের ৪ কর্মীসহ ৭ ব্যক্তির

ভাংচুর বোমাবাজি ও গুলিবর্ষণ

সমকাল

পল্টন রণক্ষেত্র নিহত ৫

আমার দেশ

১৪ দলের অবরোধে রাজধানী অচল

পল্টন-গলিস্তান রণক্ষেত্র

icsbook.info

icsbook.info

icsbook.info

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM
ঢাকা, রোববার
১৪ কার্তিক ১৪১৩
২৯ অক্টোবর ২০০৬

শনিবার বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে **জামায়াতের** সমাবেশে আওয়ামী লাঠি-বৈঠা বাহিনীর বর্বর আক্রমণের কয়েকটি দৃশ্য

## সারাদেশে ৭ নেতা-কর্মীর শাহাদাত বরণ

# ঢাকায় জামায়াতের সমাবেশে আ'লীগের নৃশংস হামলা

## দিনভর চেষ্টা করেও সমাবেশস্থলে প্রবেশ করতে পারেনি

**জাহেদীন/মিরা হোসেন :** আওয়ামী তাণ্ডবে ঢাকাসহ জামায়াত ও শিবিরের ৭ জন শহীদ ও শত শত আহত হয়েছে। সীমাহীনবর্বরতা, তাণ্ডব, নৃশংস হামলা, সত্ত্বেও আ'লীগ সন্ত্রাসীরা বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে সমাবেশ পণ্ড করতে পারেনি।

পাশি মৈঠা, ছোরা, অস্ত্র দিয়ে দিনভর তাণ্ডবের পরও তাদের অবস্থান সীমাবদ্ধ থাকে মুক্তাঙ্গন ও জিরো পয়েন্টের মধ্যে। আ'লীগের মুক্তাঙ্গনের সমাবেশ থেকে ঘোষণা দিয়ে জামায়াতের সমাবেশস্থল বায়তুল মোকাররম উত্তর সড়কে দিনভর হামলা চালায়। সন্ধ্যায় দখলে হামলায় পুরো এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। এ সময় পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমের উত্তর সড়কে পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশে মঞ্চ তৈরি হচ্ছিল সকাল থেকেই। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পল্টন মোড়ের দিক থেকে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা অতর্কিত হামলা চালায়। তারা ইট-পাটকেল পাশাপাশি মুহুর্মুহু ককটেল নিক্ষেপ করে। এ সময় জামায়াত ইসলামী ঢাকা মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারী নকল ইসলাম বুলবুলসহ কয়েকজন আহত হয়। আ'লীগ সন্ত্রাসীরা এ সময় প্রকাশ্যে পিস্তল উঁচিয়ে গুলী চালায়। (২-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেঃ)

দৈনিক
সংগ্রাম
টেলিগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা নিজামী

# লাঠি লগি বৈঠা নিয়ে আসার নির্দেশদাতারাই জামায়াতের সমাবেশে হামলা ও হত্যাকাণ্ডের হুকুমের আসামী

গত শনিবার বায়তুল মোকাররমের উত্তর সড়কে জামায়াতে ইসলামী আহূত ও পূর্ব ঘোষিত সমাবেশে শেখ হাসিনার বৈঠা-লাঠি-লগি বাহিনী উপর্যুপরি হামলা চালায়। তাদের নৃশংস হামলায় ৫ জন শহীদ ও গুরুতর আহত সহ কয়েকশ নেতাকর্মী আহত হয়। আ'লীগের বর্বর অমানবিক হামলার কয়েকটি খণ্ড চিত্র

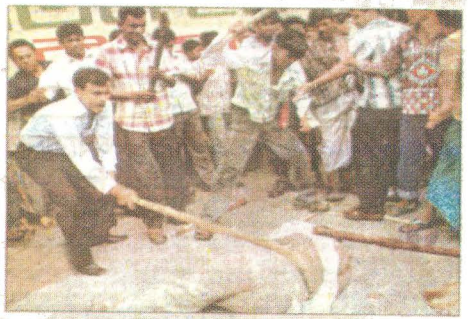

icsbook.info

# দিবাকাল







সন্তান হারা মিতার হৃদয়ভেদী আর্তনাদ

## ফিরিয়ে দাও আমার মুজাহিদকে